শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

সুগন্ধি পুষ্পের মতো সৌরভ বিতরণ করে আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আনন্দের হাটে সকলকে টেনে এনেছেন। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য মানুষের মনকে আশা এবং আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়—তাঁর স্নেহময় দৃষ্টি, সদানন্দময় মুখখানি প্রত্যক্ষ করলে কামনার উপশম হয়, মানবজীবনে রূপান্তর আসে। অন্তহীন বাসনার মাঝে তাঁর অমৃতরস পানে মনাগ্নিতে বারি সিঞ্চিত হয়। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের গুরুত্ব যেরূপ, ভক্তদের কাছে ঈশ্বরতন্ময়তাও সেরূপ। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসান্নিধ্যে দেহ হয় পবিত্র, মন হয় স্থির।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী এবং পবিত্র জীবনলীলার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তাঁর ঈশ্বরীয় রসে নিজেকে অভিষিক্ত করবে, তাঁর নাম গুণকীর্তনের মাধ্যমে কিভাবে বাস্তব জগৎ-এর মোহ থেকে মুক্ত হবার যাদুমন্ত্র শিখবে—'শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে' গ্রন্থখানিতে সাবলীল ভাষায় তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখলেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। পূর্বে এই নামেই পুস্তিকাকারে বইটি উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে বিশাল আয়তনে অনেক সংযোজন ও পরিমার্জন করে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হলো। এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে ভগবৎ ভাবনার গোলাপী নেশায় পাঠক আসক্ত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণের নিবেদন

ঈশ্বরদর্শন ব্যাকুলতার উপর নির্ভর করে। ভোগবাসনা না গেলে ব্যাকুলতা আসে না। এখন এই ব্যাকুলতা হয় কিসে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম বলেন ঃ "সাধুসঙ্গে যাওয়া আসা করতে করতে ব্যাকুলতা হয়। প্রথম দর্শনেই কি আর নূতন বউর পতির জন্য টান হয়? প্রথমে যেতেই চায় না, কত ওজর, কত কান্নাকাটা। মেয়ে পিতামাতার কাছে থাকতে ভালবাসে। তা বলে কি ওখানে বরাবর থাকতে পারে, না থাকা উচিত? পিতামাতা বলে, 'মা, কেঁদো না; ঐটি তোমার আপনার ঘর। ওখানে তোমাকে চিরজীবন থাকতে হবে। ঐ ঘর করতে হবে।' আত্মীয় কুটুম্ব পাঁচজন কত বুঝিয়ে তবে পতির ঘরে পাঠায়। দিন যায়। হঠাৎ মায়ের অসুখ হলো। পিতা মেয়েকে লিখছে, 'মা, পত্রপাঠ চলে এসো। আমাদের বড় বিপদ।' মেয়ে জবাব দিল, 'বাবা, এখন কি করে যাই। ছেলের একজামিন। আবার ওকে অফিসে বেরোতে হয়। আমি না থাকলে এদের খুব কষ্ট হবে। এখন আসতে পারলাম না; আশ্বিন মাসে চেষ্টা করব।'"

নব বধূ যেমন অপরিচিত স্বামীকে আত্মসমর্পণ, সেবা ও ভালবাসার দ্বারা আপন করে নেয়, তেমনি সাধক-সাধিকাকে লৌকিক দৃষ্টিতে অজ্ঞাত ও অপরিচিত ঈশ্বরকে আপন করে নিতে হবে। প্রেমিক যত প্রেমাস্পদের মহত্ত্ব শোনে, ততই তার ভালবাসা বাড়তে থাকে; এবং রূপ ও গুণের যতই চিন্তা করে ততই তার মন মজতে থাকে। ফলে প্রেমিক সাধকের জীবনে তন্ময়তা দেখা দেয়। সে ভগবৎ নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলতেন, "গোলাপী নেশা," "আফিংখেকো ময়ূরের অবস্থা।" আশাকরি এই গ্রন্থখানি ভগবৎ নেশা জাগাবে। এই গ্রন্থের কয়েকটি ঘটনার পুনরুক্তি বাদ দেওয়া গেল না, কারণ তাতে বিষয়বস্তুর গতিশীলতা বিঘ্নিত হতো।

বাসনার অন্ত নেই, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পরিক্রমার ইচ্ছারও শেষ নেই। "শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে" আবার নবরূপে প্রকাশিত হলো। এই পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণে নিচের প্রবন্ধগুলি সংযোজিত হলো (অধিকাংশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত) ঃ ১ বহুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ২ 'রামকৃষ্ণ' একটি নাম ও নামসাধনা ৩ শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝা ৪ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ ৫ শ্রীরামকৃষ্ণ ও কলকাতার লোক ৬ নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৭ 'শেষজন্ম' রহস্য ৮ পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ শিষ্য ৯ ঠাকুর যদি আজ থাকতেন ১০ শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমন।

ভারতে থাকতে আমি রামচরিতের উপর গবেষণা শুরু করেছিলুম, যার ফলে এই প্রবন্ধ দুটি—"রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি" এবং "রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস"—উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ দুটি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে যোগ করলুম, যাতে পাঠকেরা রামকৃষ্ণলীলার সঙ্গে একটু রামলীলা আস্বাদন করতে পারেন।

চেতনানন্দ

ভূমিকা

"কি করলে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়?"—প্রশ্ন করলেন এক নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক আমেরিকান মহিলা। উত্তরে বললুম ঃ দেখুন, রোজ দু-বেলা ধ্যানাভ্যাস করুন। ধ্যানের বিভিন্ন প্রণালী আছে, যেমন রূপের ধ্যান, গুণের ধ্যান, বাণীর ধ্যান, লীলার ধ্যান। এর মধ্যে লীলার ধ্যানটি বড় সুন্দর, সহজ ও সরস। ঈশ্বর যখন মানুষরূপ ধরে দৈবীলীলা করেন তখন তিনি মানুষের ইন্দ্রিয়ের গোচর হন। মানুষ চোখ দিয়ে দেখে অবতারকে, কান দিয়ে শোনে তাঁর কথা, হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাঁর রক্তমাংসের দেহকে। আপনি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করুন—ঐ যীশু চলেছেন পথ ধরে। অগণিত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে। যীশু সাইমনের বাড়িতে ঢুকলেন। পতিতা মেরী ম্যাগডেলেন যীশুর পা ধুইয়ে দিলেন নিজের চোখের জল দিয়ে। তারপর মাথার লম্বা চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিলেন। মেরী তারপর অ্যালাবাস্টারের বাক্স থেকে সুগন্ধি ক্রীম বের করে তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিলেন। করুণাময় ত্রাণকর্তা খ্রীস্ট মেরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

খ্রীস্টের জীবনলীলার এই দৃশ্যগুলি একটার পর একটা দেখতে থাকুন। যত সময় না মানসপটে প্রথম দৃশ্যটি জ্বলজ্বল করে না জ্বলছে পরের দৃশ্যটি দেখবেন না। আস্তে আস্তে সব দৃশ্যগুলি যখন এক এক করে দেখা হয়ে গেল, লক্ষ্য করুন ঘড়ি। দেখবেন, আপনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে পনের-কুড়ি মিনিট যীশুর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। একে বলে লীলার ধ্যান।

এমনি করে মানুষ কৃষ্ণের, বুদ্ধের, চৈতন্যের, রামকৃষ্ণের জীবনলীলার বিভিন্ন অংশ ধ্যান করে তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। ভগবৎ-সান্নিধ্য অনুভবে দেহ পবিত্র হয়, প্রাণ জুড়ায়, মন শান্তিতে ও আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন, "ঈশ্বরকে লাভ করে সংসারে থাকতে হয়।" তাহলে সংসার আর ভার বোধ হয় না। তখন সংসার হয় "মজার কুটি।" ঠাকুর ছিলেন এই মজার কুটির মানুষ। তাঁর কাছে থাকাটাই ছিল একটা মজার ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁর মজার কুটি ও আনন্দের হাটবাজার কি ভেঙে গেছে? না—ভাঙেনি। শ্রীম ঐ আনন্দের হাট ভাঙতে দেননি। তিনি আনন্দের হাটের মালিক শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন ভাবে তাঁর অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' ধরে রেখেছেন তাতে মনে হয় দোকানী তাঁর দোকানের ঝাপ বা দরজা খুলে রেখে পিছনের পর্দার আড়ালে বিশ্রাম করছেন এবং ডাক দিলেই তিনি বেরিয়ে এসে সওদা বিক্রি করবেন। কি তাঁর সওদা? জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ধ্যান-ব্যাকুলতা-সমাধি-মুক্তি।

লোকে বলত, সংসার যাতনা যদি ভুলতে চাও শ্রীমর কাছে যাও। তিনি জানতেন জগৎ ভোলার যাদুমন্ত্র ও কৌশল। তিনি নিজে জগৎ ভুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও কথা অবলম্বন করে। তাঁর কাছে যারা আসত তিনি 'কথামৃত' বর্ষণ করে পাইয়ে দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য। লোকে অনুভব করত ঠাকুরের সজীব লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব জীবন্ত গতিশীল রূপটি আমরা এই গ্রন্থের চারিটি অধ্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি। 'কথামৃত প্রবেশে' পাঠকের মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার ও তাঁর পুণ্যকথা জানবার আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করা হয়েছে। 'কথামৃতের জন্মশতাব্দী'তে দেখানো হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমাগত বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। 'পথে-প্রান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ' কিভাবে পাঠক 'পান্থজনের সখা' ঠাকুরের সঙ্গে ঘুরে জানতে পারবেন 'সংসার বিদেশে' কিভাবে চলতে হয়। মানুষ যখন মরণের মুখোমুখি হয় তখন বলে 'আমার কি হবে?' এই মৃত্যু-ভয় ও অনিশ্চিত ভাবনা থেকে কিভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায় সে কাহিনী রয়েছে 'কৃপাপ্রাপ্ত রসিকে'র ইতিকথায়। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এই প্রবন্ধগুলি ছাপানো হয়েছে। 'রহস্যময় কল্পতরু' প্রবন্ধটি পরে সংযোজিত হয়েছে। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ও শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

আতরের দোকানে ঢুকলে মানুষের নাকে আতরের সুমিষ্ট গন্ধ ঢুকবেই ঢুকবে। মানুষ ইচ্ছা করুক আর না করুক কিছুতেই সে ঐ আতরের গন্ধ রুখতে পারে না। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ ও সান্নিধ্য। ইহা দুর্লভ কিন্তু এর ফল অমোঘ ও আশুফলপ্রদ। ইহা মানুষের জীবনে রূপান্তর এনে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের 'বীক্ষণে মোহ যায়', কামনার উপশম হয়। তাঁর আনন্দে ফুটিফাটা মুখখানির দিকে তাকালে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুল হয়ে যায়, মন আশা ও আনন্দে ভরে যায়। সময় সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে গিয়ে যখন বসি তখন দেখি সেই সব কিছুই রয়েছে, কিন্তু তিনি কোথায়? ভাবি—আজ যদি ঠাকুর স্থূল শরীরে থাকতেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস্ — চেতনানন্দ
সেন্ট লুইস্, মুসৌরী, ইউ. এস. এ

প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় বুঝলাম 'শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে'র প্রতি মানুষের আকর্ষণ আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বড়দিনের ছুটি' প্রবন্ধটি যুক্ত করে দিলাম।

চেতনানন্দ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বহুরূপী রামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ এখন অগণিত মানুষের ইষ্ট দেবতা ও ধ্যানের বস্তু। ধ্যান নানা রকমের হয়, যেমন রূপের ধ্যান, গুণের ধ্যান, লীলার ধ্যান, বাণীর ধ্যান, শাস্ত্রের ধ্যান প্রভৃতি। সাধারণত লোকে রূপেরই ধ্যান করে, কারণ নাম বা মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম রূপটিই মানসপটে ভেসে উঠে। মনের মালিন্যবশত আমরা যখন চোখ বুজে ধ্যান করি তখন অন্ধকার দেখি, কখনও বা কুয়াশার মতো দেখি, কখনও ইষ্টের শরীরের অংশবিশেষ দেখি। আর যাদের মন শুদ্ধ, কামনা-বাসনাহীন তারা ইষ্টের জ্যোতির্ময় আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে পায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, "নাম করবার সময় একটা আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করে নিতে হবে, তাতে nerve (স্নায়ুগুলো) soothed (শান্ত) হয়ে যাবে। ইষ্টমূর্তিকে সহাস্য আনন্দময় ভেবে চিন্তা করতে হয়, নইলে শুঁটকো ধ্যান হয়ে যাবে।"[১]

একবার কানাডার একটি মেয়ে কথাপ্রসঙ্গে বলে, "আমি রামকৃষ্ণের চেয়ে বিবেকানন্দকে বেশি পছন্দ করি।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?" সে বলল, "বিবেকানন্দ খুব handsome." আমি হেসে বললাম, "একবার জনৈক ভক্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বলেছিল, 'মহারাজ, ঠাকুরের ছবি দেখলে—কই তাঁর ব্যক্তিত্ব তো খুব বড় বলে মনে হয় না। বরং স্বামীজীর ছবিতে একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের বিকাশ আছে।' স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ 'না হে, না। ঠাকুর একজন অসাধারণ ও অদ্ভুত লোক। তাঁর ঐ ছবি ষট্‌চক্রভেদের মূর্তি। তাঁর ঐ ভাবঘন মূর্তির দিকে তাকালে মনে হয়—তিনি সব চক্রগুলি ভেদ করে আনন্দসাগরে ডুবে রয়েছেন। আমি ঐ ছবিতে নানা জিনিস দেখতে পাই, তাই বলি।... তাঁকে দেখেছি, তাই বলছি। তাঁর সর্বাঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির একটা তরঙ্গ সদা সর্বদাই খেলা করত।... কী অসীম ক্ষমতার আধার তিনি ছিলেন। সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক—যেখানে যখন ইচ্ছা তিনি বিচরণ করতেন। একবার ঠাকুর নিজের ফটো দেখিয়ে আমাকে বলেন—দেখ। এর ভিতর আমি রয়েছি। একে ধ্যান করবি। ঠাকুরের এ ছবিতে সব আছে।' "[২]

আরতির সময় যখন ঠাকুরের সঙ্গীত গীত হয়—'জ্ঞানাঞ্জন বিমল নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়', তখন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। ঠাকুরের ঐ দিব্য চোখের একটু চাহনি মানুষের সব মোহ বিদূরিত করে দিতে পারে, যেমন আধুনিক যুগে laser beam দিয়ে চোখের ছানি operation করে।

---

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৯৮

২ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১০৭-০৯

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, ইত্যাদি প্রশ্ন উঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পটি ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "একটি গাছের উপর একটি বহুরূপী ছিল। একজন লোক দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলে কালো, তৃতীয় ব্যক্তি হলদে। এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রং দেখে গেল। তারা পরস্পরকে বলছে, না জানোয়ারটি সবুজ। কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে হলদে, আর ঝগড়া করছে। তখন গাছতলায় একটি লোক বসেছিল তার কাছে সকলে গেল। সে বললে আমি এই গাছতলায় রাতদিন থাকি, আমি জানি এইটি বহুরূপী! ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। আবার কখন কখন কোন রং থাকে না।"[৩]

এই গল্পটির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে তিনি ঐ বহুরূপী। সকল ধর্মের ও সকল মতের লোকই তাঁর কাছে আসবে ও চৈতন্য লাভ করবে। ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই। স্বামীজী তাঁকে 'অনন্তভাবময়' বলেছেন। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন,"ঠাকুর বলিতেন—শ্রীভগবানের ইতি নাই। আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের ইতি নাই।" ঠাকুর বর্ণনার অতীত। ঐ প্রসঙ্গে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, "তাঁহার (ঠাকুরের) যে কি বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি। জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।"[৪]

একবার স্বামী সারদানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুরের মূর্তির একটি মাটির মডেল অনুমোদন করার কথায় মহারাজ বলেন, "ঠাকুরের কোন্ মূর্তি অনুমোদন করব? তাঁকে একই দিনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে দেখেছি। কখনও কৃশ ছোট শরীর—এলোমেলো চুল, কখনও গভীর সমাধিমগ্ন দিব্য জ্যোতির্ময়, কখন বারান্দায় জোরে জোরে পায়চারি করছেন—বিরাট শরীর—বড় বড় পা ফেলছেন! কোন্ রূপ অনুমোদন করব?"[৫] যারা দিনরাত ঠাকুরের সঙ্গে থেকেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন—ঠাকুর ছিলেন বহুরূপী।

শাস্ত্রে আছে দেবশরীরের ছায়া পড়ে না। স্বামী অম্বিকানন্দ (নবগোপাল ঘোষের পুত্র) তাঁর মার কাছে শুনেছিলেন, "এক সময় ঠাকুরের শরীরটা যেন crystal এর মতো হয়ে গিছল। (এটা ঠাকুরই দেখেছিলেন) শরীরের ছায়া পড়ত না। তাই দেখে ঠাকুর বললেন, 'মা, একি? ঢুকিয়ে দে। এসব চেপে দে। নইলে এখানে কেউ আসবে না। আমি মানুষের মতো সকলের সঙ্গে মিশব।' "[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে কেমন ছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—কথামৃত ও ছবি। কথামৃতে ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর ক্যামেরার সাহায্যে

---

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫/১৯৯

৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ৫০৫

৫ উদ্বোধন ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫-৫৬

৬. স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরী, পৃঃ ৫৩

তোলা ঠাকুরের ছবি বা আলোকচিত্র আমাদের জানিয়ে দেয় তাঁকে দেখতে কেমন ছিল। অন্যান্য অবতারের রূপ চিন্তা করতে গেলে আমাদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু ঠাকুরের ছবিতে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই তাঁর হুবহু রূপ। এ ছবি তিনি নিজে পূজা করে বলে গেছেন, "কালে এ ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।"[৭] 'একবার জনৈক সাধু শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?" মা তার উত্তরে বলেন, "আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।"[৮]

ধ্যানে গভীরতা আনবার জন্য অনেকে ত্রাটক অভ্যাস করেন, অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর চোখ ফেটে যখন অশ্রু বের হয়, তখন চোখ বুজে ধ্যান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্যিক রূপের বর্ণনাও সাধককে ধ্যানমগ্ন হতে সাহায্য করে। ঠাকুরের নিজ কথা ঃ "তখন (সাধনকালে) এমন রূপ হয়েছিল রে যে, লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে।' গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা।' তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"[৯]

শ্রীশ্রীমা একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের বর্ণনা করেন ঃ "তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের (সোনার মতো উজ্জ্বল হলুদ) মতো ছিল। সোনার ইষ্ট-কবচের (ঠাকুরের হাতে থাকত) সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।... যখন কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত, 'ঐ তিনি যাচ্ছেন।' বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন। যখন খেতে বসতেন, তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থস্‌থস্ করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত। কামারপুকুরে যখন যেতেন, ঘরের বার হলেই মেয়ে মদ্দ হাঁ করে চেয়ে থাকত। একদিন ভূতির খালের দিকে বেরিয়েছেন, চারদিকে মেয়েগুলো—যারা জল আনতে গেছে—হাঁ করে দেখছে আর বলছে, 'ঐ ঠাকুর যাচ্ছেন।'... তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি।"[১০]

সমাধিকালে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থা কিরূপ হতো? এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মীদিদি বলেন, "ঠাকুর সমাধির সময় নিস্পন্দ হইয়া যাইতেন। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িত এবং কখনো কখনো উদরের পার্শ্বদ্বয় কাঁপিত। তখন তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখাইত এবং তাঁহার চারিধারে একটা আলোকরেখা দেখা যাইত।"[১১]

৭ সৎপ্রসঙ্গ, ১/৩০
৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২/৫৭-৮
৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১৯১
১০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২/৫১-৫৩
১১ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণিদেবী, পৃঃ ৩৮

একদিন রাখাল মহারাজের কোন এক শিষ্যকে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বললেন—"দেখ! এক একদিন মনটা এমন থাকে যে, 'যা দেখা যায় তা চট করে মনের মধ্যে বসে যায়। হামনে ত এতবার ঠাকুরের সমাধি দেখেছে, বাকী এক দিনের সমাধিতে তাঁর যা মূর্তি দেখেছি, তার সঙ্গে অন্য কোন মূর্তির তুলনা হয় না। সেদিন ঠাকুরের গায়ের রঙ্‌ কি বদলে গেছিলো! মুখখানিতে এমন অভয় ও করুণা মেশানো ছিল, কি বলবো! এখনো ত হামি সে মূর্তি ভুলতে পারে নি। তোমরা যে ছবিখানি ছাপিয়েছ তার চেয়েও সুন্দর সেই মূর্তিখানি!"[১২]

অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমাতে' লিখেছেন ঃ

"প্রশস্ত ললাট, ঈষৎ রক্তিম কুঁদেকাটা ঠোঁট দুটি, নিরুপম মুখখানি ধীর মন্দ সমীরণে আন্দোলিত কালিন্দীর স্বচ্ছসলিলের ন্যায় মৃদু হাসিতে ঢল ঢল, যেন তায় চাঁদের কিরণ মাখা, পরিমিত গ্রীবা, কণ্ঠে মুরলীর স্বর, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, শোভমান পা দুটি, কমলা অপেক্ষাও কোমল চরণতল, স্পর্শে লৌহদেহ কাঞ্চনময় হয়। যাবতীয় পূর্ণগুণে শ্রীঅঙ্গ পরিপূরিত।

"দেহধারী ভগবানকে চেনা বড় শক্ত। তিনি যে-ভাবে বা যে-রূপেই আসুন না কেন, তিনি চিনবার শক্তি না দিলে কেউ তাঁকে চিনতে পারে না। এক চৈতন্য দ্বারা তাঁকে ধরা যায়। আমি দিবালোকে বস্তু দর্শনের ন্যায় স্পষ্ট দেখছি—ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীদেহখানিতে কেবল চৈতন্য জমাটবাঁধা। জল যেমন খুব ঠাণ্ডা পেয়ে জমাট বেঁধে বরফের আকারে পরিণত হয়, তেমনি ঠিক চৈতন্যই ভক্তির হিল্লোল-যোগে প্রভুদেবের শ্রীদেহখানি হয়েছে।"[১৩]

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থে ঠাকুরের বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমার প্রথম এইরূপ মনে হইল—দক্ষিণেশ্বর থেকে এই যে লোকটি এসেছে, একেই কি বলে 'পরমহংস'? দেখিলাম, লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো; বর্ণ খুব কালো নয়, তবে, কলিকাতার সাধারণ লোকের বর্ণ হইতে কিছু মলিন। গালে একটু একটু দাড়ি আছে, কপচানো দাড়ি। চোখ দুটি ছোট—যাহাকে বলে, 'হাতি চোখ'। চোখের পাতা অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে। ঠোঁট দুটি পাতলা নয়। নীচুকার ঠোঁট একটু পুরু। ঠোঁট দুটির মধ্য হইতে, উপরকার দাঁতের সারির মাঝের কয়েকটি দাঁত একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে। গায়ে জামা ছিল; তাহার আস্তিনটা কনুই ও কব্জির মাঝ বরাবর আসিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে, জামা খুলিয়া পাশে রাখিয়া দিল এবং কোঁচার কাপড়টা লম্বা করিয়া বাঁ-কাঁধে দিল। ঘরটি বেশ গরম হইয়াছিল। একজন লোক বড় এড়ানী পাখা, অর্থাৎ, বড় পাখা লইয়া পিছন দিক হইতে বাতাস করিতে লাগিল। কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষার মতো নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমন কি, কলিকাতা

১২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২১১; ১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা, পৃঃ ১২২, ১৩০

শহরের রুচি-বিগর্হিত। কথাগুলি একটু তোতলার মতো। রাঢ়দেশীয় লোকের মতো উচ্চারণ; ন-এর জায়গায় ল উচ্চারণ করিতেছে, যেমন, 'লরেনকে বললুম', ইত্যাদি। সম্মুখে একটি রঙিন বটুয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কি মসলা আছে; মাঝে মাঝে একটু মসলা লইয়া মুখে দিতেছে।" [১৪]

স্বামী নির্লেপানন্দ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ঠাকুরের দেহের বর্ণনা যোগাড় করে 'রামকৃষ্ণ-সারদামৃত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

(১) স্বামী সারদানন্দের মুখে—তাঁহার মাথার গঠনটি অতি সৌষ্ঠবময় ছিল। অনেকটা ছায়া স্বামীজীতে পাওয়া যাইত। পিছনটা দেওয়ালের মতো চাঁচা ছোলা সাফ্। সিধে। উঁচু নিচু বা বাঁকচোর ছিল না। সম্মুখ ভাগ খোড়োচালের মতো ঢালু। কালীঘাটে যেমন মহাবীরের পটে আঁকা মাথা দেখা যায়। (মাথার গঠন ও আকৃতি স্বভাবের পরিচয় দেয়) —আমি যখন প্রথম দর্শন করি, তখন গায়ের রঙ গৌরবর্ণ। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) অপেক্ষাও এক পোঁচ ফরসা। বুকে কিছু কিছু চুল। (হাসিতে হাসিতে) তা বলে আমার মতো এতো নয়। সাধারণের চেয়ে হাত দুখানি বেশ লম্বা, আজানুলম্বিত বাহু নহে। সেরূপ হইলে অপ্রাকৃতিক হইয়া যাইত।

(২) স্বামীজীর পূর্বাশ্রমীয় ভাই তমু দত্ত প্রমুখাৎ—তাঁর কান দুখানি সাধারণের অপেক্ষা চোখের লাইনের একটু নিচুতে বসানো ছিল। লক্ষ্য করিলে ছবিতে বুঝা যাবে।

(৩) ঠাকুরের চোখ—টানা। অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত। ছেলেবেলা দেশে পিলে দাগাইয়াছিলেন বলিয়া পেটে কয়েকটি চাকা চাকা দাগ দেখা যাইত।

(৪) ঠাকুরের পা খড়ম পা।[১৫]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি স্বামী সারদানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুরের একটা মাটির প্রতিমূর্তি অনুমোদন করার অনুরোধ করেন। মহারাজ স্টুডিওতে গিয়া কিছুক্ষণ সেই মডেলটি নিরীক্ষণ করিয়া শিল্পীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এঁকে কুঁজো করেছ কেন? ইনি কখনও শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে বসতেন না।"

শিল্পী বলিল, "Anatomical measurement (শারীর-বিজ্ঞানের মাপ) অনুসারে সাধারণ মানুষ যদি এইভাবে বসে, তবে একটু কুঁজো হয়ে যায়।" মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর ছিলেন আজানুলম্বিত বাহু; সাধারণ লোকে তা নয়।"

ঐ মূর্তির কান সম্বন্ধে বলিলেন, "সাধারণ লোকের কান ভ্রূরেখার সমান সমান আরম্ভ হয়, কিন্তু ঠাকুরের কান চোখের কোণের রেখা থেকে আরম্ভ, অর্থাৎ তাঁর কান সাধারণ লোকের থেকে নিম্নে।"

সব শুনিয়া সংশোধন করিয়া শিল্পী জানাইলে মহারাজ আর একদিন দেখিতে যান, সেদিন দেখিবামাত্র মূর্তি অনুমোদন করেন।[১৬]

১৪ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ২৯-৩০; ১৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ১৯
১৬ উদ্বোধন ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৬

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ঠাকুরের রূপমাধুরী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রথম দিন যাইয়া দেখি, নরদেবের আকৃতি অতি দীর্ঘ বা খর্ব নহে, মধ্যবিৎ, তবে বাহুযুগল যেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। করতল দুটি পরস্পর সংলগ্ন, যেন কোন অদৃশ্য দেবতার আরাধনা-রত। বক্ষঃস্থল বিশাল ও আরক্তিম, বর্ণ গৌর, হরিদ্রা ও অলক্তক-মিশ্রিত, তবে রৌদ্রতাপে তাপিতের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ। ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে, কপালে যে সিন্দুর-টিপটি আছে, উহারই সঙ্গে সমবর্ণ। চক্ষু দুটি টানা হইলেও হরিকথা শুনিতে শুনিতে যেন শিবনেত্র। আবার চমক ভাঙিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া নেত্র মার্জন করিতেছেন। মধ্যবিৎভাবে কেশ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট হইলেও পারিপাট্যবিহীন। পরিধানে লালপাড় ধুতি, কোঁচা না করিয়া এলোথেলো ভাবে স্কন্ধদেশে নিক্ষিপ্ত। উদরে প্লীহা-চিকিৎসার দাগটি যেন কবচের মতো অঙ্গশোভার উৎকর্ষ করিয়াছে। গঠন এককালে দৃঢ় হইলেও, এখন যেন শিথিল ও কোমল।

"চন্দ্রালোকে গৃহাভ্যন্তর যেমন মৃদু উজ্জ্বল হয়, রূপজ্যোতিতে ঘরটি সেই রকমই হইয়াছে। মুখকমল প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। ভক্তসঙ্গে অমানিভাবে একাসনে বসিয়া ভগবৎকথা প্রসঙ্গে যেন সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কথাগুলি মিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। ফুলের তোড়া বা ধূপ জ্বালানো না থাকিলেও, অনুভব করিলাম,অঙ্গসৌরভে ঘরটি সুবাসিত, অনেকটা যেন পদ্মগন্ধের মতো। শ্রীদুর্গানাম-বিশ্বাসী ও দান-বীর শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, 'কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে যেরূপ দিব্য গন্ধের ঘ্রাণ পাই, এখানেও ঠিক সেইরূপ সৌরভ পাইতেছি।' ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই যেন কত কালের আপনার বলিয়া প্রেরণা আসিল; মন এতই মোহিত হইয়াছিল যে, প্রাণমনে সচেষ্ট না হইলেও, কি জানি কি আকর্ষণে মস্তকটি যেন আপনা হইতেই শ্রীপদে লুটিয়া পড়িল। ঠাকুরও আমাকে তাঁহার আপনার জানিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 'এসেছ—বসো।' ধ্যানমঙ্গল সেই রূপমাধুরী, চিত্রপটে ফুটে নাই, তবে আশ্রিত-হৃদয়ে পরিস্ফুট!

"পুনরপি কোমলেরও কোমল সচ্চিদানন্দ-অনুধ্যানে শ্রীঅঙ্গ এতই কোমল হইয়াছিল যে, ঠাকুরবাড়ির শক্ত লুচি ছিঁড়িতে গিয়া আঙ্গুল কাটিয়া যায়। বস্তুত ঠাকুরের অঙ্গ নবনীতের ন্যায় এতই সুকোমল ছিল যে, তাঁহার অনুকম্পায় পদসেবার অধিকার পাইলেও আশঙ্কা হইত, পাছে আমাদের কঠিন করপরশে শ্রীঅঙ্গে ব্যথা প্রদান করি।

"আবার যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, তখন দেখিয়া বোধ হইত যেন গলিত কাঞ্চনসম উজ্জ্বল, অথচ নবনীত সদৃশ কমনীয় কান্তি প্রভু যেন স্বর্গ হইতে আনীত সুধা ভক্তকুলকে বিতরণ মানসে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় বামভুজ ঈষৎ উত্তোলনসহ প্রসার এবং দক্ষিণ হস্ত কুঞ্চিত করত বামপদ অগ্রসর ও দক্ষিণপদ পিছাইয়া মৃদু মন্থর নৃত্য করিতে করিতে যখন অগ্র বা পশ্চাৎ গমন করিতেন, দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইত যে, কুসুমের ন্যায় কোমল তনু কিরূপে এমন উদ্দাম মধুর নৃত্য করিতে পারে? তখন বোধ হইত, ঢল ঢল রূপরাশি যেন তরল হইয়া ভক্তমধ্যে ঠিকুরিয়া পড়িতেছে। সে অপরূপ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বর্ণন করিতে ভাষা ভাসিয়া যায়; কেবল ধ্যানযোগেই উপলব্ধি হয় মাত্র।" [১৭]

১৭ শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১০৩-০৬

আমাকে কি মনে হয়?

অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের মনের কথা ও ভাব জানতেন। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো নবাগত ভক্তকে প্রথম দর্শনকালে বা একটু ঘনিষ্ঠ হবার পর সহসা জিজ্ঞাসা করতেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয় বল দেখি?" তিনি এ-কথা সবাইকে জিজ্ঞাসা করতেন না; কেবল যাদের আগমনের কথা পূর্বে যোগদৃষ্টি সহায়ে জেনেছিলেন, তাদের মূল্যায়ন করবার জন্য ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উত্তর দিত। "কেহ বলিত, 'আপনি যথার্থ সাধু।' কেহ বলিত, 'যথার্থ ঈশ্বরভক্ত।' কেহ 'মহাপুরুষ', কেহ 'সিদ্ধপুরুষ', কেহ 'ঈশ্বরাবতার', কেহ 'স্বয়ং শ্রীচৈতন্য', কেহ 'সাক্ষাৎ শিব', কেহ 'ভগবান'—ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ—যাহারা ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসবান ছিল না—বলিয়াছিল, 'আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ ভক্তাগ্রণীদিগের সমতুল্য ঈশ্বরপ্রেমিক।' "[১৮]

শ্রীমকে ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেন "আমাকে তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?" উত্তরে শ্রীম বলেন, "আনা এ-কথা বুঝতে পারছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনও কোথাও দেখি নাই।" আর একদিন শ্রীম বলেন, "আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন—যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।" ঠাকুর শুনে হেসে বললেন, "ওরে বলে কিরে!" শেষে বললেন, "মাইরি বলছি আমার যদি একটুও অভিমান হয়।"[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের 'আমি'টা চিরদিনের জন্য মরে গিছল। জ্ঞানাগ্নি তাঁর আমিটাকে পুড়িয়ে দগ্ধ দড়ির মতো করে রেখেছিল। উহাই পাকা আমি—যার দ্বারা কোন জিনিস বাঁধা চলে না। ঐ পাকা আমি নিয়ে তিনি ভক্তদের সঙ্গে লীলা বিলাস করতেন। হাজরার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করবার উদ্দেশ্যে বলছেন, "তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা। আর আমার একটাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম—আমার কত হয়েছে? তা বললে, 'তোমার এখনও লাল্‌চে মারছে—তোমার বার আনা।' "[২০]

"একদিন ঠাকুর কেশব সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?' কেশব সেন কিছুতেই কিছু বলতে চান না। শেষে বললেন, 'আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি করব। আপনার সম্বন্ধে আমি আর কি বলব।' পুনর্বার ঠাকুরের জিদে কেশববাবু বললেন, 'আপনার ষোল আনা জ্ঞান হয়েছে।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'আজ তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হলো না। নারদ, শুকদেব এঁরা যদি বলতেন তাহলে একটু বিশ্বাস হতো।' তিনি কি কেশবকে অপমান করলেন? তা নয়। এইটুকু জানিয়ে দিলেন যে যারা মান, যশ, ইন্দ্রিয়জ সুখ নিয়ে থাকে, তারা বুঝতে পারে না। তাঁর spiritual

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/১৯৩
১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১/৪৫, ৩/৪২
২০ তদেব, ৩/১৯৬

position-টা (আধ্যাত্মিক স্থান) ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন।"[২১]

ঠাকুর লোকমান্যিকে এমন ঝাঁটা মেরেছিলেন যে, সে বেচারা আর কোনদিন তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। ক্যাথলিকদের মধ্যে আছে যে, জীবদ্দশায় তিনটা miracle দেখাতে পারলে সে ভবিষ্যতে saint পদবী পেতে পারবে; আরও অনেক condition আছে। আর আধুনিক যুগে তিনটা fanatic ভক্ত গুরুকে অবতার খাড়া করে দিতে পারে। ঠাকুর মজা করে বলতেন, "পান চিবুতে চিবুতে হাতে ছড়ি নিয়ে যদি বলে আপনি অবতার, তবে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম।"[২২]

জহুরী জহর চেনে। অবতারকে চিনতে হলে সাধনভজন চাই। ভক্তির আতিশয্যে ভক্তরা তাঁকে অবতার বলে ঘোষণা করলে ঠাকুর বলতেন, "কেউ ডাক্তারি করে (রাম দত্ত), কেউ থিয়েটারে ম্যানেজারি করে (গিরিশ ঘোষ), এখানে এসে অবতার বল্লেন। ওরা মনে করে অবতার বলে আমাকে খুব বাঁড়ালে, বড় কল্লে। কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি?"[২৩]

অবতারকে চেনা মুস্কিল। কারণ তিনি 'যোগমায়াসমাবৃতঃ', 'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'। তিনি 'অচিন গাছ', 'ছদ্মবেশী রাজা' 'চৌদ্দ পোয়ার ভেতর অনন্ত আসা।' 'না ধরা দিলে কি পারিস ধরিতে'—তাই তাঁকে ধরা মুস্কিল। উপনিষৎ বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, অন্ধকার রাতে টর্চ লাইট হাতে সার্জেণ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ যদি সার্জেণ্ট সাহেবকে দেখতে চায়, তাঁকে অনুরোধ করতে হবে। তিনি দয়া করে তাঁর আলো যদি তাঁর মুখে ফেলেন তবেই তাঁকে দেখা যাবে। আমরা সূর্যের আলোয় যেমন সূর্যকে দর্শন করি, তেমনি ভগবৎকৃপায় ভগবৎ দর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন রূপে দর্শন দিয়েছেন। এই দর্শনগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন বহুরূপী ঈশ্বর।

বিরাটপুরুষ রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

"গদাধরের (ঠাকুরের) বয়ঃক্রম তখন সাত-আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্তা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশক-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারির মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশত ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা

---

২১ শ্রীম কথা, ২/৬২-৩; ১/৪৪ ২২ শ্রীম কথা, ২/৬২

২৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনা, পৃঃ ৪২৪

যাইতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘকায় পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই; অতএব শীঘ্র একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে, এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি-না!' শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, 'যে পুত্রের জন্মের পূর্ব হইতে আমরা নানা দিব্যদর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা অপদেবতাকৃত—এ-কথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না, বিশেষত, বাটীতে ৺রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখনও সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং এ-কথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না। জানিও ৺রঘুবীর সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন।' "[২৪]

দেব-দেবীর আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন ঠাকুরকে যথার্থ গদাধর (বিষ্ণু) বলে জ্ঞান করতেন। সরলা স্ত্রীলোক বালক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্যকথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনে মোহিত হয়ে অনেকবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন—"হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল দেখি? হ্যাঁ রে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয়।" বালক গদাই শুনে হাসতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। অথবা অন্য কথা পেড়ে ভোলাবার চেষ্টা করতেন। প্রসন্ন কিন্তু ঘাড় নেড়ে বলতেন, "তুই যা-ই বলিস, তুই কিন্তু মানুষ নোস্।"

একবার বালক গদাধর গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আনুড়ের বিশালাক্ষী মন্দিরে যান। "বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং কি অসুখ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের বারংবার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্যন্ত দিল না। পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দিগরমি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন উপায়? দেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়! প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে। এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুরদেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১/৮৬-৭

বসিয়া কখনো ব্যজন, কখনো জলসেক এবং কখনো বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

"কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই তো? সরলপ্রাণ পবিত্র বালক ও স্ত্রীপুরুষের উপরেই তো দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐ কথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে বিশালাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচরিত্রে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও; মা, রক্ষা কর; মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে কূল দাও!'

"আশ্চর্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল। তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।" [২৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা করতে যান। ফিরবার সময় তিনি শুনতে পেলেন, বামনদাস বলছে, "বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এঁকে (ঠাকুরকে) ধরে রয়েছেন।" [২৬]

একবার রেভারেণ্ড যোসেফ কুক কেশব সেনের সঙ্গে স্টীমারে করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান। ঠাকুরও তাদের সঙ্গে স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করবার সময় সমাধিস্থ হন। ঠাকুরের ঐ ভাব ও সমাধি দেখে কুক সাহেব বলেছিলেন, "বাবা, যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে।" [২৭]

মথুরবাবুর ঠিকুজিতে ছিল যে, তাঁর ইষ্টদেবতার তাঁর প্রতি এত কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন, ও রক্ষা করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতেন। মথুর একদিন বলেন, "বাবা, তোমার ভিতর আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র, যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরের শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে।" [২৮]

হলধারী ছিলেন পণ্ডিত, বাক্‌সিদ্ধ এবং ঠাকুরের খুল্লতাত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মত্ততা বুঝতে না পেরে হলধারী ঠাকুরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন; আবার কখনো কখনো ঠাকুরের ঐশ্বরিক আবেশ দেখে মোহিত হয়ে যেতেন। একদিন তিনি হৃদয়কে বলেন, "তুমি নিশ্চয়ই উঁহার (ঠাকুরের) ভিতর কোনরূপ আশ্চর্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার এত সেবা করিতে না।"

---

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৪৮-৯
২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/২০৯
২৭ তদেব, ৪/২৫২
২৮ তদেব, ৪/৪৫

ঠাকুর বলিতেন, "আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাতে কখনো কখনো আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়!' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নেই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক-ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝিতে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হ্যাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া), 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত, 'যা যা মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস, তাই ঐরূপ ভাবিস।' হাসিয়া বলিতাম, 'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না'; —কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয়, অনেকদিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থিরনিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

হলধারী একদিন ঠাকুরকে বলিয়া ফেলেন, "তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন?" ঠাকুর ঐ-কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী!" ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলিপ্রদান করিলেন। উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয়

আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?" হলধারী বলিলেন, "কি জানি, হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না।"[২৯]

কালীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে কালী মানতেন না এবং ছয় বছর ধরে তা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছেন। কিন্তু ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, "তুই মায়ের গোলাম হবি।" এবং পরিশেষে তিনি স্বামীজীকে মা কালীর কাছে সমর্পণ করেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেন, "ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে মা কালীরই অবতার বলবে, এরকম মনে করছ? হাঁ। আমারও মনে হয়, এ-কথা নিঃসন্দেহ যে, মা তাঁর নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।" [৩০]

ঠাকুর একদিন রাত ১২/১টার সময় দক্ষিণেশ্বরে ভাবের ঘোরে বেড়াচ্ছেন। গোলাপ-মা দেখলেন যেন মা কালী বেড়াচ্ছেন। তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।[৩১]

একটি ঘটনা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন ঃ তখন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করি। একদিন দুপুর বেলা গেচি, মা-কালীর মন্দির বন্ধ, ঠাকুর খেয়ে বিশ্রাম করচেন। আমি যেতেই ওঁর বিছানায় বসালেন। এ-কথা সে-কথার পর বলচেন, "একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দে তো!" আমি বল্লুম ঃ "মশায়, ঐটি মাপ করবেন। আমারই পায়ে কে হাত বুলিয়ে দেয় তার ঠিক নাই। বেশ তো গল্প করছিলেন, গল্প করুন।" তথাপি সানুনয়ে তিনি আবার বল্লেন ঃ "দে না, সাধুসেবার ফল আছে।" দু-তিনবার বলার পর পায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড! আমি তো তাজ্জব! লোকটা কি ভৌতিক জানে? সাদা চোখে দেখলুম, মা-কালী সাত আট বছরের মেয়েরূপে তীরবেগে ঘরে ঢুকলেন, ওঁর তক্তপোশে চারধারে কয়েকবার ঘুরপাক খেলেন, পায়ে মল বাজচে, শেষে ওঁর বুকে মিলিয়ে গেলেন। মুচকি হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, "দেখলি, হাতে হাতে সাধুসেবার ফল!"[৩২]

১৮৮৫ সালের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে যান। কালীপূজার আগের দিন ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে বলেন, "পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।" ভক্তেরা তাঁর ঐ-কথায়

২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৫০-৫২
৩০ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১৫৬-৫৭
৩১ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ২৮
৩২ ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃঃ ৯

আনন্দিত হয়ে যথারীতি পূজার জিনিসগুলি যোগাড় করিল। স্বামী সারদানন্দ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

''ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নিকটে পূর্বদিকের কতকটা স্থান মার্জন করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যসকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখনো কখনো আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। সেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ঁজগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণসকল তাহারা এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে! ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

''ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্দরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

''যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন—তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস বলিয়া—ঠাকুর কখনো কখনো নির্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকে এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্য ভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ঁকালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজার আয়োজন?—নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন, এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন! তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা

ধারণপূর্বক তাঁহাতে জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারংবার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।[৩৩]

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের খুব যখন অসুখ বেড়েছে—শ্রীমা কাতর হয়ে পড়ে আছেন, এমন সময় দেখেন—সেই কালো মেয়ে, এত বড় চুল, এসে কাছে বসলেন। মা বললেন—"ওমা, তুমি এলে!" মা কালী—"হাঁ, এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম।" আরও সব কি কথার পর শ্রীমা দেখলেন, ঐ কাল মেয়েটি ঘাড়টি বেঁকিয়ে আছেন; দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঘাড় মাথা অমন বেঁকিয়ে রয়েছ কেন?" মা কালী বললেন—"গলার ঘায়ের জন্যে"। শ্রীমা—"ওমা! ওঁর গলায় ঘা হয়েছে, তোমারও হয়েছে?" মা কালী—"হাঁ"। এইরূপে ঠাকুর ও তিনি যে এক, ইহা মাকে বুঝিয়ে দেন। ঠাকুরের দেহান্তক্ষণে "ওমা, কালী, তুমি আমাদের ফেলে কোথা গেলে গো"—বলিয়া শ্রীশ্রীমা ক্রন্দন করিয়াছিলেন।[৩৪]

শিবরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

কামারপুকুরে প্রতি বৎসর শিবরাত্রিকালে পাইনদের বাড়িতে যাত্রা হতো। নিকটবর্তী গ্রামের দল শিবের মহিমার উপর পালাগান ঠিক করেছিল। কিন্তু যে বালক শিবের ভূমিকায় অভিনয় করবে সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। গ্রামের প্রবীণরা বালক গদাইকে ঐ শিবের পার্ট করবার কথায় ঠাকুর রাজি হন।

"ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে জনৈক পথপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষত সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লী-গ্রামের প্রথামত সহসা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারি ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে ইশারা ও গা ঠেলিয়া 'বাহবা, 'বাহবা', 'গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে,' 'ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর করতে পারবে তা কিন্তু

---

৩৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/৩৩২-৩৪

৩৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ২২-২৩

ভাবিনি', 'ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদেব একটা যাত্রার দল করলে হয়' ইত্যাদি নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একইভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থানপরিবর্তন বা বলা-কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারি ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন, তাহার হস্ত-পদ অসাড়---বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল—বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েছে, নাম কর; আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হলো না দেখচি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েকজন কোনরূপে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই। পরে সূর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।"[৩৫]

ঠাকুর একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে অধরের বাড়িতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড় হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে) পাতাল ফোঁড়া শিব (অর্থাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ), বসানো শিব নয়।"[৩৬]

স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে (৫/১৯৮-৯৯) বৈকুণ্ঠনাথের ঠাকুরের ভিতর শিবদর্শন প্রসঙ্গে বিস্তারিত লিখেছেন। বৈকুণ্ঠনাথ নিজে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে[৩৬ক] যা লিখেছেন, তা এখানে উল্লেখ করলাম ঃ

ঠাকুর এক জনকে (বৈকুণ্ঠনাথকে) কহিতেছেন, "দ্যাখ এক সময় বামনী, (ভৈরবী) বৈষ্ণব চরণ, ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিত, বর্ধমান-রাজার সভা-পণ্ডিত পদ্মলোচন আমাকে অবতার বলেছিল। এখন গিরিশ, রাম, মনোমোহনও আমাকে অবতার বলে; শুনে শুনে অবতারে ঘেন্না হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাকে তোর কি বোধ হয়?" সে বলল, "যাহারা আপনাকে অবতার বলে, তাহারা ইতর।" ঠাকুর স্মিতমুখে কহিলেন, "ওরা সব অবতার বলে আমাকে কত বড় করলে, আর তুই তাদের ছোট লোক বলছিস?" যুবক (বৈকুণ্ঠনাথ) কহিল, "আমার ধারণায় অবতার পূর্ণ নহেন, অংশ মাত্র।" ঠাকুর কহিলেন, "ঠিক বলেছিস। তবে তোর কি বোধ হয়?" সে জানাইল---"আপনি সাক্ষাৎ শিব, অংশ নহেন। কারণ, আপনার উপদেশমত জগৎগুরু শিবের ধ্যান করিতে যাইলে, এক আধদিন নয়, বহুদিন ধরিয়া শিবের স্থানে আপনাকেই দেখিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আপনিই সেই সত্যং শিবং সুন্দরং শিব।"

"তোর ভাবে তুই ঠিক, কিন্তু আমি তার লোমের যোগ্য নই"—বলিয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৫২-৫৪ ৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫/৮৯
৩৬ক পৃঃ ১৪৫-৪৬

শিব-কালীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বলতেন, "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।" যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি অভেদ, তেমনি শিব ও শক্তি অভেদ। ঠাকুরের জীবনে শিব ও কালীর যুগপৎ প্রকাশ হয়েছিল এবং মথুরবাবু তা দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনা[৩৭] ঃ

সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ি ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ি আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীরা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুরবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশি না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুরবাবু কখনো ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনও বা বিষয়-সম্বন্ধীয় এ-কথা সে-কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতেছিলেন। মথুরবাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না।... মথুরবাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

ঠাকুর বলেন, "বললুম, তুমি এ কি করছ? তুমি বাবু রানীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ। সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল! বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম, চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।' এই বলে আর কাঁদে! আমি বল্লুম, 'আমি তো কই কিছু জানি না, বাবু'—কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হলো, পাছে এ-কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রানী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়তো বলবে কিছু গুণ টুন করেছে! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল।"

বিষ্ণু-নারায়ণরূপে

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম গয়াধামে বিষ্ণুমন্দিরে ঁগদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবার জন্য যান। সেখানে তিনি একটা দিব্যস্বপ্ন দেখেন।

---

৩৭ ৩/১৭৫-৭৬

নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু এক দিব্যপুরুষ বীণানিষ্যন্দি মধুর স্বরে বলেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।"[৩৮] এই স্বপ্নের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

ঠাকুর একদিন গৌরীর মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন— "আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে; এটা কি হতে পারে? তোমার কি বোধ হয়, বল দেখি?"

গৌরী তাহাতে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোককল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করে, আপনি তিনিই!" ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ও বাবা! তুমি যে আবার তাকেও (বৈষ্ণবচরণকে) ছাড়িয়ে যাও! কেন বল দেখি? আমাতে কি দেখেছ, বল দেখি?" গৌরী বলিলেন, "শাস্ত্রপ্রমাণে এবং নিজের প্রাণের অনুভব হইতেই বলিতেছি। এ-বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

ঠাকুর বালকের ন্যায় বলিলেন, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি তো কিছু জানি না!"

গৌরী বলিলেন, "ঠিক কথা। শাস্ত্রও ঐ-কথা বলেন—আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কি করে আপনাকে জানবে বলুন? যদি কাহাকেও কৃপা করে জানান তবেই সে জানতে পারে।"

পণ্ডিতজীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।[৩৯]

এক সময়ে মনোমোহন একটি জ্যোতির্ময় মূর্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া তিনি প্রথমে তাহা দেবমূর্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই; কিন্তু পরে যখন তাঁহার পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন সকল দেখিলেন তখন তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। তাহা যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীনারায়ণের ধ্যানমূর্তি তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তিনি সেই মূর্তির নিকট 'জয় শ্রীনারায়ণরূপী রামকৃষ্ণের জয়' বলিয়া প্রণাম করিলেন।[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বালকভক্ত পূর্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ওর বিষ্ণুর অংশে জন্ম।" "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের নিচেই পূর্ণের ঐ-বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে।"[৪১] একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর পূর্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?" ভক্তিগদগদ হৃদয়ের অপূর্ব প্রেরণায় অবশ হয়ে পূর্ণ বলেছিল, "আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" "আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।"[৪২]

৩৮ তদেব, ১/৫৮ ৩৯ তদেব, ৪/৪১ ৪০ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ২৭২
৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/১৯৫ ৪২ তদেব, ৫/১৯৭, শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৪৬

ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থানকালে গৌরীমা একদিন দামোদরের (বিষ্ণুর) অভিষেকের পর দামোদরকে হাতে লইয়া তাঁহাকে মুছাইয়া সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন—সেখানে মানুষের দু'খানি কাঁচা পা আসন জুড়িয়া রহিয়াছে। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত ইহা দেখার ভুল। কিন্তু যতই অভিনিবেশসহকারে দেখিতে লাগিলেন, ততই দেখিতে পাইলেন—দামোদরের সিংহাসনোপরি দুইখানি কাঁচা পা, অথচ দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাইতেছে না।

ভক্তের সহিত ভগবানের লীলাখেলার পরিচয় তাঁহার জীবনে ইতঃপূর্বেও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল, কিন্তু আজিকার এই রহস্যের তিনি কিছুই সমাধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, দামোদর মেঝেতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল, হাত হইতে নারায়ণশিলা কখনও ত পড়িয়া যান নাই? আজ এমন হইল কেন? দামোদরকে তুলিয়া বারবার ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন, পুনরায় অভিষেকান্তে মন্ত্র পাঠপূর্বক তুলসী দিলেন—আবার সেই পা? তুলসী যাইয়া পড়িল সেই পায়! একবার, দুইবার, তিনবার—দামোদরের উদ্দেশে প্রদত্ত তুলসী বারবার সেই পায়েই যাইয়া পড়িল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গৌরীমা ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

গৌরীমার ভাবাবেশ সারা দিন ও রাত্রি ছিল। তারপর দিন সকালে বলরামবাবু সস্ত্রীক গৌরীমাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। যন্ত্রচালিতের ন্যায় গৌরীমা প্রণামকালে দেখেন "সেই পূর্বদৃষ্ট পা দুইখানি।" তিনি শিহরে উঠলেন। ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন, তিনি ঈষৎ হাসছেন।[৪২ক]

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল[৪২খ] লিখেছেন ঃ "বৈদ্যবংশজ যোগীনের জন্মস্থান নদীয়া কৃষ্ণনগর, বৃত্তি সরকারি ছাপাখানার সহকারী কোষাধ্যক্ষ। যোগীন যেদিন প্রভুর কৃপালাভ করে, আমি উপস্থিত। আত্মীয়বোধে পার্শ্বে বসায়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, 'ভগবানের কোন্ রূপ দেখে আনন্দ হয়?' যোগীন বলে, 'তা ত জানি না। তবে বারোয়ারী পূজায় চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখে খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আজ কিন্তু আপনাতেই সেই রূপ দেখছি।' "

স্বামী অভেদানন্দ ঠাকুরের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে ধ্যানাদি করতে আরম্ভ করেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তির নানাভাবে সন্দর্শন করতে লাগলেন। যেমন যেমন দেখতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে এসে উহা ঠাকুরকে জানাতেন। ঠাকুরও শুনে বলতেন, "বেশ হয়েছে," অথবা 'এইরূপ করিস" ইত্যাদি। পরে একদিন স্বামী অভেদানন্দ ধ্যানের সময় দেখলেন যত প্রকার দেবদেবীর মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দেহে মিলিত হয়ে গেল। ঠাকুরকে ঐ কথা নিবেদন করায় ঠাকুর বললেন, "যা তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল। এখন তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবি না।"[৪৩]

৩২ক গৌরীমা, পৃঃ ৭০-৭৫ ৪২খ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৩৩৬-৩৭
৪৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/৮০, স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা, পৃঃ ২২

গদাধররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যোগীন-মা ফুল তুলে আঁচলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর তখন তাঁর উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যোগীন-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নিয়ে যাচ্ছিস গো?" যোগীন-মা ফুল দেখালেন এবং কাছে এসে ঠাকুরের পায়ে ফুল দিলেন। ভাবে ঠাকুর যোগীন-মার মাথায় পা দিলেন। গোপালের মা যোগীন-মাকে ঠাকুরের পদদ্বয় বুকে স্পর্শ করতে বলায় তিনি তাই করলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার অনেক দিন পরে যোগীন-মা জপ করতে করতে শুনলেন এক অশরীরী বাণী, "গদাধরের পাদপদ্মের মতো বুকে চিহ্ন হয়ে গেছে।"[৪৪]

বুড়ো গোপালদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) দেহ রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা কাঁধে গদাধর। গোপালদা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাঁধে গদা কেন?" ঠাকুর বললেন, "আমি গদাধর। এবার এই রকমই, সব ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ব।"[৪৫]

জগন্নাথরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীরধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাক।' "[৪৬]

শ্রীম একদিন বলেন যে ঠাকুর অনেকবার বলেছেন আমাদের, 'আমিই পুরীর জগন্নাথ'। আমাদের কয়েকবারই পুরী পাঠিয়েছিলেন। কি করতে হবে এসব বলে দিতেন। একবার বলে দিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে। মহা ভাবনায় পড়লাম কি করে হয়! তখন আলিঙ্গনের সময় নয়। শেষে এক বুদ্ধি তিনি মনে জাগ্রত করে দিলেন। অনেকগুলি রেজকি পয়সা, কিছু টাকাও ছিল, পকেটে করে নিয়ে গিয়ে সব নিচে ছড়িয়ে ফেললাম গর্ভমন্দিরে। পাণ্ডারা সব ঐ সব কুড়ুচ্ছিল আর আমি এই ফাঁকে রত্নবেদিতে উঠে আলিঙ্গন করলাম। কেউ কেউ দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। আমি ফস্ করে নেমে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারলে না—কে!

"যিনি আমায় বলে দিয়েছিলেন তিনিই বুদ্ধি দিলেন আবার তিনিই পাণ্ডাদের ভিতর লোভ দিয়ে ওদের সরিয়ে দিলেন। এখন ভাবলে অবাক হই, কি করে এ অসীম সাহসের কাজ করেছিলাম!

"ঠাকুরের শরীর থাকতে কয়েকবারই আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে

৪৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ২৬
৪৫ উদ্বোধন, ৫৭ বর্ষ, পৃঃ ৫৮
৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/২৩৭

যেতেন না। বলতেন, ওখানে গেলে এ-শরীর থাকবে না। তাই নিজে যেতেন না।" পুরী থেকে ফিরে এলে ঠাকুর শ্রীমকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, "এই আমারও জগন্নাথকে আলিঙ্গন করা হলো।" [৪৭]

কন্যার মৃত্যুর পর মনোমোহন মিত্র সস্ত্রীক পুরীধামে যান। সেখানে বিসূচিকা রোগে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। যা হোক তীর্থদর্শন মানসে "পুরীধামে পৌঁছিয়াই মনোমোহন যখন ধুলাপায়ে সরাসরি জগন্নাথ দেবের দর্শনমানসে মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন তিনি মন্দির মধ্যে জগন্নাথ দেবের মূর্তির পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি দেখিলেন। যতবার ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন ততবারই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তখন তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'জয় জগন্নাথ রামকৃষ্ণ রূপধারী।' "[৪৮]

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে[৪৯] লিখেছেন, "পুরীর শ্রীমন্দিরে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রবেশ করেছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে, সহসা দেখলেন ঠাকুর হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন। আর বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন অপার্থিব ভাবে পেয়ে তিনি সহসা যেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিপতিত হলেন—তাঁর (হরি মহারাজের) শ্রীমুখে শুনেছিলাম—অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর অদর্শন হয়ে গেলেন।"

নবযুগের মহাপুরুষ গ্রন্থে[৫০] স্বামী তুরীয়ানন্দের দর্শন আরও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১১ এবং ১৯১৭ খ্রীঃ পুরীধামে গমন করেন। উক্ত তীর্থে অবস্থানকালে তিনি একদিন জগন্নাথদেবের দর্শনে যান দিনের বেলা। অরুণ স্তম্ভের পাশ দিয়া মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, সিঁড়ির অন্য পাশ দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামিতেছেন। ঠাকুরের গলায় ফুলের মালা এবং দেহে সাধারণ জামা-কাপড়। ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তিনি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রণামান্তে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন তখন ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার চমক ভাঙিল। হরি মহারাজ বলিতেন, 'জগন্নাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। এইজন্যই ঠাকুর পুরীতে যাইতেন না এবং বলিতেন, পুরীতে গেলে তাঁর শরীরত্যাগ হইবে।' "

লক্ষ্মীদিদি বিভিন্ন সময়ে জগন্নাথরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "বলরামবাবু যখন একদিন মহাপ্রসাদ (পুরীর) নিয়ে গিয়ে তাঁকে (ঠাকুরকে) দিলেন, দেখেছি তিনি উহা মাথায় ঠেকালেন। প্রণাম কল্লেন। ভাব হলো। পরে বললেন, 'জগন্নাথে যেন আমি গেছি। সেখানে সবই বড়, বিরাট। সমুদ্র বড়, আর রাস্তাঘাট সব বড়। আবার জগন্নাথ, তিনিও কৃত বড়। এই শরীর নিয়ে সেখানে গেলে এটা থাকবে নি।' অর্থাৎ জগন্নাথ দর্শন করলে তিনি তাঁর সঙ্গে লীন হয়ে যাবেন।"[৫১]
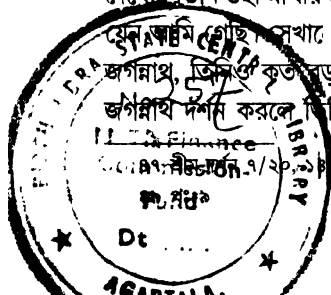
৪৭ শ্রীম দর্শন ৭/২০, [illegible]/৭২
৪৮ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২৪৪
৪৯ [illegible]
৫০ পৃঃ ৩৯৪
৫১ লক্ষ্মীমণিদেবী, পৃঃ ৪৯-৫০

৯ ফাল্গুন ১৩৩২ সাল। লক্ষ্মীদিদি ভক্ত বিপিনের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করতে যান। পথে ঠাকুরের জন্য মন খারাপ হলো। তারপর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে দেখেন, "ঘরের ভিতরে দক্ষিণ দিকে ঠাকুর একটি বেঞ্চের উপর বসে আছেন।" লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরকে দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন, "আমার খুব আফসোস হয়েছিল যে খুড়ো মশায় জগন্নাথ দেখতে পেলেন না।" ঠাকুর তখন লক্ষ্মীদিদিকে বলেন, "আমি জগন্নাথ দেবের কাছেই আছি। তুই এত ভাবছিস কেন? তুই এত ভাবছিলি বলে আমি সাক্ষাৎ তোকে দেখা দিলাম।" আর একদিন লক্ষ্মীদিদি মন্দিরে ঠাকুরকে সদলবলে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হন। তখন শ্রীজগন্নাথ তাঁকে বলেন। "দুঃখ করিও না। আমি যে, তোমার শ্রীরামকৃষ্ণও সেই।"[৫২]

কৃষ্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অম্বিকানন্দ বলেন, তাঁর বাবা নবগোপাল ঘোষ কিভাবে ঠাকুরের ভিতর কৃষ্ণ দর্শন করেন ঃ

আমাদের আগের বাড়িতে, বাদুড়বাগানে। তখন ঠাকুরকে নিয়ে ভক্তরা বাড়ি বাড়ি উৎসব করা আরম্ভ করেছেন। প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন গিরিশবাবু। কালীদানা, রামবাবু-এরা সব। একদিন আমার বাবা বাড়িতে উৎসব করলেন। ঠাকুরকে ভক্ত সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হলো। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সব আয়োজন হলো। এক পাশে ঠাকুরের আসন। ও দিকে মাথুর কীর্তনের জোগাড়ও হয়েছে। ভাল একজন কথকের ভাগবত পাঠের বন্দোবস্তও আছে। কীর্তন হচ্ছে। ঠাকুর ভাবাবেশে আসন ছেড়ে হুংকার দিয়ে একেবারে কীর্তন মধ্যে নাচিতে নাচিতে সমাধিস্থ। শ্রীকৃষ্ণের আবেশে ত্রিভঙ্গ ঠামে বংশীধারী ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান — সে অপূর্ব দৃশ্য। তাকে বেড়িয়া ভক্তদের উদ্দাম কীর্তন। বাবা গোড়েমালা (বড়) আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, পরাইয়া দিলেন। সকলে সে রূপ দর্শনে কৃতার্থ, আনন্দে ভরপুর। কীর্তন শেষে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া আসনে বসেছেন। বাবা এক একবার এসে ঠাকুরের কাছে বসছেন আবার এ-কাজে সে-কাজে এদিক ওদিক যাচ্ছেন। একবার এসে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দেখেন যে, ঠাকুরের গায়ে চন্দ্রজ্যোতি। চোখের ভুল মনে করে চোখ ধুয়ে আবার দেখেন সেই জ্যোতি। এরূপ তিনবার। তার মেজভাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজ ঠাকুরের গায়ের রং কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?' তিনি বলিলেন 'কই না।' বাবা বুঝলেন এ-রূপ তাকেই কৃপা করে ঠাকুর দেখিয়েছেন।[৫৩]

নবগোপালের স্ত্রী নিস্তারিণী বলেন ঃ "ঠাকুর একদিন ভক্তসঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেন। বাড়িতে পৌঁছে তিনি সোজা উপরতলার ঘরে এসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। আমার ঠাকুরঘরে শ্রীকৃষ্ণের একখানি ছবি ছিল। আমি ঠাকুরকে বললুম যে, আমি

৫২ লক্ষ্মীমণিদেবী, পৃঃ ১২৭-২৮

৫৩ স্বামী ধীবেশানন্দের ডায়েরী, পৃঃ ৫৩

কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাই। তিনি নিচে গেলেন এবং সংকীর্তনে মত্ত ভক্তদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারা ঠাকুরের গলায় একটা মোটা, লম্বা ফুলের মালা পরিয়ে দিল—যা তাঁর পায়ে গিয়ে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হয়ে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করলেন। সব ভক্তেরা ঠাকুরের দিব্যদর্শনে উচ্চ ভাবভূমিতে উন্নীত হলেন। পরে ঠাকুর আমাকে বলেন যে, আমি ঐ দর্শনে তুষ্ট হয়েছি কিনা। আমি বললুম, 'আমি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দেখতে চাই।' তিনি হেসে বললেন ঃ 'ওহে, সেজন্য তোমাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।' "[৫৪]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ঃ

"আমি কৃষ্ণ-অবতারে গোপগোপিনী নিয়ে প্রেমের লীলা খেলা দেখিয়েছি।"

আমি কলেজের ছোকরা, ঠাকুরের এই কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে সন্দেহ উঠেছে দেখে তিনি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার কথা বলতে লাগলেন।

"গোপীদের ভালবাসা—ঠিক ঠিক ভগবৎপ্রেম (Divine Love)। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে নিজেদের স্বামী ছেড়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণের ত কোন ঐশ্বর্য ছিল না। তথাপি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। তাঁদের দেহ, মন, চিত্ত সবই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন।

"শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেছিলেন। রাসলীলার সময় তিনি রাসমণ্ডলে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ঐ সময় তাঁর সমগ্র বীর্য ঊর্ধ্বগামী হয়ে জ্যোতিঃ স্তম্ভাকারে সহস্রারে গিয়ে উঠেছিল এবং তিনি গভীর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। গোপীদের ভেতর কেহ কেহ ঐসময় ঐভাবে বিভোর হয়েছিলেন।"

এই সব কথা বলতে বলতে ঠাকুর একেবারে ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন; বাহ্যজ্ঞানশূন্য! গভীর সমাধিস্থ! তারপর আমি তখন তাঁর সেই গোপগোপিনী নিয়ে প্রেমের লীলাখেলা দেখাবার কথা ভাবতে ভাবতে ভগবদ্ ভাবে বিভোর হয়ে গেছি। তখন তাঁর সেই Boundary of the force (প্রভাবের সীমারেখা) ঠিক যেন রাসমণ্ডলের মতো; আমি তার মধ্যে থাকায় আমার রাসলীলার সম্বন্ধে যে veil of ignorance (অজ্ঞানের আবরণ) ছিল তা তখন চলে গেল। আমারও তখন রাসলীলার সম্বন্ধে অভিনব ধারণা বা অনুভূতি হয়েছিল। ঠাকুরের গভীর সমাধি ভঙ্গ হলে পর তিনি হাসতে লাগলেন! এইসব দেখে আমি তখন একেবারে চুপ।[৫৫]

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে পীতবসন করে দে। রামলাল হলুদ বাটিয়া একখানা নূতন কাপড় গাঢ় পীত রঙে ছোপাইয়া আনিয়া ঠাকুরকে পরাইলেন ও তাঁহার গলায় সচন্দন ফুলের মালা দিলেন। বুকে হাত রাখিয়া, পরিহিত বসন ও মালা দেখাইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'পীতাম্বর বনমালী, এবে যজ্ঞসূত্রধারী!' কথাটি বারবার বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া

৫৪ Sri Ramakrishna and His Disciples by Devamata, pp. 125-26

৫৫ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১১৩-১৪

গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কাপড় খসিয়া পড়িল, মালা ছিঁড়িয়া গেল। রামলাল তখন সাদা কাপড় পরাইয়া কৃষ্ণলীলা কীর্তন করিতে লাগিলেন, ঠাকুর গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।[৫৬]

রাধারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

লীলাপ্রসঙ্গকার ঠাকুরের মধুরভাবের সাধনকালে স্ত্রীবেশ গ্রহণ এবং শ্রীরাধিকার দর্শন সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী শাড়ি এবং কখন ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার 'বাবা'র রমণীবেশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন।... স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গ-ভঙ্গি এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, এ-কথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই।... হৃদয় বলিত—"দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদ প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণী বলিতেন—'তাঁহার ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারানী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।' পুষ্পচয়নপূর্বক বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এইকালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখনো কখনো শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐরূপে সাজাইয়া কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় দেহ কখনো কখনো মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্তির স্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারানীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেব-দেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতঃপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই

৫৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ৫১৬-১৭

দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মূর্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।"

উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারানীর শ্রীমূর্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।[৫৭]

বৃন্দাবনের গঙ্গামাতাও ঠাকুরের মধ্যে রাধার আবির্ভাব লক্ষ্য করেছিলেন ঃ

"গঙ্গামাতার তখন প্রায় ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম হইবে। বহুকাল ধরিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রেমবিহ্বল ব্যবহার দেখিয়া এখানকার লোকে তাঁহাকে শ্রীরাধার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সখী কোন কারণবশত স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণা বলিয়া মনে করিত। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ইনি দর্শন-মাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'দুলালি'র এইরূপ অযত্নলভ্য দর্শন পাইয়া গঙ্গামাতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহার এতকালের হৃদয়ের সেবা ও ভালবাসা আজ সফল হইল।"[৫৮]

স্বামীজী ঠাকুরের মধ্যে রাধার দর্শন পান। "প্রায়ই তিনি কলিকাতায় স্বগৃহে বসিয়া সুদূর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যাননিমগ্ন শ্রীমূর্তি দর্শন করিতেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, 'বল্, আমি তোকে ব্রজগোপী শ্রীরাধার সাক্ষাতে নিয়ে যাব।' নরেন্দ্র অনুসরণ করিলেন। একটু দূরে গিয়েই ঠাকুর তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কোথা আর যাবি?' এই বলিয়া তিনি রূপলাবণ্যময়ী শ্রীরাধিকার রূপ ধারণ করিলেন। এই দর্শনের ফল এই দাঁড়াইল যে, নরেন্দ্র যদিও পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের গানই প্রায়শ গাহিতেন, এখন তিনি শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের—অর্থাৎ ভগবানের প্রতি জীবের আকুল আবেদন-নিবেদন, বিরহ-কাতরতাদির গানও গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতাদের নিকট যখন তিনি এই স্বপ্নের কথা বলিলেন, তখন তাঁহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, এ স্বপ্নের মর্ম সত্য?' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয় করি'।[৫৯]

স্বামীজীর এই রাধা দর্শনের পিছনে একটা মহারহস্য লুকিয়ে আছে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থে[৬০] তা উল্লেখ করেছেন ঃ "যত বড় সাধু বা পণ্ডিত হউক না কেন, সংস্কারকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। যাঁহার বিধিতে উহার উদ্ভব, কেবল তাঁহারই করুণায় নিবৃত্তি পায়। এই সংস্কার-প্রভাবে বা নীতিশাস্ত্র-মোহে বা পাশ্চাত্য

৫৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/২৬৬-৭২ ৫৮ ৪/১৩৩
৫৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১/১২০-২১ ৬০ পৃঃ ২১৮-১৯

শিক্ষার আবিলে সুরুচিপূর্ণ নরেন্দ্রনাথ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে কুরুচি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর ভাবিলেন—নরেন্দ্র যদি প্রেমের প্রতিমা শ্রীমতীতে শ্রদ্ধাবান না হয়, তাহাকে চিরদিনের মতো মাধুর্যরসে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। আবার প্রেমহীন হইলে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মচক্র পরিচালন তাহার পক্ষে সুখসাধ্য হইবে না। ইতঃপূর্বে ইচ্ছামাত্রেই যাহাকে নির্বিকল্প অবস্থায় অধিরূঢ় করেন, এখন তাহাকে প্রেমধনে ধনী করিবার বাসনায় শয্যোপরি অঙ্গুলি দিয়া যেমন লিখিলেন—'শ্রীমতী রাধে! নরেন্দ্রকে দয়া কর।' অমনই যেন যাদুদণ্ড চালনায় বা কোন মহাশক্তির (অর্থাৎ নিজ শক্তি) প্রেরণায়, নরেন্দ্রনাথ রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং 'কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিবসত্রয় ভজনের পর, শুষ্ক দার্শনিক সরস হইয়া কহেন—'প্রভুর কৃপায় আজ এক নূতন আলোক পাইলাম। যদি এ-ভাবটা না হইত, তা হলে মাধুর্যবিহনে জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হইত।' "

একদিন দোলের সময় ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে গেলে পর তাঁহার রাধার ভাব হয় এবং সে সময় তিনি কৃষ্ণের গায়ে ফাগ দিতে দিতে "আজি ফাগু রণে, দেখি তুমি হার কি আমি হারি" গান করতে করতে এরূপভাবে ক্রীড়া করেছিলেন যে, যাঁরা সে-দৃশ্য দেখেছেন, তাঁরা মোহিত হয়ে গেছেন।[৬১]

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষভাবের একত্র সমাবেশ ঠাকুরের প্রায় প্রত্যেক ভক্ত উপলব্ধি করেছিল। গিরিশ একদিন কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?" ঠাকুর হেসে তদুত্তরে বললেন, "জানি না।"[৬২] ঠাকুর যখন নারীবেশে জানবাজারের অন্তঃপুরে বাস করছিলেন, তখন মথুর হৃদয়কে সেখানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বল দেখি উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি?" এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করেও হৃদয় সহসা ঠাকুরকে চিনতে পারেননি। মথুরও চৌদ্দ বৎসর ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও নারীবেশে মা দুর্গাকে চামরব্যজনরত ঠাকুরকে চিনতে পারেননি। পরে স্ত্রীর মুখে ঠাকুরের পরিচয় পেয়ে মথুর বলেছিলেন, "তাই তো বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য? দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও আজ তাঁকে চিনতে পারলুম না।"[৬৩]

দক্ষিণেশ্বরে একবার থিয়েটারের অনেকগুলি অভিনেত্রী গিছল। তারা ঠাকুরকে 'সীতা' ও 'সাবিত্রী' অভিনয় করে দেখাল। ঠাকুর তাদের কীর্তনগায়িকাদের দূতীসংবাদ ইত্যাদি অভিনয় করে দেখালেন। কীর্তনগায়িকারা অভিনয়কালে কি করে তাদের বড় নথটি

৬১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, সুরেশ দত্ত, পৃঃ ১০-১১

৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/৩৭ ৬৩ তদেব, ৩/১৯৫

পানের পিচ ফেলে, কি করে হাত নাড়ে, কি করে গলা ও মাথা নাড়ে—তিনি তা অবিকল দেখাতে লাগলেন। অভিনেত্রীরা এতে আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইনি সাধু হয়ে কি করে এত মেয়েলী ঢঙ্ জানেন!"[৬৪]

পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে তাঁর পুরুষ-প্রকৃতির অনুভূতির কথা বলেছেন ঃ "কি অবস্থা গেছে! হরগৌরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে! কখনও সীতারামের ভাবে! রাধার ভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কর্তুম, সীতার ভাবে 'রাম রাম' কর্তুম।... সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতুম, আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হতো। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতুম—দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন।"[৬৫]

অতুলচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দেখেছিলেন, উহা শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে [৬৬] অক্ষয় সেন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দও তাঁর জীবন-কথাতে ঐ ঘটনাটি স্বহস্তে লিখেছেন ঃ

"শ্রীগিরিশচন্দ্রের সহোদর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের এক পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি নাড়ী দেখিয়া রোগীর অবস্থা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। একদিন তিনি রাত্রি প্রায় দশটার পর বাগবাজার হইতে কাশীপুরে আসিয়া দেখেন যে, বাগানের ফটক বন্ধ। ফটকে বহু ধাক্কা দিয়া কাহারও সাড়া পাইলেন না। তথাপি নিরস্ত না হইয়া ফটকের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। অবশেষে গোপালদাদা শব্দ শুনিয়া ফটক খুলিয়া দিলেন এবং অতুলকৃষ্ণ বাগানে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন শশী মহারাজ ঠাকুরের অঙ্গে পাখার বাতাস করিতেছেন এবং একপার্শ্বে লাটু মহারাজ নিদ্রিত রহিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণকে দেখিয়া শশী মহারাজ তাহার হাতে পাখা দিয়া নিচে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন বালাপোশ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছিলেন।

"কিছুক্ষণ পরে অতুলকৃষ্ণের অপূর্ব দর্শন হইল—শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণ অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাম অঙ্গে শ্রীরাধা। এই যুগল মূর্তি দর্শন করিয়া অতুলকৃষ্ণ মনে করিলেন ইহা তাহার hallucination মস্তিষ্কের বিকার। এমন সময় শরৎমহারাজ সেবা করিবার জন্য ঘরে উপস্থিত হইলেন। তখন ঠাকুর মুখের ঢাকা খুলিলেন এবং অতুলকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি গো, তুমি এখানে কখন এসেছ? এখন তুমি নিচে বিশ্রাম করগে। শরৎ আমার কাছে থাকবে।' অতুল নির্বাক হইয়া নিচে চলিয়া গেলেন এবং সেই যুগলরূপ দর্শন জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই।"[৬৭]

বালগোপালরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরীয় দর্শন প্রসঙ্গে ঠাকুর বলতেন, "যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম

৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ১৪৮-৪৯ ৬৫ তদেব, ২/২৪৫, ৩/১৬৯
৬৬ পৃঃ ৬১৩-১৫ ৬৭ মন ও মানুষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২—আমার জীবন-কথার পাণ্ডুলিপি

পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা—তারপর দ্বিভুজা—তখন দশহাত নাই, অত অস্ত্রশস্ত্র নাই। তারপর গোপাল মূর্তি দর্শন—কোন ঐশ্বর্যই নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্তি।''[৬৮] শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঐশ্বর্যহীন পবিত্র প্রেমের মূর্তিধারী গোপালরূপে ভক্তদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন।

''ভৈরবী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। আর, এদিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখন কখন কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপাল বিরহে কাতরা নন্দরানী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।''[৬৯]

অঘোরমণি দেবীর গোপাল দর্শন-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

'কামারহাটীর ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বামদিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মতো দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, ''একি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন?'' গোপালের মা বলেন, ''আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ-কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ-পানে চেয়ে (সে কী রূপ, আর কী চাউনি!) বললে, 'মা, ননী দাও'।'' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা। চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চিৎকার নয়, বাড়িতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হতো। কেঁদে বল্লুম, ''বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায়

৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/৫ ৬৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/২২৭-২৮

কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা!" কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে— কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল-লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বল্লুম, "বাবা, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।"

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হলো অমনি পাগলিনীর মতো ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লো—কাঁধে মাথা রেখে! এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চল্লুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে!"

অঘোরমণি ঐরূপ ভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কি কথাই না বলিলেন! "এই যে গোপাল আমার কোলে," "ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতরে ঢুকে গেল," "ঐ আবার বেরিয়ে এলো," "আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখন বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখন বা উজ্জ্বল বালক-মূর্তিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলা তরঙ্গতুফান তুলিয়া তাহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল! সে প্রবল ভাবতরঙ্গে পড়িয়া কেই বা আপনাকে সামলাইতে পারে!

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মার ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং ঘরে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী ছিল সেসব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ-জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচো!" ইত্যাদি।

সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল।[৭০]

পরবর্তী কালে বলরাম বাবুর বাড়িতে উল্টোরথের সময় ঠাকুর কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেই কালে অঘোরমণিদেবী ঠাকুরকে দেখতে আসেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। আমরা সকলেই বালগোপালের ধাতুময়ী মূর্তি দেখিয়াছি—দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও

৭০ তদেব, ৪/২৬৯-৭৩

এক হাত তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদ-সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে! ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ঠিক সেইরূপ সংস্থান হইয়া গেল, কেবল চক্ষু দুটি যেন বাহিরের কিছুই দেখিতেছে না, এইরূপ ভাবে অর্ধনিমীলিত অবস্থায় রহিল! ঠাকুরের এইরূপ ভাবাবস্থারম্ভ হইবার একটু পরেই গোপালের মারও গাড়ি আসিয়া বলরামবাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল এবং গোপালের মাও উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন! উপস্থিত সকলে, গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল-ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা করিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, 'কী ভক্তি, ভক্তির জোরে ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালরূপ ধারণ করিলেন', ইত্যাদি। গোপালের মা বলিলেন, "আমি কিন্তু বাবু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, ও কি! একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই!"[৭১]

রামচন্দ্ররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের ইষ্টদেবতা ছিলেন ভগবান রামচন্দ্র। তিনি একদিন গ্রামান্তর থেকে ফিরিবার কালে পথপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করবার সময় নিদ্রাবিষ্ট হন। তখন ক্ষুদিরাম স্বপ্নে দেখেন তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীর রামচন্দ্র নবদূর্বাদলশ্যাম বালকবেশে তাঁর সম্মুখে এসে একটা স্থান বিশেষ নির্দেশ করে বলেন, "আমি এখানে অনেক দিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার সেবা গ্রহণ করতে আমার একান্ত অভিলাষ হয়েছে।" ক্ষুদিরাম নিদ্রাভঙ্গে সে-স্থানে গিয়ে একটি শালগ্রামশিলা পান এবং সযত্নে গৃহে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।[৭২]

ক্ষুদিরাম অতি দরদের সঙ্গে শালগ্রামরূপী রঘুবীরের নিত্য সেবা করতেন। একদিন তাঁর সাধ হলো প্রভুকে মালা পরাতে। তিনি পুষ্প চয়ন করে মালা গেঁথে পূজাসনে বসলেন। মালাটি দেখে বালক গদাই এর ইচ্ছা হলো উহা পরতে। রঘুবীরকে স্নান করিয়ে আসনে বসাবার পর ক্ষুদিরাম চোখ বুঁজে ধ্যান শুরু করলেন। এই অবসরে গদাই সেই মালা পরলেন। রামকৃষ্ণ পুঁথিতে অক্ষয় সেন লিখেছেন :

"রঙ্গ করি জনকেরে ডাক দিয়া কন।
দেখ না গো রঘুবীর সেজেছে কেমন।।
আমি সেই রঘুবীর দেখনা গো চেয়ে।
কেমন সেজেছি মালা-চন্দন পরিয়ে।।"[৭৩]

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ইষ্ট কে ছিলেন বলা মুস্কিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার পূর্বে তিনি মা

৭১ তদেব, ৪/২৮৮-৮৯ ৭২ তদেব, ১/৩৮ ৭৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ১১

জগদম্বার আদেশ পেয়েছিলেন, তন্ত্রোক্ত শক্তির উপাসনাতে সিদ্ধ হয়েছিলেন, বৈষ্ণবোক্ত ভক্তিমার্গেরও উচ্চ সাধিকা ছিলেন, অথচ তিনি ভ্রমণকালে তাঁর চির আরাধিত রঘুবীরশিলা বহন করে নিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের পর কি হয়েছিল স্বামী সারদানন্দ বর্ণনা করেছেন ঃ "দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা, চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

"রন্ধন শেষ হইলে ঁরঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সময়ে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্যকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকৃত কার্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, 'কে জানে বাপু, আত্মহারা হইয়া কেন এইরূপ কার্যসকল করিয়া বসি!' ব্রাহ্মণী তখন জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'বেশ করিয়াছ, বাবা; ঐরূপ কার্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতর যিনি আছেন তিনি করিয়াছেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি, আর আমার পূর্বের বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইয়াছে!' এই বলিয়া ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া দেবপ্রসাদস্বরূপে উক্ত ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীর-মনাশ্রয়ে ঁরঘুবীরের জীবন্ত দর্শনলাভপূর্বক প্রেমগদ্গদচিত্তে বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালপূজিত নিজ রঘুবীরশিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিলেন!"[৭৪]

বাৎসল্যভাবে সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারী নামক এক রামাইত সাধুর কাছে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। জটাধারীর ইষ্ট রামলালার (বালকবেশী রামচন্দ্র) অষ্টধাতুর মূর্তি কি ভাবে ঠাকুরের সঙ্গে জীবন্ত মানবের মতো আহার, শয়ন, স্নান, দৌড় ঝাঁপ করেছে তা সত্যই বিস্ময়জনক। ঠাকুরও মা কৌশল্যার ন্যায় বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে রামলালার সেবা করেছেন। তারপর রামলালার সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখে জটাধারী একদিন সজলনয়নে ঠাকুরের কাছে এসে বলল ঃ

"রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমনভাবে দেখতে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে, এখান থেকে যাবে না; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না! আমার এখন আর মনে দুঃখকষ্ট নাই! তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে

৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৯০-৯১

খেলাধুলো করে, তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই! এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ। সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।—এই বলে রামলালাকে আমায় দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। সেই অবধি রামলালা এখানে রয়েছে।"[৭৫]

নবগোপাল বাবুর সহধর্মিণী পরম ভক্তিমতী ও গুণশালিনী ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি পরিণীতা হন। পরিণয়ের অল্পকাল পরে তিনি তাঁহার পতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। একবার তিনি ঠাকুরের কাছে যান; তখন ঠাকুরের খাটের নিচে একটি বিড়াল কয়েকটি সদ্যপ্রসূত ছানা লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, ওরা এলে এখুনি বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে মেরে তাড়াবে। কিন্তু আশ্রিতকে কি করে রক্ষা করা যায়? তখন স্ত্রীভক্তটি বলিলেন, আমি এগুলি নিয়ে যেতে পারি। উক্ত প্রস্তাবে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, তুমি আমাকে একটি দায়িত্ব থেকে বাঁচালে। মায়ের কৃপায় তোমার মঙ্গল হোক, ইষ্টদর্শন হোক। তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন রাম। তিনি ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। যেই তিনি আবির্ভূত ইষ্টদেবতাকে প্রণামপূর্বক পায়ের ধুলা লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে গুরুমূর্তি রামকৃষ্ণ। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, কি, এখন বিশ্বাস হলো, আমি কে?[৭৬]

স্বামী শান্তানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন ঃ

একদিন ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে রামলাল দাদা (রামলাল চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, "অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলা দেশে এসে শুনলেন যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম্ এত্না তকলিব করকে অযোধ্যাসে উন্কো ওয়াস্তে পয়দল আঁতে হে আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২। ৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এ-সময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ-ক'দিন খাস নি, এই পায়েস এনেছি খা।' এই বলে ওঁকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি

---

৭৫ তদেব, ৪/৬৬ ৭৬ উদ্বোধন ৫২ বর্ষ পৃঃ ২৯৫-৯৬

কেন?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে-মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন। রামলালদা এই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।''[৭৭]

সীতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে[৭৮] ঠাকুরের সীতা দর্শনের বর্ণনাটি খুবই কবিত্বপূর্ণ, স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

''দাস্যভক্তি-সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতঃপূর্বের দর্শনপ্রত্যক্ষাদি হইতে এক নূতন ধরনের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন ঃ এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসে আছি—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীমূর্তি-সকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মোহিত করি[illegible] ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'—এমন সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতঃপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!''

পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''ঠাকুর ইহাও বলিতেন যে, সেই দর্শনের ফলে সীতার মধুর হাসিটিও তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।'' এই হাসিপ্রাপ্তির কথা লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই।[৭৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে সীতা মূর্তি দর্শন করেছিলেন এবং মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ''মা, সীতার মতো করে দাও। একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল, হাত, পা—কোন দিকেই হুঁশ নাই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম!''[৮০]

৭৭ (উদ্বোধন, ৪৯ বর্ষ, ৫৩০ ৭৮ ২।১৪৩-৪৪; ৭৯ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ১৫২
৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪/৩১

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেন, ঠাকুর যখন সীতার বিষয় বলতেন তখন সীতার মতো হয়ে যেতেন; তাঁদের সত্তার কোন পার্থক্য থাকত না।[৮১]

আমরা ষোল আনা মন দিয়ে দেখতে জানি না—উপর উপর আবছা দেখি। আবার কোন জিনিস দেখেও মনে রাখতে পারি না। ঠাকুরের দর্শনাদি কী তীক্ষ্ণ ছিল—সে-বিষয়ে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন—হাতে ডায়মনকাটা বালা। সীতার সেই বালা দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।"[৮২]

স্বামী শান্তানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন ঃ

হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন—"তাঁর ভাব কি সামান্য ছিল? কোন কোন সময় এমন কি বহির্জগৎও তাঁর ভাব অনুযায়ী বদলে যেত। একবার মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে ওঁর জুড়ি গাড়ি করে ঠাকুরকে ওঁদের জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি যখন চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ওঁর এরূপ ভাব হলো যে উনি যেন সীতা হয়েছেন আর রাবণ ওঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—উনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ গাড়ির ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মথুরবাবু ভাবলেন এমন কেন হলো? ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পরে ওঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি সমস্ত বিবরণ বললেন। তিনি বললেন, ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি দেখলেন যেন রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণের রথ আক্রমণ করেছে এবং সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মথুরবাবু শুনে বললেন, 'বাবা, এমন হলে ত তোমার সঙ্গে রাস্তা চলা মুস্কিল!' "[৮৩]

মহাবীর হনুমানের ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

"হনুমানের ন্যায় অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি (ঠাকুর) এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন 'ঐ সময়ে আহার-বিহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনি হইয়া পড়িত! পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মতো করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে

৮১ Sri Ramakrishna and His Disciples, by Devamata, p. 50

৮২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২/৭

৮৩ উদ্বোধন, ৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৫৩০

প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর "রঘুবীর রঘুবীর" বলিয়া গম্ভীরস্বরে চিৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।' শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।' "[৮৪]

মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হনুমান সিং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দারোয়ান ছিল এবং সে ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। বাইরে থেকে এক বড় পালোয়ান হনুমান সিংকে হারিয়ে তার পদের জন্য আসে। যা হোক মল্লযুদ্ধের দিন হনুমান সিং ঠাকুরকে মহাবীর জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, "আপনার কৃপা থাকে তো আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।" সে সত্যই জিতেছিল।[৮৪ক]

দুর্গার আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সারদানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মা দুর্গা গঙ্গা বক্ষ হইতে উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার দেহে মিলাইয়া গেলেন। ঠাকুর পরে হৃদয়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা দুর্গা এসেছিলেন। এই দেখ, মাটিতে তাঁর পদচিহ্ন রয়েছে।' "[৮৫]

রামলালদাদা ঠাকুরের নীলপদ্মে দুর্গাদর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "একবার কেশব সেনের সঙ্গে ঠাকুর স্টীমারে কোম্পানীর বাগানে (ইডেন গার্ডেনে) বেড়াতে যান। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, বহু নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় নীলপদ্মের উপর গণেশ জননী (মা দুর্গা) রয়েছেন। মা ডান পাটি ঝুলিয়ে আর বাঁ পাটি ডান পায়ের উপর রেখে গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর মধ্যে মধ্যে বড় পদ্ম ফুলটি দুলছে। ঠাকুর এইরূপ কমলে কামিনী দর্শন করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।"[৮৬]

কলকাতার জানবাজার বাড়িতে মথুর প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করতেন। ঠাকুরও মহানন্দে মহাভক্ত মথুরের বাড়িতে পূজার কদিন কাটাতেন। একদিন ঠাকুর বসে পূজা দেখছেন এবং পুরোহিত মায়ের নৈবেদ্য নিবেদন করছেন। এমন সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। পুঁথিকার অক্ষয় সেন লিখেছেন ঃ

"যখন দুর্গায় ভোজ্য করে নিবেদন।
ব্রতীরূপে নিয়োজিত পূজক ব্রাহ্মণ।।

---

৮৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৪২-৪৩; ৮৪ক তদেব, ৫/১৭৫-৭৬; শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৪৬
৮৫ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৩৪৬-৪৭; ৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৫২

ভক্ষণ করেন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে উঠে চমকিয়া।।
অমনি মথুর কহে যতেক ব্রাহ্মণে।
বুঝিনু সম্পূর্ণ পূজা বাবার গ্রহণে।।
সার্থক হইল দুর্গাপূজা আরাধন।
নৈবেদ্য যখন বাবা করিলা গ্রহণ।।"[৮৭]

গুরুভাবে ঠাকুর মথুরের প্রতি কৃপা করেছিলেন। দুর্গাপূজার দশমীর দিন মথুর ঠাকুরকে বলে, "বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?" ঠাকুর মথুরের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ —এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে--সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে পূজা নেবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মোহিনী স্পর্শে মথুরের কোন দর্শনাদি হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, "উহাই সম্ভব। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁহার হৃদয়-কন্দর অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান—দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল।"[৮৮]

শিহড়ে দুর্গাপূজাকালে নিত্য সন্ধ্যারতির সময় ও সন্ধিপূজার সময় হৃদয় প্রতিমার পার্শ্বে ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিল। পরে দক্ষিণেশ্বর এসে ঠাকুরকে সে-কথা বলায়, তিনি বলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"[৮৯]

ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে অসুস্থ তখন দুর্গাপূজাকালে তিনি সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে সমাধিযোগে যান। তিনি ভক্তদের বলেন, "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা, মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"[৯০] স্বামী বিবেকানন্দ ও অপর ভক্তগণ ঠাকুরের কথামত সুরেন্দ্রের বাড়িতে যান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঠাকুর সমাধিকালে যা দর্শন

৮৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ১৪১
৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/২০০-০১
৮৯ তদেব, ২/৩৩৮-৩৯
৯০ তদেব, ২/১৬৭-৬৮

করেছিলেন হুবহু এক। দুর্গার আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীভক্ত সুরেন্দ্রকে কৃপা করবার জন্য গিয়েছিলেন।

কুণ্ডলিনীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ২২/২৩ বছরের যুবক তখন তিনি দিব্যভাবে উন্নত হয়ে উঠেন। পরবর্তী কালে তিনি ভক্তদের কাছে তাঁর ষট্‌চক্রভেদের কাহিনী বলেন ঃ

"**কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।**

"মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে **সমাধি** হয়।

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—**তাঁকে ডাকতে হয়।** ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে!

"এই অবস্থা যখন হলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগল, আর সমাধি হলো। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—উর্ধ্বমুখ হলো!

"হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়েছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম উর্ধ্বমুখ হলো—আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো! **সেই অবধি আমার এই অবস্থা।**" [৯১]

কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঠাকুর বলতেন, 'চৈতন্য বায়ু', 'হরিবাই' 'মহাবায়ু', 'সাপ', 'মা'। এই শক্তি সদা ঠাকুরের মধ্যে খেলা করত। ঠাকুর কখনো কখনো গানের দ্বারা ভক্তদের মধ্যে এই শক্তি জাগিয়ে দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে একবার, স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "ঠাকুর বালকগণ সঙ্গে মা কালীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন এবং মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী।।
শরীরে শারির যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণী।
আধারে ভৈরবাকার, ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী;
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,

৯১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/২৪৮

তান মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনী।।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়।
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।।

গাহিতে গাহিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গান থামিয়া গেল, মুখের অদৃষ্টপূর্ব হাসি যেন সেই স্থানে আনন্দ ছড়াইয়া দিল—ভক্তেরা নিস্পন্দ হইয়া এখন ঠাকুরের শ্রীমূর্তিই দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের ধীরে ধীরে বাহ্যচৈতন্য হইল; কিন্তু তখনও যেন বিপরীত নেশার ঝোঁকে সহজভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! পা বেজায় টলিতেছে!

প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুর এইবার নিজ কক্ষে আসিয়া পশ্চিমদিকের গোল বারাণ্ডায় যাইয়া বসিলেন—তখনও ভাবাবিষ্ট। সে ভাব আর ছাড়ে না—কখন একটু কমে, আবার বাড়িয়া বাহ্য চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়! এইরূপে কতক্ষণ থাকার পর ভাবাবস্থায় ঠাকুর সঙ্গী ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সাপ দেখেছ? সাপের জ্বালায় গেলুম!" আবার তখনি যেন ভক্তদের ভুলিয়া সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকেই (তাঁহাকেই যে ঠাকুর বর্তমান ভাবাবস্থায় দেখিতেছিলেন এ-কথা আর বলিতে হইবে না) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি এখন যাও বাবু; ঠাকরুণ, তুমি এখন সর; আমি তামাক খাব, মুখ ধোব, দাঁতন হয় নি"—ইত্যাদি। এইরূপে কখনও ভক্তদিগের সহিত এবং কখনও ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ক্রমে সাধারণ মানবের মতো বাহ্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।[৯২]

কুণ্ডলিনীর জাগরণে ঠাকুরের শরীর কখন কখন প্রসারিত হতো; কখনও দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক করত। দক্ষিণেশ্বরের এক দুপুর রাতে ঠাকুরের খুব খিদে পায় এবং তিনি রামলালদাদাকে কিছু খাবার আনতে বলেন। লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনা তুলে ধরছি ঃ

"ঘরে অন্যদিন কত মিষ্টান্নাদি মজুত থাকে, সেদিন খুঁজিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই! অগত্যা রামলালদাদা নহবতখানার নিকটে যাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার সহিত যে-সকল স্ত্রীভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সেই সংবাদ দিলেন। তাহারা শশব্যস্তে উঠিয়া খড়কুটো দিয়া উনুন জ্বালিয়া একটি বড় পাথর-বাটির পুরাপুরি এক বাটি, প্রায় এক সের আন্দাজ হালুয়া তৈয়ার করিয়া ঠাকুরের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। জনৈকা স্ত্রী-ভক্তই (গোলাপ-মা) উহা লইয়া আসিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই চমকিত হইয়া দেখিলেন ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, ঠাকুর ঘরের ভিতর ভাবাবিষ্ট হইয়া পায়চারি করিতেছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল নিকটে বসিয়া আছে। সেই ধীর স্থির নীরব নিশীথে ঠাকুরের গম্ভীর ভাবোজ্জ্বল বদন, সেই উন্মাদবৎ মাতোয়ারা নগ্ন বেশ ও বিশাল নয়নে স্থির অন্তর্মুখী দৃষ্টি—যাহার সমক্ষে সমগ্র বিশ্বসংসার ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে

৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২৪৫-৪৭

লুপ্ত হইয়া আবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকাশিত হইত—সেই অনন্যমনে গুরুগম্ভীর পাদবিক্ষেপ ও উদ্দেশ্য-বিহীন সানন্দ বিচরণ দেখিয়াই স্ত্রী-ভক্তটির হৃদয় কি এক অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হইল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরের শরীর যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া কত বড় হইয়াছে! তিনি যেন এ-পৃথিবীর লোক নহেন! যেন ত্রিদিবের কোন দেবতা নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ-হাহাকার-পূর্ণ নরলোকে রাত্রির তিমিরাবরণে গুপ্ত লুক্কায়িতভাবে নির্ভীক পদসঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন এবং কেমন করিয়া এ-শ্মশানভূমিকে দেবভূমিতে পরিণত করিবেন, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে তদুপায়-নির্ধারণে অনন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন! যে ঠাকুরকে সর্বদা দেখেন ইনি সেই ঠাকুর নহেন! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং নিকটে যাইতে একটা অব্যক্ত ভয় হইতে লাগিল।

"ঠাকুরের বসিবার জন্য রামলাল পূর্ব হইতেই আসন পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি কোনরূপে যাইয়া সেই আসনের সম্মুখে হালুয়ার বাটিটা রাখিলেন। ঠাকুর খাইতে বসিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভাবের ঘোরে সে সমস্ত হালুয়াই খাইয়া ফেলিলেন!" [৯৩]

পরবর্তী কালে কথাপ্রসঙ্গে গোলাপ-মা বলেছিলেন, "এক দিন দেখি কি, খাবার সময় ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিচ্ছেন অমনি ঠাকুরের ভিতর থেকে একটা যেন সাপের মতো উহা ছোবল মেরে মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে! আমি ত দেখে হেসেই আকুল! ঠাকুরও জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, 'কিগো, বল দেখি—আমি খাচ্ছি, না কে খাচ্ছে?' আমি এতক্ষণ যা দেখছিলুম তাই বল্লুম—আপনার ভিতর থেকে একটা সাপে ছোবল মেরে নিচ্ছে! ঠাকুর তাই শুনে মহাখুশি হয়ে বল্লেন 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ'—এই বলে আমাকে কত যে কি প্রশংসা করতে লাগলেন। সর্পাকারা কুণ্ডলিনীর আহূতি গ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলুম!" [৯৪]

স্বামী অম্বিকানন্দের মা নিস্তারিণীদেবীও ঠাকুরের ভিতর থেকে কুণ্ডলিনীরূপী সর্পের আহার গ্রহণ দেখেছিলেন। স্বামী অম্বিকানন্দের স্মৃতিকথা ঃ

ঠাকুরকে অন্দরে নেওয়া হলো। মেয়েরা প্রণাম করতে এসেছে। ঠাকুর পা ছুঁতে বারণ করে বলছেন 'ঐ হয়েছে, মা, থাক্, থাক্।' তা মেয়েরা শুনবে কেন? আগ্রহে তারা পায়ের ধুলো নিলে। ঠাকুরকে মা তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন খাওয়াবার জন্য। ঠাকুর সন্দেশ ভালবাসিতেন। শহরের সেরা সন্দেশ তাঁর জন্য আনিয়ে রাখা হয়েছে। আসন পাতা হয়েছে। ঠাকুর বসে মার দিকে তাকিয়ে দেখেন মা জোড় হাতে সামনে। ঠাকুর "কি লো, তোর কি ইচ্ছে? তুই নিজ হাতে আমায় খাইয়ে দিবি? আচ্ছা দে।" এই বলে ঠাকুর মুখব্যাদন করিলেন। মা একটি সন্দেশ ঠাকুরের মুখে দিতে গিয়ে দেখেন কে যেন ঠাকুরের ভিতর থেকে ঐ সন্দেশ গপ্ করে গিলে ফেলল। মা তো ভয়ে জড় সড়। তার তখন অল্প বয়স। ঠাকুরের খাওয়া হলে ঠাকুর মাকে প্রসাদ খেতে বললেন। অন্য গুরুজনদের আগে মা কি করে খাবেন? মা ইতস্তত করছেন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলায় মা খেলেন।

৯৩ তদেব, ৪/১৮-১৯

৯৪ উদ্বোধন, ২৭ বর্ষ, ৪৯ পৃঃ

বাকি প্রসাদ থালায় নিচে পাঠান হলো। যেতে না যেতেই উহা একেবারে লুঠ হইয়া গেল। ঠাকুর বললেন "দেখলি? এই জন্য বলেছিলাম খেতে।"[৯৫]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলঘরিয়াতে ঠাকুরকে দর্শন প্রসঙ্গে বলেন, "গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাদা কাপড় পরা দাঁড়িয়ে আছেন। এক অদ্ভুত দৃশ্য। মুখের ভাব কি যেন কি রকম! পাকা ফুটি যেমন ফেটে যায়, এ যেন সেই রকম। মুখ বিকৃত বলা চলে না। শরীরের সব শক্তি যেন উপরের দিকে উঠে গেছে; মুখে দিব্যভাব আর ধরছে না। দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে। চোখ যেন কি দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে। বাহিরের হুঁশ নেই। একজন (পরে জানলুম বাবুরাম মহারাজ) দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ধরে আছেন, পাছে পড়ে যান। কিছুপরে ঠাকুর বসলেন। আর নিত্যগোপালের সঙ্গে ভাবে কথা কইতে লাগলেন। কথার ভিতর কেবল 'ফিট্ ফিট্' শোনা যাচ্ছিল। যখন লোকে ভাবপূর্ণ হয়, তখন কথা কইতে পারে না। ঠাকুর যখন দাঁড়িয়েছিলেন তখন যেন মা কালীর ভাব। কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের ভাব। বোধ হয়, নিত্যগোপালের শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছিল, তাই ঐ ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন। তিনিও ঐরকমভাবে কথা কইছিলেন। এ সময় আর একটি ব্যাপার যা দেখেছিলাম, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। দেখেছিলাম, 'ঠাকুরের spinal chord (মেরুদণ্ড) নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত একটি মোটা দড়ির মতো ফুলে উঠেছে, আর মাথার দিকে যে শক্তি উঠেছে যেন সাপের মতো ফণা বিস্তার করে রয়েছে, আনন্দে হেলছে দুলছে।' "[৯৬]

সচ্চিদানন্দ সাগরে শ্রীরামকৃষ্ণ

সচ্চিদানন্দের কোন রূপ নেই। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দই ব্রহ্মের সত্তা বা রূপ। নিরাকারের দর্শন একটা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। যেমন রামপ্রসাদের কালীমূর্তির চিত্রকর ও ভাস্কর আজও পর্যন্ত জন্মায় নি, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের ব্যাখ্যাকার এখনও জন্মায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মানুভূতি বা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের কথা আমাদের তাঁরই শ্রীমুখ থেকে শুনতে হবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল। এসে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।... দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"[৯৭]

"আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার

৯৫ স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরী, পৃঃ ৫৩-৫৪ ৯৬ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ২২০-২৩
৯৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/১৪৯

আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ।"[৯৮]

"অন্তরে বাহিরে দুই দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটি দেখছি।"[৯৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরের বেদি, প্রতিমা, কোশাকুশি, দরজার চৌকাট, উদ্যানের ঘাস, বৃক্ষ প্রভৃতিতে উপলব্ধি করেছিলেন চৈতন্য জ্বলজ্বল করছে, চৈতন্যে রসে রয়েছে।

ভক্তভৈরব গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বলেছিলেন, "তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম! তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা।"[১০০]

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শ্রীমকে নিরাকারের ধ্যান শেখাবার জন্য মতিশীলের ঠাকুরবাড়ির ঝিলে মাছদের অবাধ সন্তরণ দেখাতে নিয়ে গিছলেন। ঠাকুর বললেন, "এই দ্যাখো কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা।"[১০১]

একবার কামারপুকুরে ঠাকুরের ঐরূপ একটা দিব্যানুভূতি হয়, যা সেখানকার মেয়ে ভক্তেরা দর্শন করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন ঃ

ঠাকুর বলিতেন—একদিন তিনি আহারান্তে নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটি রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা তাঁহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানাভাবে সন্তরণক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, "উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে।" রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐ-কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রমণী সত্যই বলিয়াছে। আশ্চর্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল!"[১০২]

খ্রীস্টরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

সাধনকালের শেষের দিকে ঠাকুর শম্ভু মল্লিকের কাছে বাইবেল শোনেন। ফলে তাঁর যীশু খ্রীস্টের সম্বন্ধে আরও জানতে ইচ্ছা হয়। কিরূপে ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, সে

৯৮ তদেব, ৪/২৫০ ৯৯ তদেব, ২/৩০৪ ১০০ তদেব, ৪/২৬২
১০১ তদেব, ৪/২৮ ১০২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৩১৭

প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণপার্শ্বে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুলাল ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলে কর্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপালমূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা আমাকে এ কি করিতেছিস!" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীস্ট ঈশামসি!' তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল! ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।[১০২ক]

পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় একটি চার্চে খ্রীস্টানদের উপাসনা দেখতে গিয়েছিলেন। খ্রীস্টানধর্মাবলম্বী উইলিয়মস্ নামে এক ব্যক্তি ঠাকুরকে 'নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র

১০২ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৩৭০-৭২

ঈশামসি' বলে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এই ব্যক্তি ঠাকুরের উপদেশে সংসারত্যাগ করে পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের কোন এক স্থানে তপস্যার দ্বারা শরীরপাত করেছিলেন।[১০৩]

২৮ জুলাই ও ২৮ আগস্ট ১৮৮৫ শ্রীমর সঙ্গে ঠাকুরের যীশু সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। ঠাকুর জানতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে যীশুর কোন্ কোন্ ব্যাপারে সৌসাদৃশ্য আছে। অবশেষে শ্রীম বললেন, "আমার মনে হয়—যীশুখ্রীস্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি।" ঠাকুর জানালেন, "এক এক! এক বইকি।"[১০৪]

কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টান সাধু প্রভুদয়াল মিশ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্যামপুকুরের বাড়িতে দর্শন করতে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শী মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত লিখেছেন ঃ ঘরে বসিবার পর তিনি (প্রভুদয়াল) কিছুক্ষণ আত্মস্থ-ভাবে থাকিয়া ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আমি একজন খ্রীস্টান, বহুদিন যাবৎ কোন নিভৃতস্থানে প্রভু যীশুখ্রীস্টের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত ছিলাম। যদিও আমি খ্রীস্টান তবুও আমার উপাসনা-পদ্ধতি হিন্দুর ন্যায়। আমি হিন্দুর যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতাম। প্রভু ঈশাকেই আমার ইষ্টদেব বিবেচনায় তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় দিন কাটাইতাম। সহসা আমার এক সময় জানিবার ইচ্ছা হইল যে, পৃথিবীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতায় এখন সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি কেহ আছেন কিনা, তাই এইরূপ মানসিক অবস্থায় উপাসনাকালে একদিন আমি ধ্যানে দুইজন লোককে দর্শন করি। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে দেখামাত্র মনে হইল যে এই ব্যক্তিই সেই উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরের দ্বারিস্বরূপ হইয়া যেন তিনি বসিয়া আছেন। তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেই সহজে নগরে প্রবেশ অধিকার লাভ করা যাইতে পারে। আর একজনকে তাঁহার পদ-প্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনিও যেন সাধারণ পাত্র নহেন। তবে এখনও সেই সম্পূর্ণ উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ দর্শনলাভের পর আমার ধারণা হইল তাহা হইলে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তি আছেন। কিন্তু কোথায় সেই ব্যক্তি? কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব? আমি নানাদেশ তাঁহারই অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। সাধারণত দূর পশ্চিম প্রদেশই সাধু ফকিরগণের আশ্রয়স্থান। এজন্য সেইসব স্থানে বহু অন্বেষণের পর ব্যর্থকাম হইয়া শেষ গাজীপুরে পওহারীবাবা নামে একজন বিখ্যাত সাধুর অবস্থানের কথা শুনিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার ধ্যানলব্ধ মূর্তির কোন সাদৃশ্য না দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়ি। এমন সময় তাঁহারই ঘরস্থিত একখানি ছবির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ায় চমকাইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, এইত ঠিক আমার সেই ধ্যানলব্ধ মূর্তি। তখন সেই ছবিখানি কাহার প্রতিকৃতি ইহা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করায় তিনিই আমায় বলিয়া দেন যে ইঁহার নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। তখন কোথায় ইঁহার দর্শন লাভ করা যাইতে পারে এ-কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ইনি পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের

১০৩ তদেব, ১৯৩-৯৪

১০৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/২৫৯, ৪/২৫৬-৫৮

কালীবাড়িতে অবস্থান করিতেন। সম্প্রতি কোন সঙ্কটময় ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় ভক্তগণ ইঁহাকে চিকিৎসার্থে কলিকাতার কোন স্থানে আনিয়া রাখিয়াছেন, আপনি কলিকাতায় ইঁহার সন্ধান পাইবেন। তাই তাঁহারই নির্দেশমত কলিকাতায় আসিয়া তিনি এখানে আছেন শুনিয়া উপস্থিত হইয়াছি।...

...ঠিক সেই সময় পরমহংসদেবও হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ছবিতে যেমন যীশুখ্রীস্টের মূর্তি দেখা যায়, সেইভাবে হাতটি তুলিয়া সমাধিস্থ হইলেন। এই দৃশ্য দেখামাত্র সেই সাধুটিও অমনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং যুক্তকরে একদৃষ্টিতে পরমহংসদেবের সেই দণ্ডায়মান সমাধিস্থ মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

উভয়ের ভাবাবস্থা দেখিয়া আমরাও সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।... ইহার পর আমরা ঐ সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহার ঐরূপ ভাবাবস্থা হইবার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, এতদিন যাঁহার ধ্যান-ধারণায় দিন কাটাইয়াছি, আজ ইঁহারই মধ্যে সেই প্রভু ঈশারই প্রত্যক্ষ মূর্তি দেখিলাম।" ঠাকুর যে সাক্ষাৎ সেই ঈশাই—এইরূপ ভাব আমাদের কাছে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১০৫]

শ্রীম বলেন ঃ "মিশির সাহেবও খ্রীস্টান ধর্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কত কথা, কত ভালবাসা। তাঁকে ঈশ্বর-দর্শন করালেন ঠাকুর ঈশামসিরূপে। মিশির সাহেব কালীঘরে প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখলেন ক্রাইস্ট—মা কালী ক্রাইস্ট। পরে বুঝলেন, ঠাকুরই ক্রাইস্ট।"[১০৬]

আল্লার আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ

বেদান্ত সাধনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামধর্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় গোবিন্দ রায় নামে এক সুফী দরবেশ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে সাধন করতে আসেন। যতদূর জানা যায় তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পারসী ও আরবী ভাষা জানতেন। ধর্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিত্য কোরাণ পাঠ করতেন এবং ঐ ভাবে সাধনও করতেন। ঠাকুর তাঁর বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হন।

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্ম-সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের

---

১০৫ উদ্বোধন, ৪১ বর্ষ, পৃঃ ৬৭০-৭১ ১০৬ শ্রীম-দর্শন, ১১/৪৫

দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।[১০৭]

রামলালদাদার কথোপকথন থেকে জানা যায় ঃ

একবার ঠাকুরের মুসলমানের মসজিদে গিয়ে সাধনা করতে ইচ্ছা হলো। একটা মসজিদ আছে। (রামলাল দাদার বাড়ি হইতে মন্দির যাইবার পথে অথবা সদর ফটক হইতে রাস্তার নিকট যাইবার পথে) একদিন ঠাকুর ভোরে (তখন কেউ উঠেনি) ঐ মসজিদে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে এক গজ কাপড়—কাচা নেই, তারপর মুসলমানরা এসে দরজা খুলে দেখে—একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে, কোথায় থাক?' তার মধ্যে একজন বলে উঠল—'ইনি মন্দিরে থাকেন ও পূজা করেন।' তারপর ঠাকুর তাদের সঙ্গে নমাজ পড়তে গেলেন, এইরূপে তিনি তিন দিন সাধনা করেছিলেন। একদিন ঠাকুর দেখেন মসজিদে একটি বৃদ্ধ ফকির, গোঁফ, দাড়ি মাথায় চুল সব সাদা, আলখাল্লা পরা, গলায় কাঁচের (অর্থাৎ ফকিরদের গলায় যেরূপ মালা দেখা যায়) মালা, হাতে লাঠি—ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুমি এসেছ, বেশ বেশ, বলে হাসিলেন ও হাত নেড়ে আশীর্বাদ করলেন।' এই সব ঘটনা ঠাকুরের মুখে শোনা।[১০৮]

আল্লার আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে গেঁড়াতলা মসজিদে উপস্থিত হন, প্রত্যক্ষদর্শী মন্মথনাথ ঘোষ তা বলেন ঃ অনেক চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্সে চাকরি যোগাড় করলাম। বেশি মাইনে নয়, তাই ধর্মতলা থেকে গেঁড়াতলা হয়ে বিডন স্ট্রীটে হাঁটাপথে যেতাম। একদিন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় গেঁড়াতলা মসজিদের সমুখে দেখি একটি মুসলমান ফকির দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'প্যারে আও।' চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বেশ প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছে, 'প্যারে আ জাও, আ জাও।' আমি শুনে মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি হতে নেমেই সবেগে চললেন সেই মুসলমান ফকিরের দিকে। পরে দুইজনে একেবারে প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ। ভাড়াটিয়া গাড়িতে দুইজন লোক ছিল—একজন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল।—এঁর হাত দিয়ে দু-একবার মিষ্টান্ন প্রসাদ আমায় ঠাকুর দিয়েছিলেন। ঠাকুর কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করে ভাড়াটিয়া গাড়িতে ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃশ্য![১০৯]

শিখগুরু নানকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বুদ্ধদেব, মহাবীর, শংকরাচার্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন এবং তাঁদের বাণী অবলম্বন করে শিক্ষাও দিয়েছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।"[১১০] শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি ও খ্রীস্টের

---

১০৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৩০৯ ১০৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ২

১০৯ উদ্বোধন ৫৭ বর্ষ, পৃঃ ৬১৮ ১১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৩৭৪

একখানি ছবি ছিল এবং তিনি তাঁদের সামনে ধূপ ধুনা দিতেন। তিনি ঐরূপে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করলেও জৈন তীর্থঙ্করদের এবং শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক থেকে গোবিন্দ পর্যন্ত দশগুরুদের মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলে নির্দেশ করেন নি। শিখদের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, "উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদের নিকট শুনিয়াছি—রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণসাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন, শিখদের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোন কারণ নাই।"[১১১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ নেই যে বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, নানক, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ঠাকুরের সঙ্গে লীন হয়েছেন, যেমন রাম, কৃষ্ণ, খ্রীস্ট, চৈতন্য প্রভৃতি ঠাকুরের অঙ্গে মিশে গেছেন। এ-রহস্য এখন আর উদঘাটন করবার সম্ভাবনা নেই।

যা হোক ঠাকুরের সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উত্তর পাশে একটা সরকারি বারুদখানা ছিল, এবং উহা পাহারা দেবার জন্য একদল শিখসৈন্য সেখানে থাকত। তারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে আসত এবং কখনও তাদের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়াত। স্বামী অম্বিকানন্দ বলেন, "ঠাকুরকে 'পরমহংস' নাম দেয় ম্যাগাজিনের শিখ পাহারাওয়ালারা। ঠাকুর মহানন্দে ন্যাংটো হয়ে তখন ঐ বেলতলার দিকে ঘুরে বেড়াতেন। পাঞ্জাবীরা সাধুসন্ন্যাসী ভক্ত। তাদের মধ্যে ওসব ভাবের ধারণা আছে। ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখে শিখরা বলত, 'আরে, ইয়ে তো পরমহংস হ্যায়।' সেই থেকে 'পরমহংস' নাম হয়।"[১১২]

ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য। এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং (হাবিলদার) বলত, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই—তুমিই নানক।' "[১১৩]

একদিন ঠাকুর শিখদের আবাসে গিয়াছেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া। ঠাকুরকে স্বয়মাগত দেখিয়া শিখরা উল্লসিত হইল এবং শ্রীপদে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। ঠাকুর ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন ও শিখরা একমনে সেই কথামৃত পান করিতেছে, এমন সময়ে, ঠাকুরের কথার ফাঁকে, শাস্ত্রীও দুই একটি জ্ঞানের কথা তাহাদিগকে শুনাইলেন।

শুনিয়া সৈন্যের দল উন্মত্তের প্রায়।
উঠাইয়া তরবারি কাটিবারে যায়।।

১১১ তদেব, ২/৩৭৪-৭৫ ১১২ স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরী, পৃঃ ৫৭
১১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/২৫১-৫২

সংসারীর মুখে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
শুনাইলে শিখদলে বুঝে অপমান।।
শাস্ত্রীকে কহিল তুমি আসক্ত সংসারী।
জ্ঞানকথা-উপদেশে নহ অধিকারী।।

... ...

কোপাবিষ্ট শিখে দেখি প্রভু নারায়ণ।
মিষ্টভাষে তুষ্ট কৈলা তাহাদের মন।।

আরও আগেকার দিনের কথা। ইংরাজ সেনাপতির পরিচালনায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত শিখসৈন্যরা দ্রুতপদে কলকাতার দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইতেই—ফিটন গাড়িতে করিয়া মথুরবাবুর সঙ্গে তিনি আসিতেছিলেন—সৈন্যরা হাতের বন্দুক ভূমিতে ফেলিয়া, 'জয় গুরু' বলিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই কাজটি সামরিক-রীতি-বিরুদ্ধ; ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে।

দেখি সেনাপতি কহে সৈনিকের দলে।
অনুমতি বিনা হেন কি হেতু করিলে।।
উত্তরে অধ্যক্ষে কহে যত সৈন্যগণে।
আমাদের এই রীতি গুরু-দরশনে।।
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক্ যাক্ প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম।।
আশিস করিলা প্রভু ডান হাত তুলে।
অস্ত্রত্যাগী ধরাশায়ী সৈনিকের দলে।।
শ্রীপ্রভুর কৃপাদৃষ্টে মহিমা অপার।
সেনাপতি পুনরুক্তি না করিল আর।।[১১৪]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

কলুটোলার হরিসভার সভ্যগণ আপনাদিগকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত পদাশ্রিত মনে করিতেন এবং ঐ কথাটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা একখানি আসন বিস্তৃত রাখিয়া উহাতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া পূজা, পাঠ প্রভৃতি সভার সমুদয় অনুষ্ঠান ঐ আসনের সম্মুখেই করিতেন। ঐ আসন 'শ্রীচৈতন্যের আসন' বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। সকলে ভক্তিভরে উহার সম্মুখে প্রণাম করিতেন এবং উহাতে কাহাকেও কখন

১১৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পৃঃ ২২৫, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২০৪-০৫

বসিতে দিতেন না। অন্য সকল দিবসের ন্যায় আজও পুষ্পমাল্যাদি-ভূষিত ঐ আসনের সম্মুখেই ভাগবতপাঠ হইতেছিল। পাঠক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকেই হরিকথা শুনাইতেছেন ভাবিয়া ভক্তিভরে পাঠ করিতেছিলেন এবং শ্রোতৃবৃন্দও তাঁহারই দিব্যাবির্ভাবের সম্মুখে বসিয়া হরিকথামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছি ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছিলেন। ঠাকুরের আগমনে শ্রোতা ও পাঠকের সে উল্লাস ও ভক্তিভাব যে শতগুণে সজীব হইয়া উঠিল, ইহা আর বলিতে হইবে না।

ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং 'শ্রীচৈতন্যাসনের' অভিমুখে সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না! কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিসকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় সেই প্রকার ঊর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার শরীর-মন এবং ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যের শরীর-মনের মধ্যে স্থূলদৃষ্টে দেশকাল এবং অন্য নানা বিষয়ের বিস্তর ব্যবধান যে রহিয়াছে, ভাবমুখে ঊর্ধ্বে উঠিয়া সে বিষয়ের কিছুমাত্র প্রত্যক্ষই তিনি আর তখন করিতেছেন না! পাঠক পাঠ ভুলিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; শ্রোতারাও ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ ধরিতে বুঝিতে না পারিলেও একটা অব্যক্ত দিব্য ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ শান্ত হইয়া রহিলেন, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে সময়ে কেহ আর বলিতে সমর্থ হইলেন না। ঠাকুরের প্রবল ভাব-প্রবাহে সকলেই তৎকালের নিমিত্ত অবশ হইয়া অনির্দেশ্য কোন এক প্রদেশে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে—এইরূপ একটা অনির্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি করিয়া প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে ঐ অব্যক্তভাব-প্রেরিত হইয়া সকলে মিলিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নামসঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে ঐ কথা লোকমুখে বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভগবানদাস বাবাজীও উহা শুনিতে পাইলেন।

শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত সিদ্ধ বাবাজী নিজ ইষ্টদেবতার আসন অজ্ঞাতনামা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে শুনা অবধি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দেশে কটুকাটব্য বলিতে এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ভাগিনেয় হৃদয় ও মথুরবাবুকে সঙ্গে লইয়া কালনায় উপস্থিত হইলেন।

ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিতে যান এবং বাহিরে অপেক্ষা করিয়া হৃদয়কে দিয়া সংবাদ দেন যে, তিনি বাবাজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণে ঠাকুর যখন বাবাজীর নিকট উপস্থিত হন, তখন

তিনি বৈষ্ণব সাধুদের ক্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনায়—কাহাকেও সমাজ হইতে বিতাড়িত কর, কাহারও কণ্ঠি কাড়িয়া লও ইত্যাদি যেন বিচারকের ন্যায় আদেশ দিতেছিলেন।... ভক্তকল্যাণ-জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তাই প্রাচীন ভক্তকে মোহমুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অর্ধবাহ্য অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর বাবাজীকে কহেন—"আমি জানি, একমাত্র ভগবানই কর্তা, আর সকলে অকর্তা—তোমার এতই অহঙ্কার, তুমি যেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছ?" বাবাজী তখন ঠাকুরের মৃদু ভর্ৎসনায় চৈতন্য পাইয়া প্রণামপূর্বক কহেন—আপনার কৃপায় দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আপনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সুতরাং আপনিই যে চৈতন্যাসনে বসিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? আপনার পদার্পণে দিব্যসৌরভ পাইয়া ভক্তদের বলিয়াছি—আমাকে কৃপা করিতে দেবোপম কোন মহাভাগের আগমন হইয়াছে। (ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের নিকট শ্রুত।)[১১৫]

তীর্থদর্শনকালে নবদ্বীপ ধামে শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে অনুভূতি হয়, সে প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ বর্ণনা করেছেন ঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভিতর অনেকেই তখন সন্দিহান ছিলেন, এমন কি 'বৈষ্ণব' অর্থে 'ছোটলোক' এই কথাই বুঝিতেন এবং সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত ঠাকুরকে অনেক সময় ঐ বিষয় জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। ঠাকুর তদুত্তরে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমারও তখন তখন ঐ রকম মনে হতো রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথায়ও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া-নেড়ীরা টেনে বুনে একটা বানিয়েচে আর কি!—কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হতো না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোসাঁইয়ের বাড়ি, ছোট গোসাঁইয়ের বাড়ি, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না!—সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল; ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসচে! অমনি 'ঐ এলোরে, এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেললে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!"[১১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মীদেবী বলেন ঃ

---

১১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/১৫০-৫৫, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১০০-০১

১১৬ তদেব, ৪/১৪৬-৪৭

চিনু শাঁখারী আমাদের কামারপুকুরে, পাড়ার মধ্যে খুব পরিচিত—ঠাকুরের বাল্যসখা। সাধন কত্তে কত্তে তাঁর ভেতরে এক সময় কিছু বিভূতি সিদ্ধাই ফুটেছিল। সৌম্যমূর্তি, পরম বৈষ্ণব। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চিনুদাদা আদর করতেন আর বলতেন—'ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।'[১১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মহাভাবের লক্ষণ দেখে ও তাঁর দিব্যানুভূতির কথা শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বুঝেছিলেন যে এবার চৈতন্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন ঃ

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি অপূর্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শিবিকারোহণে কামারপুকুর হইতে শিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাটীতে যাইবার কালে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হয়। উহারই কথা এখন পাঠককে বলিব—সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতলছায়াময় অশ্বত্থবট-বৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিত তরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বনপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন! সেইজন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল।" হৃদয় বলিত, ঐ-কথা বলিয়া ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার
> পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
> কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।।
> অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।[১১৮]

রামচন্দ্র দত্তের আত্মকথা ঃ

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছুদিন পরে আমরা 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যতই পাঠ করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই। মনে হইতে লাগিল, এই গ্রন্থখানি যেন পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্তবিশেষ। আমাদের

১১৭ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ৫

১১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৬১-৬২

মনে একটা নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সন্দেহ হইবারই কথা; কথাটা ত একটা কথার কথা নহে। একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিতে আমাদের আজ্ঞা করেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার নিকট আমরা বসিয়া আছি, তথায় আর কেহ ছিলেন না, তিনি অতি প্রশান্তভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?" আমরা বলিলাম, "আপনাকে দেখিতেছি।" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমাকে কি মনে কর?" আমরা বলিলাম, "আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া জ্ঞান হয়।" পরমহংসদেব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "বামনী ঐ কথা বলত বটে।"[১১৯]

একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ দাদা, বুঝিয়াছ কি এবার একে তিন? গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গাবতারে তিন আধারে তাহার বিকাশ ছিল।'[১২০]

রামচন্দ্রের ইষ্ট কে ছিলেন তা সরাসরি জানা যায় না। তবে তাঁর নিম্নোক্ত অনুভূতিদৃষ্টে মনে হয় চৈতন্যদেব তাঁর ইষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে তিনি ঠাকুরের মধ্যে দর্শন করেন ঃ

একদা রজনীকালে প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গৃহের বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া ফিরিয়া দেখি যে, আমার পশ্চাতে প্রভু ভাবাবেশে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিতেছেন, "রাম! কি চাও?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "প্রভু! কি লইব আপনি বলিয়া দিন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিতে পারি, এমন কোন বস্তুই পৃথিবীতে দেখিলাম না।" করুণাময় রামকৃষ্ণদেব তখন আমার নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "আমায় দেখ। আর যে মন্ত্র তোমায় দিয়াছি, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ করিয়া যাও। অদ্যাবধি তোমার কর্ম শেষ হইল।" আমি এতক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলাম। আমার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া মানসে মন্ত্র সমর্পণ করিলাম। তিনি আমার মস্তকে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করিয়া কিয়ৎকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন।... তখন আমার হৃদয়ের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত, এক্ষণে তাহার এক পরমাণু ভাব আভাসে ব্যক্ত করিতেও অশক্ত হইতেছি। সে-সময়ে মন বলিয়া কোন বিষয়ই আমার ধারণা ছিল না। প্রাণ রামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি যে, সেইদিন হইতে আমার মন-প্রাণের বিবাদ মিটিয়াছে, সেইদিন হইতে গুরু চিনিয়াছি, সেইদিন হইতে গুরু ইষ্টের একাকার হইয়াছে।[১২১]

মনোমোহন মিত্রের মা শ্যামাসুন্দরী ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "দেখ, তিনি সাধু মহাত্মা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় উনিই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। এই লীলায় সেই মহাপ্রভুই শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আগমন করিয়া জীব উদ্ধার করিতে লীলা করিতেছেন।"[১২২]

---

১১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৩১
১২০ নবযুগের মহাপুরুষ, পৃঃ ৩০৬
১২১ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, পৃঃ ২০৮-১০
১২২ ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি, পৃঃ ১৭

স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়!
(তোরা কে নিবি রে আয়!)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায়!
(গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)
নদে ভেসে যায়!"

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধন-পূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্য সত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন! কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"[১২৩]

ঠাকুর একবার স্বামীজীকে বলেছিলেন, "নদের গৌরের কথা শুনিস্ নি? সেই গৌর আমি!"[১২৩ক]

কীর্তনিয়া নীলকণ্ঠ ঠাকুরের মধ্যে গৌরাঙ্গরূপ দর্শন করেন। কথামৃতের বর্ণনা ঃ ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন—আমি আপনার সেই গানটি শুনব, কলকাতায় যা শুনেছিলাম।

মাস্টার—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্ত-প্রায়! ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে!

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন; তাঁহারা উত্তরের বারান্দা হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীর্তন দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের

---

১২৩ পৃঃ ৫/২১-৫২

১২৩ক শ্রীম দর্শন, ১/৫৩

মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!'

সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আখর দিতেছেন—

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দুভাই এসেছে রে।'

উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায়, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন—**ভাগবত, ভক্ত, ভগবান**—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগরী পূর্ণিমার পর দিন। চতুর্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

নীলকণ্ঠ—**আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।**

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও-গুনো কি!—আমি সকলের দাসের দাস।[১২৪]

জ্যোতির্ময়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সারদানন্দ হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিতেছে! চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটির প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও ঠাকুরকে পুনঃপুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, 'আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি?' ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে।

১২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪/২১৮

মনে হইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন-অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ এবং তাঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীরধারণপূর্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি। ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং অর্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—"ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা, আমিও তাহাই!"

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্ থাম্, অমন বলিতেছিস কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে!' কিন্তু সে কি তাহা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে।' "[১২৫]

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দক্ষিণেশ্বরের বাগানের এক ভাগ্যবান মালীর কিভাবে ঠাকুরের জ্যোতির্ময়রূপ দর্শন হয়েছিল তা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন: দেখা হতো মথুরবাবুর আমলের ছিয়াত্তর-সাতাত্তর বছরের এক বুড়ো মালীর সঙ্গে। প্রথম যখন তাকে দেখি, একখানি খুরপি নিয়ে ঠাকুরের ঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত পথটি পরিষ্কার করছিল সে— একমনে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীর, কিন্তু লক্ষ্য করতুম ঐ কাজটিতে তার অদ্ভুত ঐকান্তিক নিষ্ঠা—ঝাউতলা বেলতলা পর্যন্তও পথটি প্রতিদিন তার পরিষ্কার করা চাই। তাকে রোজ ঐ এক কাজ করতে দেখে আমার খুব কৌতূহল হলো। একদিন থাকতে না পেরে প্রশ্ন করে ফেললুম, 'তুমি ঠাকুরকে দেখেছ?' খুরপিটি রেখে সে অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বললে, 'তাঁরই তো আদেশ পালন করছি। তিনি বলেছেন—কত ভক্ত আসবে। তাই তাঁদের জন্য পথ পরিষ্কার করছি।' এর বেশি আর কিছু সে বলতে রাজি হলো না। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে পরে সে বলতে শুরু করলে এক অপূর্ব ঘটনা। বললে: গ্রীষ্মকালে একদিন রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। বাগানে বেড়াচ্ছি। দেখি বেলতলার দিক থেকে একটা আলো আসছে। খুব কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, তিনি (ঠাকুর) বেলতলায় সমাধিস্থ, আর তাঁর সারা শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে। সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে এলুম। পরদিন সকালে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলুম। তিনি বললেন, 'কি রে! ব্যাপার কি? হঠাৎ তোর এত ভক্তি কেন?' কিছু ভেবে না পেয়ে বললুম, 'আমায় কৃপা করুন'। তিনি আমার মনের কথা সব বুঝে আমাকে ধরে তুললেন। তারপর বললেন, 'কাল যে-মূর্তি দেখেছিস তাই ধ্যান করবি। আর এই রাস্তাটি পরিষ্কার করবি, কত ভক্ত আসবে।' তাই আমি তাঁর সেই মূর্তি ধ্যান করি, আর রাস্তাটি প্রত্যহ সাফ করি।[১২৬]

১২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৩৩৪-৩৫ ১২৬ সৎপ্রসঙ্গ ২/১৩৪

অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতারের নানা লক্ষণ আছে। শাস্ত্রীয় লক্ষণ গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন ঈশ্বর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কালে তিনি সাধুদের রক্ষা করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেন। অবতারের আরও লক্ষণ আছে, যেমন ১। জীবে দয়া, ২। পতিতদের উদ্ধারকর্তা, ৩। সর্বভূতে সমজ্ঞান, ৪। ধর্মের সামঞ্জস্যভাব, ৫। পরম বৈরাগী, ৬। জৈবধর্মবিবর্জিত, ৭। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ৮। আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব, ৯। সেবকদের কর্মনাশ, ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর অবতাররূপ আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলাতে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে।

সুরেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন ঠাকুরের আদিলীলা প্রসঙ্গে ঃ তাঁহাদের গ্রামের জমিদার গঙ্গাবিষ্ণু লাহার মাতাঠাকুরানী গদাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভাল মন্দ দ্রব্য পাইলে গদাইয়ের জন্য তাহা তুলিয়া রাখিতেন। ভাল ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গদাইকে ভোজন করাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে বলিতেন "আমার মনে হয় তুই মানুষ নয় দেবতা।" এইরূপ শুনা আছে যে কামারপুকুরের জনৈক বৃদ্ধ দোকানদার বাল্যকালে ঠাকুরের অপূর্ব ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইঁনি মনুষ্য নন, লীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই কারণ সে ব্যক্তি একদিন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মাঠে লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার দিয়া দুঃখ করিতে করিতে বলিয়াছিল, "গদাই! তোমার অপূর্ব ভবিষ্যৎ লীলা আমি তো দেখিতে পাইব না।"[১২৭]

মধ্যলীলাতে ঠাকুর অবতাররূপে স্বীকৃতি পেলেন তদানীন্তন সাধক ও পণ্ডিত সমাজের কাছে। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুরবাবুর সহিত বসিয়াছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরমোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি যাহাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই? সুতরাং তাঁহার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, এ কথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন... মথুরবাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে যাহা বল সেই সব কথা আজ ইঁহাকে

১২৭ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, ১৩১৫ সাল, পৃঃ ৭১

বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার তো দশটি ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন তো? বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার শরীর-মনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।"... ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন।[১২৮]

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনকালে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধন-কালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।' বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই, এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—তোমার অবস্থা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!"[১২৯]

ঠাকুর 'চালকলা বাঁধা বিদ্যা' না শিখলেও, পরীক্ষা দিতে কোনদিন ভয় পান নি। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি তবে তাকে বিশ্বাস করবি।" "বাজিয়ে নিবি" সত্যকে কেউ উপহাস করে উড়িয়ে দিতে পারে না। ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ছদ্মবেশী রাজা নগর পরিভ্রমণকালে জানাজানি হলে স্থান ত্যাগ করে নিজের প্রাসাদে ফিরে যান, তেমনি ঠাকুরের অন্ত্যলীলাতে দেখা যায় তিনি ভক্তদের কাছে আত্মপ্রকাশ ও অভয়দান করে স্বধামে ফিরতে ব্যস্ত। তিনি বলেছেন, "সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।"[১৩০]

---

১২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৯৪-৯৫ ১২৯ তদেব, ২/৩৮০-৮১

১৩০ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, সুরেশ দত্ত, পৃঃ ১১৪

কেশব সেন রাম দত্তকে ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে? তাই অত ঘাঁটাঘাঁটি করছ। ওকে মখমলে মুড়ে ভাল একটি গ্লাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ভাল ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে।"[১৩১]

ঠাকুরকে দর্শন করবার পূর্বে সুরেশ দত্ত কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন এবং তাঁর অনুগত ভক্ত ছিলেন। সুরেশ বাবু লিখেছেন ঃ ব্রাহ্মবন্ধুগণ কতদূর অবগত আছেন জানিনা কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, কেশববাবু শেষাবস্থায় তাঁহাকে অবতার বলিয়া গোপনে পূজা করিয়াছিলেন। একদিন পরমহংসদেব কেশববাবুর বাটী গমন করিলে পর কেশববাবু তাঁহাকে বলেন যে, আপনি একবার আমার উপাসনা গৃহে পদার্পণ করুন তাহা পবিত্র হইয়া যাউক। পরমহংসদেব কেশববাবুর উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলে পর তিনি পুষ্প দ্বারা তাঁহার পদপূজা করিয়া বলেন "যে এ-কথা আপনি কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না।" উক্ত ঘটনার পর একদিন ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পরমহংসদেবের নিকট গমন করিলে পর পরমহংসদেব উপরোক্ত ঘটনাটি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "কেশব আপনার মঙ্গল করিল কিন্তু এ-কথা গোপন করিয়া সাধারণের অমঙ্গল করিল।" আমরা এ-ঘটনাটি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিলাম।*

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার শেষক্ষণে তাঁর নিজের অবতারত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি শ্রীম কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—"গিরিশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিলল?"

নরেন্দ্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস?

---

*উক্ত ঘটনাটি আরও বিশদভাবে ভক্তিভাজন ধর্মাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে—"১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলঘরিয়ার বাগানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশববাবুর পরিচয় হয়। পরমহংস দেবের কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া, তিনি বৈরাগ্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন এবং গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমনকরত দেখিলেন যে, কেশববাবু স্বহস্তে বন্ধন করেন এবং সময় সময় একতারা বাজাইয়া ভজন করেন। পরমহংসদেবের আলোকসামান্য সাধুতা দর্শন করিয়া কেশববাবু এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া ফুল চন্দনাদি দ্বারা পরমহংসদেবের পদপূজা করিয়াছিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে,"কেশববাবু যদি তখন উহাকে (পরমহংসদেবকে) প্রকাশ্যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এতদিন ব্রাহ্মসমাজ উদ্ধার হইয়া যাইত।" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন—"আজ আমাকে কেশব পূজা করেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে, পাছে উহার দলের লোকেরা টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ করে পূজা কল্লে তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে।" (শ্রীমদাচার্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধনা ও উপদেশ, শ্রীঅমৃতলাল সেন গুপ্ত প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, সন ঃ ১৩২২ সাল।) (ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি, পৃঃ ৮-৯)

১৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৪৪

কিছুদিন পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন—"আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি বোধ হয়?"

নরেন্দ্র বললেন, "অন্যের মত শুনে আমি কিছু করব না; আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই বলব।"

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তা হলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন,—"**যে রাম যে কৃষ্ণ,** ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।" নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।[১৩২]

রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বাল্যকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের এক খ্রীস্টান বাঙালী অধ্যাপককে জানতেন, যিনি স্বামীজীর শিক্ষক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই ঘটনাটি ঐ অধ্যাপকের কাছে শুনে পরে স্মৃতিকথায় বলেছেন ঃ মাস্টারমশাই স্বামীজীকে বললেন ঃ "আচ্ছা নরেন, তুমি এ কি করলে। শেষ পর্যন্ত এক পাগলা পুরুতঠাকুরের কাছে মাথা মুড়োলে! আবার শুনি তুমি নাকি মনে কর যে তোমাদের ঐ পুরুতঠাকুর নাকি ভগবান—জগতের পরিত্রাতারূপে মানুষ হয়ে এসেছেন? এসব গাঁজাখুরি গালগল্পে তুমিও বিশ্বাস করলে?" স্বামীজী শান্তভাবে বললেন ঃ "মাস্টারমশাই, আপনি ঠিকই শুনেছেন, আমি তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেই বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি, জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্য মানুষরূপে তিনি দেহধারণ করেছেন। আপনার মতো আমিও আগে এ-সমস্তকে গাঁজাখুরি গালগল্পই মনে করতাম। তাঁকেও ঐ কথা কতবার বলেছি সরাসরি। তিনি ছিলেন শিশু—আমার কথা শুনে তিনি শিশুর মতো হাসতেন, আর বলতেন—'তোকে কি আমি বিশ্বাস করতে বলছি?' কিন্তু আমাকে যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেই হলো, মাস্টারমশাই। তিনি যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন একদিন যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর ঐ রামকৃষ্ণ-শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ হয়ে এবার আবির্ভূত হয়েছেন। একবার রাম রূপ, একবার কৃষ্ণ রূপ পৃথক পৃথক ভাবে তিনি আমাকে দেখিয়েছেন, তারপর তাঁরা দুজনে রামকৃষ্ণ-শরীরে মিলে গেলেন—সেভাবেও দেখিয়েছেন। সে-দেখা hallucination নয়—সাদা চোখেই দেখা। শুধু ঐভাবেই নয়, আরও নানাভাবে আমি বুঝেছি, আমি জেনেছি, আমি দেখেছি যে, তিনিই স্বয়ং ভগবান।" [১৩৩]

১৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫/পরি/৪৬ ১৩৩ উদ্বোধন, ৯৪/৮২ পৃঃ

কল্পতরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে কল্পতরুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহা একটি স্মরণীয় দিন। পুঁথিকার অক্ষয় সেন লিখেছেন ঃ "প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ। হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।। সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে। কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে।।"[১৩৪]

'উথলিছে প্রেম পারাবার'—কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ দুহাতে প্রেম-ভক্তি, দর্শন-সমাধি বিলোতে শুরু করলেন। ঐ দিন প্রথম হরিশ মুস্তাফি ঠাকুরের ঘরে যাওয়ামাত্র তিনি তাকে কৃপা করলেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে নিচে এসে সেবকদের বললেন, "ভাইরে, আমার আনন্দ যে ধরে না! এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই। ভাই, প্রভুর অপূর্ব মহিমা!"[১৩৫]

তারপর ডাক পড়িল দেবেন্দ্র মজুমদারের। তিনি ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "রাম যে আমায় অবতার বলে, এ-কথাটা তোমরা স্থির কর দেখি। কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলত।" পরবর্তী কালে দেবেন্দ্র বলেছিলেন, "এই অবতার-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মর্ম আমরা কি বুঝিব? ঠাকুর নিজেই ইহার মর্মার্থ পরে প্রকটিত করিলেন। বৈকাল বেলা আপনি 'কল্পতরু' হইয়া বসিলেন। একে একে সকলকে দ্বিতলে ডাকিয়া কৃপা করিতে লাগিলেন। তাহাতে দয়াময় প্রভু তৃপ্ত না হইয়া নিচে নামিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন এবং আপনি যাচিয়া যাচিয়া সকলকে কৃপা করিতে লাগিলেন। কাহারও বক্ষ, কাহারও মস্তক স্পর্শ করিলেন। কাহারও কানে কানে কি বলিলেন।"[১৩৬]

বিকাল ৩টায় ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটি জুতা পরে রামলালের সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। শরীর একটু ভাল বোধ করায় তাঁর বেড়াবার ইচ্ছা হয়েছিল। গৃহীভক্তেরা ঠাকুরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুবই আনন্দিত। তিনি গিরিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতার সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি বলিতে পারি।" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন ঃ "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।"[১৩৭]

ঠাকুরের এই আশীর্বাদপূর্ণ বাণী, ভক্তদের অনুভূতির দরজা খুলে গেল। তাঁর দিব্য স্পর্শে ভক্তদের অপূর্ব ভাবান্তর হলো। তখন কেউ হাসতে লাগল, কেউ কাঁদতে লাগল,

১৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬০৬
১৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৫
১৩৬ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১৫
১৩৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১০৯, ৫/৩৯৪

কেউ ধ্যানে নিমগ্ন হলো, কেউ আনন্দে ভরপুর হয়ে অপরকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য।

হারাণচন্দ্র দাস ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করামাত্র তিনি তার মস্তকে পা দিয়ে স্পর্শ করলেন। পুরাকালে গয়শিরে পদার্পণ করে নারায়ণ যেমন পিতৃগণের মুক্তিক্ষেত্র করেছিলেন, ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণরূপী গদাধর আগন্তুককে সেইরকম কৃতার্থ করলেন।

অক্ষয় সেনকে 'কি গো' বলে ঠাকুর কাছে ডাকলেন। তারপর ঠাকুর তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে, কানে এক 'মহামন্ত্র' দিলেন। অক্ষয় সেনের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল এবং তার জীবন কৃতার্থ হলো।

নবগোপাল ঘোষকে ঠাকুর একটু ধ্যানজপ করতে বলেন। নবগোপাল বলেন যে, তার অবসর নাই। তখন ঠাকুর বলেন, "আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" "তা খুব পারব"—এই উত্তর শুনে ঠাকুর বললেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"[১৩৮]

তারপর এগিয়ে আসেন উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। "উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন। লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন।"[১৩৯]

এরপর কৃপালাভ করেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে, সকলের ত একরকম হলো, আমার কি গাড়ু গামছা বয়া সার হলো? একথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন, 'কিরে রামলাল, এত ভাবছিস কেন? আয় আয়।' এই বলে আমায় সামনে দাঁড় করালেন, গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন—'দেখ্ দিকিনি এইবার'।" রামলাল বলেন, "আহা, সে যে কি রূপ, কি আলো, জ্যোতি! সে আর কি বলব।" তিনি স্বামী সারদানন্দকে আরও বলেন, 'ইতঃপূর্বে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না; অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর ইষ্টমূর্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।"[১৪০]

ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করায় ঠাকুর বললেন, "তোর সমাধি হবে।"

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থ প্রার্থনা করায় ঠাকুর বললেন, 'তোর অর্থ হবে।'[১৪১]

ঠাকুর যখন তাঁর দিব্য স্পর্শে সকলের ভিতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা পার্থিব বস্তু বিতরণ করছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, "মহাশয়, আমায় কৃপা করুন।" ঠাকুর বললেন, "তোমার তো সব হয়ে গেছে।" বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা জানান, "আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় হয়ে গেছে; কিন্তু আমি যাতে উহা অল্প

১৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ২/৩৭৮ ১৩৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬০৭

১৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/৩৯৭

১৪১ আমার জীবন-কথা, পৃঃ ৮৩

বিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।" "আচ্ছা," বলে ঠাকুর ক্ষণেকের জন্য বৈকুণ্ঠের হৃদয় স্পর্শ করলেন। "অমনই সে তাহার অন্তর বাহিরে, পুত্তলিবৎ ভক্তমণ্ডলী মধ্যে, উদ্যানের পাদপপত্রে ও গগনে সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণরূপ দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাণ্ডুরোগে আঁখিতে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রাভ দেখায়, তাহার ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ক্ষণিক আবেগে এক আধ ঘণ্টা বা এক দিন নহে, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় এইরূপ দর্শনে সে যেন উন্মাদের মতো হইয়াছিল।"[১৪২]

তারপর ঠাকুর অতুল, কিশোরী রায়কে কৃপা করলেন। কে কোথায় বাদ পড়ে গেল, সেই খোঁজে গিরিশ রান্নাঘরে যান, দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলি রুটি বেলতে বসেছে। গিরিশ তাকে ধরে এনে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করলেন। দয়াময় ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেন।

উপস্থিত ভক্তসকলের মধ্যে দুইজনকে (একজন হরমোহন মিত্র) কেবল ঠাকুর "এখন নয়" বলে স্পর্শ করেন নি। এই আনন্দের দিনে তাতে তাঁরা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হন। পরে একদিন ঠাকুর এদেরও স্পর্শ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হরমোহন বলেছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্য স্পর্শের ফলে তাঁর অনেক অনুভূতি লাভ হয়েছিল, তিনি ভ্রূযুগলের মধ্যে অনেক দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন।[১৪৩]

তারপর রামলালের সঙ্গে ঠাকুর ঘরে ফিরে বললেন, "শালাদের পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গা জল নিয়ে আয়, গায় মাখি।"[১৪৪] ঐ দিন সন্ধ্যায় স্বামীজী হাজরাকে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হন এবং হাজরাকে কৃপা করতে অনুরোধ করেন। "উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে। সময় সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে।।"[১৪৫] অবশেষে আসেন চুনীলাল। স্বামীজী তাঁকে ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঠাকুর সস্নেহে বললেন, "তুমি কি চাও?" নির্বাক চুনীলালকে ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে বললেন, "এটাতে ভক্তিবিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।"[১৪৬]

জীবদ্দশায় ভক্তদের দর্শন

একবার ঢাকায় অবস্থান করিবার কালে বিজয় যখন ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিলেন ঘরের দরজায় খিল দিয়া বসিয়া, সেই সময় গৃহমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরকে দেখিতে পান। উহা মাথার খেয়াল কিনা জানিবার জন্য ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া টিপিয়া দেখেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি এই ঘটনাটি বলিয়াছিলেন ঠাকুরের ও বহু ভক্তের সম্মুখে বসিয়া, শ্যামপুকুরে।[১৪৭]

---

১৪২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/৩৯৮-৯৯; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৯৯

১৪৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১১২, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৬

১৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬০৭-০৮; ১৪৫ তদেব, পৃঃ ৬০৮; ১৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ২/৪১১

১৪৭ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৫৮

'কথামৃতে' শ্রীম এ-বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

বিজয়—ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—সে তবে আর একজন!

নরেন্দ্র—আমি এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি করে বলব—আপনার কথা বিশ্বাস করি না![১৪৮]

ঢাকাতে শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামীরও ঠাকুরের দর্শন হয়েছিল। ঐ দর্শন সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে মঠ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে বলেন ঃ আমি ঢাকায় গমন করি। আমি তখন অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতেছি। ঢাকার নিকটে একটি বন আছে, সেখানে মুসলমানদের গোরস্থান। আমি সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে আমি দেখিলাম একটি লোক আমার সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কি করিতেছ।" সেই বনে লোকে বুলবুলি ধরিতে যায়, আমি জানিতাম। আমি বোধ করিলাম সেইরূপ কেহ বুলবুলি ধরিতে আসিয়াছে। তিনি আমাকে কোন কথা বলিবেন বলিয়া ডাকিলেন এবং তাঁহার মুখের কথায় আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া সেই কৃপাস্বরে বলিলেন, "নিত্যগোপাল বাবা যা ধরেছ তা ছেড় না।" ইহার পর আমি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি আসিয়া বিজয়বাবুকে এই সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনিও অনেকবার ঐরূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। রাত্রে আমি নিদ্রাগত হইয়া সমস্ত রাত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি এবং তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে লাগিলেন এবং অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি এক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তিনি আমার নিকট আহার চাহিলেন এবং একখানি গাত্রবস্ত্র চাহিলেন। আমি তাঁহাকে দিবার পর তিনি আমার মস্তকে পদ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।[১৪৯]

স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলেছিলেন, "ঠাকুরের কাছে প্রথমবার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেন লোকে এঁকে মহাপুরুষ বলে।" দ্বিতীয়বারও তাই হলো। আর যাবেন না ঠিক করলেন। শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয়বার গেলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে ধরলেন। আর যাবেন কোথা? স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলতেন, "তারপর থেকে দিনরাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হতো, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কি একটা ব্যথা, চেষ্টা করেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না।"[১৫০]

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নিত্য নিজের ঠাকুরঘরে বসে ধ্যানাদি অভ্যাস করতেন। একদিন তাঁর মনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার বাসনা জাগল। তিনি স্থির করলেন, পূজাগৃহে ধ্যানকালে যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয়, তবেই তিনি জানবেন যে ঠাকুর অবতার। কি আশ্চর্য! "কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান। ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান।।

১৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/২৮৯

১৪৯ ৫ম অধিবেশন, ২৩ মে ১৮৯৭

১৫০ উদ্বোধন, ৫৭ বর্ষ ১৫৭ পৃঃ

এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর। সুরেন্দ্রের প্রভুপদে পড়িল নির্ভর।।" [১৫১]

স্বামী তুরীয়ানন্দ সুরেন্দ্র মিত্রের জীবনের একটি ঘটনা বলেছিলেন। ইনি ঠাকুরকে দর্শনের পূর্বে মদ ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন। যা হোক ঠাকুরের কৃপা লাভের পরে একদিন পূর্ব-সংস্কারবশত অফিস ফেরৎ তিনি একটি বারবনিতার গৃহে যান। তিনি ঐ নারীর উপর তলার ঘরে গিয়ে দেখেন, সে নারীর পরিবর্তে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। লজ্জায় সুরেন্দ্র সে স্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসেন।[১৫২]

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর মন্ত্রগ্রহণের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"আমি এই সময় ঠাকুরকে সর্বত্র দর্শন করিতাম—রাস্তায় চলিতেছি, দেখি ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া আগে আগে চলিতেছেন। আমি দাঁড়াইলে, তিনি দাঁড়াইতেন; আমি বিশ্রাম করিতে বসিলে, তিনিও বসিতেন। সর্বদাই আমার সঙ্গে ফিরিতেন। এমন কি, আমি শৌচে গিয়াও তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতাম; প্রথম প্রথম আমার বড় লজ্জা বোধ হইত। একদিন মা কালীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি, তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ হয়—তিনি যে আমার সর্বস্ব, আমার রক্ষাকর্তা—ইহা বুঝাইবার জন্য ঠাকুর আমার সঙ্গছাড়া হইতেন না।"[১৫৩]

দেহত্যাগের পর ভক্তদের দর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রথম দর্শন পান শ্রীশ্রীমা। ঐদিন "সন্ধ্যাকালে শ্রীমা দেহ হইতে একে একে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পরিশেষে যখন সোনার বালাও খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন অকস্মাৎ ঠাকুর গলরোগের পূর্বেকার মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "একি করছ? হাতের বালা খুলো না। আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়ো-স্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?—শুধু এঘর আর ওঘর।" শ্রীমা হাতের বালা আর খুললেন না।[১৫৪]

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমা বহুবার তাঁর দর্শন পেয়েছেন। বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রার পথে রেলের কাঁচের সার্শিতে ঠাকুরের মুখ দেখেন। এই সময় ঠাকুরের সোনার ইষ্টকবচ-খানি মার বাহুতে বাঁধা ছিল। মা ঐ বাহুটি জানালার পাশে রেখে শয়ন করলে, ঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেন, "ওগো, কবচটি এমন ভাবে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" মা তখনই হাত থেকে খুলে টিনের বাক্সে রেখে দেন।[১৫৫]

বৃন্দাবনে শোকসন্তপ্ত শ্রীমাকে ঠাকুর ঘন ঘন দর্শন দেন; স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষা

১৫১ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ২/২৭৯, পুঁথি, পৃঃ ২৬২

১৫২ Prabuddha Bharata, 1925, pp. 532-33

১৫৩ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৫

১৫৪ শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৮১; জননী সারদাদেবী, স্বামী অপূর্বানন্দ, পৃঃ ৬৮

১৫৫ শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী, মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃঃ ১২৭

দিতে বলেন। কামারপুকুরে লোক ভয়ে শ্রীমা আবার হাতের বালা খুলতে গেলে ঠাকুর তাঁকে বললেন, "তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণব-তন্ত্র জান ত?" মা, "বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি ত কিছু জানি নে।" ঠাকুর বললেন, "আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।" সেইদিন বৈকালে গৌরদাসী এসে মাকে বললেন, "চিন্ময় স্বামী।"[১৫৬]

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ঠাকুরের তিরোধানের এক সপ্তাহের মধ্যেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। সেদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় ঠাকুরের ভক্ত হরিশের সহিত নরেন্দ্রনাথ উদ্যানবাটীর সম্মুখস্থ (পশ্চিমের) পুকুরধারে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন, ফটকের দিক হইতে রাস্তা ধরিয়া ঠাকুরেরই মতো এক শুভ্র বস্ত্রাবৃত উজ্জ্বল মূর্তি তাঁহাদেরই অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। নরেন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগিল, "ঠাকুর নাকি?" যুক্তিবাদী নরেন্দ্র তবু চুপ করিয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন, তিনি কাল্পনিক কিছু দেখিতেছেন না ত? এমন সময় হরিশও শ্রীরামকৃষ্ণ-সদৃশ সেই মূর্তি দেখিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, "ও কি? নরেন, দেখ দেখ!" তখন নরেন্দ্র স্পষ্টস্বরে ডাকিলেন, "কে ওখানে?" তাঁহার গলার তীব্র আওয়াজ শুনিয়া অপর সকলে দ্রুতপদে সেখানে আসিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ঐ মূর্তি নরেন্দ্র ও হরিশ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন উহার দশ হাত দূরে এক যুঁই ফুলের ঝোপ পর্যন্ত আসিয়া মিলাইয়া গেল। তখন লণ্ঠন আনিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, তবু কিছুই পাওয়া গেল না। এই দর্শনটি নরেন্দ্রের অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং উপস্থিত সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ঠাকুর সূক্ষ্মদেহে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন।[১৫৭]

পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে স্বামীজী লিখিয়াছেন ঃ "শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ-শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে।"[১৫৮]

ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা?—এই প্রশ্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে করা হলে, তিনি বলেন, "স্বামীজী তো বহুবার দেখেছেন; আমরাও কখন কখন ভাবে দেখি। কখন বা প্রত্যক্ষও দেখি।" কাশীতে থাকাকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ" নামক পুস্তিকাটির সংকলন কার্য শেষ করেন। মহারাজ নিজের ঘরে বসে ঠাকুরের উপদেশাবলী লিখতেন; সংকলন করবার সময় অপর কাকেও ঘরে থাকতে দিতেন না। তাঁর সেবকগণ লক্ষ্য করেছেন তিনি গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে কোনদিন উপদেশ সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি আনিয়ে সংশোধন করিয়েছেন। কাউকে কাউকে তিনি নিজমুখে বলেছেন, "ঠাকুর এসে

---

১৫৬ তদেব, পৃঃ ১৩৯
১৫৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১/২০২-০৩
১৫৮ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১৮

বলে গেলেন, এ-কথা তো আমি বলিনি—আমি এই বলেছি;" অথবা "ওরে, এটি আমার কথা নয়,অমুক বলত।"[১৫৯]

ঠাকুর যে শুধু কেবল শ্রীমা ও ত্যাগী সন্তানদের দর্শন দিয়েছেন তা নহে; তাঁর গৃহী ভক্তেরাও দর্শন পেয়েছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির ঠিক পরবর্তী দিনগুলি লোকদৃষ্টিতে বিষাদব্যাকুল, বিফলতাময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ হইলেও ঠাকুর স্বয়ং অলক্ষ্যে নিজ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় স্থির করিতেছিলেন। তাঁহার ভক্ত ও 'রসদ-দার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (যাঁহাকে অনেকে সুরেশ বলিয়া ডাকিতেন) একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া পূজাগৃহে ঠাকুরের ধ্যানে মগ্ন আছেন, এমন সময় এক দিব্যদর্শন পাইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" শুনিয়াই সুরেন্দ্র উন্মত্তবৎ সমপল্লীবাসী নরেন্দ্রনাথের গৃহে দ্রুত উপনীত হইলেন এবং সমগ্র বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কাম-কাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে গিয়ে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্র এই দানের কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং বাড়ির সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।[১৬০]

যোগেন-মার মনে একবার সংশয় আসে—'ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন—ভাই, ভাই-পো, ভাই-ঝিদের জন্য অস্থির। কিছুই বুঝতে পারি না।' একদিন গঙ্গার ঘাটে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "দেখ, গঙ্গায় কি ভাসছে।" যোগেন-মা দেখেন একটি সদ্যোজাত শিশু নাড়িভুঁড়ি-জড়ান গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিলেন, 'গঙ্গা কি কখনও অপবিত্র হয়? না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না, ওকে একে (নিজেকে দেখাইয়া) অভেদ জানবে।' গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন-মা মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমায় ক্ষমা কর।" মা বলিলেন, "কেন যোগেন, কি হয়েছে?" তখন যোগেন-মা ঘটনাটি বলিয়া বলিলেন, "তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল। তা আজ ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিলেন।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস হয়।"[১৬১]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র কিভাবে ঠাকুরের দর্শন পান সে-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা

১৫৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, পৃঃ ৯৯, ব্রহ্মানন্দ চরিত, পৃঃ ২৩০, ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃঃ ৫১

১৬০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১/২০৮

১৬১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২/৩৩৬-৩৭

বলেন ঃ "যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই সে দিন* একটি ছেলে মারা গেল। আহা, সে কত ভাল ছিল! ঠাকুর তাদের বাড়ি যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত ২০০ টাকা ট্রামে তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ি এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে—'হায় ঠাকুর, কি করলে!' তার অবস্থাও তেমন ছিলনা যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে দেখে ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন, 'কাঁদছিস কেন? ঐ গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে দ্যাখ।' সে তাড়াতাড়ি উঠে ইটখানা তুলে দেখে—সত্যই এক তাড়া নোট! শরতের কাছে এসে সব বললে।"[১৬২]

ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৬ মাস রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপে দীর্ঘকাল শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেও তাঁর মন এক ক্ষণের জন্যও চিন্তিত বা অবসন্ন হয় নাই। ঠাকুরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পূর্ণ বলতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমার শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ বসে রয়েছেন।" একদিন রাতে তিনি একাকী শৌচে যান এবং দুর্বলতাবশত মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। বাড়ির কেহ টের পায় নি। এই ঘটনার কিছু পরে কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির কথা উল্লেখ করলে রুগ্ন পূর্ণ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কে বলে ঠাকুর অদর্শন হয়েছেন? ঠাকুর এখনও জ্যান্ত রয়েছেন—তাঁকে জ্বলজ্বলভাবে দেখছি। আমি প্রস্রাব করতে গিয়ে একা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। তিনি কোলে করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে গেলেন। তিনি রয়েছেন, যেমন আগে ছিলেন ঠিক তেমনি রয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি।"[১৬৩]

ঠাকুর যে কেবল তাঁর নিজের শিষ্য-শিষ্যাদের দর্শন দিয়েছেন তা নয়, বিদেশী ঈশ্বরানুরাগীদেরও দেখা দিয়েছেন। ঠাকুর সমাধিযোগে পাশ্চাত্য দেশে গমন করে পরে রামলালদাদাকে বলেছিলেন, "এক নতুন জায়গায় গেছলুম গো। কি রকমের সব লোক সেখানে। ধবো ধবো (ধলা, সাদা) অনেক লোক। তাদের নীল চোখ। এক নূতন দেশ।"

১৮৯৭ সালে স্বামী সারদানন্দ নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে বেদান্ত প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময় তিনি মণ্টক্লেয়ারে এক ভক্তিমতী মহিলার (মিসেস হুইলার) বাড়িতে বাস করতেন। মহিলার বয়স তখন প্রায় ৪৫। একদিন ক্লাসের পর স্বামী সারদানন্দ তাঁর পকেটের নোটবুক থেকে ঠাকুরের একখানি ছবি বের করে দেখিয়ে বলেন, "দ্যাখো, যাঁর কথা বলি, তাঁর এই চেহারা।" ঐ ছবি দেখে মিসেস হুইলার চমকে উঠে বললেন, "আমার যখন বিশ-পঁচিশ বয়েস, তখন প্রথম স্বপ্নে আমি এই মহাত্মার দেখা পাই।** আর সেই অবধি, আমার অসুখ বিসুখ হলে বরাবরই দেখতুম, ইনি—এই ইনিই, অনন্ত দয়া করে, বাপের মতো আমার মাথার ধারে এসে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। সেই থেকে আমার এশিয়ার

* ৩১শে ভাদ্র ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথাই বলিতেছেন।

** স্বপ্নদৃষ্টে মনে হয় ঐ মহিলা ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন যখন ঠাকুর সশরীরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছিলেন।

১৬২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১/৩৮-৩৯ ১৬৩ উদ্বোধন ৪৯ বর্ষ পৃঃ ৩৬৫-৬৬

লোকদের উপর ভারি শ্রদ্ধা। প্রাচ্য দেশ থেকে নূতন কেউ এলে বা পূর্বদেশের সম্বন্ধে কথাবার্তা বক্তৃতা কোন পণ্ডিত সজ্জন দিলে, সংবাদ পাবা মাত্র ছুটে যাই। তোমাদের এ বেদান্ত আন্দোলন আমার খুব ভাল লাগে। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাত্মার দেশের লোকদের কণ্ঠ থেকে এ সবই যে উচ্চারিত হচ্ছে।"[১৬৪]

অশরীরী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের কিভাবে রক্ষা করেন, তা পড়লে বিস্ময় জাগে। আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে গোঁড়া খ্রীস্টিয়ান্ মিশনারীরা স্বামীজীকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। এক নৈশভোজে স্বামীজী কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলছেন, "খাসনি, ও বিষ।" স্বামীজী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এই ঘটনাটি বলেন ঃ

একবার পূর্ববঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি (স্বামী প্রেমানন্দ) ঠাকুরকে প্রণাম করতে উপরে গেলেন। পূর্ববঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ভক্তরা সব এসেছেন। সব তৈরি। এমন কি নৌকো পর্যন্ত ঘাটে বাঁধা হয়ে গেছে—নিয়ে যাবে কলকাতায়। ঠাকুরঘর থেকে নিচে নেমে এসে তিনি বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না।' যে ব্যক্তি সেই সময় ঠাকুরঘরে ছিল, সে দেখল যে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন আর শেষে বললেন, 'তা হলে আমি যাব না?' সে ব্যক্তি বাবুরাম মহারাজের কথাই শুধু শুনতে পেয়েছিল। ঠাকুর কি বললেন, শুনতে পায়নি। বাবুরাম মহারাজ নিচে এসে যখন বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না', তখন অনুমান করে বোঝা গেল যে, ঠাকুর যেতে নিষেধ করেছিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সব ব্যবস্থা তৈরি, অথচ তিনি বলছেন যাবেন না। অগত্যা সে দিন যাওয়া হলো না। পরে শুনা গেল যে, যে স্টীমারে তাঁর গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাবার কথা ছিল সেই স্টীমারটা ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়েছিল। তা হলে দেখা গেল যে, ওঁকে রক্ষা করার জন্যেই ঠাকুর ওঁকে নিষেধ করেছিলেন।[১৬৫]

স্বামী অভেদানন্দ একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "ভগবান যার সহায়, সংসারে তার আর ভাবনা কি বল! ভক্ত মানে সত্যকারের সরল বিশ্বাসী একান্তচিত্ত মানুষ। এখানে আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলি শোন—যার পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা ও করুণা ছিল! তিনি যে সকল সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন এবং এখনও সদাসর্বদাই করেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি অনেক পেয়েছি। তাঁর পবিত্র *presence*-ও (উপস্থিতি) জীবনে অনুভব করেছি বহুবার।... লণ্ডন থেকে সেইবার আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিকঠাক। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল 'লুসিটেনিয়া'। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ মে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনব এমন সময়ে মনে হলো যেন কে টিকিট কাটতে আমায় নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম

১৬৪ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে, পৃঃ ৭১ ৭২, স্বামী সারদানন্দের জীবন, অক্ষয় চৈতন্য, পৃঃ ৯১
১৬৫ উদ্বোধন ৮২ বর্ষ ১৬৬ পৃঃ

মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে। সেবারেও ঠিক সেই রকম। তখন টিকিট কেনা আর হলো না, বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা—S. S. Lusitania is no more—অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলাণ্টিক-মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে।[১৬৬] আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এল! বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন।"[১৬৭]

ভক্তদের দেহত্যাগকালে দর্শন

হিন্দুশাস্ত্রে আছে মৃত্যুকালে মানুষ যে চিন্তা নিয়ে দেহত্যাগ করে পরজন্মে সে সেইরূপ হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" (৮/৫) ঠাকুর বলতেন, "যার শেষজন্ম সেই এখানে আসবে।" কামনাবাসনাই পুনর্জন্মের কারণ। বাসনাহীনের জন্ম হয় না। অবতারের সান্নিধ্যে এলে বাসনার বীজ আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করে।

ঠাকুরের ভক্তদের মৃত্যুকাহিনী চমকপ্রদ। তিনি যে কেবল ভক্তদের জীবদ্দশায় সঙ্গী ছিলেন তা নয়, মৃত্যুকালেও তিনি অশরীরীরূপে উপস্থিত থেকে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে নিয়ে গেছেন।

স্বামী শিবানন্দ দক্ষিণেশ্বরের মেথর রসিকের মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প শোননি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল, "বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?" তখন ঠাকুর বলেছিলেন, "ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।" ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল, 'এই যে, এসেছ। বাবা এসেছ!' এই বলতে বলতে মারা গেল।[১৬৮]

স্বামী শিবানন্দ ঠাকুরের ভক্ত বলরাম বসুর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে বলেন ঃ ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত। বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য রকমের।

১৬৬ ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের যাত্রীবাহী জাহাজ (liner) 'লুসিটেনিয়া' (S. S. Lusitania) জার্মানদের কোন একটি সাবমেরিনের আক্রমণে আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্ক-এর (Cork) উপকূলের কিছু দূরে ৭ মে, ১৯১৫ তারিখে ডুবে গিছল। সেই জাহাজ ডুবিতে ১১৯৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও ছিলেন।

১৬৭ মন ও মানুষ, ৩/৮৩-৪

১৬৮ শিবানন্দ বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৫

তাঁর তো খুব কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। একদিন তিনি কেবলই বলতে লাগলেন—'কই, আমার ভাইরা কোথায়?' এ-সংবাদ পেয়ে আমরা বাগবাজারে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। শেষের দিকে আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম, তাঁর সেবাদিও করতাম। দেহত্যাগের দু-তিন দিন আগে থেকে আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে কাছে আসতে দিতেন না; আমাদেরই কেবল দেখতে চাইতেন। যতটুকু কথাবার্তা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগে ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। দেহত্যাগের দিন আমরা তাঁর পাশেই বসে আছি; বলরামবাবুর স্ত্রীও শোকে খুব ম্রিয়মাণা হয়ে গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী আকাশের গায়ে একখণ্ড কালো মেঘের মতো দেখতে পেলেন। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নিচে নেমে আসতে লাগল এবং একটি রথের আকার ধারণ করে বলরাম-মন্দিরের ছাদের উপর নামল। ঐ রথের ভেতর থেকে ঠাকুর নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন, সেদিকে গেলেন এবং খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এই vision (অলৌকিক দৃশ্য) দেখতে দেখতে বলরামবাবুর স্ত্রীর মন এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিল, যেখানে শোক-তাপ স্পর্শ করতে পারে না। যখন তাঁর চমক ভাঙল, তখন তিনি ঐ দর্শনের কথা গোলাপ-মাকে বললেন। গোলাপ-মা এসে আমাদের ঘটনাটি জানালেন; তার কিছুক্ষণ আগেই বলরামবাবুর দেহত্যাগ হয়েছিল। এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে! আজকালও অনেক ভক্তদের অদ্ভুত দেহত্যাগের খবর পাওয়া যায়। দেহত্যাগ-সময়ে কত দিব্য দর্শন ও অনুভূতি হচ্ছে! ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে! ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।[১৬৯]

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী নাগ মহাশয়ের মৃত্যুকথা লিখেছেন ঃ মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে রাত্রি দুইটার সময় মাতাঠাকুরানী, হরপ্রসন্নবাবু ও আমি শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, নাগমহাশয় চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন। সহসা চক্ষু মেলিয়া ব্যস্তভাবে আমায় বলিলেন, "ঠাকুর এসেছেন, আমায় আজ তিনি তীর্থদর্শন করাবেন।" আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপনি যে-সকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" আমি সম্প্রতি হরিদ্বারে গিয়াছিলাম, তাহারই নাম করিলাম। নাগমহাশয় অমনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হরিদ্বার—হরিদ্বার! ঐ যে মা ভাগীরথী কলকল নিনাদে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন! ঐ যে মায়ের তরঙ্গভঙ্গে তীরতরুরাজি দুলিতেছে। ওপারে, ঐ যে চণ্ডীর পাহাড়! ওঃ কত ঘাট মায়ের গর্ভে নামিয়াছে! আপনি একটু থামুন, আমি আজ বিশ বৎসর স্নান করি নাই, একবার মায়ের গর্ভে স্নান করিয়া মানবজন্ম সফল করিয়া যাই।" 'গঙ্গা, গঙ্গা, মা পতিতপাবনী, মা অধমতারিণী' বলিতে বলিতে নাগ মহাশয় গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমার মনে হইল তিনি যথার্থই স্নান করিয়া উঠিতেছেন।

১৬৯ শিবানন্দ বাণী, ২/১৩৫-৩৬

নাগ মহাশয় অন্য তীর্থের নাম করিতে বলিলেন। আমি যন্ত্র-চালিতবৎ প্রয়াগতীর্থের নাম করিলাম। তিনি তখনি 'জয় যমুনে, জয় গঙ্গে!' বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখানেই না ভরদ্বাজের আশ্রম? কৈ, তা তো দেখতে পাচ্ছি না। ঐ যে গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারা! ঐ যে ওপারে পাহাড় দেখছি! হায়, ঠাকুর তো ভরদ্বাজের আশ্রম দেখাচ্ছেন না।" যেন একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। দুই-তিন মিনিট পরে বলিলেন, "হাঁ, ঐ যে মুনির কুটির দেখা যাচ্ছে!" আবার ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী, মহাশক্তির অবতার হয়ে কেন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" 'জয় রাম, জয় রাম' বলিতে বলিতে নাগ মহাশয় আবার গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমি সাগরতীর্থের নাম করিলাম। তিনি যেন সগরবংশের উদ্ধার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সমুদ্রদর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি কাশীধামের নাম করিলাম। নাগমহাশয় অমনি বলিতে লাগিলেন, "জয় শিব! জয় শিব! বিশ্বেশ্বর! হর হর ব্যোম ব্যোম!" তৎপরে বলিলেন, "এবার আমি মহাশিবে লয় হইয়া যাইব।" তাহার পর শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র; নাগমহাশয় শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে উচ্চ মন্দির! ঐ যে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বেচা কেনা হইতেছে!" আমার মনে হইল যেন তিনি দুই একবার শ্রীচৈতন্যের নাম করিলেন। এইরূপে ক্রমে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল, নাগ মহাশয়ের যেন একটু তন্দ্রাবেশ আসিল। পরদিন প্রভাত হইবার পরও তাঁহার সে নিদ্রাবেশ ভাঙিল না। গ্রামে একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল! তিনি আসিয়া এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেন। আমি তাঁহাকে সেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম। ন্যাকড়ার পলিতা করিয়া একটু দুধও খাওয়াইলাম। নাগ মহাশয়ের জীবনের এই শেষ আহার। আহার দিয়া আমার স্মরণ হইল, তাঁহার জীবনের আজ শেষ দিন।

১৩ পৌষ ৮টার পর হইতে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব হইতে লাগিল। আমি তাঁহার কর্ণমূলে অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনাইতে লাগিলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম, "যাঁহার নামে আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রতিমূর্তি। দর্শন করিয়া তিনি করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "কৃপা কৃপা—নিজগুণে কৃপা!" ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কথা।[১৭০]

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে জটিলা কুটিলা সদৃশ হাজরা মহাশয়ের মৃত্যুকাহিনী তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

যাঁহারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক জনৈক সাধকের বিষয় অবগত আছেন। ইনি একজন প্রকৃত জাপক ছিলেন। ইনি বহুকাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বাস করিয়াও তাঁহাকে সাধু ব্যতীত ভগবানের

১৭০ সাধু নাগমহাশয়, পৃঃ ১৩৭-৩৯

অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। বরং যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, তাঁহাদের বিদ্রূপ করিতেন। তাই কোন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি এঁকে কৃপা করুন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহার শেষ সময়ে করিব। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার অদ্ভুত দেহত্যাগের কথা শুনিয়া সকলেই চমকিত হইয়াছেন! তিন দিবস সামান্য জ্বর হইয়াছিল। ইঁহার অন্য কোন অসুখ ছিল না। গ্রামের জনৈক ডাক্তারও দেখিয়াছিলেন; হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ! তুমি কাল প্রত্যূষে উঠিয়া সকলকে বলিয়া আসিবে যে, তাহারা সকলে যেন আমাদের বাড়িতে বেলা ৯টার আগে আহারাদি করিয়া আসে। কাল ৯টার সময় আমি মরিব। তাঁহার স্ত্রী মনে করিলেন যে, বড়ই জ্বরের জন্য ভয় পাইয়া এইরূপ বলিতেছেন, তিনি ও-কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তৎপরদিন খুব ভোরে উঠিয়া হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে উঠাইয়া জোর করিয়া সকলের বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। কেহ বা হাজরা পাগল হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, কেহ বা রঙ্গ দেখিতে আসিলেন। বেলাও প্রায় ৮।।০ (সাড়েআট ঘটিকা) হইল। হাজরা মহাশয় মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। চিরদিনই হাজরা মহাশয় মালা জপ করেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব, সকলেই জানে। আজও তাহাই করিতেছেন। বাড়িতে কতকগুলি লোকও আসিয়াছে। হঠাৎ সকলে হাজরা মহাশয়ের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন, হাজরা মহাশয় ঠিক যেন কোন লোকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! কিয়ৎক্ষণ পরেই হাজরা মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে ঠাকুর এসেছেন। ঠাকুর এতদিন পরে স্মরণ করেছেন?" এই কথা বলিয়াই তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো, একটা আসন দাও, শীঘ্র দাও, দেখ্‌চো না, পরমহংসদেব এসেছেন।" স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। পুনরায় হাজরা মহাশয় বলিলেন, শীঘ্র দাও। স্ত্রী কি করেন, কাজেই সেইখানে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। হাজরা মহাশয় বলিতেছেন, "ঠাকুর! আপনাকে একটু দয়া করতে হবে। এই আসনের উপর বসুন, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট অনুগ্রহ করিয়া থাকুন।" এই কথা বলিয়াই আবার হাজরা মহাশয় জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে, রামদাদা এসেছেন। আমার কি সৌভাগ্য!" আবার স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো আর একখানা আসন দাও, রামদাদার জন্যে।" হাজরা মহাশয় পুনরায় মহাত্মা রামচন্দ্রকেও জোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনিও অনুগ্রহ করিয়া মৃত্যু সময় পর্যন্ত আমার নিকট থাকুন।" আবার জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে তৃতীয়বার বলিয়া উঠিলেন, "আসুন! আসুন! এই যে যোগীন মহারাজ এসেছেন। আহা! কি আনন্দের দিন!" পুনরায় ইহাকেও আসন প্রদান করিয়া মৃত্যু সময় পর্যন্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে করজোড়ে বলিলেন যে, "ঠাকুর! যদি এতই দয়া করেছেন, তবে আর একটু কষ্ট করুন। অনুগ্রহ করিয়া

তুলসীতলায় চলুন। আমি তুলসীতলায় দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।" ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া হাজরা মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে তুলসীতলায় তিনখানি আসন দিতে বলিলেন এবং তথায় তাঁহার শয্যা করিতে বলিলেন। অতঃপর তুলসীতলায় আসিয়া তিনখানি আসনের উপর তিনজনকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আপনি শয়ন করিয়া মালা লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। মুখে তিনবার বলিলেন, হরি, হরি, হরি। আর হাজরা মহাশয়ের সংজ্ঞা নাই! একি! সত্য সত্যই যে হাজরা মহাশয় ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এইরূপ সকলে চিন্তা করিতে করিতে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক হাজরা মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তখন সকলে অবাক হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেরই মুখে এক কথা ধন্য হাজরা মহাশয়! তুমি যথার্থ মহাপুরুষ ছিলে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের একএকটি সাঙ্গোপাঙ্গের অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া কত মানবের যে মোহতিমির বিদূরিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা স্বচক্ষে এই সকল লীলা দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য![১৭১]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত কালীপদ ঘোষের শেষ সময়ে কি হয়েছিল সে-প্রসঙ্গে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলেন, "দেখো, শেষের দিনে সত্যি তিনি (ঠাকুর) এসেছিলেন। তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেছিলেন। বাবুরাম ভাই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি যাকে যা বলে গেছেন, সব ঠিক ফলছে।"[১৭২]

কালীপদর কাহিনী 'যোগোদ্যান মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিত হয়েছে ঃ

ভক্তপ্রবর কালীবাবু পরমহংসদেবকে মুক্তিদাতা সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতেন। তিনি একদিন পরমহংসদেবকে স্বগৃহে আনিবার আয়োজন করেন। পূর্ব ধার্য দিনে তিনি নৌকা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েন। নৌকার মাঝিকে বলিয়া রাখেন যে, আসিবার সময় নৌকা মাঝ-গঙ্গা দিয়া আনিতে হইবে। পরমহংসদেবকে লইয়া নৌকা যখন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিল তখন কালীবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ ধরিয়া বলেন, "আপনি আমাকে উদ্ধার করুন—আপনি মুক্তিদাতা।" ঠাকুর বলিলেন, "না, না, আমি কি জানি, আমি কি জানি, ভগবানের নাম কর, মুক্তি পাইবে।" কালীবাবু বলিলেন, "আমি সর্বদা 'মদে-বদে' থাকি—নাম করার সময় আমার নাই। আপনি কৃপাসিন্ধু, আপনি কৃপা করিয়া সাধন-ভজন-বিহীন এই পাষণ্ডকে পরিত্রাণ করুন।" কালীবাবু কিছুতেই চরণ ছাড়িবেন না—ঠাকুর অনুপায় দেখিয়া ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হইয়া ভক্ত কালীবাবুর জিহ্বার উপর একটি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এখন হতে তোমার জিহ্বায় ভগবানের নাম আপনা হইতেই বাহির হইতে থাকিবে।" অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারেই জিহ্বা ভগবানের নাম জপ করিবে। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। কালীবাবু বলিলেন, "আমি উহা চাই না।" ঠাকুর বলিলেন তবে কি চাস? এইবার কালীবাবু বলিলেন—"যখন আমি চলিয়া যাইব সে-সময় জগৎ অন্ধকার দেখিব। সেই ভীষণ অন্ধকারে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে; তখন

১৭১ তত্ত্বমঞ্জরী, পৌষ ১৩১০ সাল, ৭ম বর্ষ, পৃঃ ২১৪-১৬ ১৭২ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৪১১

দারাসুত পরিজন কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। সেই ঘোর-দুঃসময়ে একমাত্র সহায় হইবেন আপনি। বাম হাতে আলো এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আমার হাত ধরিয়া আপনি লইয়া যাইবেন। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। আমার এই প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।" কল্পতরু ঠাকুর ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া বলেন—"হবে, হবে, তাই হবে, মাঝ-গঙ্গার মধ্যে এনে এই সব কাণ্ড।" কালীবাবু ঠাকুরকে দিয়া উহা তিন বার স্বীকার করাইয়া লইলেন। শেষের দিনে দেখা গেল, সেই শেষ মুহূর্তে ধ্যাননেত্রে কালীবাবু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং সেই অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরমভক্তকে পরমহংসদেব হাত ধরিয়া পরমধামে লইয়া গেলেন। গুরু-শিষ্যের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জগতে অমর হইয়া রহিল।[১৭৩]

অন্তর্যামীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান অন্তর্যামী। তিনি সকলের মনের কথা জানেন। তাঁকে লুকিয়ে কিছু করা যায় না। তিনি 'সর্বতঃ চক্ষু'। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ অর্থাৎ তিনি সব কিছু সাধারণভাবে জানেন এবং বিশদভাবেও জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্যামিত্বের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

রানী রাসমণি একবার দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে আসেন এবং ঠাকুরকে শ্যামা-সঙ্গীত করতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর যখন তন্ময় হয়ে গান গাইছিলেন, রানী তখন বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটা মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁর মনের কথা জানতে পেরে "এখানেও ঐ চিন্তা" বলে তাঁর কোমল অঙ্গে আঘাতপূর্বক তাঁকে মায়ের সামনে বিষয় চিন্তা থেকে বিরত করেন। ঠাকুর যে তাঁর মনের কথা জানেন, তা দেখে রানী প্রথম বিস্মিত হন এবং পরে অনুতপ্ত হন। এতে ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি বৃদ্ধি হয়।[১৭৪]

শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন পরীক্ষা করবার ছলে বলরাম বসু একখানি থালায় কতকগুলি সন্দেশ রেখে, মনে মনে ঠাকুরকে ২টি উৎসর্গ করেন। ঠাকুরের সামনে থালাটি ধরামাত্র তিনি তাঁর জন্য রাখা সন্দেশ-দুটি নিলেন এবং বলরামের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বলরাম বুঝতে পারলেন ঠাকুর অন্তর্যামী।[১৭৫]

মনোমোহন মিত্রের পিসিমাতা তাঁহার জননীকে বলিলেন—'দেখ! এমনভাবে তোমার ছেলেকে রোজ রোজ দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিও না। ক্রমে ঘর সংসার ছেড়ে দিলে কি করবে?' ইহা শ্রবণ করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিয়াছিলেন—'আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে আমার ছেলে সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।' ইঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যান। তথায় ঠাকুরের সম্মুখে যাইবামাত্র তিনি বিষণ্ণ বদনে মনোমোহনকে বলিলেন—'দেখ! একজন এখানে আসে দেখে তাহার পিসি তাহার মাকে এমনি এমনি করে নানা কথা বলেছে; কি হবে বল দেখি, সেকি আর এখানে আসবে না?' প্রশ্ন শুনিয়া মনোমোহন বিস্মিত হইলেন এবং সেদিন হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল

১৭৩ যোগোদ্যান মাহাত্ম্য, পৃঃ ৭৪-৭৫
১৭৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা ২/৪৩৪
১৭৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৩৫৮

যে ঠাকুর অন্তর্যামী।[১৭৬]

ভক্ত রাম দত্ত ঠাকুরের জীবনীতে লিখেছেন ঃ

আমরা প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমানুষ শক্তির অনেক কার্যই দেখিতাম। আমরা যে দিন যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেইদিন সেইকথাই শ্রবণ করিয়াছি। যে যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পারিতেন। তিনি জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য আমরা একদিন শ্যামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলাম। পুলের দক্ষিণ দিকে একটা চার-পাঁচ বৎসরের ছেলে একখানি জিলিপির জন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। সে শুনিল না। পরে ভক্তমালগ্রন্থের একটি গল্প আমাদের মনে হইল। "এক সাধু রুটি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি কুক্কুর রুটিগুলি মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধু কুক্কুরের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কহিলেন 'রাম, অপেক্ষা কর, রুটিগুলিতে ঘি মাখাইয়া দি'।" আমরা ভাবিলাম, এ ছোঁড়া বুঝি আমাদের ছলনা করিতেছে। কি জানি, যদি ঈশ্বরের কোনপ্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে আমাদের অপকার হইবে, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়া দিলাম। একথা আর কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া আমরা নির্দিষ্ট স্থানে উহা সংস্থাপনপূর্বক সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়া কাটাইলাম। অপরাহ্ণকালে পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জল পান করিতে চাহিলেন। আমরা ব্যস্ত হইয়া সেই জিলিপিগুলি প্রদান করিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি বামহস্তে তাহা স্পর্শ করিয়া ঊর্ধ্বদিকে নিরীক্ষণপূর্বক জিলিপি কয়েকখানি চূর্ণ করিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া হস্ত ধৌত করিয়া ফেলিলেন! এতদ্দৃষ্টে আমাদের বক্ষঃস্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। জিলিপিগুলি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুই চারিদিন পরে আমরা পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে তিনি কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমার জন্য যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিও না। আমি ঠাকুরকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে পারি না। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব?" এই প্রকার ঘটনা সর্বদাই হইত, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিয়াছিল।[১৭৭]

নিস্তারিণী দেবী ঠাকুরের অন্তর্যামিত্বের কাহিনী বলেছিলেন আমেরিকান ভক্ত ভগিনী দেবমাতাকে ঃ এক রবিবার আমরা সব দক্ষিণেশ্বরে গেছি। এক গরিব মহিলা ঠাকুরকে দেখতে এসেছিল ৪টি রসগোল্লা নিয়ে। কিন্তু ঠাকুরের ঘর ভক্তাবৃত থাকায় সে নহবতে মায়ের কাছে এল। তারপর সেদিন ঠাকুরের দর্শন মিলবে না ভেবে সে নহবতের বারান্দায় কাঁদতে শুরু করল। আমরা জানতুম ঐ সামান্য উপহার তার পক্ষে যথেষ্ট। হঠাৎ ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকালেন। তারপর

১৭৬ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৭ ১৭৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত, পৃঃ ১৩১-৩২

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা নহবতে এসে যেন কাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি তখন সোজা ঐ গরিব ভক্ত মহিলার কাছে গিয়ে বললেন, "আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে কি কিছু খেতে দিতে পার?" মহিলাটি চোখের জল মুছে ঠাকুরের সামনে রসগোল্লার ভাঁড়টি তুলে ধরলেন। তিনি তৃপ্তির সঙ্গে ৪টি রসগোল্লা খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। আর মহিলাটি খুশি মনে ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল।[১৭৮]

সর্বদেবদেবীস্বরূপ-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

নামরূপের পারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। নামরূপ মায়ার রাজ্য। প্রকৃত নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ নির্গুণ ও নিরাকার। নামরূপধারী ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। নিরাকার ও সাকার দুই-ই এক—যেমন জল ও বরফ। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে ছিলেন নিত্যরূপী সচ্চিদানন্দ ও লীলারূপী সকল দেবদেবী। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন, "মানবদেবতা রামকৃষ্ণের জীবনীতে আমি জেকবের সিঁড়ির কাহিনী বর্ণনা করব, যে-সিঁড়ি দিয়া মানুষের অন্তরে দিব্য দুটি পথ স্বর্গ হতে মর্তে এবং মর্ত থেকে স্বর্গে অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে উঠানামা করছে।"[১৭৯]

ঠাকুর একদিন নিরাকারবাদী শ্রীমকে বলছেন, "যদি (স্বপ্নে) দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।" [১৮০] "আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।" [১৮১] আবার সাকারবাদী যোগীন-মাকে বলছেন, "দ্যাখো, তোমার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরই আছে (নিজের শরীর দেখাইয়া)—একে ভাবলে তাঁকেই মনে পড়বে।" [১৮২] আর একদিন ঠাকুর তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মীমণিকে বলছেন, "ঠাকুর দেবতা যদি স্মরণে না আসে, তো আমায় ভাববি। তা হলেই হবে।"[১৮৩] স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদিন জনৈক স্ত্রীভক্তকে বলেছিলেন, "ঠাকুরের মধ্যে কালী, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি সব দেবতা আছেন।"[১৮৪]

ঠাকুর একবার স্বামী অভেদানন্দকে নিজের মূর্তি ধ্যান করতে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "আমার দেহের মধ্যে মা কালী ও সমস্ত দেবদেবী আছেন। তাই আমার মূর্তি ধ্যান করলেই সকল দেবদেবীর ধ্যান করা হবে।"[১৮৫]

"শ্রীরামকৃষ্ণ," লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ, "সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানব জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।"[১৮৬] একটা ভাব অবলম্বন করে কি করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হয়, সে-প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন ঃ

"দ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে

১৭৮ Days in an Indian Monastery, p 237 ১৭৯ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ৪
১৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫/১১২; ১৮১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/৮৪
১৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ১৭; ১৮৩ তদেব, পৃঃ ৪৮-৯; ১৮৪ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ২৮২-৮৩
১৮৫ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৪৮-৯; ১৮৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/৯০

পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকিল দেখলেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম—বুঝলে কি না? মন নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এইজন্যে বলছি।"

আবার ঠাকুর বলতেন ঃ "যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, একজনকে বা একটাকে পাকা করে ধর তবে তো আঁট হবে। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।'—ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।'—ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই—তবে তো হবে। ভাব কি জান?—তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটু সম্বন্ধ পাতানো—এরই নাম। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা।"[১৮৭]

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন ঃ "আমি এক এক ভাবে ও মতে সিদ্ধ সাধু পুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু সকল ভাবে ও মতে সিদ্ধ কেবল পরমহংসদেবকেই দেখিয়াছি। আর কাহাকেও দেখি নাই। জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন।"[১৮৮]

বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থান হতে উৎপত্তি লাভ করে সমুদ্রে একীভূত হলে নাম ও রূপ হারিয়ে ফেলে; তেমনি বিভিন্ন ধর্মপথ অদ্বৈত ভগবানে মিলিত হলে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "সেখানে সব শিয়ালের এক রা।"

ভক্ত রামচন্দ্র অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ অদ্বৈত জ্ঞানই বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এইরূপে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিলেই বেদান্ত পাঠের ফললাভ হইয়া যায়। অদ্বৈত জ্ঞান লাভপূর্বক কালী বলিয়া হউক, দুর্গা বলিয়া হউক, শিব বলিয়া হউক, রাম বলিয়া হউক, কৃষ্ণ বলিয়া হউক, গৌরাঙ্গ বলিয়া হউক, বুদ্ধ বলিয়া হউক, আল্লা বলিয়া হউক, অথবা যীশু বলিয়াই হউক, কিম্বা কোন বিশেষ নাম না বলিয়াই হউক, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের অর্চনা করিবেন, তাঁহার সেই ভাবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইহাই রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

রামকৃষ্ণদেব এই উপদেশ আপনার জীবনে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে সকল ভাবেরই পূর্ণ স্ফূর্তি দেখা যায়। তিনি এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণরূপে, অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ আকারে, বৈদান্তিক অদ্বৈত-জ্ঞানের আকরবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে পরমহংস বলিতেন; তিনি লীলারূপের অদ্বিতীয় পক্ষপাতী এবং প্রেম ভক্তির প্রস্রবণবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলেন। তিনি তন্ত্র সাধনার অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তন্ত্রাদি, বিশেষতঃ উর্ধ্বমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদি যাহা

১৮৭ তদেব, ৩/৮৪-৮৫ ১৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, সুরেশ দত্ত, পৃঃ ১২

অসাধ্য, তাহাও তিনি নিজে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া তান্ত্রিক সাধকদিগের দ্বারা পরিকীর্তিত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ নবরসের ঘনীভূত দেবতা বলিয়া নবরসিক সম্প্রদায় তাঁহাকে রসিকচূড়ামণি বলিয়াছেন। তিনি বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবের গোঁসাই, কর্তাভজার আলেখ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শিখেরা নানক, মুসলমানেরা পয়গম্বর, খ্রীস্টানেরা যীশু, ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতেন।[১৮৯]

এই দীর্ঘ নিবন্ধে বহুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের রূপের পরিক্রমা করে দেখা গেল, তাঁর রূপের ইতি নাই। তিনি ছিলেন 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'। যখন খুশি তিনি ভক্তদের জন্য তাদের ঈপ্সিত রূপ পরিগ্রহ করতেন। মথুর ঠিকই বলেছিলেন, "বাবা আমার বহুরূপী ভগবান, যখন যে রূপ ধরেন, তাহা অবিকল ও অপরূপ।"[১৯০]

নাম, রূপ ও গুণ—এ সব লীলার রাজ্য। আমরা এই লীলা বা মায়ার রাজ্যে বাস করি। ফলে এই মায়-রচিত সুখ-দুঃখে, ভাল-মন্দে, জয়-পরাজয়ে, নিন্দা-স্তুতিতে দুলিতে থাকি। শাশ্বত শান্তি পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে লীলা থেকে নিত্যে এবং নিত্য থেকে লীলার মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। তিনি বলেছেন আত্মজ্ঞান লাভ করে বা বুড়ি (ঈশ্বরকে) ছুঁয়ে সংসারে থাকলে আর ভয় থাকে না। যেমন স্থুল ধরে সূক্ষ্মে পৌঁছাতে হয়, তেমনি এই নাম, রূপ ও গুণকে ধরে নামহীন, রূপহীন, গুণহীন মায়াতীত ব্রহ্মে পৌঁছাতে হয়। রূপকে ধরে অরূপের অপরূপ রূপ দেখাই প্রকৃত সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একঘেয়েমি পছন্দ করতেন না, এবং তিনি শুঁটকো সাধু ছিলেন না। তিনি পাঁচ ব্যন্নুনে খেতে পছন্দ করতেন এবং সাত ফোকরের বাঁশিতে বিভিন্ন রাগরাগিণী শুনতে ভালবাসতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের মিলন মন্ত্র গেয়েছেন এবং নিজ জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন যে তিনি সর্বরূপে সর্বদা বিদ্যমান। বর্তমানের এই হিংসা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সকল ধর্মমতের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম। সর্বশেষে বহুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই—

তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ।।

১৮৯ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, ২/৫০১-০২

১৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৫৩

'রামকৃষ্ণ' একটি নাম ও নামসাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে একটি বিস্ময়। 'রামকৃষ্ণ' নামটি এখন বিশ্বের অগণিত মানুষের মুখে প্রতিদিন উচ্চারিত হচ্ছে। কেউ তাঁর নাম জপ করছে; কেউ তাঁর কথা বলে বা শুনে আনন্দ পাচ্ছে; কেউ বা নামের পিছনে যে-মানুষটি রয়েছে তাঁকে জানবার চেষ্টা করছে। রোমাঁ রোলাঁ বেশ সুন্দরভাবে রামকৃষ্ণের জীবনের উপসংহার করেছেন ঃ "মানুষটি আর নেই। কিন্তু তাঁর আত্মা মানুষের সমষ্টিগত জীবনের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হবার জন্য যাত্রা করেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নামযশকে ঘৃণা করতেন, প্রচারের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁর দিব্য-জীবন যাপন করেই খুশি ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী মনোমোহন মিত্র বলেছেন ঃ "সমবেত ভক্তগণকে লইয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় কয়েকজন ভক্তসহ কেশববাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ আলোচনার পর কেশববাবু ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিলেন ঃ যদি আদেশ দেন তাহা হইলে আপনার কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিই। তাহাতে বহুলোকের উপকার হইবে। আপনার কথা যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।' ইহাতে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় দক্ষিণহস্ত উত্তোলন-পূর্বক দৃঢ়স্বরে কহিলেন ঃ 'এর মধ্যে যে-ভাব আছে, যে-শক্তি আছে তাহা এখন প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে না। যখন বাহির হইবার সময় হইবে, তখন আপনা-আপনি তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। শত শত হিমালয় পাহাড়ের দ্বারা চাপা দিলেও এর শক্তি, এর ভাব কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না'।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অমর, অম্লান পুষ্প। এ পুষ্পে রূপ আছে, রঙ আছে, গন্ধ আছে, মধু আছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে গেছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে রামকৃষ্ণ-মধু পান করতে। এ-মধুতে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে মানুষ বলেছে, "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।" কথামৃতকার শ্রীম সদা রামকৃষ্ণ-সুধা পান করে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে সমবেত ভক্তদের সেই নামামৃত বর্ষণ করতেন। তিনি আপন কল্পনায় প্রিয়তম গুরুর ছবি আঁকতেন ঃ "ঠাকুর যেন একটি ফুল—A beautiful flower, তার স্বভাবই হচ্ছে ফুটে গন্ধ ছড়ানো। তিনি যেন Bonfire—জ্বলন্ত আগুনের গোলাবিশেষ, আর তাই থেকে অন্যান্য ছোট পিদ্দিম জ্বালানো হয়েছে। ঠাকুর যেন একটি পাঁচ বছরের ছেলে, সদাই তাঁর মা-র জন্যে ব্যস্ত। তিনি যেন একটি স্বর্গীয় বীণা, আপন

১ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৮-৫৯

মনে মা-র গুণগানে সদা মত্ত। তিনি যেন একটি বড় মাছ, মহানন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে মহাসুখে সাঁতার দিচ্ছেন। ঝড়ের সময় পাখির মতো সব আশ্রয়স্থল ভেঙে যাওয়ায় তিনি যেন অনন্তের দ্বারে বসে আপন সুখে অনন্তের গুণগান করে দোল খাচ্ছেন।''[২]

রামকৃষ্ণ নামের অর্থ

শব্দের বা নামের সঙ্গে অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ দুই প্রকার—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। 'রামকৃষ্ণ' নামের শব্দার্থ রামকৃষ্ণরূপ দেহধারী মানুষবিশেষ। ইনি ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির পুত্র, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী ইত্যাদি। আর 'রামকৃষ্ণ' শব্দের মর্মার্থ, তিনি 'সচ্চিদানন্দ', 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর', 'অবতার-বরিষ্ঠ'।

নাম-জপ কালে অর্থের বোধ হলে নামের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় এবং ভিতরে আনন্দও হয়। কাশীর এক খ্যাতনামা পণ্ডিত-সন্ন্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি শ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী উপলক্ষে 'রামকৃষ্ণ' নামের গূঢ়ার্থ উল্লেখ করেন ঃ

''এই 'রামকৃষ্ণ' নাম সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে শুনিতে ছোট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিচারদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে ইহাতে বড়ই রহস্যভরা রহিয়াছে দেখা যায়। যথা—'রমন্তে যোগিনোঽস্মিন্নিতি রামঃ, কর্ষতি ভক্তানাং দুঃখং পাপং মনো বেতি কৃষ্ণঃ'—যোগিজন যাঁহাতে রমণ করেন তিনিই রাম এবং যিনি ভক্তগণের দুঃখ বা পাপ আকর্ষণ করিয়া নষ্ট করিয়া দেন, অথবা স্বীয় ভক্তগণের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় ভক্তিতে তল্লীন করিয়া দেন, তিনিই কৃষ্ণ। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার দূর করিবার জন্য তৎ তৎ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই একত্র সমাবেশ ইদানীং এই (রামকৃষ্ণ) নামে হইয়াছে।

'' 'রাম' নামে বহু রহস্য আছে। যখন রাজা দশরথের গৃহে রাম অবতাররূপ ধারণ করিলেন তখন রাজা কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'হে গুরো, এই বালকের নামকরণ করুন।' বশিষ্ঠজী 'রাম' এইরূপ ছোট একটি নাম রাখিয়া দিলেন। তখন দশরথ ও মন্ত্রিগণ বলিলেন যে, এ তো অতি ক্ষুদ্র নাম, কোনও 'ডবল' নাম হওয়া চাই, যে নাম রাজচক্রবর্তীর পুত্রের যোগ্যতানুযায়ী হইতে পারে। বশিষ্ঠজী বলিলেন, 'হে রাজন্, 'রাম' নামের মহিমা আপনি জানেন না। শুনুন—'রাম' শব্দে যে 'রা' অক্ষর আছে তাহা হইল 'নমো নারায়ণায়'—এ-ই সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবমন্ত্রের প্রাণ। ইহা হইতে 'রা' অক্ষর পৃথক করিলে 'নমো নায়নায়' এইরূপ হইয়া যায় (র-এর জন্য 'ণ' হইয়া থাকে, ইহা ব্যাকরণের নিয়ম)। ইহার অর্থ হয়—'রূপরসাদি বিষয়কে নমস্কার।' এরূপ অনর্থ 'রা' অক্ষরের পৃথক-করণ দ্বারা হইয়া যায়। এই প্রকার 'রাম' শব্দের ম-কারও 'নমঃ শিবায়' মন্ত্রের জীবন। রাম-এর ম-কার 'নমঃ শিবায়'-তে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। 'নমঃ শিবায়' হইতে

২ উদ্বোধন, ৩৯তম বর্ষ, পৃঃ ৪৫২

'ম' পৃথক করিলে অর্থের অনর্থ হইয়া যায়। 'নমঃ শিবায়' মন্ত্রের অর্থ হইল—কল্যাণস্বরূপ শিবের জন্য প্রণাম। কিন্তু ম-কার বাদ দিলে 'ন শিবায়'-এর অর্থ হইয়া যায়—কল্যাণের জন্য নহে অর্থাৎ দুঃখ বা অশিবের জন্য।' এই প্রকারে বশিষ্ঠজী 'রাম' নামের রহস্য বুঝাইয়া দিলেন, তখন দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ঐ 'রাম' নাম শ্রীরামকৃষ্ণের নামের মধ্যে রহিয়াছে।

''কৃষ্ণ' পদের আধ্যাত্মিক অর্থ—'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।' কৃষ্ ধাতুর অর্থ ত্রিকালারাধ্য-স্বরূপ ব্রহ্ম; ন প্রত্যয়ের অর্থ সুখ—আনন্দ সদ্‌রূপ ব্রহ্ম। সৎ এবং আনন্দের যে অভেদ সদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাই হইল 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ। যে সদ্‌রূপ ব্রহ্মকে বাদ দিলে কোন বস্তুকে 'অস্তি' (আছে) এইরূপ বলাই চলে না, যে আনন্দকে বাদ দিলে আমরা কোন বস্তুকে চাহিতেই পারি না—সেই 'সৎ' ও 'আনন্দ' (সুখ)-ই হইতেছে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ। ঐ 'কৃষ্ণ' যে 'রামকৃষ্ণ' নামে প্রবিষ্ট রহিয়াছে তাহার মহত্ত্ব বর্ণনাতীত।''[৩]

যে নামকে অবলম্বন করে জীবন কাটাতে হবে, সে নামের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এতে ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়। কর্ম, উপাসনা, জপ ও ধ্যানের দ্বারা আমরা যাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইছি , তিনি কে, কিবা তাঁর স্বরূপ—এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকলে জীবনে রসানুভূতি হয়। শরীরত্যাগের দুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন, ''সত্যি সত্যি বলছি , যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'' স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠাকুরের এই বিখ্যাত উক্তির ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ ''এর অর্থ এই যে, বেদান্তের অদ্বৈতমতে বলিয়া থাকে যে, জীব ব্রহ্ম এক। ইহার অর্থ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, সকলেই রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি; তাঁহাদের বিশেষত্ব নাই। তাই পাছে স্বামীজী মনে করেন যে, সেইভাবে ঠাকুর বলিতেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' '' সেইজন্য ঠাকুর উল্লেখ করিলেন, 'তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরচৈতন্য, জীবচৈতন্য নহে। অদ্বৈতমতে জীব সাধন, ভজন, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা অজ্ঞান দূর করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর যিনি তিনি চিরদিনই ঈশ্বর। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ঈশ্বরই থাকেন, কখনো জীব হন না।''[৪]

নাম ও রূপ

বেদান্তমতে,

''অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্।।''

৩ উদ্বোধন, ৩৮তম বর্ষ, পৃঃ ৫০১-৫০২
৪ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ৩২৭

—সত্তা, প্রকাশ, আনন্দ, রূপ ও নাম এই পাঁচটি অংশ দেখা যায়। তন্মধ্যে পূর্ব তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ; নাম ও রূপ এই দুইটি জগতের স্বরূপ। (বাক্যসুধা, ২০ শ্লোক) ব্রহ্মই 'সত্য' অর্থাৎ তিনকালে বিদ্যমান। নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা বা মায়িক। সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি নাম ও রূপ মিথ্যা। অতএব এদের অবলম্বন করা অর্থহীন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই, নির্বিকল্প সমাধির প্রাক্কালে তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে তাঁর আরাধিতা দেবী মা-কালীর রূপ কেটে ফেললেন।

শাস্ত্র বলেন নাম-রূপের পারমার্থিক সত্তা নেই, তবে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে গুরু, শিষ্য, মন্ত্র, ও অজ্ঞান মিথ্যা বা অবিদ্যমান। কিন্তু মিথ্যা গুরু মিথ্যা শিষ্যের মিথ্যা অজ্ঞান মিথ্যা মন্ত্রের দ্বারা নষ্ট করে দেন। ঠিক তেমনি মিথ্যা ডাক্তার মিথ্যা রোগীর মিথ্যা ব্যাধি মিথ্যা ঔষধের দ্বারা নিরাময় করেন। সত্য বলতে কি, ব্রহ্মই সব হয়েছেন। তিনিই সাপ হয়ে দংশন করেন এবং রোজা হয়ে বিষ তুলে নেন। এসব তাঁর লীলা-খেলা।

নাম-রূপের আশ্রয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মই নামরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' এবং দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে 'যথা যথা নেত্র পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে।' আমরা নাম-রূপের রাজ্যে বাস করি। এখন আমাদের এমন নাম-রূপ অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা আমরা এই মায়ার রাজ্য পার হতে পারি। রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা নাম-রূপহীন ব্রহ্মে পৌঁছবার দ্বার। উপনিষদে শব্দব্রহ্মকে অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। ''শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি''—অর্থাৎ অপরা বিদ্যাতে কুশল হলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামী শিবানন্দ লিখেছেন ঃ ''এই রামকৃষ্ণ-নাম, এই রামকৃষ্ণ-রূপই তাঁহার সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থাতে লইয়া যায়।''[৫]

নাম ও নামী অভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''নাম ও নামী অভেদ।'' এ-কথাটা দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ''বাগার্থৌ সম্পৃক্তৌ'' অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থ সদা যুক্ত। তেমনি নামের সঙ্গে নামী সদা যুক্ত। প্রথম নাম প্রকাশিত হন শব্দব্রহ্ম ওঁকার রূপে—ইহাই সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন। নাম নামীতে উদ্ভূত, প্রতিষ্ঠিত ও বিলীন হয়। নামী কিছুদিন লোকচক্ষে থাকেন, কিন্তু নাম অবিনাশী। ইহা চিরন্তন। ইহাই অদৃশ্যতাকে দৃশ্য করে তোলে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন ঃ ''খুব বিশ্বাস কর—নাম আর ভগবান। নাম-নামী এক করে ফেল। ভগবানই নাম হয়ে ভক্ত-হৃদয়ে বাস করেন। নাম কর, নাম শোন। নাম না করে যা-কিছু করবে, তাতে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে।''[৬]

৫ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ২৫৩

৬ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৫১-৬০

কোন ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলে তার মুখখানা চক্ষুতে বা মানসপটে ভেসে ওঠে। লৌকিকে দেখা রামকে ডাকলে রামই সাড়া দেয়, শ্যাম সাড়া দেয় না। তেমনি কোন দেবতাকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। অবশ্য ঠিকমত ডাকতে হবে। "যদি কেউ দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়, তার নাম ধরে ডেকে দরজায় ঘা দিলে যেমন সে জেগে উঠে সাড়া দেয় ও দরজা খুলে দেখা দেয়, তেমনি সরল বিশ্বাসে ও ভক্তির আবেগে ইষ্টমন্ত্র জপ ও সাধন করলে সর্বজীবের হৃদয়শায়ী ইষ্টদেবতা জাগ্রত হয়ে হৃদয়মন্দিরের দরজা খুলে দেন এবং সাধককে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন।"[৭]

বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রে নামের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি।। হর্ষে প্রভু কহে শোন স্বরূপ রাম রায়। নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।।" একবার জনৈক গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, "নামেতেই হবে। কলিতে নামমাহাত্ম্য।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বলেন, "হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?"[৮]

অনেকে প্রশ্ন তোলেন ঃ আমরা সাধারণ মানুষ। ভগবানকে দেখিনি, তাঁর স্বরূপও জানি না। তিনি কোথায় থাকেন তাও জানি না—তবে কি করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব? ঋষি পতঞ্জলি বলছেন, "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় কর। কিভাবে আশ্রয় করব? "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" অর্থাৎ প্রণব (ওঁকার বা ইষ্টমন্ত্র) ভগবানের বাচক বা প্রকাশক। কিভাবে নাম জপ করব? "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" অর্থাৎ প্রণব জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপের সময় সেই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, "চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্। ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটি-জপাদপি।।" অর্থাৎ মন্ত্রকে চৈতন্যময় বা অনুভূতিময় না করিয়া লক্ষ কোটিবার জপ করিলেও প্রকৃত ফললাভ হয় না। কেবলমাত্র বর্ণ উচ্চারণ কবা হয়।

মন্ত্রচৈতন্যের সাধন

পৃথিবীর অগণিত মানুষ রাম, কৃষ্ণ, কালী, যীশু, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী বা অবতারের নাম জপ করে। গুরু-প্রদর্শিত পথে জপ-ধ্যান করা অবশ্যই কর্তব্য। অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করে মনে মনে ভাবে—যথেষ্ট।

তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রকে চৈতন্যময় করবার নানাবিধ সাধন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্যগণ ঐসব সাধন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে পূজাকালে

৭ পরমার্থ-প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ, ১৩৬০, পৃঃ ১৪৬
৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/২/৫

"রং" মন্ত্র উচ্চারণ করে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করতেন, তখন দেখতেন তাঁর চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নির প্রাচীর তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মন্ত্রকে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা দেখতে পেতেন। অথচ আমরা চোখ বুজে ধ্যান-জপ করি আর চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কখনো মনে হতাশ ভাবও আসে। তাই গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রচৈতন্যের প্রক্রিয়া জেনে নিয়ে সাধন করলে জপ-ধ্যানে আস্বাদ পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্রচৈতন্য প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "মন্ত্রবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস—কতকগুলি শব্দ গুরু বা শিষ্যপরম্পরায় চলে এসেছে। এই সকল শব্দের বারবার উচ্চারণে ও জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। 'মন্ত্রচৈতন্য' শব্দের দু-রকম অর্থ করা হয়। এক মতে—মন্ত্র জপ করতে করতে জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। 'ইষ্ট' হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় বা মন্ত্রের দেবতা। আর একটি মত এই ঃ যে গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিলে—সেই মন্ত্রে চেতনা সঞ্চার করতে হলে দীক্ষিতকে কতকগুলি অনুষ্ঠান (পুরশ্চরণাদি) করতে হয়, তখন সেই মন্ত্র-জপের ফল পাওয়া যায়।"[৯]

মন্ত্রচৈতন্য কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ "সব মন্ত্রই হচ্ছে বর্ণের সমষ্টি। বর্ণের সমষ্টি হচ্ছে পদ। যে-পদের শক্তি থাকে, তাই সার্থক, নইলে শক্তিহীন পদ নিরর্থক। এই শক্তিজ্ঞান গুরুর নিকট হতে লাভ হয়। এই শক্তিজ্ঞান লাভ হলে, তখন মন্ত্রোচ্চারণ করলে সেই জ্ঞানের স্মরণ হয়। তখন মন্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর জাগরণ ঘটে। এরই নাম মন্ত্রচৈতন্য সাধন। যেমন 'গো' পদ শ্রবণ করলে তখন পূর্বদৃষ্ট গো-সকলের স্মরণ হয় এবং তারপর 'গো' পদের অর্থজ্ঞান হয়। কিন্তু 'গো' পদের দ্বারা যে গো-পদার্থকে বোঝায় শিশুকে তা তার বাপ-মার কাছ থেকে শিখতে হয় এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারা 'গো' এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র পূর্বজ্ঞানের স্মরণ হয় এবং পরে গো-পদার্থের শাব্দবোধ হয়। সেইরূপ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু গুরুর কাছ থেকে শুনতে হয়। কিন্তু একবার শুনলেই যে বোঝা যায়, তা নয়, কারণ সাধারণত আমাদের বুদ্ধি মলিন। সেইজন্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ অভ্যাস করতে হয়।... পুনঃপুনঃ শুদ্ধ শাব্দবোধের স্মরণ করতে করতে চিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক হয়ে যায়। এর নাম মন্ত্রচৈতন্য।"[১০]

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন ঃ "সৃষ্টির ধারাতে পরা বাক্ হইতে পশ্যন্তী, তার পর মধ্যমা বাকের আবির্ভাব হয়। সকলের শেষে বৈখরী বাক্ প্রকাশ পায়। আমরা যে বাকের প্রয়োগ করি, যাহা মুখ দ্বারা উচ্চারিত হয়, যাহা কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে বায়ুর সংঘর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বৈখরী বাক্।...গুরুশক্তির প্রভাবে অথবা তীব্র অভ্যাসের ফলে বৈখরী শব্দ ক্রমশ সংস্কৃত বা শোধিত হয়। আমরা যে শব্দ উচ্চারণ করি তাহা মলিন—তাহাতে আগন্তুক মল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মল দূর না হইলে মধ্যমাতে প্রবেশ করা যায় না। শব্দের পুনঃপুনঃ আবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে শব্দগত

৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯

১০ অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৭-৮৮

মল ক্ষীণ হয়। তখন একদিকে শ্বাসবায়ু ইড়া-পিঙ্গলা মাঝ হইতে সরিয়া সুষুম্নাতে প্রবেশ করিতে থাকে। সুষুম্নাটি মধ্যমার্গ—নির্বিকল্প জ্ঞানে যাইবার রাজমার্গ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত গুপ্ত পথ। এই পথটি নিম্নদিকে এক প্রকার নিরুদ্ধপ্রায় রহিয়াছে।... বৈখরীতে জপ (যথাবিধি) করিতে করিতে ক্রমশ কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—এদিকে সুষুম্নাপথ অল্পে অল্পে খুলিয়া যায়। তখন বায়ু ও মন সূক্ষ্ম হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাদের অভ্যুত্থান হয়। নাদের উদয়ই মন্ত্রচৈতন্যের পূর্বাভাস।''[১১]

মন্ত্রচৈতন্য বিষয়টি বড় কঠিন। সাধন ছাড়া জানা যায় না। বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে মন্ত্রচৈতন্যের বোধ হয় না। সেজন্য বিভিন্ন সাধকের সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানতে হবে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখেছেন ঃ ''সাধনায় সত্য সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য অধিকারে আসা চাই। মন্ত্রচৈতন্য না হইলে সাধনা পণ্ডশ্রম। সত্য-প্রতিষ্ঠায় একদিক দিয়া যেমন আস্তিক্যবোধ, আশ্রয়-আশ্রিতবোধ, আত্মীয়বোধ, আত্মবোধ স্ফুটতর হইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনই মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়।... মন্ত্র, গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন ভাববোধক শব্দবিশেষ মনন করিলে সেই শব্দকে মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।... মন্ত্র বলে—ঐরূপ শব্দবিশেষকে, আর গুরু বলে—সেই শব্দগত অর্থকে বা জ্ঞানকে। শব্দ উচ্চারণে যে অর্থ মনে ফুটিয়া উঠে, সেই অর্থটি সেই শব্দের গুরু। গুরু অর্থে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদাতা। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ আলোকে যিনি লইয়া যান তাঁহাকে গুরু বলে। আর দেবতা বলে—সেই জ্ঞানের অনুভূতিকে। প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় আত্মার বিশিষ্টতাগুলিকে দেবতা বলে। অনুভূতি উদয়কেই দেবতার আবির্ভাব স্থূলত বলা যায়। আর মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে তাহার অর্থ ও অনুভূতি যদি একসঙ্গে ঘটে, তবেই মন্ত্র, গুরু ও দেবতা এক হইয়াছে বলা হয়। স্থূলত ইহারই নাম মন্ত্রচৈতন্য।

''দৃষ্টান্ত দিই—মনে কর, তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ যে, তোমার বাড়ির নিকটস্থ বৃক্ষে ভূত আছে। ভূত আছে, এই কথাটা শুনিয়া অবধি তুমি মনে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার স্মরণ করিতেছ। আর ভূতের অর্থ তোমার জানা আছে যে, ভূত বলিলেই বিভীষিকাপ্রদ কোন জীববিশেষকে বুঝায়। তারপর তুমি রাত্রে সেই বৃক্ষতলে কার্যবশত যেমনি হঠাৎ গেলে, অমনি তোমার মনে পড়িয়া গেল সেই শব্দটা—'ভূত'। আমি সেই গাছের ভূত সত্তাটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোমার মনে আঁকিয়া দিয়াছিলাম। তুমি বৃক্ষতলে যাওয়ামাত্র তোমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল, বুকের ভিতর কেমন সব জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তুমি সভয়ে বৃক্ষের দিকে চাহিতে গিয়া দেখিলে, যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে আবির্ভূত। ভয়ে—হয় পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া উঠিলে, অথবা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে। এই হইল তোমার ভূতানুভব বা 'ভূত' মন্ত্রে চৈতন্যযুক্ত হইবার ফল। ভূত শব্দটি যেন মন্ত্র, তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনাদি করিয়াছিলাম, তাহা গুরু আর এই 'যেন সত্যই ভূত

১১ পরমার্থ প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩

বৃক্ষে উপবিষ্ট', এই অনুভূতিটিই ভূত মন্ত্রের দেবতা।"[১২]

জপের প্রণালী ও লক্ষণ

দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যকে জপ-ধ্যানের প্রণালী বলে দেন যা অবশ্য-পালনীয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হলে সাধক এগোতে পারে না। ধ্যান হওয়া বড় কঠিন। চিন্তাধারা মনের চঞ্চলতাহেতু কেটে কেটে যায়। তাই প্রথমে খুব করে জপ করে নিতে হয়। পুনঃপুনঃ নামের স্মরণের দ্বারা ভগবানকে বুদ্ধিতে ধরে রাখবার চেষ্টার নাম জপযজ্ঞ। ভগবান গীতায় বলেছেন ঃ "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।"

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখে একটি অভিযোগ—"মন চঞ্চল। কি করব?" শাস্ত্রের সরাসরি উত্তর ঃ "অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ কর।" শ্রীশ্রীমা বলতেন যে, ১৫।২০ হাজার জপ প্রতিদিন করলে মন অবশ্যই শান্ত হয়। স্বামী শিবানন্দ একখানি পত্রে লেখেন (১৬।৬।১৯২২) ঃ "মনকে স্থির করিবার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় এই—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নাম জপ করা এবং এই মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখিতেছেন ও তুমি যে তাঁহার নাম জপ করিতেছ তাহা শুনিতেছেন এবং তোমায় কৃপা করিবার জন্য বসিয়া আছেন। এইরূপ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে, প্রভুতে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং শান্তি পাইবে।"[১৩]

ভগবানের নাম-জপ নানাভাবে করা যেতে পারে—যেমন বাচনিক অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করে, উপাংশু বা আস্তে আস্তে শব্দ উচ্চারণ করে যা কেবল জাপকের কর্ণগোচর হয়, এবং মানসিক। কেউ মালা বা কর সহযোগে সংখ্যা রেখে জপ করেন। কেউ বা চক্রে চক্রে (ষট্‌চক্র ধরে) জপ করেন। অপরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করেন। শাস্ত্র বলেন মানুষ অহরহ অজপা জপ করে। শ্বাসগ্রহণ কালে 'সো' শব্দ হয় এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কালে 'হং' শব্দ হয়। উভয়ে মিলে "সঃ অহং" (তিনিই আমি) এই মন্ত্র সর্বদা জপ হয়। এই সঃ অহং (বা সোঽহং) মন্ত্র—বিপরীতে হংস মন্ত্র হয়। তাই একে হংস বা অজপা গায়ত্রী বলে। "সোঽহং হংস পদৈনৈব জীব জপতি সর্বদা।" ইহাই জীবের স্বাভাবিক জপ।

মনকে কি করে ভগবানে ধরে রাখা যায়—এর জন্য বহু সাধক বিভিন্নভাবে সাধন করেছেন এবং তাঁদের সাধনলব্ধ ফল শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন চক্রে জপের দ্বারা মনকে দ্রুত অন্তর্মুখী করা যায়। মনুষ্যশরীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা নামে ছয়টি চক্র আছে। এবং সর্বোপরি সহস্রার—যেখানে পরমশিব রয়েছেন এবং মূলাধারে মা কুণ্ডলিনী শক্তি রয়েছেন। সাধক মূলাধার পদ্মে মন স্থির করে ইষ্টমন্ত্র জপ করে স্বাধিষ্ঠানে উঠবেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক চক্রে চক্রে জপ করতে

১২ ঋতম্ভরা, পৃঃ ২৪১-৪৬

১৩ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ২২৭-২৮

করতে সহস্রারে উঠবেন, এবং সেখানে দ্বিগুণসংখ্যক জপ করে প্রত্যেক পদ্মে পদ্মে জপ করতে করতে অনাহতে নামবেন। এইরূপে হৃদপদ্মে ইষ্টে মন রেখে জপ করবেন। একেই ষট্চক্রভেদ বলে। তন্ত্র বলেন ঃ "মূলাধারে বসেৎ শক্তি সহস্রারে সদাশিবঃ। তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে।।" অর্থাৎ মূলাধার পথে যে শক্তি আছেন, তাঁকে সহস্রারস্থ শিবের সঙ্গে মিলন করানোকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে। এ যোগ। (আত্মসমর্পণযোগ, ৯০-৯১)

তন্ত্রে আছে যে নিঃশ্বাস রোধ করে ভাবনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একেবারে সহস্রারে নিয়ে যাবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে প্রত্যানয়ন করবে। এভাবে বার বার করতে করতে সুষুম্না পথে বিদ্যুতের ন্যায় বা ভ্রামিত অঙ্গারের ন্যায় শিখা অর্থাৎ দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হবে। সেই শিখাতে চিত্ত একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করলেই মন্ত্রশিখা ভাবনা হবে। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার 'জপরহস্যে' লিখেছেন, "সহস্রারে গুরুধ্যান, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করে পরে সহস্রারে গুরুমূর্তি তেজোময়, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ তেজোময় ও হৃদয়ে ইষ্টমূর্তি তেজোময় চিন্তাপূর্বক ঐ তিন তেজের একতা করে ঐ তেজপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনা করে হৃদয়ে তেজোময় ইষ্টমূর্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে জপ করতে হবে।" (নিত্যপূজাপদ্ধতি, পৃঃ ২৬৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়লে মনে হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জ্ঞাত বা শাস্ত্রানুমোদিত যত রকম সাধন আছে প্রায় সব রকমই করেছিলেন। আবার অনেক নূতন নূতন সাধনও করেছিলেন, যেমন ভক্তদের বলতেন, "ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমির রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখছ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে।"[১৪] চঞ্চল মনকে বশে আনবার জন্য অনেকে জপের সঙ্গে মূর্তিকে যোগ করে দেয়। যেমন মনকে বলা হলো—তুমি কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি দেখে একশত বার জপ কর। তারপর জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের মূর্তিতে একশত বার, দক্ষিণেশ্বরের কালী একশত বার, কৃষ্ণ একশত বার শিব একশত বার, ঠাকুরের ঘরে একশত বার, নহবতে মায়ের সামনে একশত বার; পঞ্চবটীতে একশত বার, কাশীপুরে একশত বার, এবং বেলুড়মঠে ঠাকুরের সামনে একশত বার জপ করলে এক হাজার বার জপ হয়ে যাবে। চঞ্চলমন খেলতে ভালবাসে। এও তেমনি জপ নিয়ে ঠাকুরের নানাবিধ রূপের সঙ্গে খেলা।

দীক্ষাকালে গুরু উপদেশ দিয়ে বলেন, "সকাল সন্ধ্যায় নিত্য নিয়মিত জপধ্যান করবে।" জপকে কার্যকরী করতে গেলে নিষ্ঠা, নিয়ম ও ক্ষণ রক্ষা করতে হয়। ক্ষণ রক্ষাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেমন কোন ব্যক্তি সকাল সাতটায় ব্রেকফাস্ট খায়, বেলা একটায় লান্চ এবং রাত আটটায় ডিনার খায়। গত ৪০।৫০ বছর ধরে সে ঐভাবে রুটিন পালন করছে। ঐ তিন সময় তার পাকস্থলী খাদ্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। ঠিক তেমনি,

---

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৭৭) গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮১

সময় ঠিক করে জপ করলে মন ভগবানের সান্নিধ্যের জন্য তৈরি থাকে। গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন ঃ ''ক্ষণ রক্ষা মানে আপনি একটা নিয়ম করে নিলেন জপ করার জন্য—(ভোর) চারটার সময় বসব—ঠিক চারটার সময় বসতে হবে। চারটার সময় যদি আপনার লক্ষ টাকাও যায় তাহলেও আপনাকে চারটার সময় বসতে হবে। যদি নাও বসতে পারেন তাহলে 'বাবা বসতে পারলাম না' বলে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু সেই এক মিনিটের জন্য চিন্তা করতে হবে। ক্ষণ রক্ষা করা বড় কঠিন জিনিস। ক্ষণ রক্ষা করতে পারলে ভগবানকে নিয়ে আসা যায়।... অন্য সময় বেশিক্ষণ বসুন কিন্তু সেই ক্ষণটিকে ভুলবেন না। মুসলমানরা যেমন করে, যখন রাস্তা দিয়ে চলে নামাজ পড়বার সময় হলে ঐখানেই বসে পড়ে, সেখানে কোন মসজিদের দরকার করে না, কিছু দরকার করে না। ক্ষণকে রক্ষা করতে না পারলে দশ ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করলেও কিছু হয় না। কত রকমের প্রতিবন্ধক আসে, সেসব এসে পড়ে। ক্ষণে তা হয় না—ক্ষণটা হচ্ছে কালের নাশক।''[১৫]

যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলেছেন ঃ ''ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্''। (৩।৫২) অর্থাৎ ''বিভাগ হয় না এরূপ সূক্ষ্ম কালাবয়বকে ক্ষণ বলে। উহাতে এবং উহাদের অবিচ্ছেদ পৌর্বাপর্য প্রবাহে সংযম করলে বিবেকজ বা সমস্ত বস্তুর অসঙ্কীর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয়।'' এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য পড়লে বোঝা যায় ক্ষণ রহস্য কী দারুণ ব্যাপার।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বৃন্দাবনের এক সিদ্ধাত্মার প্রসঙ্গে বলেন ঃ ''তখন আমি ও হরি মহারাজ একসঙ্গে ছিলাম। আমরা নিয়মিতভাবে খুব ধ্যান-জপ করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা নেহাৎ প্রয়োজন না হলে একেবারেই হতো না। রাত্রি আটটার পর মাধুকরীর রুটী দু-একখানা যা থাকত তা-ই খেয়ে শুয়ে পড়তাম। আবার রাত ঠিক বারটার সময় উঠে মুখহাত ধুয়ে জপে বসতাম। জানি না সেদিন কেন একটু বেশি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বিষম ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভাঙল। কে যেন বললে, 'বারটা বেজে গেছে, জপে বসবে না?' নিদ্রার ঘোর তখন সম্পূর্ণ যায়নি আমার। ভাবলাম ঘুমুতে দেখে হরি মহারাজ আমায় বোধহয় জাগিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি জাগাননি। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে জপ করতে বসছি, সামনের দিকে চেয়ে দেখি এক বাবাজী নিবিষ্ট মনে জপ করছেন। হঠাৎ বাবাজীকে দেখে বেশ একটু ভয় হলো। জপ করি আর মাঝে মাঝে তাঁর দিকে দেখি। যতক্ষণ বসেছিলাম বাবাজীও ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে জপ করছিলেন। তারপর নিত্যই দেখতাম তিনি ঐভাবে জপ করছেন।''[১৬]

নামে রুচি

আমরা ভগবানের নাম জপ করি অথচ ভগবৎ-রসের আস্বাদ পাই না। সকাল-সন্ধ্যায়

১৫ পরমার্থ প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৫৩
১৬ ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ১৬৯

ঠাকুরঘরে বসি এবং যন্ত্রবৎ মালা ঘোরাই। আনন্দ পাই না। তাই ঠাকুরঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলেছেন, "স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" অর্থাৎ দীর্ঘকাল সদা-সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সঙ্গে (যোগারূঢ় হবার) চেষ্টা করলেই অভ্যাস দৃঢ় হয়। জপের দ্বারা অন্তর্জগতে ঢুকতে হলে ধৈর্য দরকার। সিনেমা শুরু হবার পর কেউ যদি সিনেমা হলে ঢোকে সে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। তখন কেবলমাত্র কয়েকটা দরজার উপরে Exit-এর ক্ষীণ লাল আলোগুলি মাত্র থাকে। ভিতরে খানিকক্ষণ থাকলে পর চেয়ারের সব সারিগুলি আস্তে আস্তে চোখে ভাসে এবং গাইড এসে টিকিট দেখে বসিয়ে দেয়। তেমনি হৃদয়ের অন্ধকার নাম-জপের দ্বারা আলোকিত হয়, তখন আনন্দাস্বাদ হয়। তুলসীদাস বলেছেন, ঘরের প্রবেশপথে প্রদীপ রাখলে যেমন ভিতর-বার আলোকিত হয়, তেমনি জিহ্বায় 'রাম' নাম জপ করলে অন্তর ও বাহির জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠে।

অনুরাগ ছাড়া সাধন-ভজন আলুনি তরকারির মতো বিস্বাদ হয়। খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয় হয়, তেমনি অনুরাগের সঙ্গে নাম করলে রুচি হয়। শাস্ত্র বলেন, পিত্তদোষ হলে জিহ্বায় চিনি ভাল লাগে না, তেতো লাগে। কিন্তু ঔষধসেবনের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করে চিনি খেলে পিত্তদোষ কেটে যায় এবং চিনিতে রুচি হয়। এইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির ভগবানের নাম ভাল লাগে না; কিন্তু সে যদি প্রতিদিন একটু করে নামকীর্তন বা জপ করে তবে তার মায়ামোহ কেটে যায় এবং সে ভগবৎরস আস্বাদন করতে পারে। অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে জিভের স্বাদ চলে যায়। মুখে কিছুই ভাল লাগে না। তখন ভাত তরকারির সঙ্গে একটু তেঁতুলের আচার মিশালে একটু স্বাদ বোধ হয়। ভগবৎ অনুরাগই তেঁতুলের আচার। মাতালের মদের কথা শুনতে ভাল লাগে, তারপর মদের বোতল দেখে মন নেচে উঠে, কর্ক খোলামাত্র গন্ধেতে গোলাপী নেশা শুরু হয়ে যায়, অবশেষে মদ পান করে আনন্দে মশগুল হয়ে সে জগৎ ভুলে মেঝেতে বা রাস্তায় পড়ে থাকে। নাম করতে করতে সাধকদের 'গোলাপী নেশা' হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, "সিদ্ধি-সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও। তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে।"[১৭]

লৌকিকে দেখা যায়, আমরা যাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না, তাদের নাম শুনলে বিরক্তি বোধ হয়; আবার যাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ তাদের কথা শুনতে ভাল লাগে। এই আত্মীয়বোধ থেকে রুচি হয়। প্রিয়তমের কথা বলতে ও শুনতে আনন্দ হয়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে রূপ গোস্বামী লিখেছেন ঃ "কে জানে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদুটি কত সুধা দিয়ে তৈরি। এক মুখে কৃষ্ণ নামে তৃপ্তি হয় না; প্রবল ইচ্ছা হয় বহুমুখে কীর্তন করার। কানে একবার শুনলে ইচ্ছা জাগে অনেক কানে শোনবার এবং মনের অঙ্গনে একবার সে নাম এলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মূর্ছিত হয়ে পড়ে।"

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত. ১। পরি।২

বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'নামগানে সদা রুচি'ঃ একটা বিশেষ সাধন। প্রেম সাধনার বিভিন্ন ধাপ আছে, যেমন প্রথম শ্রদ্ধা, তারপর ক্রমে সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, ভগবানের আসক্তি, ভাব ও প্রেম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সোজা ভাষায় বলেছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন। ইহা বই ধর্ম নাই, শুন সনাতন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নামসাধনা

পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য এসে নামসাধনা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবানের নামে সকলের অধিকার। ভক্তের মধ্যে ধনী-নির্ধন, বিদ্বান-অবিদ্বান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতি কোন ভেদ নাই। চৈতন্যদেবের জপমন্ত্র ছিল ঃ "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।।" এ ছাড়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোল নাম বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামসাধনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন ঃ "মনকে যে ভূতটি পেয়ে বসেছে, সেই ভূতকে ছাড়াতে হলে অর্থাৎ সমল মনকে বিমল করতে হলে ভগবানের নামের শরণ লওয়া একটি সহজ উপায়। অবিরত সরল প্রাণে ভগবানের নাম করতে করতে সমল মন বিমল হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন, নামের অপার মহিমা। নামই বীজ, নামই গাছ, নামই ফল। নামের ভিতরেই ভগবান নিজে আছেন। কথায় বললে মানুষ সহজে নেয় না, তাই রামকৃষ্ণদেব জীবশিক্ষার জন্য নিজে প্রাতঃ-সন্ধ্যা করতালি দিয়ে তালে তালে নাচতে নাচতে ভগবানের নাম নিতেন, নামে উন্মত্ত হয়ে যেতেন। তারপর নামোন্মত্ততা গভীর সমাধিতে পরিণত হতো। এতে ঠাকুর জীবকে দেখাচ্ছেন ও বলছেন, যে-সমাধি জন্ম জন্ম বিবিধ কঠোর সাধনার ফল, সেই সমাধি নামের বলেও পাওয়া যায়।... নামের শরণাপন্ন হওয়া, নাম শ্রবণ, নামকীর্তন করাকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মতে নারদীয় ভক্তি বলে। কলিকালে ভগবানলাভের এই নারদীয় ভক্তিই প্রশস্ত।"[১৮]

যেমন ব্যাঙের শব্দ হতে থাকলে আমরা পরস্পরের কথাবার্তা শুনতে পাই না, তেমনি উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্তন করলে মনের কামনা-বাসনা অভিভূত হয়ে পড়ে। লোকে বলে নাম কামকে খেয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী যোগানন্দকে কামের প্রতিষেধক হিসাবে হরিনাম করতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নাম করতেন সে-প্রসঙ্গে রামলালদাদা বলেন ঃ "'জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীনদয়াল। হরে মুরারে গোবিন্দ, বসুদেব দেবকীনন্দন গোবিন্দ। হরে নারায়ণ গোবিন্দ হে। হরে কৃষ্ণ বাসুদেব।' ঠাকুর

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা, পৃঃ ১৩২-৩৩

সকাল ও সন্ধ্যায় এইটি বলে কখনো কখনো নৃত্য করতেন।"[১৯] শ্রীমও এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ "ঠাকুর রোজ সন্ধ্যার পর একটি মন্ত্র বলতেন, 'ব্রহ্মমায়া জীবজগৎ।' এটি জপ করলেও সিদ্ধ হওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়। বলতেন, 'এসব খুব গুহ্য মন্ত্র'।"[২০]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় বলরাম ভবনে বা কোন ভক্ত বাড়িতে নাম করতেন, তখন অনেকে কৌতূহলবশত আসত। ফিরবার সময় বলতে বলতে যেত, "কী মা নাম করে রে পরমহংস! একেবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে যায়।"[২১]

কথামৃতের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই ঠাকুর কিভাবে বিভোর হয়ে নানা দেবদেবীর নাম করতেন ঃ

কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু! প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! বুদ্ধি কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ।

প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।

সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী।

হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল, হরি হরি হরিবোল।

রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম।

জয় জয় দুর্গে, জয় জয় দুর্গে।

সহজানন্দ, সহজানন্দ।

ওঁ কালী, ওঁ কালী।

কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।

মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।

ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী।

শরণাগত, শরণাগত। নাহং, নাহং, তুহুঁ, তুহুঁ। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।

হরি ওঁ! হরি ওঁ! ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ... ওঁ কালী।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ।

ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ, গোপী! গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ।

নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোবিন্দ।

শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীমন্নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

জগন্নাথ, দীনবন্ধু, জগবন্ধু।

ওমা, ওমা, ব্রহ্মময়ী।

১৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫

২০ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১

২১ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ৪১

মা, মা, রাজরাজেশ্বরী!

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো একঘেয়ে ছিলেন না। তিনি অনুভূতির দ্বারা জেনেছিলেন—একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। যে-কোন একটি নামকে ধরে এগোলে লক্ষ্যস্থল ঈশ্বরে পৌঁছানো যায়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একদিন বসে বসে 'গৌর, গৌর' নাম করছেন গুন্ গুন্ করে। একজন বললেন ঃ "আপনি মায়ের নাম করুন। 'গৌর', 'গৌর' করছেন কেন?" ঠাকুর তক্ষুণি উত্তর করলেন ঃ "কি আর করি বাপু বলো? তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকাকড়ি, কিন্তু আমার এই এক অবলম্বন। তাই কখনো গৌর বলি, কখনো মা, কখনো রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, এই করে সময় কাটাই।"[২২]

ভবরোগের ঔষধ—নাম। দুঃখকষ্টই ভবরোগ। ঠাকুর ভক্তদের এই দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য গান গেয়ে শোনাতেন ঃ "ওগো, আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না," "নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার," "আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি, আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে, দেখা যাবে গো শঙ্করী।"

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীমকে মনের আন্তরিক-হীনতা ও বিষয়োন্মত্ততা সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়ায় তিনি বলেন ঃ "তাঁর (ঠাকুরের) নিকট ব্যাকুলতার জন্য প্রার্থনা করুন।" ভক্ত—"প্রার্থনা করতে যে ইচ্ছা করে না।" শ্রীম—"বেশ তো, গুরুমন্ত্র জপ করুন। চিত্ত একাগ্র না হলেও দশ-পনের হাজার জপ রোজ করুন দিকিন। 'নাম নিতে নিতে হবে অনুরাগ, ক্রমে হবে বিষয়ে বিরাগ, ক্রমে কুণ্ডলিনী হবে সজাগ।' " ভক্ত—"নাম জপ করতেও যে ইচ্ছা করে না।" শ্রীম—"তাহলে case serious, বাঁচবার আশা কম। নামে রুচি হলো শেষ চিকিৎসা। নামে রুচি থাকলে আর ভয় নেই। ধীরে ধীরে সব হবে।"[২৩]

নামসাধনার ফল

পৃথিবীর সকল মানুষ খুঁজছে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি। এ তিনটি পরস্পর পৃথক নয়। তিনে এক—একে তিন। সাধারণ মানুষের মন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, দুঃখ-অশান্তিতে ভরা। নামসাধনা করলে মনের ময়লা কেটে যায়, রিপু দমন হয়, বুদ্ধি স্বচ্ছ ও দৃঢ় হয়, শরীরে স্ফূর্তি আসে। স্বামী শিবানন্দ বলতেন ঃ "রামকৃষ্ণ নাম এ-যুগের মন্ত্র। যে এখানকার শরণ নেবে, তারই কল্যাণ হয়ে যাবে।... খুব অনুরাগের সঙ্গে তাঁর নাম করে যাও। না করলে কিছুই হবে না। তাঁর নামেই সব শক্তি নিহিত আছে।"[২৪]

ভগবান যুগে যুগে নানা নামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ-যুগে তিনি 'রামকৃষ্ণ' নামে আবির্ভূত। "এ নামের অদ্ভুত মহিমা। বিপদে এ নাম ভরসা; ব্যাধিতে এ নাম ঔষধ; অন্ধকারে এ নাম আলো; সম্পদে এ নাম আনন্দ; মৃত্যুর পর এ নাম অমৃত-লোকে নিয়ে

---

২২ শ্রীম-দর্শন, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮

২৩ উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, পৃঃ ৫২২

২৪ শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৬

যায়; সংঘর্ষে এ নাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করে; ধ্যানে এ নাম চিত্তকে তাঁতে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন করে তোলে।"[২৫]

নামসাধনার মুখ্য ফল নামীর দর্শন বা মুক্তি; আর অবান্তর ফল দৈহিক ও মানসিক শান্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"[২৬] "ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনো না কখনো এর ফল হবেই হবে।"[২৭] আবার কখনো তিনি বলতেন যে, হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করলে দেহ থেকে পাপ পাখি উড়ে যাবে। এখানে কথিত আছে রাজা দশরথ এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে তিনটি ব্রহ্মহত্যার কারণ হয়েছিলেন। সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি মহামুনি বশিষ্ঠের কাছে যান। মুনি বাড়িতে না থাকায় তাঁর পুত্র বামদেব দশরথকে তিনবার 'রাম' নাম করতে উপদেশ দেন এবং পরে পিতাকে তা বলেন। বশিষ্ঠ ক্রোধে পুত্রকে বলেন, "তুই চণ্ডাল হবি। যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলে এমন পাপ ত্রিভুবনে নেই, যা থেকে জীব পরিত্রাণ পায় না, সেই নাম তিনবার উচ্চারণ করতে বলায় তুই নামের মহিমা খর্ব করেছিস।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় মজা করে ভক্তদের কাছে নামমাহাত্ম্য খ্যাপন করতেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি জনৈক ভক্ত ঠাকুরের জন্য এক চ্যাঙারি জিলিপি আনেন। তিনি সানন্দে একটু জিলিপি ভেঙে খেয়ে ভক্তদের বললেন ঃ "দেখছ, আমি মায়ের নাম করি বলে—এইসব জিনিস খেতে পাচ্ছি!" সবাই হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন ঃ "কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না, তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য!"[২৮]

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে যান। কথামৃতের বর্ণনা ঃ "নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন।... ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাস্টার বসিলেন। ... নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নিচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপসিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক এক জন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে)—বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

২৫ অন্তরাগে আলাপন, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩১
২৬ কথামৃত , ১।২।৬
২৭ ঐ, ১।৩।২
২৮ ঐ, ৪।১।১

মাস্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কত নেবে?

মাস্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মার মাহাত্ম্য![২৯]

এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ নামসাধনার ফল দেখিয়ে গেছেন। তিনি টাকা ছুঁলেন না, সঞ্চয় করলেন না, ঘরবাড়ি বানালেন না। মার নাম করে মহানন্দে জীবন কাটিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বলেছেন ঃ "ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না।' এটি তাঁর নিজের মুখের কথা।"[৩০] "ঠাকুর বলতেন, 'আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না।'।"[৩১] "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে'।"[৩২] মানুষ দুঃখকষ্ট পায় নিজের কর্মের জন্য। এ-ব্যাপারে অপরকে দোষারোপ করা বৃথা।" শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপতপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়।"[৩৩]

'আপনি কে?'

শ্রীরামকৃষ্ণরূপ নামধারী ব্যক্তিটিকে বোঝা বড়ই মুস্কিল। স্বামীজী, গিরিশ প্রভৃতি ভূয়োদর্শী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পর্যন্ত ধাঁধার মধ্যে পড়েছেন। একদিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মহাশয়, আপনি কে?" প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলেন ঃ "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ। আমি এইখানেই থাকি।"[৩৪] যোগীন-মার দিদিমা কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকায় পরমহংসদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের বেশভূষার জাঁকজমক ছিল না, গেরুয়াও পরতেন না, মালাতিলক কোন চিহ্নই ছিল না। তাই বুড়ি দিদিমা না জেনে ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করেন ঃ "হাঁগা, এখানে কোথায় পরমহংস আছেন বলতে পার?" ঠাকুর উত্তরে বললেন, "কি জানি বাপু! কেউ বলে—পরমহংস। কেউ বলে—ছোট ভট্‌চায। কেউ বলে—গদাধর চাটুজ্যে। কেউ বলে—পাগলা বামুন। দ্যাখো, জিজ্ঞেসপড়া করে কোথাও হবে।"[৩৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মগোপন করে থাকতেন। নিজের নাম জাহির করবার প্রবৃত্তি তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। ভক্তদের কখনো ঠারেঠোরে কখনো বা সুস্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে নিজের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করতেন ঃ "অচিন গাছ," "বাউলের দল," "দীনহীন কাঙালের বেশে

২৯ কথামৃত, ২।১৪।৫

৩০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩; ৩১ ঐ, পৃঃ ১৫৩; ৩২ ঐ, পৃঃ ৭৩

৩৩ ঐ, পৃঃ ১১৫; ৩৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১০

৩৫ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১৬

ঘুরছে জীবের ঘরে ঘরে," "ভক্তের নেমন্তন্ন খেতে আসেন," "সচ্চিদানন্দ এঁর (নিজের শরীর) ভিতর থেকে বের হয়ে বললেন, 'আমি যুগে যুগে অবতার হই।' " (নরেন্দ্রকে বললেন) "এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে এইসব (বিশ্ব) বের হয়েছে।" "একদিন মা নানা অবতারের রূপ দেখালেন। তার ভিতর এটিও (নিজের রূপ) দেখলাম।"[৩৬] এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।"[৩৭]

অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে কসুর করেনি। তিনি প্রতিবারই সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাসতে হাসতে বলতেন, "এখনো অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর—পাকা করে ধর—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম।"[৩৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন উক্তি আছে। যেমন "সরকারী লোক—তাঁহাকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেইখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।"[৩৯] "যার শেষ জন্ম সে-ই এখানে আসবে। যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।"

"যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পুনঃপুনঃ আগমনের ও জন্ম মরণের শেষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখানকার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে।"

"দ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কিনা। একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে।"

"তোমার ইষ্ট (উপাস্য দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে।"

"একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এইজন্যে বলছি।"

"আমি যেরূপে বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া যাস তাহা হইলে সোজাসুজি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া যাইবি।"

'তুমি আমার নাম করবে'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 'আমি' 'আমার' এ-দুটি শব্দ ক্বচিৎ শোনা গেছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি 'এর,'

---

৩৬ শ্রীম-দর্শন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩

৩৭ কথামৃত, ৪।২৪।৩

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৭৭), গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৭৫

৩৯ ঐ, ২য় ভাগ (১৩৭৯), পৃঃ ২০৭

'এর ভিতর,' 'এখানকার' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নিজের বিষয় ইঙ্গিত করতেন। আমি ও আমার হচ্ছে মায়ার বেড়াজাল। তিনি ঐ বেড়াজাল চিরদিনের মতো ছিন্ন করে অনন্তের সঙ্গে বিরাজ করতেন। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গের গুরুভাব পূর্বার্ধে 'ভাবমুখ' ব্যাখ্যাকালে ঠাকুরের 'আমি'-র রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি 'আমি' বা অহং-এর চারটি স্তর দেখিয়েছেন। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হতেন, তখন তাঁর 'আমি' নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেত। তারপর এক ধাপ নিচে এসে সেই আমি "বিশ্বব্যাপী আমি বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়ে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হতো।" তখন কল্পতরুর মতো হয়ে তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করতেন, "তুই কি চাস?" আর এক ধাপ নেমে তিনি 'সন্তান আমি', 'ভক্ত আমি', 'দাস আমিকে' দীনের দীন রূপে মা জগদম্বার যন্ত্ররূপে লোকশিক্ষা দিতেন। একেই তিনি বলতেন 'পাকা আমি'। ইহাই বিদ্যা-আমির শেষ স্তর। এর নিচের ধাপ 'অবিদ্যা-আমি' বা 'কাঁচা আমি।' কাঁচা আমির উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলতেন, "অমুকের ছেলে আমি, ব্রাহ্মণ আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি।" এ-আমি বন্ধনের কারণ। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল।"[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী তুরীয়ানন্দকে গানের মাধ্যমে ভক্ত হনুমানের উক্তি শুনিয়েছিলেন ঃ "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব? ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?" ঠাকুর অনেক সময় কৃপা পরবশ হয়ে কোন কোন ভক্তকে বলতেন, "আমাকে তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?" চতুর্থ দর্শনকালে শ্রীমকে এই প্রশ্ন করায়, তিনি উত্তরে বলেন, " 'আনা' এ-কথা বুঝতে পারছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমাভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনো কোথাও দেখি নাই।" ঠাকুর হাসলেন। তারপর শ্রীমকে বললেন, সে যেন বলরামের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। শ্রীম প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তারপর সদর ফটক থেকে আবার ফিরে এসে তিনি ঠাকুরকে বললেন, "আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি—যেতে দেবে কিনা; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব। তা হলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।"[৪১]

"তুমি আমার নাম করবে, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।"—এটি বড় আশার কথা। কেবল শ্রীমকে নয়, সংসারের দিশেহারা সব মানুষকে ঠাকুর ভগবৎ পথের সন্ধান করে দিচ্ছেন। তাঁর নাম করলে সর্বত্র দ্বার মুক্ত হয়ে যাবে—সে ধনীর প্রাসাদই হোক বা সংসারের গোলোক-ধাঁধাই হোক। যেমন রাজপুত্রের রাজ প্রাসাদের সর্বত্র অবাধ গতি এবং দ্বারীরা সসম্মানে অভিবাদন করে রাজপুত্রের জন্য দ্বার খুলে দেয়; তেমনি মহামায়া অবতারের আত্মীয় বা অন্তরঙ্গদের স্বেচ্ছায় সাগ্রহে মুক্তির দরজা খুলে দেন। কারণ অবতার মায়াধীশ।

---

৪০ তদেব, পৃঃ ১০৬

৪১ কথামৃত, ১।২।৬

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমকে ঠাকুর বলেন, "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ। তারা ও-কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো; প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তুমি এই শেষ থাকের।"[৪২] অবতারের সঙ্গে একবার সম্বন্ধ পাতাতে পারলে মনুষ্যজীবন সফল হয়, সংসারের যাতনার অবসান হয়, মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়। "আমি রামভক্ত"—এই রামনামের জোরে মহাবীর হনুমান সর্বত্র জয়ী হতেন এবং অসম্ভব সম্ভব করতেন।

১ জানুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে কল্পতরু হয়ে সমবেত ভক্তদের 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্র দত্ত নবগোপাল ঘোষকে বলেন ঃ "মশায়, আপনি কি করছেন? ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" শুনে নবগোপাল দ্রুত ঠাকুরের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন, "প্রভু আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থেকে বললেন, "একটু ধ্যান-জপ করতে পারবে?" নবগোপাল ঃ "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ঠাকুর ঃ "তা একটু জপ করতে পারবে না?" নবগোপাল ঃ 'তারই বা অবসর কোথায়?" ঠাকুর ঃ "আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" নবগোপাল ঃ "তা খুব পারব।" ঠাকুর তখন বললেন ঃ "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"[৪৩]

দয়াল ঠাকুর ভক্তদের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানলাভের সোজা সরল পথ দেখিয়ে দিতেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ "যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করতে না পার, তাহলে অভ্যাসযোগ প্রয়োগ কর। তা যদি না পার তবে ভগবৎ-কর্মপরায়ণ হও; তা যদি না পার তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হয়ে সর্বকর্মের ফল ত্যাগ কর।" এরূপে কৃষ্ণ ভগবানে মন নিবিষ্ট করবার নানাবিধ উপায় দেখিয়েছেন। "শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি কাকেও বলতেন—তুমি মা-কালীর ঘরে তিনদিন কিছু জপ কর; কাকেও বলতেন—যদি তিনদিন না পার, একদিন কর। কাকেও বলতেন—তুমি যদি অন্য জপ-ধ্যান করতে না পার, এখানের (অর্থাৎ ঠাকুরের) স্মরণ মনন রেখো; কাকেও বলতেন—তোমার কিছু করতে হবে না, এখানে এলে গেলেই হবে—এই আজ এসেছ, আর দুদিন এস; কাকেও বলতেন—তুমি একদিন মঙ্গলবারে কি শনিবারে এস, তা হলেই হবে। কখনো কখনো ভালবেসে বলতেন, এখানে এসে সরলপ্রাণে যে বলবে, 'হে ঈশ্বর, তোমার তত্ত্ব বা তোমাকে কি করে জানব!' সে নিশ্চয়ই তাঁর তত্ত্ব পাবে পাবে পাবে।"

৪২ তদেব, ৪।১৪।১

৪৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭৮

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা, পৃঃ ৬৪) কারুকে জিহ্বায় লিখে দিতেন। আবার কারুকে বলতেন "আমাকে চিন্তা করলেই হবে, আমাকে ধ্যান করলেই হবে।"[৪৪]

রামকৃষ্ণ-নাম ছড়াচ্ছে

প্রদীপের নিচে অন্ধকার, আর সেই আলো দূরে আলোকিত করে। শ্রীম একবার কামারপুকুরে যান। সেখানকার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীমর পরিচয় জেনে বলেন, "ও গদায়ের ভক্ত তুমি? কি করে তার ভক্ত হলে অত পড়াশুনা করে? ও কোন শাস্ত্র পড়ে নাই। মূর্খ।" শ্রীম ঐ পণ্ডিতকে ঠাকুরের কয়েকটি উপদেশ শোনালেন ঃ চিল-শকুন খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে; পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল হবে, কিন্তু টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না; বাজনার বোল মুখে বলা সোজা কিন্তু হাতে আনা কঠিন। পরে ঐ পণ্ডিত অনুতপ্ত হন।[৪৫]

প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন ঃ "মহাপুরুষদের কাছের লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় না, দূরের লোকেরা তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়।... একদিন দক্ষিণেশ্বরে গ্রীষ্মকালে পঞ্চবটীর শীতল ছায়ায় রামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁর কতকগুলি ভক্ত বসে আছেন। নানা রকমের ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, এমন সময় কথায় কথায় এঁড়েদহ, দক্ষিণেশ্বর ও বরাহনগরের লোকদের কথা উঠল। ঠাকুরের উপর এঁদের জটিলা-কুটিলার ভাব; তাই একটি ভক্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দূর-দূরান্তরের লোক এসে এখানে শান্তিলাভ করে যাচ্ছেন, আর এঁরা আসেন না কেন?' ঠাকুর মুখে কোন জবাব না দিয়ে, একটি গাই দড়াবাঁধা ছিল, সেই গাইটিকে দেখিয়ে দিলেন। গাইটি গঙ্গার গর্ভে চরায় দড়াবাঁবখা ছিল; এখন গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে। গাইটি দেখে কথার জবাব তখন কেউ বুঝতে পারলেন না। রামকৃষ্ণদেবের কি মহিমা! এমন সময় আর চার-পাঁচটি ছাড়া গরু এসে গঙ্গার জলে নেমে গিয়ে ইচ্ছামত জল খেয়ে ডাঙ্গায় উঠল। তখন ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন যে, ঐ গাইটির ভারি তৃষ্ণা পেয়েছে, কিন্তু বাঁধা রয়েছে, তাই এত কাছে জল তবু খেতে পাচ্ছে না; আর ঐ গরুগুলি ছাড়া ছিল, তাই তৃষ্ণা পাবামাত্র জল খেয়ে গেল। এখানকার লোকেরা বাঁধা আছে, তাই আসতে পারে না।"[৪৬]

ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় দূরে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-বাণী উত্থিত হয়েছিল, তা এখন ছড়িয়ে পড়ছে সাগরপারে—দেশ-দেশান্তরে। এ-কথা খুবই সত্য যে "নাম মানুষকে জাঁকাইয়া তোলে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে।" কিছুদিন আগে Thomas Merton ঃ A Monk বইখানি পড়ছিলাম। টমাস মার্টন একজন বিখ্যাত লেখক ও ট্রাপিস্ট সন্ন্যাসী। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী

৪৪ শ্রীম-দর্শন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬, ৫৮, ১৪০
৪৫ শ্রীম-দর্শন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১-১৪২
৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা, পৃঃ ৪৫

ও সন্ন্যাসিনীদের স্মৃতিকথা নিয়ে ঐ বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। Thomas ঃ "If you love another person, it's God's love being realized. One and the same love is reaching your friend through you, and you through your friend." David ঃ "But isn't there still an implicit dualism in all this?" Thomas ঃ "Really there isn't, and yet there is. You have to see yours will and God's will dualistically for a long time. You have to experience duality for a long time until you see it's not there. In this respect I am a Hindu. Ramakrishna has the solution."[৪৭]

কয়েকবছর আগে ক্যানসাস সিটিতে একটি জাপানী রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি তিনজন আমেরিকান ভক্তসহ। একটি জাপানী পরিচারিকা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল ঃ "Are you from India?" আমি বললাম ঃ 'Yes'।' মেয়েটি আনন্দে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠল ঃ "I know Ramakrishna." আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "How do you know Ramakrishna?" সে বলল, ক্যালিফর্নিয়ার Costa Mesa Yoga Centre-এর সঙ্গে সে যুক্ত ছিল এবং সেখানে সে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় পড়েছে। এখনো সেই জাপানী মেয়েটার জাপানী accent-এর উক্তি—"I know Ramakrishna" কানে বাজছে।

৪৭ Thomas Merton ঃ A Monk, Sheed and Word, Inc., New York, 1974, pp. 88-89

শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝা

সমুদ্রের তল আছে, পারও আছে। পৃথিবীর সীমা আছে ও ভৌগোলিক গণ্ডিও আছে। আকাশের অন্ত আছে, পরিধিও আছে। ঈশ্বরই তলহীন, পারহীন, সীমাহীন, গণ্ডিহীন, অনন্ত, অখণ্ড, অরূপ, অদ্বিতীয়। মানুষ সীমিত মন বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরকে বুঝতে পারে না। ঐজন্য উপনিষৎ হেঁয়ালী ভাষায় বলেছে—যে বলে ব্রহ্মকে জানি, সে জানে না। আর যে বলে জানি না কিভাবে ব্রহ্মকে ব্যক্ত করতে হয়—সেই জানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদগ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে বলেছেন, "একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম।... মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত।" [১]

অথচ এই অবাঙ্‌মনসগোচরম্ ব্রহ্ম মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বরূপ জানাই হচ্ছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য। নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম সগুণ ও সাকার ঈশ্বররূপে বা অবতাররূপে আবির্ভূত হন—যাতে মানুষ তাঁর ধ্যান-চিন্তা করতে পারে। ক্রমে মন শুদ্ধ হলে সে তার স্বরূপে ফিরে যায়।

অবতার বা মানুষরূপী ঈশ্বরকে চেনা বড় কঠিন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো আহার, নিদ্রা ও শারীরিক কর্মাদি করেন, আবার তিনি স্বতন্ত্র, অসাধারণ, অনন্য। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?" "আজ্ঞে না।" "কোন পরমহংসের সঙ্গে?" "আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই।" "অচিনে গাছ শুনেছ?" "আজ্ঞে না।" "সে এক রকম গাছ আছে—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।" "আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার জো নেই। আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে।" [২]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে জানতেন—তিনি কে

অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দৈবী সত্তা জানতেন। তিনি নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত রেখে নরলীলা করতেন। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলতেন, "সেদিন দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল। এসে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার। ... দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" [৩]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৭ম উদ্বোধন, পৃঃ ৪৯; ২ তদেব, পৃঃ ২৬০-৬১; ৩ তদেব, পৃঃ ৭৬২

ঠাকুরের মার যখন শরীর যায়, তখন বকুলতলার ঘাটে মায়ের পা দুটি ধরে কেঁদে বলেছিলেন, "মা, তুমি কে গো, আমায় গর্ভে ধরেছ?" [৪] মানুষভাবে তিনি মায়ের জন্য শোকপরবশ হয়ে কাঁদছেন, আর দেবভাবে বলছেন যে তুমি সাধারণ নারী নও। তুমি পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণকে গর্ভে ধারণ করেছ।

বেদান্ত শাস্ত্রে 'স্বসংবেদ্য' ও 'পরসংবেদ্য' নামে দুটি শব্দ আছে। স্বসংবেদ্য মানে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের স্বরূপ জানেন; আর পরসংবেদ্য মানে অপরে শাস্ত্রবর্ণিত লক্ষণগুলি দেখে জ্ঞানীর অবস্থা অবগত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতেন, আবার দ্বৈত ভূমিতে অবস্থান কালে নিজের দ্বৈত সত্তা দেখে বলতেন, "এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি—আর একটি—ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?... কারেই বা বলব কেই বা বুঝবে?" [৫]

ঠাকুর নিজেকে উদ্দেশ করে বলেছেন, "এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।" [৬] জীব কল্যাণের জন্য তাঁর হৃদয় ছটফট করত। ১৫ মার্চ ১৮৮৬ ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন : শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকেদের চৈতন্য হতো।... তা রাখবে না। সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যানজপ নাই।" [৭]

ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন : "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" এর চেয়ে আর স্পষ্ট উক্তির প্রয়োজন আছে কি? যেমন একই চাঁদ বার বার আবির্ভূত হয়, তেমনি একই ঈশ্বর বার বার অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ঈশ্বরের অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হলো।' [৮] যীশু খ্রীস্টও বলেছেন, "He that hath seen me, hath seen the Father. I and my Father are one."

তিনি না জানালে কে তাঁকে জানতে পারে

উপনিষদে আছে—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—অর্থাৎ এই আত্মা যাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন। ঠাকুর রাতের অন্ধকারে আলোকধারী সার্জেন্ট সাহেবের উপমা দিয়ে বলেছেন যে তিনি যদি নিজ মুখে আলো ধরেন তবেই তাঁকে লোক দেখতে পাবে।

শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "আমরা কি বুঝতে পারি তাঁকে? আমাদের বুদ্ধি আর কতটুকু? এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? অতবড় উচ্চ অধিকারি অর্জুন তিনিই বুঝতে পারলেন না। বলেছিলেন, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা বলছেন, তুমি অবতার। আর তুমি নিজেও বলছ—'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।' তাই বিশ্বাস হচ্ছে তুমি

৪ শ্রীম দর্শন, ২/৫৮; ৫ তদেব, পৃঃ ১০২৪; ৬ কথামৃত, ৫/৮৯
৭ তদেব, পৃঃ ১০২৩; ৮ তদেব, পৃঃ ১৪৫

অবতার। অর্জুনই যদি এই কথা বলেন, আমরা কি?

"অবতারকে কেউ চিনতে পারে না—তিনি না চেনালে। তাঁর কৃপা হলে ধরতে পারে, নচেৎ নয়। অবতারত্ব এমনি রহস্যপূর্ণ। Man with limitations—a conditioned being কি করে বুঝবে তাঁকে?" [৯]

বেদান্ত শাস্ত্রে আছে—আত্মার আলোয় সব আলোকিত। তাঁর চৈতন্যে জীবজগৎ চৈতন্যময়। আত্মার আলো যখন জীবের অন্তঃকরণে পড়ে, তখন সেই প্রতিফলিত চৈতন্যকে চিদাভাস বলে। সূর্যের আলো যেমন আয়নায় ধরে ছেলেরা নানা দিকে ঘোরায়, তেমনি বুদ্ধি চৈতন্যের আলো ধরে নানাবিধ বস্তুতে ফেলে জ্ঞান লাভ করে। মানুষ যখন তার বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ করে, তখন তার ঈশ্বরের জ্ঞান হয়। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত। মানুষের যদি ভগবানকে জানবার ব্যাকুলতা হয়, তাহলে ঈশ্বর কৃপা করে তার বুদ্ধি ভগবৎমুখী করে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে শ্রীম তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করবে। সেজন্য শ্রীম যাতে তাঁকে মোটামুটি বুঝতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন সময়ে শ্রীমর বুঝবার ক্ষমতার মূল্যায়ন করতেন। প্রথম থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমর অহঙ্কার চূর্ণ করেন, কারণ অহং থাকতে মানুষ ভগবানকে বুঝতে পারে না। অহং বুদ্ধি প্রাচীরের মতো ব্যবধান সৃষ্টি করে। ঠাকুর নিজ থেকে করুণাপরবশ হয়ে ভক্ত শ্রীমকে কাছে টানবার জন্য নিজের স্বরূপ প্রকটিত করতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। ... আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।"

মণি (সহাস্যে)—"যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত।—আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"তুমি বুঝে ফেলেছ! কি জান—সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়। সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। ... আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর। তাঁর কাছেই সকলি আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।" [১০]

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ?"

মহেন্দ্র—"হাঁ—অনেকবার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কিরূপ? কিছু উপদেশ দিতে দেখ?"

মহেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যদি দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।" [১১]

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

মাস্টার—"আপনি সরল আবার গভীর। আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন।[১২]

---

৯ শ্রীম দর্শন, ২/৫৪; ১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/৩৩-৩৪; ১১ তদেব, ৫/১১২; ১২ তদেব, ৫/১৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছল। এসে আর খবর দিলে না। সমুদ্রেতেই গলে গেল।... তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

"আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বললেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; কেমন করে তোমার সেবা করব? রঘুবীর বল্লে—তা হয়ে যাবে।

"সেজবাবু বল্লে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বর আছেন।" [১৩]

তপস্যা না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা যায় না

সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যা না থাকলে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায় না। শাস্ত্রে আছে—"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।" বৈদিক যুগে শিষ্যেরা ঋষিদের কাছে সমিৎপাণি হয়ে ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করলে, ঋষিরা বলতেন—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" (তৈঃ উপঃ) "তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ।" (প্রশ্ন উপঃ)—"আগে তপস্যা কর, তারপর ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন কর।" "এক বৎসর ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য, আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে গুরুগৃহে যথাবিধি বাস কর।" এইরূপ তপস্যা না থাকলে শিষ্যেরা আবোল তাবোল প্রশ্ন করবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে ৩২ বছর ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা করতে বলেন। তারপর বিরোচন বুঝলেন—শরীর আত্মা। ইন্দ্র ১০১ বছর পরে বুঝলেন প্রকৃত আত্মা।

নিষ্কাম কর্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা, উপাসনার দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়, বাসনার জাল ছিন্ন হয়, বুদ্ধির ধারণাশক্তি বাড়ে। শ্রীম বলতেন, "এসব পড়ে বা শুনে বোঝা যায় না। তপস্যা থাকলে কতকটা বোধ হয়। সাধন চাই। ... সাধুসঙ্গ না হলে ঠিক তত্ত্ববোধ হয় না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হয় না।... আর সর্বদা ঠাকুরের জীবন ও বাণী—এসব চিন্তা করতে হয়। তবে বোঝা যায়।[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ-বিষয়ে জনৈক সাধু শ্রীমর পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, "ধর্মের প্রাণ তপস্যা। ঠাকুর সেই তপোমূর্তি ছিলেন। যদি তোমরা ভারতবর্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করে ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী তপস্বীদের অভিজ্ঞতা-লিপি সংগ্রহ করতে পার, তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ হবে।" [১৫]

অবতার না এলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। অবতার মানুষরূপী ভগবান—দেহস্থোঽপি অদেহস্থঃ—দেহে বাস করেও দেহবোধহীন। পূর্ণ ব্রহ্ম কি করে সাড়ে তিনহাত মানুষটির মধ্যে থাকেন—সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এ-বিষয়টি ঠাকুর একদিন শ্রীমকে উপমার

---

১৩ তদেব, ৪/৪৫-৪৬. ১৪ শ্রীম দর্শন. ১১/৩৬. ১৫ উদ্বোধন, ৬৩/৩৫০

সাহায্যে বোঝান ঃ "দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ। সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়। বলো দেখি সেই ফাঁকটি কি?" শ্রীম—"সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়।" ঠাকুর শুনে খুব খুশি হয়ে শ্রীমর গা চাপড়ে বলেছিলেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে।" [১৬]

ঈশ্বরের কৃপা ও তপস্যার দ্বারা মানুষ সূক্ষ্ম বস্তু বুঝতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে বহুরূপে ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ভাবলেন, তাঁকে লোকে ধরতে পারবে না। সাধারণত সমাজে ধনী লোকদেরই লোকে চেনে। দ্বিতীয়ত ঠাকুর ভাবলেন যদি লেখাপড়া না শিখি লোকে তাঁকে এড়িয়ে যাবে। সমাজে বিদ্বানরাই মান্য পায়। সর্বশেষে মন্দিরের পুরোহিতের চাকুরী নিলেন। ভাবলেন যে লোকে মনে করবে "ও ব্যাটা মন্দিরের চালকলা বাঁধা পূজারী—কি জানে!" কোন ভাবেই নিজেকে আত্মগোপন করতে পারলেন না। লেলিহান অগ্নিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না—তার শিখা চতুর্দিকে আলোকিত করে।

আত্মগোপনকারী অবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরা কত কঠিন, সে-বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ "ভিতরে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মভাবে ভালমন্দ ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐ-সকল ভাব লইয়া তাঁহারা কালযাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরুপদবীস্থ আচার্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষত আবার বর্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকুলে যে-সকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে-সকল ইঁহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যায়—একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্বগুণে বেদ বেদান্তাদি সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এ-কথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? "আমি কিছু নহি, কিছু জানি না—সব আমার মা জানেন"—সর্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, "মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন," তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/২৫৯-৬০

করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে—"কি পরামর্শই দিলেন! ও কথা তো আমরা সকলে 'কথামালা' 'বোধোদয়' পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?" ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও সকল খুবই ছিল! আবার ও সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল—তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইলে, নতুবা তাঁহাকে ধরা বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে।"[১৭]

আত্মীয়-স্বজনদের চক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ

কথায় বলে, প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। কাছের লোকেরা দিনরাত ঠাকুরের নিকটে থেকেও তাঁকে বুঝতে পারেনি। শ্রীম বলতেন ঃ "ওরাই কি চিনতে পারত? ওরা মনে করত, আমাদের ভাই, খুড়ো, মামা, পরিবারের লোক যেমন মনে করে থাকে। ক্রাইস্ট, চৈতন্য এঁদেরও চিনতে পারে নাই পরিবারের লোক। রামলালকে কেউ হয়ত বললে, 'কি হে, তোমাদের খুড়োর তো এখন খুব নাম যশ কত ভক্ত, শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের এখন খুব সময়। তোমাদের আর ভাবনা কি।' উত্তর হলো, 'না ভাই, যার যা সুখ নিয়ে সে ব্যস্ত। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি।' দেশের লোক বলত, 'কেন, এত সব বড় বড় লোক যাওয়া-আসা করে। তাদের বলে টাকা দেওয়াতে পারে না তোমাদের?' কখনও বলত, 'কলকাতার লোকগুলি কি বোকা! এই গদাই, আমরা ছেলেবেলা থেকে একে দেখছি। একে নিয়ে অত নাচানাচি।'

"ঠাকুর নিজের মাকে নিয়ে কাশী গিছলেন। রাম চাটুয্যে সঙ্গে ছিলেন।

"ঠাকুরের সর্বদা সমাধি হচ্ছে, দেখে ঠাকুরের মা বললেন, 'হাঁ রে কেষ্ট, তুই অমন হয়ে থাকিস। আমি মরলে কে দেখবে?' 'কেষ্ট' বলে ঠাকুরকে ডাকতেন। ঠাকুর বলতেন, কি জানি মা আমি অত কিছু জানি না। রামলালকে বল, ও দেখবে। অর্থাৎ—সর্বদা জগদম্বার কথা ভাবছেন। অন্য কথা কি করে ভাববেন।...

"কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুয্যে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার আবার নেও মামা।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক।' আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন, 'আমি কি তখন তোমায় জানতুম।' অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।"[১৮] ঠাকুরের সব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১৬০-৬১ ১৮ শ্রীম দর্শন, ৩/২০৭-৮; ১৩/১৯৯-২০০

হৃদয়ই সবচেয়ে তাঁর কাছে বেশি দিন থেকেছে। সাধনকালে হৃদয় ঠাকুরকে সেবা করেছে, শরীর রক্ষা করেছে। স্বামী সারদানন্দ হৃদয়ের কাছ থেকে ঠাকুরের সাধনজীবনের অনেক কথা শুনে লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। হৃদয় ঠাকুরের দেবভাব ও মানুষভাব দর্শনের প্রত্যক্ষদর্শী। ঠাকুরের মহত্ত্বে নিজেকে মহৎ মনে করত। কালে ভয়ঙ্কর অহঙ্কার দেখা দিল হৃদয়ের মনে। ঠাকুর বলেন, "সত্ত্বগুণের অবস্থায় হৈ চৈ সহ্য হয় না। হৃদে তাই চলে গেল; মা রাখলেন না। শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক করত।" [১৯] হৃদয় বলত, "বোকা, তোমার সাধুগিরি উঠে যেত আমি না থাকলে।" [২০]

হৃদয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঠাকুর কাশীবাসী হবার কথা ভেবেছিলেন। আর একদিন হৃদয় ঠাকুরকে খুব বকেছে। ঠাকুর পোস্তায় দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিছলেন।[২১]

হৃদয়ের মা ঠাকুরকে চিনেছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন ঠাকুরের পিসতুত বড় বোন। ঠাকুর বলেছিলেন, "হৃদের মা আমার পা পূজা করত ফুলচন্দন দিয়ে।" [২২] ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, "দেখ, এর ভিতর যিনি আছেন তিনি বলছেন, তুমি কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করবে।" তাই হয়েছিল।[২৩]

দিব্যভাবে অবস্থান কালে ঠাকুরের জাতিভেদ বুদ্ধি লোপ পায়। তাঁর মেজ ভাই রামেশ্বর কামারপুকুরে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতেন। ঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দেশে গেলুম; রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাবলে, যার তার বাড়িতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার করে দেয়। আমি তাই বেশি দিন থাকতে পারলুম না। চলে এলুম।" [২৪]

কামারপুকুরে ঠাকুরের দিব্যভাব বুঝতে না পেরে রামেশ্বর ও মাঁ চন্দ্রমণি তাঁকে বায়ুরোগগ্রস্ত মনে করে নানাবিধ ঔষধাদি ব্যবহারের সঙ্গে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক, ওঝার দ্বারা চণ্ডপূজা, বলিদান, শিব মন্দিরে হত্যা দেওয়া প্রভৃতি নানা জৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হয়েছেন।

হলধারী (রামতারক চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন ঠাকুরের খুল্লতাত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্ঠাবান ও বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজারীর কাজ করতেন। ঠাকুর অনেক সময় হলধারীকে নানা বিষয় প্রশ্ন করতেন। তিনি শুনেছিলেন যখন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। ঠাকুর এক পূর্ণিমার দিন হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা, আজ কি অমাবস্যা?" হলধারী বললেন, "এ কলিকাল। একে আবার লোকে মানে। যার অমাবস্যা পূর্ণিমা বোধ নেই।" [২৫]

বাক্‌সিদ্ধ হলধারীকে ঠাকুর একটি সাধন বিষয়ে সাবধান করায় তিনি ঠাকুরকে অভিশাপ দেন—ফলে ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। অবশ্য এই শাপ ঠাকুরের পক্ষে বরই হয়েছিল—নতুবা তাঁর জড়সমাধিতে প্রাণ যেত।

---

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/২৫৭; ২০ শ্রীম দর্শন ১/২০১; ২১ শ্রীম কথা ২/১৪৮
২২ কথামৃত, ৪/৪৬; ২৩ শ্রীম দর্শন, ৩/১৮২· ২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১৬৯; ২৫ তদেব, ৩/১১৩

অপর একটি দিব্যোন্মাদ কালের ঘটনা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, "কালীবাড়িতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, 'তুই করছিস কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে!' " আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বললাম, "তবে রে শালা, 'তুমি গীতা, বেদান্ত পড়'? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন!"[২৬]

হলধারী কখনো কখনো ঠাকুরের ব্যাকুলতা ও ঐশ্বরিক আবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁর মন সর্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকায় ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা ধরতে পারতেন না। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

ঠাকুর বলিতেন, "আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়!' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নেই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভগবত গীতা বা অধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হ্যাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত, 'যা যা মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস, তাই ঐরূপ ভাবিস।' হাসিয়া বলিতাম, 'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না'—কিন্তু সে-কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয়, অনেকদিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থিরনিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"[২৭]

পরে একদিন হলধারী মা কালীকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলায় ঠাকুর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি মায়ের মন্দিরে যান, তারপর বিষ্ণুমন্দিরে পূজারত হলধারীর কাঁধে বসে বলেন, "তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার

২৬ তদেব, ২/১৪৪

২৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৫০-৫১

শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী।" ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর অন্তত সাময়িকভাবে ধারণা পাল্টাল। তিনি ঠাকুরের ভিতর মা জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন।[২৮]

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মালিক ও কর্মচারীরা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম দিব্যভাবে মণ্ডিত। সাধারণ মানুষের কাছে উহা বোধগম্য ছিল না, ফলে তারা ভুল বুঝত। দক্ষিণেশ্বরের মালিক রাণী রাসমণি ও মথুরানাথ বিশ্বাস ঠাকুরকে প্রথমে খেয়ালী যুবক, একটু বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে করেছিলেন। কারণ ঠাকুরের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্তা অপরদের মতো ছিল না। মায়ের মন্দিরে বসে রাসমণি মোকদ্দমা চিন্তা করায় ঠাকুর তাঁকে চপেটাঘাত করেন। মন্দিরের রক্ষীরা ঠাকুরকে বের করে দিতে উদ্যত হলে, রাসমণি বারণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন ঠাকুর সর্বজ্ঞ, এবং তাঁর শাস্তি উপযুক্তই হয়েছে। মথুর কিন্তু ঠাকুরের মাথা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দেখালেন। কবিরাজ মশায় ঠাণ্ডা তেল ও অন্যান্য ঔষধ দেন। ঔষধে বিশেষ কাজ না হওয়ায় মথুর ভাবলেন যে উন্মাদের কারণ সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য, তাই হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এক সন্ধ্যায় ঠাকুরের ঘরে এক বারবনিতা পাঠালেন।

ঠাকুর পরে ভক্তদের বলেছিলেন, "আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি 'মা, মা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বললুম, 'দাদা, দেখবে এস ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে আর সব লোককে বলে দিলুম।" [২৯] এর পরেও মথুর মেছুয়াবাজারের নামী বারবনিতা লক্ষ্মী বাঈ-এর কাছে ঠাকুরকে নিয়ে যেয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

অবশেষে মথুর বুঝেছিলেন ঠাকুর মানুষ শরীরে ঈশ্বর। তিনি ঠাকুরের মধ্যে শিব ও কালী দর্শন করেন। মথুর ধন দিয়ে, সুন্দরী রমণী দিয়ে, নিজের ও বাড়ির সকলের উপর প্রভুত্ব দিয়ে, এবং তাঁকে ভগবৎজ্ঞানে সেবা করে নানাভাবে ঠাকুরকে যাচাই করে বুঝেছিলেন—ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক কিছুতেই ভুলেন না এবং গর্ববোধও করেন না।

মন্দিরের খাজাঞ্চীরা কেউ ঠাকুরকে জ্বালিয়েছে আবার কেউ শ্রদ্ধাও করেছে। ঠাকুর বলেছেন, "বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্চী সেজবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভটচার্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজবাবু আমার অবস্থা বুঝত। পত্রের উত্তরে লিখলে, 'উনি যা করেন তাতে কোন কথা বলো না।" [৩০] আর একদিন এই ভোগব্যাপারে খাজাঞ্চী ঠাকুরের উদ্দেশে কুবাক্য বলে। লোকমুখে শুনে ঠাকুর হাসলেন; একটুও রাগলেন না। [৩১]

২৮ তদেব ২/১৫১; ২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/৩০৪; ৩০ তদেব, ৪/৩৭; ৩১ তদেব, ৩/২০৭

কলকাতায় গিয়ে গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে তিনি খ্রীস্টানদের উপাসনা দেখেন। পরে বলেন, "খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসি নাই—ভাবলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।" ঠাকুর একদিন শিব মন্দিরে ঢুকে ভাবাবেশে ক্রন্দন ও জোরে স্তব পাঠ করেন। মন্দিরের কর্মচারীরা ভাবল যে সেদিন ঠাকুরের পাগলামির বাড়াবাড়ি চলছে। এমন সময় মথুর সেখানে উপস্থিত হলেন। কর্মচারীরা জোর করে ঠাকুরকে মন্দির থেকে বের করে দেওয়ার প্রস্তাব করলে. মথুর রেগে বললেন, "যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন এখন ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়।" [৩২]

মন্দিরের কতিপয় কর্মচারীর ঠাকুরের প্রতি ঈর্ষা ছিল, কারণ তারা দেখত মালিক মথুরবাবু ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। অন্য একদিন মথুরের সঙ্গে পরামর্শ না করে খাজাঞ্চী দারোয়ান দিয়ে ঠাকুরকে মায়ের মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেন। রামচন্দ্র দত্ত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "দৌবারিক বাহু প্রসারণপূর্বক তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ইচ্ছামত পূজা করিতে লাগিলেন। দ্বারবান এক মুষ্ট্যাঘাতে এত অধীর হইয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়ক এই সংবাদে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহা মথুরবাবুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইল। মথুরবাবু পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কর্মচারীদিগের বর্ণনাতিশয্য ও দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের কার্যের প্রতি কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না; তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন। এই কথায় বৃত্তিভোগী কর্মচারীরা বাহ্যিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ক্রোধে, অপমানে, হতশায় জর্জরীভূত হইতে লাগিল।" [৩৩]

রামচন্দ্র দত্ত আরও লিখেছেন ঃ "তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই, কথা বলি, তিনিও কত কি বলেন। এ সকল কি মিথ্যা, ভ্রম দর্শন করি? ভাল, অদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।' এই প্রকার স্থির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা করা যাইবে। কিন্তু তখন কিছুই মনে আসিল না।

"একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়া রাসমণির একজন অতিপ্রিয় কর্মচারী সেইস্থান দিয়া গমন করিতেছিল। রামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল; এমন কি, কখনও কথা কহিত না। পরমহংসদেব রামধনকে দেখিয়া মনে মনে মাকে বলিলেন, 'মা, তুমি যদি সত্য হও, তাহলে রামধনকে আমার কাছে বন্ধুর মতো এখন এনে দাও। তবে জানব যে, তুমি আমার কথা শোন, আর সকলই সত্য বলে ধারণা হবে।' এই কথা মনে হইবামাত্র রামধন সহসা রামকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নিকটে নামিয়া আসিল এবং মৃদুস্বরে বলিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কালীর সাক্ষাৎ পেয়ে থাক ভাল, তা অত বাড়াবাড়ি করবার আবশ্যক কি?' এই কথা বলিয়া রামধন চলিয়া গেল।" [৩৪]

---

৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১৭৩-৪; ৩৩ পৃঃ ২৩; ৩৪ পৃঃ ২৬

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালীবাড়ির মুহুরী ছিলেন, পরে দীননাথ খাজাঞ্চীর মৃত্যুর পর খাজাঞ্চী হয়েছিলেন। ইনি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন। একবার ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হওয়ায় যদু মল্লিকের সঙ্গে বিবাদ হয়, কারণ ঐ পাইখানার পাশেই যদুর বাগান। ভোলানাথ কোর্টে বিচারপতির কাছে এজাহার দেওয়ায় ভয় হয় এবং ঠাকুরের শরণ নেয়। ঠাকুর ভক্তের দুঃখে চিন্তিত হলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন এলে সব বললেন। অধর সব শুনে বললেন, "ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে।" এ শুনে ঠাকুরের গুরুতর চিন্তা দূর হলো।[৩৫]

ঠাকুরও অনেক সময় ভোলানাথের সাহায্য নিতেন। একদিন ঠাকুর নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি বালক ভক্তদের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন দেখে, হাজরা বলল, "তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন?" চিন্তিত হয়ে ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং বিশ্বাসী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন। ভোলানাথ বললেন— "মহাভারতে ঐ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে।" মহাভারতের ঐ নজির পেয়ে ঠাকুর আশ্বস্ত হন।[৩৬]

কাশীপুরে ঠাকুর যখন অসুস্থ, তখন তাঁর মালিশের তেলের দরকার হয়েছিল। ঠাকুর ভক্তদের বলেন, "ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে দেবে, কিরকম করে লাগাতে হবে।"[৩৭]

ঠাকুরের বালকের স্বভাব। শ্রীম বলেছেন ঃ "কেশব সেনের ওখানে খেয়ে এসেছেন। আমাদের বলছেন কাউকে বোল না, তাহলে কালীঘরে ঢুকতে দেবে না। পরের দিন দেখলাম খাজাঞ্চী যাচ্ছে কাছ দিয়ে। ঠাকুর নিজেই বলতে লাগলেন, 'দেখ, কাল কেশব সেনের ওখানে গিছলাম। খুব খাওয়ালে। তা ধোপা কি নাপিত খাইয়েছে তা জানি না। আচ্ছা, এতে আমার কিছু হানি হলো? খাজাঞ্চী হেসে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে— আপনার কিছুতেই দোষ নেই।' "[৩৮]

লাটু মহারাজ বলেছেন ঃ "কালীবাড়ির একজন চাকর তামাক খেয়ে যেমন হুকোটি রেখেছে, আর ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে সেই হুকোয় টান দিলেন। অমনি কালীবাড়ির বামুনরা বলে উঠল, 'ছোট ভট্‌চাজ্জির জাত গেছে আর আমরা ওর সঙ্গে খাব না।' ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'আঃ বাঁচলুম। শালাদের সঙ্গে না খেতে হলে বাঁচি।'"[৩৯]

ঠাকুরের সময় দক্ষিণেশ্বরে খাজাঞ্চী, মুহুরী, বামুন ঠাকুর, ঝি, চাকর, দারোয়ান, মালি, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি নানারকম কর্মী ছিল। ঠাকুর তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশতেন, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন, নানাবিধ উপদেশও দিতেন। ঠাকুরের পরিচারিকা বৃন্দে ঝি ২৫ জুন ১৮৭৭ সালে দক্ষিণেশ্বরে কর্মে নিযুক্ত হয়। সে ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করত। শ্রীম প্রথম দিনে (২৬/২/১৮৮২) বৃন্দে ঝিকে ঠাকুরের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা,

---

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/১৬৫; ৩৬ তদেব, ২/৯৪; ৩৭ তদেব, ৪/২৯৭; ৩৮ শ্রীম-দর্শন, ২/৫৯; ৩৯ সৎকথা, ২৩৯-৪০

ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?" বৃন্দে—"আর বাবা বইটই! সব ওঁর মুখে।" বৃন্দে তারপর শ্রীমকে ঘরে গিয়ে বসতে বলল।

ঠাকুর সব নারীতে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করতেন। তিনি বলেন, "যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। তাই আমি বৃন্দেকে কিছু বলতে পারি না।"[৪০] বৃন্দের জলখাবারের বরাদ্দের লুচি ঠাকুর অনেক দিন কলকাতার ভক্তদের খাইয়ে দিতেন। ফলে বৃন্দে বকাবকি করত। শ্রীশ্রীমা বলেন, "ঐ সব কথা পাছে ছেলেদের কানে যায়, তাই ঠাকুর আবার ভয় করতেন। একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে আমাকে বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে, তা তুমি তাকে রুটি, লুচি যা হয় করে দিও, নইলে এক্ষণি এসে আবার বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়।' "[৪১]

রানী রাসমণির বাড়ির পুরাতন দাসী ভগবতীকে ঠাকুর জানতেন। প্রথম জীবনে তার চরিত্র ভাল ছিল না। সে কাশী, বৃন্দাবন, প্রভৃতি তীর্থ দর্শন ও সাধুদের সেবা করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করত। ঠাকুর তাকে নানাভাবে উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভগবতী ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করায় তিনি বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করে গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুয়ে ফেলেন। ঠাকুর ভগবতীকে ভবিষ্যতে দূর থেকে প্রণাম করতে বলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে কয়েকটা গান গেয়ে শোনান। ভগবতী পতিতপাবন ঠাকুরকে চিনেছিল।

ভর্তাভারি নামে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এক মালী ছিল। সে ঠাকুরকে ভক্তি করত। ঠাকুর পঞ্চবটীতে তুলসী কানন করেছিলেন জপধ্যান করবেন বলে। কিন্তু গরু ছাগল ছোট গাছগুলিকে মুড়ে খেত। ঠাকুর ভর্তাভারিকে বেড়ার কথা বলেছিলেন। তাঁর আত্মকথা: "ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে। ঠাকুর বাড়ির একজন ভারী (ভর্তাভারি) ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।"[৪২] ঠাকুর ভর্তাভারির সাহায্যে বেড়া দেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ঠাকুরের কৃপাপাত্র এক বুড়ো মালীর কথা বলেছেন, এই মালী ভর্তাভারি কিনা জানার উপায় নেই। এই শিক্ষাহীন মালী ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল। সে এক রাত্রে বেলতলায় ঠাকুরের সমাধিস্থ জ্যোতির্ময় রূপ দেখে, এবং পরদিন ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে কৃপা ভিক্ষা করে। ঠাকুর তাকে বলেন, "কাল যে-মূর্তি দেখেছিস তাই ধ্যান করবি। আর এই রাস্তাটা পরিষ্কার করবি, কত ভক্ত আসবে।" সেই থেকে মালীটি ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করত আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানের রাস্তা সাফ করত।[৪৩]

সরল না হলে সরলকে পাওয়া যায় না। সরল মেথর রসিক সরলতার প্রতিমূর্তি ঠাকুরকে বুঝেছিল এবং কিভাবে কৃপা পেয়েছিল—সে বিষয়ে এই গ্রন্থের "কৃপাপ্রাপ্ত

---

৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৫১০; ৪১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১/১৩৭

৪২ কথামৃত, ২/১০৫; ৪৩ সৎপ্রসঙ্গ, ২/১৩৪

রসিক" প্রবন্ধে বিশদভাবে লেখা হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর বাগানের কোন কোন দারোয়ান ঠাকুরকে খুব ভক্তি করত। ঠাকুর যখন কলকাতায় যেতেন এবং গভীর রাতে ফিরতেন, রাতের দারোয়ান তাঁর জন্য গেটের কাছে অপেক্ষা করত। ঠাকুর তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে লুচি, মিষ্টি খাওয়াতেন। অনেক সময় ঘুম না হলে রাতের দারোয়ানের কাছে গিয়ে বলতেন, "হাঁগা, একটু রামনাম করতে পার।"

বাগানে হনুমান সিং নামে এক দারোয়ান ছিল। ঠাকুর তাকে ভালবাসতেন—কারণ সে কেবল পালোয়ান ছিল না মহাবীরের নিষ্ঠাবান সাধকভক্ত ছিল। একবার একজন পালোয়ান দক্ষিণেশ্বরে আসে এবং হনুমান সিং-এর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তার পদ নিতে চায়। হনুমান সিং দিনে একবার ভোজন, প্রাতঃস্নান ও ইষ্টমন্ত্র জপ শুরু করল। ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ব্যায়াম ও পুষ্টিকর আহার দ্বারা শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লইলে না, নূতন মল্লের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিবে কি?" হনুমান ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, "আপনার কৃপা থাকে তো আমি নিশ্চয় জয়লাভ করব।" হনুমানেরই জয় হলো।[৪৪]

ভগবান ভক্তির বশ। শ্রীম বলেন, "ঠাকুর যদু মল্লিকের বাগানে গেলে সেখানকার দারোয়ান ঠাকুরকে বাতাস করত। তার ভক্তিপূর্ণ সেবা দেখে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যেত। সেই দারোয়ান একদিন ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করলে। ঠাকুর আমাকেও সেখানে খাবার জন্য বলেন। দেখ, বড়লোকে নিমন্ত্রণ করলে হয়ত নিমন্ত্রণ নিতেন না।" [৪৫]

অহঙ্কার থাকতে নিরহঙ্কার ঠাকুরকে চেনা যায় না। শ্রীম বলেন, "মথুরবাবু ও রানী রাসমণি চিনেছিলেন। কিন্তু ছেলেরা, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি জানত না। একবার কুঠিতে এসেছিল ত্রৈলোক্য, মেয়েমানুষ নিয়ে গান বাজনা করবে। ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, 'ছোট ভট্‌চায মশায় গান শুনান।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'সে কি গো! কই ওরা (মেয়েরা) গান করবে আমরা শুনব। তা না করে আমার গান!' তারপর উনিও গাইলেন, ওরাও গাইল। চলে আসছেন—তখন ওরা মিষ্টিমুখ করাতে চাইল। কিন্তু তিনি খেলেন না। পিছে পিছে একটা লোক খাবার ঠাকুরের ঘরে নিয়ে এল।" [৪৬]

গুরু ও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রগুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী উচ্চস্তরের সাধিকা ছিলেন। তিনি মা জগদম্বার কৃপায় জানতে পেরেছিলেন ঠাকুরের বিষয়। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে মা বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং নিজের অলৌকিক দর্শন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা, শারীরিক বিকার প্রভৃতি বলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি সত্যই পাগল হইলাম?

৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/১৭৫-৭৬ ৪৫ শ্রীম কথা, ২/৭৫-৭৬
৪৬ শ্রীম-দর্শন, ১১/১৬২, ৩/১৫১

জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" ভৈরবী ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া বলেছিলেন, "তোমার কে পাগল বলে, বাবা? তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থা সকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারানীর—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে।"[৪৭] পরে ভৈরবী মথুরবাবুকে বলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সকলকে আন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার এ-কথা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত।" অবশেষে মথুরের ব্যবস্থাপনায় সভা আহূত হয় এবং ভৈরবী ঠাকুরের মধ্যে অবতারের সব লক্ষণ আছে বলে ঘোষণা করেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাধক বৈষ্ণবচরণ ভৈরবীর দাবি অনুমোদন করেন। তিনিও সাধনাপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে ঠাকুরকে দেখা মাত্র মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরেছিলেন। পরে শাক্তসাধক গৌরী পণ্ডিত ঠাকুরকে বলেছিলেন। "বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোককল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করে, আপনি তিনিই।"[৪৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তগুরু তোতাপুরী প্রথমে ঠাকুরকে সাধারণ কালীভক্ত বলে মনে করেন; শেষে ঠাকুরকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়ার পর নির্বিকল্প সমাধিলাভ করায় বিস্ময়ে অভিভূত হন। তোতা চল্লিশ বছরে যা লাভ করেন, ঠাকুর তা তিন দিনে লাভ করেন। পরবর্তী কালে তোতার জীবনে রূপান্তর হয়। তিনি ভগবানের সাকার রূপ মেনেছিলেন, এবং জ্ঞানী হয়েও ঠাকুরের মাতৃসঙ্গীত শুনে কাঁদতেন, যদিও বাংলা ভাষা বুঝতেন না।

যে ভগবানদাস বাবাজী কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের চৈতন্যের আসনে বসায় তীব্র সমালোচনা ও আপত্তি করেছিলেন, সেই বাবাজী কালনাতে ঠাকুরকে দর্শন এবং অপূর্ব ভাববিকাশ দেখে বুঝতে পারেন ঠাকুর অসামান্য পুরুষ।

ঠাকুর বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলেছিলেন যে 'চাপরাশ' না পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। শশধর ঠাকুরের ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরানুভূতি দেখে মুগ্ধ হন। পরে একদিন বলরামের বাড়িতে এসে সজলনয়নে করজোড়ে ঠাকুরকে নিবেদন করেন, "দর্শন চর্চা করে আমার হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেছে; আমায় একবিন্দু ভক্তি দান করুন।" ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পণ্ডিতজীর হৃদয় ঐ দিন স্পর্শ করেন।[৪৯]

পণ্ডিত পদ্মলোচন বর্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ঠাকুর কামারহাটিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ঠাকুর বলেন, "এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না!"[৫০] পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তি ছিল; তিনি ঠাকুরকে বলেন, "তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, তার আর কি? তোমার সঙ্গে হাঁড়ির বাড়ি

---

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/১৮৯; ৪৮ তদেব, ৪/৪১; ৪৯ তদেব, ৪/২৩৪

৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/১০৭

গিয়ে খেতে পারি। তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো।" তারপর কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো।"[৫১]

ঠাকুর মানুষের বুদ্ধিকে যাচাই করতেন। যেসব পণ্ডিতদের ত্যাগবৈরাগ্য নাই, তাদের কথা মান্য করতেন না। ঠাকুর কাউকে বলতেন, "তোমার রাঁড়িপুতি বুদ্ধি"—অর্থাৎ হীনবুদ্ধি। রাঁড়ির ছেলে অনেক কষ্টে মানুষ হয়—অনেক হীন উপায় অবলম্বন করে। কাউকে বলতেন, "চিঁড়া ভেজা বুদ্ধি, স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি"—কামিনী কাঞ্চন, মানসম্ভ্রম লাভের বুদ্ধি। শ্রীম একবার কামারপুকুরে যান। সেখানকার এক বৃদ্ধ পণ্ডিত বলেন, "তুমি নাকি লেখাপড়া শিখেছ? কিন্তু কি করে গদাইয়ের শিষ্য হলে? গদাই তো শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ে নাই। মূর্খ।"

শ্রীম তখন ঠাকুরের কাছে যা শিখেছিলেন তা সেই পণ্ডিতকে বললেন ঃ "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে।" "পাঁজিতে লিখেছে এবার বিশ আঁড়া জল হবে, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। তেমনি পণ্ডিতগুলো শ্লোক আবৃত্তি করে ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু ধারণা নাই।" "বাজনার বোল মুখস্থ করা সহজ কিন্তু হাতে আনা বড় কঠিন।"[৫২]

স্বয়ংজ্যোতি আত্মাকে কখনো চাপা রাখা যায় না। ঠাকুরের মহিমা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। নানাবিধ গণ্যিমাণ্যি ব্যক্তিরা ঠাকুরকে যাচাই করতে আসত। অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা'-তে লিখেছেন ঃ কত দেশ-বিদেশ থেকে ঠাকুরের কাছে সময়ে সময়ে কত দিগ্বিজয়ী বড় বড় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আসতেন। প্রথমত তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে বিদ্যাভিমানে মত্ত হয়ে ভয়ঙ্কর বাক্যচ্ছটা সহকারে ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ে এমন তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেন এবং ঠাকুরকে এমন অবস্থায় ফেলতেন যে, তিনি কি বলবেন তার পথ পেতেন না। লোকে বুঝত, ঠাকুর পরাজিত হলেন। এমন সময় ঠাকুর কি করতেন জান? তিনি বলতেন, 'আমি মল কি মূত্র ত্যাগ করতে যাব।' একবার যাব বললে আর থাকবার জো নেই; যেমনি বলা, তেমনি ওঠা। ভক্তেরা প্রভুর ধারা অনেক বুঝেন; ঠাকুরকে উঠতে দেখে অমনি একজন জলপাত্র নিয়ে ঠাকুরের পেছু পেছু চললেন।

পাঠক। ঠাকুর পরাজিত হলেন—এ কেমন কথা?

ভক্ত। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে সবটুকু শোন। ঠাকুরের পরাজয়ের খুব কারণ আছে। বিদ্যাভিমানীদের বাসনাই বিচারে জয়লাভে প্রশংসিত হয় এবং তাঁদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই তাই। ঠাকুরের ঢোলপেটা নাম শুনে, তাঁর কাছে ঐ বাসনাতেই এসেছেন; ঠাকুর কল্পতরু; যার যা বাসনা, তাই তিনি পূর্ণ করেন। অমানীকে অভিমান দিতে ঠাকুরের মতো এমন দাতার কথা কোথাও শুনিনি।

তারপর পথে যেতে যেতেই ঠাকুরের ভাবাবেশ; চলছেন ঠিক মাতালের মতো আবার শ্রীমুখে বিড় বিড় করে কত কি বলতেন, কখন কিছু বুঝা যেত, কখন কিছু

৫১ তদেব, ৪/৫৮, ২৬৯ ৫২ শ্রীম-দর্শন, ২/১৮০, ৯/১৪১

বুঝা যেত না। এভাবে যথাস্থানে একবারমাত্র বসেই দ্রুতপদে ফিরে আসতেন, আর সেই তার্কিককে ছুঁয়ে দিয়ে বলতেন, কই তুমি কি বলছিলে, বল দেখি। এই ছুঁয়ে দেওয়াটিই করুণানিধির অপার করুণা। প্রভুদেবের স্পর্শে তার্কিক পণ্ডিতেরা কেমন একরকম হয়ে যেতেন---সেটা কেমন জান? সর্পবিদ্যাবিদ্ সাপুড়ে ছড়ি হাতে করে উন্নত-ফণা সাপকে ধরলে সাপটির যেমন হয়, পণ্ডিতদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হতো। এখন আর আগেকার চক্রধরা ভাব নেই, লম্বা-চওড়া শ্লোক আওড়ে ফোঁস ফোঁসানি নেই—সে বিস্তৃত-ফণা ভুজঙ্গম এখন যেমন কুঁচে। এভাবে কিছুক্ষণ ঠাকুরের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকতেন; তারপরই কেউ বা হাঁটু গেড়ে জোড়হাতে ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করতেন, কেউ বা বলতেন, "দেহি মে চৈতন্যম্", আবার কেউ বা কেবল ঠাকুরের পা-তলে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে মাটি ভিজাতেন।[৫৩]

সুরেশচন্দ্র দত্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও উপদেশ' গ্রন্থে উত্তরপাড়ার এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেছেন ঃ সেদিন ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উপরে বিছানার উপর পরমহংসদেব বসিয়া আছেন। নিম্নে চারি ধারে ভদ্রলোকগণ বসিয়া আছেন দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। তার পর বলিলেন, "আপনি পরমহংস? তা বেশ! বেশ!" পরে ঠাকুরের বিছানার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বা! আবার মশারি আছে?" পরমহংসদেব ওমনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে আপন বার্ণিস করা চটি জুতা দেখাইলেন। তিনি ওমনি বলিলেন, "হাঁ! চটি জুতা আছে? তা বেশ! বেশ!" ঠাকুর আবার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অপরাপর দ্রব্যাদি দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ওমনি—বটে! বটে! ওমুক দ্রব্য আছে? অমুক দ্রব্য আছে করিতে লাগিল। তারপর তিনি ঠাকুরের আসনে বসিয়া বলিলেন আজ আমার খুব পরমহংস দেখা হইল। তারপর একটি শাস্ত্রীয় বচন আউড়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের বলিলেন আপনারা অতি সরল লোক তাই এত কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে পরমহংস দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক আপনারা প্রতারিত হইয়াছেন। পরমহংস অবস্থা এরূপ নয়, পরমহংসের অবস্থা কিরূপ জানেন বলিয়া সকলকে সেই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তারপর সন্ধ্যা হওয়াতে বলিলেন, "যাক! আর দিনটা বৃথা যায় কেন? আপন কাজটা সারিয়া আসি।" পণ্ডিত মহাশয় গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করিতে গেলেন। গঙ্গায় হাত মুখ ধুইয়া একধারে নীরবে চক্ষু মুদিয়া ইষ্টমূর্তির ধ্যানে বসিলেন। কতকক্ষণ ধ্যানের পর হঠাৎ তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া পরমহংসদেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন ঠাকুর সমাধিস্থ। পণ্ডিত মহাশয় করযোড়ে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর তুমি ভগবান বলিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।[৫৪]

---

৫৩ পৃঃ ২১৬-১৭

৫৪ পৃঃ ৭৬-৭৭

ব্রাহ্মদের দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জোড়াসাঁকোতে মথুরের সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাহির ও ভিতর পরীক্ষা করে বললেন, "তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা শুনাও।" দেবেন্দ্র ঠাকুরকে বেদ থেকে কিছু শুনান।

দেবেন্দ্র খুশি হয়ে ঠাকুরকে ব্রাহ্মোৎসবে নিমন্ত্রণ করে বলেন, "ধুতি আর উড়ানি পরে এস। তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।" ঠাকুর বললেন, "তা পারব না। আমি 'বাবু' হতে পারব না।" [৫৫] দেবেন্দ্র ও মথুর ঠাকুরের সরলতা দেখে হেসেছিলেন। তারপর দিন দেবেন্দ্র মথুরকে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ গায়ে উড়ানি না থাকলে অসভ্যতা হবে ব্রাহ্মসমাজে। কাপুড়ে সভ্যতায় সভ্য নয় বলে অবতার রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করতে পারলেন না।

১৮৭৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরিয়াতে ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম থেকেই উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেশব কেবল বিখ্যাত বক্তা ও লেখক ছিলেন না, তিনি সাধকও ছিলেন। ঠাকুর কেশবের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

১ জানুয়ারি ১৮৮১ কেশব সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে আসেন। ঠাকুর হেসে কেশবকে বলেন, "কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। ... তুমি কিছু বল। এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।" কেশব (বিনীতভাবে, সহাস্যে) বলেন, "এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রি করতে আসা!" [৫৬]

কেশব পরে ঠাকুরকে বলেন, "আপনি কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন—ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ও তোমার কি কথা! আমি খাই দাই থাকি; তাঁর নাম করি। লোক জড় করাকরি আমি জানি না।"

কেশব—"আচ্ছা, আমি লোক জড় করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি সকলের রেণুর রেণু। যদি দয়া করে আসবেন, আসবেন।"

কেশব—"আপনি যা বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।" [৫৭]

কেশব ঠাকুরের মহত্ত্ব ও দেবত্ব উপলব্ধি করে তাঁর জীবন ও বাণী 'সুলভ সমাচার', 'সানডে মিরর', 'থিইস্টিক কোয়াটার্লি রিভিউ' প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্ম পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ফলে বহুলোক, বিশেষত ঃ 'ইয়ং বেঙ্গল' ঠাকুরের নিকট যাতায়াত শুরু করে।

৫৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/২২২; ৫৬ তদেব, ৫/পরি/৮৫; ৫৭ তদেব, ৫/পরি/ ৮৬

জীবনের শেষ প্রান্তে কেশব ঠাকুরকে ভগবান-জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। শ্রীম বলেন ঃ "ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, 'একদিন একজনের (কেশব সেনের) বাড়ি গেছি। সে আমায় ঠাকুরঘরে যাবার জন্য বললে। বললে, ঐ ঘরে ঈশ্বরের পূজা হয়। একবার এসে স্থানটি পবিত্র করে দিন। ঘরে যেই ঢুকলুম অমনি কবাট বন্ধ করে দিল। আর ফুল-চন্দন দিয়ে আমার পা পূজা করতে লাগল। আবার বলছে, আপনি কাউকে এ-কথা বলবেন না। কেন নিষেধ করল? গুরুগিরি আছে কিনা! শিষ্যরা পাছে গোল বাঁধায়।" ৫৮

কেশবের শিষ্যগণ ঠাকুরকে ভাল বুঝতে পারে নি। ঠাকুর তাদের বলতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" ৫৯ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'কেশব চরিত' গ্রন্থে লেখেন যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের সঙ্গে দেখাশুনা হবার পর মত বদলিয়েছেন—এখন পরমহংসদেব বলেন যে সংসারেও ধর্ম হয়। গিরিশ ঘোষ ত্রৈলোক্যকে ঠাকুরের সামনে এ-ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করায়, ত্রৈলোক্য বলেন, "সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি—যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ "ওসব তোমাদের কি কথা! যারা 'সংসারে ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়ঃ ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ!... তখন কামিনীকাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে।"

ত্রৈলোক্য—"সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটি দান ধ্যান—"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কী আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর! আর দান ধ্যান দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না।... মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!"

গিরিশ—"তাহলে আপনি যা লিখেছেন ওকথা ঠিক না?"

ত্রৈলোক্য—"কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি কি মানেন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হয়; কিন্তু জ্ঞান লাভ করে থাকতে হয়—ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান।" ৬০

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে কিছুটা বুঝেছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং সাধুসন্ত দর্শন করেছিলেন। ঠাকুর যখন ক্যানসার চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে, তখন বিজয় ঠাকুরকে দেখতে আসেন কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তসহ। মহিমা চক্রবর্তী বিজয়কে তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী বলতে বলায়, তিনি উত্তরে বলেন, "দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি,

৫৮ শ্রীম-দর্শন, ২/১৫৩; ৫৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/১২; ৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/১৮৮-৯০

এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুআনা, কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।" ৬১ পরবর্তী কালে বিজয় বলেছিলেন, "আমি এক এক ভাবে ও মতে সিদ্ধ সাধু পুরুষ দেখিয়াছি; কিন্তু সকল ভাবে ও মতে সিদ্ধ কেবল পরমহংসদেবকেই দেখিয়াছি, আর কাহাকেও দেখি নাই। জগতের ইতিহাসে, ইহা নূতন।" ৬২

ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিলেন। শিবনাথও ঠাকুরের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভগবান লাভের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঠাকুরের উপদেশে বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাব পরিবর্তন ও পরিণামে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ দেখে শিবনাথ ঠাকুরের নিকট যাওয়া বন্ধ করেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি স্নায়ু-দৌর্বল্য থেকে দেখা দিয়েছে এবং অত্যধিক কঠোরতার ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে মাতাল ও দুষ্ট নটনটীরা ঠাকুরের কাছে যায়, উপরন্তু ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁকে ঈশ্বর বলে প্রচার করতে শুরু করেছে। কথা কানে হাটে। ঠাকুর সব শুনেছিলেন। তারপর একদিন শিবনাথের সঙ্গে দেখা হলে বলেন, "হ্যাঁ, শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব জড় জিনিসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ-সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার?" ৬৩ শিবনাথ এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি।

পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ও শিক্ষিত অধিকাংশ ব্রাহ্মরা ঠাকুরকে ধরতে পারেনি; তবে তারা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব লক্ষ্য করেছিল। আগে যেখানে কেবল ধ্যান, বেদপাঠ ও বক্তৃতা হতো, সেখানে কীর্তন, ভক্তিগীতি, নৃত্য, মায়ের বন্দনা প্রভৃতি শুরু হলো। কেশবের প্রধান শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, 'ইঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিবার আগে আমরা ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা কি বুঝিতাম—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইঁহার দর্শনলাভের পরে বুঝিয়াছি যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।" ৬৪

ভক্ত ও আগন্তুকদের দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "এখানে ঢং নেই।" প্রকৃত ধর্ম অনুভূতির বস্তু। উহা একটা ঢং বা show business নয়। লোকে দেখত ঠাকুর বিবাহিত অথচ গৃহী নন; আবার সন্ন্যাসী কিন্তু গেরুয়া কাপড় পরেন না, মুণ্ডন করেন না, জটা নেই, গায়ে ভস্ম নেই, গাঁজা খান না। এ কোন দিশি সাধু! বাঘছালে বসে ফোঁটাতিলক পরে রুদ্রাক্ষ মালায়

৬১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১০৫৮
৬২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, সুরেশ দত্ত, পৃঃ ১২
৬৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৮/৮৮
৬৪ তদেব, ৫/২৩

জপ করেন না; সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান না; হঠযোগ করেন না, ঔষধ ও মাদুলী দেন না। ঘোড়ার গাড়িতে করে কলকাতায় ভক্তবাড়িতে যান—একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন ও ভালমন্দ খান। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে একটা সুন্দর ঘরে থাকেন। বিছানা ফিটফাট। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে ঠাকুর নৃত্যগীত করেন, হাসিঠাট্টা ও রঙ্গরসও করেন। সাধারণ মানুষের মতো আহার-বিহার, পান-তামাক সেবন করেন। এ হেন ব্যক্তিকে চট করে অবতার বলে বোঝা খুবই কঠিন। অথচ তাঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তাঁকে একবার যে দেখেছে ভুলতে পারত না। কলকাতায় থিয়েটার দেখতে গিয়ে বাবুরাম ও মাস্টারকে বলেছিলেন, "দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল করো না। ঐহিকেরা ঢং মনে করবে।" [৬৫]

ভক্তদের মধ্যে যাদের দিব্য দৃষ্টি ছিল, তারা ঠাকুরের দেবত্ব বুঝেছিল। নাগমহাশয় বলেন, "ঠাকুরের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করার পর জানিতে পারিলাম, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, গোপনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া লীলা করিতেছেন।" কেমন করে জানলেন?—এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ঠাকুরই যে নিজগুণে কৃপা করে জানিয়ে দিলেন 'তিনি কে?' তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ তাঁকে জানতে পারে! সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্যা করলেও যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে কেউই তাঁকে বুঝতে সমর্থ হয় না।"

অপর একদিন ঠাকুর নিজ দেহ দেখিয়ে নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার এটা কি বোধ হয়?" তিনি অমনি করজোড়ে বললেন "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না! আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি—আপনি সে-ই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হয়ে নাগমহাশয়ের বুকে ডান পা স্পর্শ করেন। সহসা নাগমহাশয়ের ভাবান্তর হলো। তিনি দেখলেন, "সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরে কি এক দিব্য জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছে!" [৬৬]

ঠাকুর একদিন রামচন্দ্র দত্তকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমায় কি মনে কর?" তিনি উত্তরে বলেন, "চৈতন্যচরিতামৃতে গৌরাঙ্গদেবের যে-সকল লক্ষণ লিখিত আছে, তদ্দ্বারা প্রভু, আপনাকে শ্রীগৌরাঙ্গই বলিয়া জ্ঞান হয়।" ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বামনী এই কথা বলিত।" রামবাবু বলেন, "সেই দিন হইতে আমি তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতাম।" [৬৭] পরবর্তী কালে ঠাকুরের শরীর গেলে রামবাবু স্টার থিয়েটারে প্রকাশ্যে "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা?" —এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয়, বৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ বক্তৃতা দেন। তিনি লোকসমক্ষে বলেন, "রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ অনাথের নাথ, রামকৃষ্ণ অগতির গতি, রামকৃষ্ণ মূর্খের দেবতা, রামকৃষ্ণ পতিতের অবতার। যাহারা আমাদের মতো নিরুপায়, যাহারা সংসারচক্রে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, যাহাদের দশদিক শূন্যময় বোধ হইয়াছে, তাহাদেরই জন্য, কেবল তাহাদেরই জন্য রামকৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন।" [৬৮]

---

৬৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১৫১
৬৬ নাগ মহাশয়, পৃঃ ৪১
৬৭ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, ২/৩৩১
৬৮ তদেব, ১/৪৩-৪৪

১ জানুয়ারি ১৮৮৬ সালে কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে এত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) বলে বেড়াও?" গিরিশ ঠাকুরের সামনে নতজানু হয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন, "ব্যাস, বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!" [৬৯]

১৮৯৭ সালের ১৫ আগস্ট, রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গিরিশবাবুকে ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁর কি মত প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, "যদি অন্যরূপ ঈশ্বর থাকেন, তাহলে আমি ক্ষুব্ধ হব। আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনার গৃহ হতে তাঁর নিকট গিয়েছি, আমাকে বসতে আসন দিয়েছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হতে পাপ থিয়েটার-গৃহে মিঠাই নিয়ে এসেছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাইনি। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। তাঁর এককথায় আমার জীবনে যুগান্তর হয়েছে।... তাঁকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়; তাঁকে ভুলাই কঠিন।"

ঠাকুরের গৃহীশিষ্যদের মধ্যে পূর্ণ ছিল ঈশ্বরকোটি। ঠাকুর পূর্ণের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার।" দ্বিতীয়বার দর্শনের সময় ঠাকুর পূর্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?" শুদ্ধ সত্ত্ব পূর্ণের ঠাকুরকে চিনতে মোটেই কষ্ট হয়নি। সে ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলে, "আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" [৭০]

ঠাকুরের স্ত্রীভক্তেদের মধ্যে গোপালের মা দেখেছিলেন তাঁর গোপালকে ঠাকুরের মধ্যে; যোগীন-মা বুঝেছিলেন যে ঠাকুর অন্তর্যামী। নিজের শরীর দেখিয়ে ঠাকুর একদিন যোগীন-মাকে বলেন, "তোমার যে ইষ্ট তা এর ভেতরেই আছে। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়বে।"[৭১] মনোমোহনের মা শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে জেনেছিলেন। মনোমোহন নিজ মেয়ে মাণিকপ্রভার কঠিন ব্যাধির কথা ঠাকুরকে জানাতে ইতস্তত করায় শ্যামাসুন্দরী বলেন, "যিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে—তাতেও দ্বিধা?" [৭২] গোলাপ-মা দেখেছিলেন সর্পরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি গপ্ গপ্ করে ঠাকুরের ভিতর আহার গ্রহণ করছে। গৌরী-মাও বলেছিলেন, "আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও তিনি, এই দুয়ে অভেদ।" [৭৩]

কত লোক দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করেছে, "পরমহংস কোথায়?" তিনি বলতেন, "কে জানে বাপু! কেউ বলে পরমহংস, কেউ বলে ছোট ভট্‌চায, কেউ বলে পাগলা বামুন—খুঁজে নাও।" কি করে অহঙ্কার দূর করতে হয়, কি করে দীনের দীন হতে হয়, ঠাকুর নিজে জীব সেজে সকলকে দেখিয়ে গেছেন। সুরেশ চন্দ্র দত্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও উপদেশ" গ্রন্থে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছেন :

একদিন একটি কৃশকায় গরিব লোক এক পা ধুলা সমেত এক জোড়া চটি জুতা পায়

[৬৯] শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩/১১০-১১; [৭০] তদেব, ৫/১৯৭; [৭১] শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি, পৃঃ ২৭
[৭২] ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১০০ [৭৩] গৌরীমা, পৃঃ ১০৬

দিয়া ফট্ ফট্ করিয়া আসিয়া "কিহে রামকৃষ্ণ" বলিয়া ঠাকুরের গদির উপর বসিল। তারপর ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়া বলিল "এক ছিলিম তামাক সাজ তো ভাই?" পরমহংসদেব ওমনি তাড়াতাড়ি তার জন্য তামাক সাজিতে গেলেন। উপস্থিত ভক্তেরা ওমনি তাঁহার হাত হইতে কলকে লইয়া তামাক সাজিয়া দিল। সে লোকটা চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া তামাক টনিয়া, তারপর "আমি ভাই রাম" বলিয়া চলিয়া গেল। সে লোকটা চলিয়া যাইলে পর সকলেই পরমহংসদেবকে কহিতে লাগিল, "আপনি তামাক সাজিতে গিয়াছিলেন কেন? আমাদের বলিলেই তো হইত।" পরমহংসদেব তাহাদের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "দিলুমই না হয়, তাতে ক্ষতি কি?"

* * *

একদিন পরমহংসদেব কোন্নগরে কোন ভদ্রলোকের বাটী গিয়াছিলেন। তথাকার দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে বিশারদ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া বলিলেন, আপনি কি আমার প্রণম্য?" পরমহংসদেব তদুত্তরে কাঁহলেন, "আমি সকলের দাস, আমার প্রণম্য সকলেই।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর দিন, আপনি আমার নমস্য কি না?" পরমহংসদেব কাতর হইয়া বলিলেন এ বিশ্বসংসারে সকল বস্তু হইতে আমি অধম আমি সকলের দাসানুদাস, সকলেই আমার প্রণম্য।" পণ্ডিত মহাশয় আবার বলিলেন "আপনি বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, আপনার পৈতা নাই সেজন্য আপনি ব্রাহ্মণের নমস্য নন, তবে যদি আপনি সন্ন্যাসী হন তবেই আমরা প্রণাম করিতে পারি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কি সন্ন্যাসী?" নিরহঙ্কারী রামকৃষ্ণ সে কথাও নিজ মুখে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। অনেক অনুরোধে অবশেষে স্বীকার করেন।

* * *

একদিন তিনি উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় একজন কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার তথায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া কতকগুলি যুঁই ফুল তুলিয়া আনিতে আদেশ করেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি ফুল আনিয়া দিয়াছিলেন। এই ডাক্তারবাবু পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি সর্বনাশ! আমি করিয়াছিলাম কি? এঁকেই ত আমি ফুল তুলিতে বলিয়াছিলাম।" [৭৪]

লাল নরুণ পেড়ে মোটা ধুতি পরতেন ঠাকুর। অধিকাংশ সময় খালি গায়ে বা ধুতির অপর অংশ গায়ে জড়াতেন। কখনও সস্তা মার্কিন কাপড়ের জামা গায়ে দিতেন। আগন্তুকরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী বা মালী বলে ঠাওরাত। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

৭৪ পৃঃ ৪৮-৪৯

"সৎ প্রসঙ্গ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "মথুরবাবুর কোন বন্ধু একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসেছেন। বাগানভরা ফুল। ঠাকুরকে সেখানে দেখে মনে করলেন বাগানের মালী। তাই তাঁকে বললেন ভাল করে একটা ফুলের তোড়া করে দিতে। ঠাকুর খুব চমৎকার একটি তোড়া তৈরি করে সেই ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। তিনিও খুব খুশি। কলকাতা গিয়ে ঐ বন্ধু মথুরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—'এমন মালী কোথায় পেলে? কি সুন্দর তোড়া গড়ে দিয়েছে আমায়!' মথুরবাবু শুনে বললেন—'চল আবার সেই মালীর কাছে।' দক্ষিণেশ্বরে গেলেন দুজনে। মথুরবাবু বন্ধুকে দেখালেন—মালী নয়, তিনিই পরমহংস।"[৭৫]

পরবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরের অনেকে ঠাকুরকে দর্শন করেনি বলে অনুতাপ করেছে। লাটু মহারাজ এক ইঞ্জিনিয়রের কথা বলেছেন, যিনি স্বামী যোগানন্দের পিতার সঙ্গে স্বামীজীকে দেখতে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় স্বামীজী বললেন, "আপনি পরমহংসদেবের কাছে যান নি কেন?" ইঞ্জিনিয়রবাবু বলেন, "আমি আর ইনি পরমহংসদেবের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ইনি বললেন—থাক, এ পাগল, এর কাছে যেও না। চল পঞ্চবটীর সাধুর কাছে যাই। আমরা পঞ্চবটীর সাধুর কাছেই গেলাম। সাধুর কৃপা ভাগ্যে না থাকলে সাধুদর্শন হয় না। এখন বড় দুঃখ হয়, একটা সামান্য কথার জন্য তাঁর দর্শন পেলুম না।" [৭৬]

তালতলার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামকরা ডাক্তার ছিলেন। তিনি মদ খেতেন এবং ঠাকুরকে চিকিৎসাও করেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "ও (দুর্গাচরণ ডাক্তার) রাত্তির দশটার সময় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 'হৃদে, হৃদে,' করে ডাকত। ওর গলা শুনে তখনই হৃদেকে বলতুম, 'ওরে, দোর খুলে দে।' হৃদে দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটি কথাও না বলে বসে থাকত। ডাক্তারই জানে, কি চোখে আমায় দেখেছিল।" [৭৭]

ঠাকুর তখন কাশীপুরে ক্যান্সারে ভুগছেন। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র বসুকে রাম দত্ত চিনতেন। রামবাবু ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা করাবার জন্য কৈলাস ডাক্তারের কাছে যান। কৈলাস বসু রামবাবুর কাছে তাঁর গুরুর মহত্ত্বের কথা শুনে বলেন, "দেখ রাম, তোমরা তিলকে তাল কর। কোন ব্যক্তির সাধুত্বের পরিচয় পাইলে তাঁহাকে 'পরমহংস' বা 'অবতার' প্রভৃতি উচ্চ আখ্যায় পরিচিত না করিলে তোমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা প্রমাণ করিতে চাও যে, তোমরাও বড় বড় ভক্ত এবং লোকমান্য পুরুষ। এদিকে বলছ, 'পরমহংসদেব,' 'অবতার,' আবার বলছ—তাঁহার গলদেশে বিষাক্ত ক্ষত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে। পরমহংস অবতারও হবেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারও হবে। আমি হলে ভাই, ওরকম পরমহংসের বা অবতারের কান মুচড়ে দিতুম।"

এ শুনে রামবাবু দুঃখিত হয়ে বললেন, "ওরূপ মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে ভাই—এরূপ কটু উক্তি করিতে নাই। করিলে, বক্তার ও শ্রোতার উভয় পক্ষেরই অকল্যাণ হয়।"

৭৫ ১/৭৯; ৭৬ সৎকথা, ১৫; ৭৭ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৩২-৩৩

কৈলাস ডাক্তার রামবাবুর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং গাড়ি করে কাশীপুরে পৌঁছুলেন। উভয়ে পুকুরের ঘাটের কাছে পৌঁছুলে ঠাকুর একজন সেবককে দিয়ে কৈলাস ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। রামবাবু ও কৈলাস ডাক্তার উভয়ে ঠাকুরের ঘরে গেলে, ঠাকুর ডাক্তারকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁ ডাক্তার, তুমি আগে আমার চিকিৎসা করবে, না আমার কান মুচড়ে দেবে? কোন্‌টি আগে করবে?" এ-কয়টি কথা শোনামাত্র কৈলাস ডাক্তারের অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। তিনি বুঝিলেন—এ পরমহংস নিশ্চয়ই অন্তর্যামী ভগবান। নতুবা গাড়িতে তিনি ও রামবাবু ব্যতীত কেউ ছিল না—ইনি কি করে জানলেন। কৈলাস ডাক্তার ঠাকুরের কাছে বললেন, "দীনের অপরাধ মার্জনা করবেন। না বুঝিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তাহা লইয়া আর লজ্জা দিবেন না।" তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা করেন এবং চিরদিনের মতো ঠাকুরের ভক্ত হন। তাঁর দম্ভ চূর্ণ হয়। পরবর্তী কালে তিনি ঠাকুরের ছবি প্রণাম না করে বাড়ি থেকে বের হতেন না এবং কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ২৫০০ টাকা দান করেন।[৭৮]

অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। ঠাকুর বহিরঙ্গদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলে তাদের মনকে ভগবৎমুখী করে দিতেন। আর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে নিজ দৈবীলীলা আস্বাদন করতেন এবং তাঁর বাণী বহন করবার শিক্ষা দিতেন। শ্রীম বলেন ঃ "ঠাকুর বলছেন, 'আমি কে আর তোরা কে—এ জানতে পারলেই হলো। আর কিছুর দরকার হবে না।' অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এয়েছেন—এ জানলে, ভক্তরা তাঁর অংশ, পার্ষদ হবে—এ-কথা জানতে পারলে তারা আর মায়ায় পড়বে না।" [৭৯]

রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরকে প্রকাশ্যে ঈশ্বরাবতার বলে ঘোষণা করতে থাকেন। ঠাকুর ঐসব শুনে তাদের ঐরূপ করতে নিষেধ করেন এবং পরে বিরক্ত হয়ে একদিন বলেন, "কেউ ডাক্তারী করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বল্লেন। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় কল্লে! ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি?" [৮০] এটা ঠিকই। অবতারই একমাত্র নিজের স্বরূপ জানেন। শংকরই একমাত্র তাঁর নিজের দর্শনের বিষয় জানতেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করে গেল।" সাধারণ মানুষ মহাপুরুষ বা অবতারদের মূল্যায়ন করে নিজেদের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে। যে যেমন আধার সে তেমনি বোঝে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

৭৮ যোগোদ্যান মাহাত্ম্য, পৃঃ ২৬-২৯; ৭৯ শ্রীম-দর্শন, ২/১৩৩; ৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/১০৫

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্যেরা ঠাকুরকে একভাবে বুঝেছে, ত্যাগী শিষ্যেরা আর এক ভাবে বুঝেছে। তিনি যাকে যেমন বুঝান সে তেমনি বুঝে। লাটু মহারাজ বেশ মজা করে বলেছেন ঃ "ঠাকুর চলে গেলে কেউ বললে, 'ঠাকুর আমায় বেশি ভালবাসতেন'; অন্য কেউ, 'আমায় বেশি'—এই রকম মাঝে মাঝে ঝগড়া হতো। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, প্রত্যেকেই মনে করত তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। একদিন আমি অমনি ঝগড়া দেখে বললাম, 'তিনি (ঠাকুর) কিছু রেখে যাননি, তাতেও তোরা সব ঝগড়া কচ্ছিস, আর যদি কিছু রেখে যেতেন, তাহলে তোরা নিশ্চয়ই মকদ্দমা লড়তিস।' " ৮১

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা ছিলেন কেউ ঈশ্বরকোটি, নিত্যমুক্ত, কেউ পূর্বের অবতারদের পার্ষদ। তাঁরা সবাই কমবেশি বুঝেছিলেন তাদের গুরু মানুষদেহধারী ভগবান বা মহাপুরুষ, বা অত্যন্ত আপনজন। ঠাকুরকে কি ভগবান বলে মনে হতো?—এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলেন, "তা হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না তাঁর ধারে থাকা যায়? বাপ বলে মনে হতো।... তিনি যে অবতার, তা স্বামীজী বলেছে, আমি আর কি বলব? তিনি আমার গুরু, পিতা। আমি তাঁকে কি জানি, আর কি, বুঝি বলব যে?" ৮২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরকে প্রথমে আপন স্নেহময়ী জননীরূপে দেখেছিলেন, এবং পরে বুঝেছিলেন ঠাকুর ও মা জগদম্বা অভিন্ন এবং মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু। স্বামী তুরীয়ানন্দ তীব্র পুরুষকার অবলম্বন করে বেদান্ত সাধনা করতেন। ঠাকুর একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে এই গানটি শোনান—"ওরে কুশীলব/করিস কি গৌরব/ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?" কুশীলব যখন মহাবীরকে বাঁধেন, তখন মহাবীর এই গানটি গেয়েছিলেন। তুরীয়ানন্দ পরে বলেছিলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন হইতে বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।" ৮৩

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একদিন বলেছিলেন, "তোরা ঠাকুরকে 'অবতার, অবতার' বলিস! অবতার কি বল ত? এই বলিয়া mathematics-এর অঙ্কের ধারায় বলিলেন—স্বামীজী তাঁহার সমুদয় বাক্যে, বক্তৃতায় যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন + (plus) ঠাকুরের সব পার্ষদ + (plus) অনন্ত = (equal to) ঠাকুর।" ৮৪

কোন কোন সন্ন্যাসী শিষ্য ঠাকুরকে দেখে এবং সঙ্গ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। পরবর্তী কালে কেউ কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরের মহিমা ব্যক্ত করেছেন, কেউ বা নির্বাক হয়ে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলেছিলেন, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আর কি বলব—তাঁকে কতটুকুই আর বুঝেছি? শ্রীশ্রীঠাকুরকে বোঝা তো দূরের কথা, স্বামীজীকেই বুঝতে পারলাম না। স্বামীজীর ভিতর দিয়াই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারা যায়। তাঁকে বুঝিবার সাধ্য কি?" ৮৫

৮১ সৎকথা, ২৩৮; ৮২ তদেব, পৃঃ ৯, ৩; ৮৩ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ২০
৮৪ উদ্বোধন, ৪৮ বর্ষ, পৃঃ ৫৩৬; ৮৫ স্বামী গোপালানন্দের স্মৃতিকথা ঃ সংগ্রাহক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পৃঃ ৬৮

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেছিলেন, "ঠাকুর দেখতে শুনতে বেশ সোজা লোক, কথাও বলতেন বেশ সোজা সরলভাবে। তাঁর কথা শুনে মনে হতো, বেশ সহজকথা কিন্তু পরে যত ভাবা যায় ততই তার মানে বুঝে উঠা ভার।" [৮৬] আর একদিন কথা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ বলেন ঃ "প্রথম যেদিন পরমহংসদেবের মুখে শুনেছিলাম—'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ-শরীরে রামকৃষ্ণ।' তখন আমার তত বিশ্বাস হয় নি। মনে হয়েছিল—তা একটু আবোল তাবোল বললেই বা; লোকটি তো ভাল, সরল। পরে ঠাকুর একদিন তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল সে-ই এ শরীরটায় আছে।' তাঁর তখনকার দিব্য আবেশ এবং মুখ চোখের ভাব দেখে আমার সে-কথা বিশ্বাস হয়েছিল।" [৮৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দকে ঠাকুরের শেষ জীবনের ঘটনাবলী লিখতে অনুরোধ করায় তিনি বলেছিলেন, "যখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে আরম্ভ করি, মনে করেছিলাম ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখছি ঠাকুরের জীবন অতি গভীর। আমি শুধু উপরের ডালপালা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু শিকড় মাটির অনেকখানি নিচে।" [৮৮]

স্বামী শিবানন্দ ঠাকুরকে নিজের মা বলে অনুভব করেছিলেন। পরে তিনি বলেন, "ঠাকুর যে ঈশ্বর, সে-কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। আগে ঠাকুরের ভালবাসার আকর্ষণেই আমরা তাঁর কাছে ছিলুম। এখন দেখছি, ও বাবা! দেখতে ছোট্ট মানুষটি, নড়চড়া করতেন সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু তিনি কী বিরাট! কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই না তাঁর ভিতরে রয়েছে!" [৮৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্ক বড়ই রহস্যপূর্ণ। ঠাকুর স্বামীজীকে ঠিক চিনেছিলেন, কিন্তু স্বামীজী প্রথম থেকে ঠাকুরকে পাগল বলে বুঝেছিলেন, কারণ তাঁর কথাবার্তা, আচরণ সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। তারপর ঠাকুরের স্পর্শে স্বামীজীর অপূর্ব অনুভূতি হওয়ায়, তিনি ভাবলেন, "ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন ঐরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মতো করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে?" [৯০]

ঠাকুর শিষ্যদের বলেছিলেন, "বাজিয়ে নিবি"; "সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি তবে তাকে বিশ্বাস করিবি।" তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রধান বার্তাবহ নরেন্দ্র যেন তাঁকে ভালভাবে বুঝতে পারে, নতুবা তাঁর বাণী যথাযথভাবে সকলের কাছে পৌঁছাবে না। স্বামীজী ছয় বছর ধরে ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাবুঝির সংগ্রাম করেছেন, প্রশ্নবাণে উত্তপ্ত করেছেন, সন্দেহ করেছেন, এবং ঠাকুরের কথা ও কাজ যাচাই করে দেখেছেন।

---

৮৬ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১২৬
৮৭ তদেব, পৃঃ ১৫৫
৮৮ উদ্বোধন ৬৮ বর্ষ পৃঃ ৬৭৮
৮৯ শিবানন্দ বাণী, ১/১৩২-৩৩
৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/৯৩-৯৪

Christopher Isherwood লিখেছেন : "Among Vivekananda's many tremendous qualities, one of the greatest that he had, for us, was his capacity to be a doubter ... When a being like Vivekananda is converted, then the whole of the nineteenth century is altered."[৯১]

ঠাকুরকে যে যত বুঝবে সে অধ্যাত্মপথে তত এগিয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, "যারা আমার অন্তরঙ্গ, আপনার লোক, তাদের গালাগালি দিলেও আসবে।" শ্রীম বলেন, "ঠাকুর স্বামীজীকে দুবার বকেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরের বাগানে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম প্রথম স্বামীজী মা কালীকে যা তা বলতেন। ঠাকুর তাই শুনে একদিন বললেন, 'তুই এখানে আর আসিস নি।' স্বামীজী ঠাকুরের বকুনি খেয়েও রাগ না করে তাঁর জন্য তামাক সাজতে লাগলেন। কাশীপুর বাগানে তান্ত্রিক মতের কথা নিয়ে বকেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি দেখেছি, যারা ধর্মের নামে এ-রকম করে, তাদের কারো ভাল হয়নি।' স্বামীজী নিচে এসে বললেন, 'আমি কখনও বকুনি খাইনি, তোরা লাগিয়ে আমাকে বকুনি খাওয়ালি'।" [৯২]

কাশীপুরে শরীর ত্যাগের পূর্বে ঠাকুর স্বামীজীর ভিতর নিজের শক্তি সঞ্চার করেন এবং নিজের স্বরূপ শেষবারের মতো সন্দেহাকুল শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে বলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ-শরীরে রামকৃষ্ণ।" স্বামীজীর কবিতায় ও স্তোত্রে, পত্রে ও প্রবন্ধে, বাণী ও রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ঠাকুরের প্রতি মহান উক্তিগুলি : "বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।" "খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়। নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।" "স্বামী বিবেকানন্দের ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।" "রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।" [৯৩]

ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে স্বামীজীই ঠাকুরকে অধিক বুঝেছেন—এ-কথা অন্যান্য শিষ্যেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে। সারদানন্দ বলেছেন, "স্বামীজী না বুঝালে আমরা ঠাকুরের কিছুই বুঝতুম না। স্বামীজীর interpretation ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরকে যিনি বুঝতে যাবেন, ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক তিনি ধরতে পারবেন না।" স্বামী ওঁকারানন্দ একবার স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজী বলেছেন—'ঠাকুরকে বোঝার আগে আমায় বোঝ, আমি কি ফ্যালনা?'—এটা বললেন কেন?"[৯৪] তুরীয়ানন্দ বললেন : "দ্যাখো, ঠাকুর ভগবান, স্বামীজী একজন পারফেক্ট ম্যান (সম্পূর্ণ মানুষ)। নর ছাড়া নারায়ণকে কে বুঝবে? আর ঐ পারফেক্ট ম্যান-এর কাছে আমরা পিগ্‌মি (বামন)।" [৯৪ক]

একবার শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীকে বলেন, "মহাশয়, আপনি ঠাকুরকে অবতার

৯১ Vivekananda : East meets West, pp.x-xi
৯২ শ্রীম কথা, ১/১৯৬
৯৩ বাণী ও রচনা, ৭/৭৬ ৯৪ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৩৬৩
৯৪ক শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ, পৃঃ ১৭৩

বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার তো শক্তি—বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।" স্বামীজী উত্তরে বলেন ঃ "তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্প শক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার রঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি।" [৯৫]

পরে একদিন স্বামীজী শরৎবাবুকে বলেন, "তাঁর (ঠাকুরের) উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?" ঠাকুরকে বুঝা এবং প্রচার করা যে কত কঠিন—সে প্রসঙ্গে স্বামীজী শিষ্য শরৎচন্দ্রকে বলেন ঃ কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখন হয়েছে?—না, হতে পারে? ও-কথা কখনও বিশ্বাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটি' 'অন্তরঙ্গ' ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁরা ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই নিতে পারলে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ও-সব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর 'বাদশা', তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবনযাপন করতে পারে?

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন?

স্বামীজী। তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে spirituality (ধর্মানুভূতি)-র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তারাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ করে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন।

শিষ্য। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছে, সে-সব কি সত্য নয়?

স্বামীজী। একেবারে সত্য নয়—বলা যায় না; তবে তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা করছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেউ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেউ বলছেন—সাধন-ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি; ও-সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি,

৯৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯/১৪৬

কত কত পূর্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ—তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।[৯৬]

ভগবৎ লীলা দুর্বোধ্য

ভগবানের মানুষলীলা মধুর অথচ দুর্বোধ্য। বিরাট ঈশ্বর পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, খুড়ো, বন্ধুরূপে বিচিত্র লীলা করেন। অনন্ত ঐশ্বর্যকে চেপে, লুকিয়ে ঈশ্বর ভক্তদের নিয়ে মজা করেন, শিক্ষা দেন, নাচেন, গান; ভক্তদের সুখ-দুঃখের সাথী হন; কৃপা পরবশ হয়ে ভক্তদের বুঝবার সামর্থ্য দেন। "জহুরী জহর চেনে"—এই গল্পে ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, "যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়।" বেগুনওয়ালা হীরের পরিবর্তে ৯ সের বেগুন, কাপড়ওয়ালা ৯০০ টাকা, এবং জহুরী এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল।

ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে রাম দত্ত ডাক্তার ছিলেন এবং নিজেকে ভক্তদের অধ্যক্ষ বলে মনে করতেন। ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গার পর ঠাকুর রামবাবুকে ঠাট্টা করে বলেন, "এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙ্গল? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও।" [৯৭]

রামবাবুর ভগবৎকথায় বাচালতা ও "হাম জান্‌তা" ভাব দেখে ঠাকুর একদিন বলেন, "ভাল রাম, তুমি এর কি করবে? দশ হাত জলের নিচে ইলিশ মাছ বেড়ায় তা খেলে পেট গরম হয়। আর ডাব নারকেল বিশ হাত উঁচুতে রোদ পাচ্চে, তার কিনা শৈত্য গুণ। কামার বেটা সারাদিন আগুন-তাতে হাপর টানছে, তার কিনা সর্দি, কেবল ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ছে। আর ডুবুরি জলের ভেতর ডুব গালছে, সে কিনা মিছরির সরবৎ খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে। আর দেখ বিপত্তে মধুসূদন, যাঁর স্মরণ করলে সকল বিপদ ঘুচে যায়, সেই তিনি দাসের মতো যে পাণ্ডবদের সঙ্গে ফিরছেন, তাদেরই কি না যত বিপদ। তা রাম, যতই বল না কেন, ভগবানের ইতি করা যায় না, আর তাঁর লীলাও বুঝা যায় না।" [৯৮]

ঠাকুরকে কি করে ধরা যায়? কি করে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়? যাঁকে চোখে কখনও দেখিনি—কি করে তাঁকে ভালবাসা যায়?—এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে। গোপীরা প্রেমের রজ্জু দিয়ে তাদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণকে বেঁধেছিল। ভাগবতে আছে—অপরাজিত ভগবান ভক্তদের ভালবাসার বন্ধনে পরাজিত হন, স্বাধীন হয়েও অধীন হন;

৯৬ তদেব, পৃঃ ৯/২৫০-৫২
৯৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১৩২
৯৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৭১-৭২

কারণ তিনি অতি করুণ ও ভক্তবৎসল। নিষ্কাম ভক্তেরা ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করলে, ভগবানও ঋণ পরিশোধের জন্য নিজেকে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। (৬/১৬/৩৪) শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন ঃ "ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।" [৯৯]

অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তির দ্বারা ভগবানকে ধরা যাবে না। চাই প্রেম-ভক্তি-নিরভিমানতা-শরণাগতি। দেহ-মন-প্রাণ ভগবানে নিবেদন করে, তাঁর নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া-লীলার চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা সম্বন্ধ পাতাতে হবে। যারা এভাবে ভগবানের সঙ্গে সদা যুক্ত, কৃষ্ণ বলেছেন, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে।"—আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দেই, যাতে তারা অনায়াসে আমাকে লাভ করতে পারে।

কথামৃতকার শ্রীম ঠাকুরের সঙ্গে এমন অটুট সম্বন্ধ পেতেছিলেন যে তাঁর বুদ্ধি চিরদিনের জন্য রামকৃষ্ণময় হয়ে গিছল। শ্রীমর আত্মকথা ঃ আমি আগে মনে করতাম, বুঝি উনি (ঠাকুর) আমাদের আপনার লোক। ও মা, ভেবে যত দেখি ততই অনন্ত, অনন্ত দেখতে পাই।

যখন মিশতেন আমাদের সঙ্গে, তখন একেবারে সত্যি সত্যি আমাদের একজন, যেমন পিতা বা মাতা। আবার এর পরই কোথায় গেল ঐ সম্বন্ধ! যেন অনন্ত সাগর হয়ে গেলেন, অপার অসীম! জ্ঞান-আনন্দ-শান্তি-প্রেমসাগর!

ভাগবতে আছে, চন্দ্রের কিরণ জলে পড়েছে। মাছগুলো মনে করে এটা আমাদেরই একজন। মাছ যত কাছে যায় প্রতিবিম্ব ভেঙ্গে যায়। জল জল দেখে। জলে তো চাঁদ নেই। চাঁদ অনন্ত আকাশে। তেমনি ছিলেন ঠাকুর।

কেউ মনে করত গুরু, কেউ পিতা, কেউ মাতা। তাদের ঐ ভাব। এরই ফাঁকে ফাঁকে ঐ অসীম অনন্ত রূপ ধারণ করতেন।

যারা তাঁর এই অনন্ত ভাবটি ধরতে পারে তারা শরণাগত হয়ে পড়ে থাকে। দুঃখকষ্ট যতই হোক, তেমন বিচলিত হয় না।[১০০]

প্রেমিকের স্বভাবই হচ্ছে প্রেমাস্পদকে চেনা, জানা, মিলিত হওয়া। এই মিলনের মধ্যে আনন্দ। অজানিত, অপরিচিত ব্যক্তিকে কেউ ভালবাসতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সকলের প্রেমাস্পদ। আমরা যত বেশি তাঁকে জানতে ও ভালবাসতে চেষ্টা করব, আমরা তত তাঁর নিকটবর্তী হব। একথা রূঢ় সত্য যে আমরা সামান্য জীব হয়ে সেই অনন্তরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে জানতে পারব না। তবে আমাদের চেষ্টা যদি সরল, অকপট ও আন্তরিক হয়, তিনি কৃপা করে তাঁর স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। নান্যঃ পন্থাঃ—আর কোন পথ নেই।

৯৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/৫৭

১০০ শ্রীম-দর্শন, ১১/১৬২

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ

বাসনার ইতিকথা

এই সুন্দর জীবজগৎ বাসনা থেকেই সৃষ্টি। বাসনা আছে বলেই জগৎ চলছে। আবার বাসনার বিলয়ে জগতের প্রলয়। ধন্য এই মায়াবিনী বাসনা! সৃষ্টির প্রথম ক্ষণে স্রষ্টা ঈশ্বরের মনে বাসনা জাগল, তিনি বহু হবেন ("বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি...।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।৩) তারপর তিনি এই লোকসমূহ ও লোকপাল সৃষ্টি করলেন ("স ইমাঁল্লোকানসৃজত।... স লোকপালান্ নু সৃজা ইতি।" ঐতরেয় উপনিষদ্, ১।১।২-৩) সবকিছু সৃষ্টি করে তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন ("তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৬) এইভাবে ঈশ্বরের সৃজনেচ্ছা প্রতি জীবে প্রবেশ করল এবং বাসনার দ্বারা জীব বদ্ধ হলো। বন্ধনে দুঃখ আর মুক্তিতে আনন্দ। নিত্যমুক্ত ঈশ্বর তাঁরই সৃষ্ট জীবের সঙ্গে মায়া-মুক্তির লুকোচুরি খেলা শুরু করলেন। এই ক্রীড়াভূমি হচ্ছে মায়া বা অজ্ঞান। ঈশ্বর রইলেন মায়াধীশ এবং জীব হলো মায়াধীন। জীব যখন অজ্ঞান কাটিয়ে ঈশ্বরকে দেখে তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়।

বেদান্ত-মতে অবিদ্যা-কাম-কর্মের চক্র অনবরত ঘুরছে। অবিদ্যা ছাড়া বাসনা জাগে না, আর বাসনা না থাকলে কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে (৯১।২৯) বশিষ্ঠ বাসনার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন ঃ "পূর্বাপর বিচার পরিত্যাগপূর্বক (আমি আমার—এইপ্রকার) দৃঢ় সংস্কারের সঙ্গে যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয়, তাকেই বাসনা বলে।" ফলাফলের বিচারের সুযোগ না দিয়ে যে-সংস্কার হঠাৎ মনে জেগে জীবকে বিবিধ কর্মে প্রেরণা দেয়—তা-ই বাসনা। শাস্ত্রে বাসনাকে মাদকদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নেশামত্ত মানুষের যেমন বিচারশক্তি বিলুপ্ত হয়, তেমনি মানুষ বাসনার দ্বারা উপস্থাপিত জগৎরূপ সকল বস্তুই ভ্রান্তভাবে দেখে থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ঃ "জীব কামময়। তিনি যেরূপ কামনাবান হন, সেরূপ কৃতসঙ্কল্প হন; যেরূপ কৃতসঙ্কল্প হন সেরূপ কর্ম করেন; যেরূপ কর্ম করেন সেরূপ ফল পান।" (৪।৪।৫)

যোগবাশিষ্ঠ-মতে বাসনা দুই প্রকার—শুদ্ধা ও মলিনা। মলিনা বাসনার দ্বারা পুনর্জন্মলাভ হয়, আর শুদ্ধা বাসনার দ্বারা পুনর্জন্মনাশ বা মুক্তি হয়। মলিনা বাসনা আবার তিনপ্রকার—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা। লোকবাসনা বা নামযশের ইচ্ছা। সকল লোকে যাতে আমার স্তুতি করে, আমি সর্বদা সেরূপ আচরণ করব—এরূপ প্রবল ইচ্ছার নাম লোকবাসনা। শাস্ত্রবাসনা তিন প্রকার—পাঠব্যসন (পাঠাসক্তি), শাস্ত্রব্যসন

(বিবিধ বিদ্যাশক্তি) ও অনুষ্ঠানব্যসন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পাঠাসক্তির ওপর একটি সুন্দর গল্প আছে। ঋষি ভরদ্বাজ তিন আয়ুষ্কাল ধরে কেবল ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন। অবশেষে তিনি জীর্ণকায় ও বৃদ্ধ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন একদিন ইন্দ্র এসে বললেন ঃ "ভরদ্বাজ, তোমাকে চতুর্থ আয়ুষ্কাল দিলে তুমি কি করবে?" তিনি বললেন ঃ "আমি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করব অর্থাৎ পড়াশুনায় মত্ত থাকব।" ইন্দ্র তাঁকে তিনটি পর্বত-সদৃশ অপঠিত গ্রন্থরাশি দেখালেন এবং তা থেকে এক-এক মুষ্টি নিয়ে ভরদ্বাজকে দিয়ে বললেন ঃ "ভরদ্বাজ, এর সকলগুলিকেই বেদ বলে জেনো।" ইন্দ্র তাঁকে পাঠের অসারতা দেখিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। শাস্ত্রব্যসনও নিষ্ফল। কথিত আছে, দুর্বাসা বহুবিধ শাস্ত্রপুস্তকের বোঝা নিয়ে মহাদেবকে নমস্কার করতে এসেছিলেন। সেই সভায় নারদ তাঁকে ভারবাহী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা সব গ্রন্থ লবণসমুদ্রে ফেলে দেন। তখন মহাদেব তাঁকে আত্মবিদ্যায় নিয়োজিত করলেন। অনুষ্ঠানব্যসন বা বৈদিক যাগযজ্ঞ ও বিভিন্ন স্মার্তকর্মের বাসনা পুনর্জন্মের কারণ বলে মলিন।

বিষয় বাসনাকে মানস বাসনার (লোক, শাস্ত্র, দেহ-বাসনা) দ্বারা রোধ কর। তারপর মানস বাসনাকে অমল বাসনার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা-ভাবনা) দ্বারা পরিবর্তিত কর। বিষয় বাসনা যেমন লৌহশৃঙ্খল, তেমনি শুদ্ধা, বাসনা স্বর্ণশৃঙ্খল। উভয় শৃঙ্খলই সমভাবে মানুষকে বাঁধে। পরে চিৎ বাসনার দ্বারা অমল বাসনাকে অপসারিত কর এবং পরিশেষে চিদ্বাসনা ত্যাগ করে চিন্মাত্রে সমাহিত হও। শাস্ত্র বলেন—এভাবে বাসনাক্ষয় হেতু মনোনাশ এবং মনোনাশের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। "অকামো বিষ্ণুকামো বা"—অর্থাৎ ঈশ্বর-কামনা কামনার মধ্যে নয়, কারণ তা বন্ধনের পরিবর্তে মুক্তি এনে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে উপকার হয়। মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।"[১]

বাসনার ইতি নেই। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে জগতের সব বাসনা বা এষণাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—পুত্রৈষণা বা সন্তানকামনা, বিত্তৈষণা বা অর্থসম্পত্তি-কামনা এবং লোকৈষণা বা নামযশের কামনা। এই এষণাত্রয়-ত্যাগেই মুক্তি।

বাসনা সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রকাশ পায় প্রবল বেগে। মানুষকে হিমসিম খাইয়ে দেয়। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। কিন্তু তার এই জীবত্ব বা হীন অবস্থার কারণ এই বাসনা। যেখানে বাসনা সেখানেই অপূর্ণতা। যার বাসনা বলবতী সেই দরিদ্র। ("কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণ।"—মণিরত্নমালা ৫) মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক বাসনা ত্যাগ করে মুক্ত হন। "বাসনা পুষ্যতি বপুঃ"—বাসনা শরীরকে ধরে থাকে। বাসনা না থাকলে শরীরটা পাকা ফলের মতো মাটিতে পড়ে যেত। জীবন্মুক্ত পুরুষ বা অবতারকল্প পুরুষেরা লোককল্যাণ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৮৩৪

কামনা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষহীন কামনার দ্বারা শরীরটাকে ধরে রাখেন জগতের মঙ্গলের জন্য। এদের কামনা বা ইচ্ছা পোড়া দড়ির মতো বন্ধনে অক্ষম।

।। শ্রীরামকৃষ্ণের নানা সাধ ।।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানাবিধ সাধ, ইচ্ছা, শখ ছিল। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর কামনা, বাসনা, স্পৃহা, প্রত্যাশা ছিল না। বাসনা জাগে সংস্কারযুক্ত জীবের। অবতার সংস্কারমুক্ত। অবতারের মনের স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বে। জগৎকল্যাণের জন্য অবতারপুরুষেরা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছা যোগ করে লীলাখেলা করেন। 'সাধ' মানে খেয়ালী ইচ্ছা অর্থাৎ পেলে ভাল, আর না পেলেও কিছু যায় আসে না। 'বাসনা' মানে বাস্তব ইচ্ছা অর্থাৎ ঐ অভীষ্ট বস্তু আমার চাই-ই চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানা সাধ তাঁর আত্মকথায় প্রকাশ পেয়েছে ঃ

"ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম।

"বড়বাজারের রঙকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হলো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,—তারপর অসুখ।

"ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হলো। তা বেশিক্ষণ রাখবার জো নাই—গোট পরে ভিতর দিয়ে সিড়সিড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগল—সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনা? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হলো। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

"ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। (সকলের হাস্য)

"শম্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল! সে-গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হলো।...

"একবার মনে উঠল যে, খুব ভাল জরির সাজ পরব, আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হলো। গুড়গুড়ি নানারকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উঁচু থেকে নিচু থেকে। তখন বললাম—মন, এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম, পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম আর তার উপর থুথু করতে লাগলাম, বললাম—এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়! সেই যে সব ফেলে দিলুম, আর মনে ওঠে নাই।..."[২]

"পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম—মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক করে তারপর ফেলে দিলুম।... আমার

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৫৫-৬৫৬

কামারবাড়ির ডাল খেতে ইচ্ছা ছিল—ছেলেবেলা থেকে। কামাররা বলত—বামুনরা কি রাঁধতে জানে? তাই খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ।"[৩]

ভক্ত-ভক্তি কামনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর নিয়েই ছিলেন। ঈশ্বরদর্শন করেও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। তাঁর আত্মকথা ঃ "সমুদ্রের তীরে যে-ব্যক্তি সর্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখনো কখনো বাসনার উদয় হয়, রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানা রূপে দেখিব।"[৪]

সাধারণ মানুষ আত্মীয়স্বজন, পুত্র-পরিবার, অর্থসম্পত্তি প্রভৃতি নিয়ে দিন কাটায় — বদ্ধজীবের মতো কামনা-বাসনার জালে জড়িয়ে থাকে। মোহের দরুন তাদের হুঁশ থাকে না যে, তারা মায়ার বন্ধনে ক্রীতদাসের মতো বাঁধা। সকলকেই কোন না কোন ভাবে দিন কাটাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটত ঈশ্বর, ভক্তি, ভক্ত নিয়ে। তিনি বলতেন ঃ "তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। আমার ঈশ্বর বৈ কিছু ভাল লাগে না।"[৫] সাধারণ মানুষ বিষয় সম্ভোগ করে ক্ষণিক আনন্দ পায়, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানকে নিয়ে দিব্যানন্দে কাটাতেন। "জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।"[৬] দৈহিক যন্ত্রণা তাঁর মনকে ভগবান থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

দক্ষিণেশ্বরে কৃষ্ণমন্দিরের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের এক অনুভূতি হয় —যার দ্বারা তিনি জানতে পারেন, 'ভক্ত-ভাগবত-ভগবান এক'। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভক্তের রাজা হব!' "[৭] মা তাঁর এই বাসনা পূরণ করেছিলেন। নরলীলায় অবতার ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকেন। ঠাকুর ভক্ত খুঁজে বেড়াতেন ঃ "আমি সঙ্গী খুঁজছি —আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়! একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি-মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভূতটা যেই দেখে কেউ শনি-মঙ্গলবারে ঐরকম করে মরছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হলো। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে-লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে।"[৮]

ভগবান ভক্তের জন্যই দেহধারণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ভক্তেরাও আসে। ঠাকুর বলতেন ঃ 'ঈশ্বর পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে।" ভক্তেরা না থাকলে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কে জানতে পারত? ভক্তেরা যেমন ঈশ্বরকে খোঁজে, ঈশ্বরও তেমনি ভক্তদের খোঁজেন। ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন ঃ "তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম!

৩ তদেব, পৃঃ ৮২১, ৬৯৪
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮, সাধকভাব, পৃঃ ২৭২;
৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯১৫; ৬ তদেব, পৃঃ ৯৮২; ৭ তদেব, পৃঃ ১০০৬; ৮ তদেব, পৃঃ ৯৩৯

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হতো! লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে কাঁদতে পারতুম না; কোনরকমে সামলে-সুমলে থাকতুম! আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল —তোরা এখনো এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির ওপরে ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম! মনে হতো পাগল হয়ে যাব! তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম বলে, তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বললে, 'ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হলো। ঐ থাকের (শ্রেণীর) লোকের কেউ আসতে আর বাকি রইল না।' মা দেখিয়ে বলে দিলে, 'এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ'।"[৯]

বিষয়ীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ জ্বালা করত। ঈশ্বরীয় কথা বলবার জন্য তিনি সঙ্গী খুঁজে বেড়াতেন। মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "মা! আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হলো।"[১০]

ঈশ্বর-ভক্তদের দেখবার বাসনা শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ তীব্র ছিল যে, তিনি লোক-লৌকিকতা, আমন্ত্রণাদির ধার ধারতেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নাম করেন শুনে ঠাকুর চললেন মথুরকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মোৎসবে আমন্ত্রণ করেন এবং শেষে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন, কারণ ঠাকুর ব্রাহ্মদের মতো পোশাকে সজ্জিত হতে রাজি ছিলেন না। তারপর বাগবাজারের দীনু মুখুজ্যেকে দেখতে যান্ মথুরের সঙ্গে। তাঁর আত্মকথা ঃ "বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল, 'ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না।' মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বললে, 'বাবা! তোমার কথা আর শুনব না।' আমি হাসতে লাগলুম।"[১১]

কোথায়, কখন, কিভাবে যে ঠাকুরের মনে বাসনা বা সাধ জাগত তা ভক্তেরা বুঝতে পারত না। তিনিও ঐসব না লুকিয়ে শিশুর মতো বলে ফেলতেন ঃ "মনে চারিটি সাধ উঠেছে। বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখব। আর আট আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান করবে, তাই দেখব আর প্রণাম করব।"[১২] ঠাকুরের এসব অদ্ভুত সাধের ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কত ভাল ভাল জিনিস থাকতে তাঁর তুচ্ছ বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খেতে ইচ্ছা হলো! মনে হয়, ছোটবেলায় নিজের গর্ভধারিণী মার হাতে ঐ ঝোল খেয়েছিলেন, তাই সেই সংস্কার মনে উঠেছে। কেন শিবনাথকে দেখতে চান? —সে-প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন ঃ "যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের

৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ১৩৫৮, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ২০৮-২০৯; ১০ কথামৃত, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫
১১ কথামৃত, পৃঃ ২৩৬; ১২ ঐ, পৃঃ ৬৯১

শক্তি আছে।"

ক ামৃতের বর্ণনায় (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) রয়েছে, ঠাকুর ঐ চারিটি বাসনার কথা বলে সমাধিমগ্ন হলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি থেকে নেমে বলছেন ঃ "সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! বলব? না, আজ কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী! সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে থাক। ভাল নয় —অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নিচে থাকব। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে (ব্রহ্ম) গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না! ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি।"[১৩] এ থেকে ঐ তুচ্ছ বেগুন দিয়ে মাছের ঝোলের রহস্য বোঝা গেল। ঐ তুচ্ছ বস্তু বা শিবনাথ অবতারের মনকে লোকশিক্ষার জন্য ধরে রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার হয়ে দেখালেন, কিভাবে সাধুদের সেবা করতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীম বলেন ঃ "ঠাকুরের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। দক্ষিণেশ্বরে আছেন, অনেক সাধু আসা-যাওয়া করেন। তোতাপুরী আসার পূর্বে। তাঁরই মুখে শোনা কথা। পঞ্চবটীতে তখন একটি সাধু থাকতেন —গোপালের সেবা করেন। ঠাকুর তাঁর কাছে যেতেন, তাঁর উপদেশ শুনতেন। আর সেবা করতেন —এই জলটল তুলে দিতেন। তিনদিন সেবা করেই আর যান না। সাধু বললেন, 'কেয়া, তুম্ আতা নেহি কেঁউ?' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'এই যে এসেছিলাম তিনদিনের জন্য; তিনদিন তো হয়ে গেছে। আর কেন করব?' 'তিনদিন' মানে গুরুসেবা তিনদিন করলেন। 'আর যাননি মানে'—ওরা বড় একঘেয়ে। যে-ভাবটি নিয়ে আছে সেটার বাইরে যাবে না। ওদের খণ্ড সাধনা —fragmentary worship। অখণ্ড সাধন নেই তাঁদের। তারই জন্য ঠাকুর তিনদিন মাত্র গিছলেন।"[১৪]

অদ্ভুত ঠাকুরের সব অদ্ভুত বাসনার কথা যখন পড়ি, তখন সত্যই মনে হয় তিনি বাসনাকে নিয়ে খেলতেন; আমাদের মতো বাসনার দাস ছিলেন না। আমরা বাসনা-ব্যাধিতে ভুগে মরি। এ ব্যাধির লক্ষণ লোভ, ভয়, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, চঞ্চলতা, অশান্তি।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন। ভক্তদের 'যোগক্ষেম' ঈশ্বর বহন করেন। ঈশ্বরপ্রেমিকদের সাহায্য করবার বাসনা ঠাকুরের মনে কিভাবে উদয় হয়েছিল তা তিনি নিজে বলেন ঃ

"একসময়ে এমনটা মনে হলো যে, সকল রকমের সাধকদের যা কিছু জিনিস সাধনার জন্য দরকার, সেসব তাদের যোগাব! তারা এই সব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঈশ্বরসাধনা করবে, তাই দেখব আর আনন্দ করব। মথুরকে বললুম। সে বললে, 'তার আর কি বাবা, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি; তোমার যাকে যা ইচ্ছা হবে দিও।' ঠাকুরবাড়ির ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি যার যেমন ইচ্ছা তাবে সেইরকম সিধা দেবার বন্দোবস্ত তো ছিলই —তার ওপর মথুর সাধুদের দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, মায় তারা যেসব নেশা ভাঙ করে —সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদের জন্য 'কারণ' প্রভৃতি সকল

১৩ কথামৃত, পৃঃ ৬৯১-৯২ ১৪ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৩য় ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ১৭৬

জিনিস দিবার বন্দোবস্ত করে দিলে। তখন তান্ত্রিক সব ঢের আসত ও শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান করত। আমি আবার তাদের সাধনার দরকার বলে আদা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে, মুড়ি কড়াইভাজা আনিয়ে সব যোগাড় করে দিতুম; আর তারা সব ঐ নিয়ে পূজা করছে, জগদম্বাকে ডাকছে, দেখতুম। আমাকে তারা আবার অনেক সময় চক্রে নিয়ে বসত, অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাত; 'কারণ' গ্রহণ করতে অনুরোধ করত। কিন্তু যখন বুঝত যে, ওসব গ্রহণ করতে পারি না, নাম করলেই নেশা হয়ে যায়, তখন আর অনুরোধ করত না। তাদের সঙ্গে বসলে 'কারণ' গ্রহণ করতে হয় বলে 'কারণ' নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম বা বড় জোর আঙুলে করে মুখে ছিটে দিতুম আর তাদের পাত্রে সব ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখলুম, তাদের ভিতর কেউ কেউ উহা গ্রহণ করেই ঈশ্বরচিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকে। অনেকে আবার কিন্তু দেখলুম লোভে পড়ে খায়, আর জগদম্বাকে ডাকা দূরে থাক বেশি খেয়ে শেষটা মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐরকম বেশি ঢলাঢলি করাতে শেষটা ওসব (কারণাদি) দেওয়া বন্ধ করে দিলুম।''[১৫]

ঘর ও সাধনস্থল সাজাবার বাসনা

মানব-মনে পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-ভজনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সুউচ্চ কারুকার্যমণ্ডিত কালী মন্দির-সন্নিহিত বিষ্ণুমন্দির ও নাটমন্দির, সুবিস্তৃত উঠান, সারিবদ্ধ শিবমন্দির ও চকমিলানো বাসস্থান, মনোহর পুষ্পকানন, নিস্তব্ধ গভীর অরণ্য ও পঞ্চবটী, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা কলকলনাদিনী গঙ্গা, পাখির কাকলি ও নহবতের রাগরাগিণী প্রভৃতি মিলে একটি রহস্যময় সাধনালোক সৃষ্টি করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সদা দিব্যভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকলেও নিজের ঘরখানিকে খুব সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। সকালে গোলাপ-মা বা অন্য কোন ভক্ত তাঁর ঘরখানি ঝাড়পোঁছ করে দিতেন। দুখানি তক্তপোশ এবং সম্ভবত একটা টুল ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র তাঁর ঘরে ছিল না। ভক্তেরা মেঝেতে শতরঞ্চিতে বা মাদুরে বসতেন। তাঁর বালিশ-বিছানা পরিষ্কার থাকত। ঠাকুর প্রতিটি জিনিস তার জায়গায় রাখতেন এবং ভক্তদেরও তাই করতে বলতেন। নিজের ঘরেই মেঝেতে কাঠের পিঁড়িতে বসে খেতেন। সন্ধ্যায় মন্দিরের পরিচারিকা এসে তাঁর ঘরে ধূপধুনা দিয়ে তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিত।

নিজের ঘরখানিকে তিনি দেবদেবীর ছবি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি—কালী, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য-সঙ্কীর্তন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি, বাগ্দেবী সরস্বতীর ছবি, ডুবন্ত পিটারকে যীশু হাত ধরে তুলছেন ইত্যাদি ছবি। ঠাকুরের ছবি সংগ্রহের সাধ ছিল।

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ৬৯-৭০

রামলালদাদা বলেন ঃ "ঠাকুর একদিন সিঁথির বেণীমাধবকে বলেছিলেন, 'আমায় কিছু ভাল ছবি এনে দিতে পার?' তা বেণীমাধব আমায় বলেছিলেন, 'আমি ছবি দেব তুমি এনে দিও।' আমি পাঁচটি ছবি আনি—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গৌরাঙ্গের, জগন্নাথের ও কমলেকামিনী।"[১৬] কেউ এলে ঠাকুর তাঁর ঘরের ছবি দেখাতেন। একদিন অশ্বিনী দত্তকে বললেন ঃ "বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়?" অশ্বিনীবাবুর মুখে 'হ্যাঁ' শুনে ঠাকুর বললেন ঃ "সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও।"[১৭]

সাধুসন্ন্যাসীর ছবি ঘরে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। ৯ মার্চ ১৮৮৪ ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "আমার ইচ্ছা যে, দুখানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি—যোগী ধুনি জ্বেলে বসে আছে, আর একটি ছবি—যোগী গাঁজার কলকে মুখ দিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে জ্বলে উঠছে। এসব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন সোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।"[১৮]

২৪ আগস্ট ১৮৮২ ঠাকুর শ্রীমকে বলেন ঃ "যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমাকে সেই ছবি দেখাতে পার?" শ্রীম ঠাকুরকে ঐ ছবি দেখাতে না পারলেও পরে তা কোন শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কাজ পান মায়ের বেশকাররূপে। শ্রীম কথামৃতের প্রথম ভাগে মা ভবতারিণীর বিভিন্ন অলঙ্কারের বর্ণনা করেছেন। পশ্চিমের মেয়েদের পায়ে পাঁয়জোর দেখে ঠাকুরের মনে সাধ হলো মাকে ঐ অলঙ্কার পরাতে হবে। ঐ কথা মথুরবাবু শুনে অলঙ্কার তৈরি করে দিলেন এবং ঠাকুর মাকে পরিয়ে বাসনা পূরণ করেন। প্রেমিক প্রেমাস্পদকে সাজাতে ভালবাসে—ও প্রকৃতির নিয়ম। পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকেও গহনা গড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "ও সারদা—সরস্বতী—সাজতে ভালবাসে।"

নিজের সাধনস্থানটিকে ফিটফাট রাখবার জন্য ঠাকুর মনোযোগ দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে তপস্যার প্রারম্ভে ঠাকুর পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পঞ্চবটী স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। পূর্বে তিনি হাঁসপুকুরের পাশে একটা আমলকী গাছের নিচে ধ্যান করতেন। ঐ গাছটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন সাধনকুটিরের পশ্চিম পাশে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করেন এবং হৃদয়কে দিয়ে বট, অশোক, বেল ও আমলকীর চারা লাগালেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার কতকগুলি চাবা দিয়ে স্থানটিকে ঘিরে দিলেন। তাঁর আত্মকথা ঃ "পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম জপধ্যান করব বলে। ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হলো। তারপরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি,

---

১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমলকৃষ্ণ মিত্র, পৃঃ ১০ ১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১২৫৯
১৮ তদেব, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭

খানিকটা দড়ি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুরবাড়ির একজন ভারী ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।"[১৯]

"তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি"—তীর্থযাত্রীরাই তীর্থকে জাগিয়ে তোলেন। দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার দ্বারা ও বিভিন্ন সাধু সমাগমের মাধ্যমে। ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ১৮৬৮ সালে। সেখান থেকে বৃন্দাবনের রজঃ এনে পঞ্চবটীর চারিদিকে ছড়িয়ে দেন এবং সেখান থেকে মাধবীলতা এনে রোপণ করেন। "আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন, 'বাঁদুরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে না।' "[২০]

"মনটাকে তোদের জন্য নিচে নামাই"

মানব-মন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাসনার নানা স্তর। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম প্রভৃতি সোপান অতিক্রম করে মানুষ যখন বাসনাহীন হয় তখন ঈশ্বরদর্শন করে। বাসনাসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে—যেমন কামপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে কাঞ্চন-কামনা জাগল, আবার কাম-কাঞ্চনকে ছাড়িয়ে নামযশের ইচ্ছা দৃঢ় হয়ে উঠল। এ বাসনাজালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুবই কঠিন। ঠাকুর বলতেন ঃ "বাসনার লেশ থাকিতে ঈশ্বরদর্শন হয় না। অতএব ছোট ছোট বাসনাগুলি পূরণ করিয়া লইবে এবং বড় বড় বাসনাগুলি বিচার করিয়া ত্যাগ করিবে।"[২১]

মনটা বড় পাজি। কিছুতেই বশে থাকতে চায় না। অথচ মানুষের সুখশান্তি নির্ভর করছে এই মনের শান্ত অবস্থার ওপর। আমরা বাসনার বেড়া কেটে জোর করে মনটাকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করছি। আর ঠাকুর জোর করে ছোট ছোট এক-আধটা বাসনা ধরে মনটাকে নিচে নামিয়ে রাখতেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি ছিল নির্বিকল্পের দিকে, যেখান থেকে মন নিচে আসতে চায় না।

বাসনা লীলাময়ী, রহস্যময়ী। ঠাকুর তাঁর অনুভূতির দ্বারা ঐ দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন ঃ "সাধারণ মানবের মন গুহ্য, লিঙ্গ এবং নাভি-সমাশ্রিত সূক্ষ্ম স্নায়ুচক্রেই বিচরণ করে। কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে ঐ মন কখনও কখনও হৃদয়সমাশ্রিত চক্রে উঠিয়া জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ময় রূপাদির দর্শনে অল্প আনন্দানুভব করে। নিষ্ঠার একতানতায় বিশেষ অভ্যস্ত হইলে কণ্ঠসমাশ্রিত চক্রে উহা উঠিয়া থাকে এবং তখন যে-বস্তুতে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার কথা ছাড়া অপর কোন বিষয়ের আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়। এখানে উঠিলেও সে-মন নিম্নাবস্থিত চক্রসমূহে পুনর্গমন করিয়া ঐ নিষ্ঠা এককালে ভুলিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি কখনও কোনপ্রকারে প্রবল একনিষ্ঠা সহায়ে কণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশস্থ ভ্রূমধ্যাবস্থিত চক্রে তাহার গমন হয়, তখন সে সমাধিস্থ হইয়া যে-আনন্দ

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩৭৪
২০ তদেব, পৃঃ ৫২৭
২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশচন্দ্র দত্ত, ১২শ সং, পৃঃ ১৪৭

অনুভব করে, তাহার নিকট নিম্ন চক্রাদির বিষয়ানন্দ-উপভোগ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়; এখান হইতে আর তাহার পতনাশঙ্কা থাকে না। এখান হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র আবরণে আবৃত পরমাত্মার জ্যোতিঃ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা হইতে ঈষন্মাত্র ভেদ রক্ষিত হইলেও এখানে উঠিলেই অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ আভাসপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই চক্র ভেদ করিতে পারিলেই ভেদাভেদজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান হয়। আমার মন তোদের শিক্ষার জন্য কণ্ঠাশ্রিত চক্র পর্যন্ত নামিয়া থাকে, এখানেও ইহাকে কোনরূপে জোর করিয়া রাখিতে হয়। ছয় মাস কাল ধরিয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করাতে ইহার গতি স্বভাবতই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে। এটা করিব, ওটা খাইব, একে দেখিব, ওখানে যাইব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাতে নিবদ্ধ না রাখিলে উহাকে নামানো বড় কঠিন হইয়া পড়ে এবং না নামিলে কথাবার্তা, চলাফেরা, খাওয়া ও শরীররক্ষা ইত্যাদি সকলই অসম্ভব। সেইজন্যই সমাধিতে উঠিবার সময়ই আমি কোন না কোন একটা ক্ষুদ্র বাসনা, যথা—তামাক খাব বা ওখানে যাব ইত্যাদি করিয়া রাখি, তথাপি অনেক সময়ে ঐ বাসনা বারবার উল্লেখ করায় তবে মন এইটুকু নামিয়া আইসে।"[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণের খাওয়ার বাসনা

ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে খেতে বসেছেন। তাঁর সামনে ভাতের থালা এবং তার চারিদিকে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি ছোট ছোট বাটিতে পরিবেশিত। ঠাকুর আজন্ম অল্পাহারী। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নানাবিধ ভোজনসামগ্রী দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, ঠাকুর রাজসিক আহার করেন। তাঁর ঐ মনোভাব বুঝতে পেরে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "মনটা সদাই অখণ্ডের দিকে ছুটে। তোদের সঙ্গে কথা কইব বলে মনটাকে নিচে নামিয়ে রাখবার জন্য এটা খাই, ওটা খাই, ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দি।"[২৩]

সাধনকালে ঠাকুরের শরীরে গাত্রদাহ, নিদ্রাহীনতা, দারুণ ক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তিনি নিজ মুখে বলেছেন ঃ "এসময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনি যেন কিছু খাই খাই--সমান খাবার ইচ্ছা! দিন-রাত্তির কেবলই 'খাই-খাই' ইচ্ছা—তার আর বিরাম নেই! ভাবলুম, এ আবার কি ব্যারাম হলো? বামনীকে বললুম, সে বললে—'বাবা, ভয় নেই; ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখনো কখনো হয়ে থাকে, শাস্ত্রে এ-কথা আছে; আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্চি।' এই বলে, মথুরকে বলে ঘরের

২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ৩৩১-৩২
২৩ স্বামী তুরীয়ানন্দ, ১৯৮৬, পৃঃ ২১

ভেতর চিঁড়ে-মুড়কি থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে আর বললে, 'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাক আর যখন যা ইচ্ছে হবে তখনই তা খাও।' সেই ঘরে থাকি, বেড়াই, সেইসব খাবার দেখি, নাড়িচাড়ি; কখনো এটা থেকে কিছু খাই, কখনো ওটা থেকে কিছু খাই—এইরকমে তিনদিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল, তবে বাঁচি।''[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের পেটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না! খুব ভুগতেন। মা চন্দ্রমণি ঠাকুরকে বলতেন ঃ ''মা কালীর ভোগ খেয়োনি। (কারণ, সেটি খুব ঝালমশলাযুক্ত) যে-কদিন পেটটা খারাপ থাকে, বৌমাকে বলব এখন, মাছের ঝোল আর কাঠের জ্বালে চাট্টি চাট্টি ভাত রেঁধে দিবেক। তাই খেয়ো।'' রোগীর পথ্য খেতে খেতে ঠাকুরের অরুচি ধরে গেলে তিনি তাঁর মাকে বলতেন ঃ ''তুমি মা, সেই দেশের মতন করে বেশ ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি করো না। খেতে বড় মন যায়। আর এদের তরকারি রুচেনি।'' মা চন্দ্রমণি সেইমত রেঁধে পুত্রকে খাওয়াতেন।[২৪]

ফোড়নের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বালকসুলভ প্রীতি ছিল। একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীকে বললেন ঃ ''লক্ষ্মী, চার পয়সার পাঁচফোড়ন কিনে নিয়ে আয় তো।'' তারপর শ্রীমাকে বললেন ঃ ''পাঁচমিশুলি ডাল করো, এমন সম্বরা দেবে যেন শুয়োর গোঁঙায়।'' একদিন তিনি শুনলেন ভ্রাতৃজায়া রামলালেব মা শ্রীমাকে বলছেন ঃ ''ঘরে পাঁচফোড়ন নেই, সুতরাং ফোড়ন ছাড়াই রাঁধতে হবে।'' শুনেই তিনি বললেন ঃ ''সেকি গো! পাঁচফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে, তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়সের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?'' রামলাল-জননী লজ্জা পেয়ে তখনই ফোড়নের ব্যবস্থা করলেন।[২৫]

ঠাকুর নিজের সাধন ব্যাপারে বা খাওয়ার ব্যাপারে একঘেয়েমী পছন্দ করতেন না। তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ ''মা, আমায় রসে বশে রাখিস।'' তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ ''আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! (সকলের হাস্য) আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, অম্বলে মাছ, বাটি-চচ্চড়ি—এসব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি।''[২৬]

শরীর সারাতে সাধারণত বর্ষাকালে ঠাকুর কামারপুকুরে যেতেন। সকালে উঠেই শ্রীশ্রীমাকে বলতেন ঃ ''আজ এই শাক খাব, এইটি রেঁধ।''[২৭] বাড়ির মেয়েরা ঐসব রান্না করে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। কয়েকদিন পরে ঠাকুর বললেন ঃ ''আঃ, আমার একি হলো?

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ১০-১১; ২৫ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত, পৃঃ ৯-১০
২৬ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩৭৫, পৃঃ ৪৯; ২৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৬৮৭

সকাল থেকে উঠেই কি খাব, কি খাব! রাম রাম!" তারপর শ্রীশ্রীমাকে বললেন ঃ "আর আমার কিছু খাবার সাধ নেই, তোমরা যা রাঁধ, যা দেবে, তাই খাব।"[২৮]

ভাবাবস্থায় ঠাকুর অসময়ে কখনো কখনো বেশি খেয়ে ফেলতেন, কিন্তু তাতে তাঁর শরীর খারাপ হতো না। একবার কামারপুকুরে রাতে খাওয়ার পর শুতে গিয়ে উঠে এসে বললেন ঃ "তোমরা সব শুলে যে, আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে শুলে যে?" রামলাল-দাদার মা বললেন ঃ "ওমা, সেকি গো? তুমি এই যে খেলে!" ঠাকুর বললেন ঃ "কৈ খাওয়ালে?" বাড়ির মেয়েরা বুঝল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ঘরে তখন কেবল মুড়ি ছিল। ঠাকুর শুধু মুড়ি খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর রামলাল-দাদা দোকানদারকে ঘুম থেকে তুলে মিষ্টান্ন কিনে এনে দিলেন। তারপর সেই মুড়ি ও মিষ্টান্ন খেয়ে ঠাকুর ঘুমোতে গেলেন।

জয়রামবাটীতেও একবার ঠাকুর অনুরূপভাবে অসময়ে খেতে চান। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে জানান যে, পান্তাভাত ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি তাই খেতে সম্মত হলেন। শেষে মা একটা মৌরলা মাছের কাই-সহ পান্তাভাত এনে দিলেন। দুপুর রাতে তাই খেয়ে ঠাকুর শান্ত হন।[২৯]

দক্ষিণেশ্বরেও মাঝে মাঝে ঠাকুরের সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা জাগত। এক রাত্রে তিনি রামলাল-দাদাকে বললেন ঃ "ওরে, ভারি ক্ষুধা পেয়েছে, কি হবে?" ঘরে সেদিন কোন ফল বা মিষ্টি ছিল না। অগত্যা রামলাল-দাদা নহবতে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সব বললেন। তিনি তখনি উনুন ধরিয়ে এক সের আন্দাজের হালুয়া তৈরি করে গোলাপ-মাকে দিয়ে ঠাকুরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। খেতে বসে ঠাকুর গোলাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বল দেখি, কে খাচ্চে? আমি খাচ্চি, না আর কেউ খাচ্চে?" গোলাপ-মা বললেন ঃ "আমার মনে হচ্চে আপনার ভিতরে যেন আর একজন কে রয়েছেন, তিনিই খাচ্চেন।" ঠাকুর হেসে বললেন ঃ "ঠিক বলেছ।" রামপ্রসাদের গানে আছে—"আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।" মা-কুণ্ডলিনী ঠাকুরের শরীরের ভিতরে বসে আহার করতেন।[৩০]

দেবতা ও সাধু দর্শন করতে গেলে খালি হাতে যেতে নেই। তা গোলাপের মা কামারহাটি থেকে দুই পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে যান। তাঁকে দেখামাত্র ঠাকুর বললেন ঃ "এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।" গোপালের মা লজ্জায় সেই সস্তার সন্দেশ ঠাকুরকে দেন। তিনি মহানন্দে তা খেয়ে বললেন ঃ "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে—লাউশাক চচ্চড়ি, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" গোপালের মা চচ্চড়ি রেঁধে তিন মাইল হেঁটে

২৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৩৮০, পৃঃ ৫৩

২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৫

৩০ তদেব, পৃঃ ১৭-১৯

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতেন। ঠাকুর তা খেয়ে "আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা!" বলে আনন্দ করতেন। আবার নতুন ফরমাশ দিয়ে ঠাকুর বলতেন ঃ "এবার সুষনি শাক চচ্চড়ি ; কলমি শাক চচ্চড়ি আনবে।"[৩১]

সাধনকালে ঠাকুরের যখন উন্মাদ অবস্থা, তখন তাঁর কোন জাতিবিচার ছিল না। যার-তার হাতে খেতেন। ইসলামধর্ম সাধনকালে ঠাকুর মুসলমানদের খাদ্য আহার করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বরে মুসলমান বাবুর্চির নির্দেশে হিন্দু ব্রাহ্মণ পাচকের মাধ্যমে রান্না করিয়ে ঠাকুরকে খাওয়ান।

ঠাকুর নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ "সেজোবাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম (মুসলমান) মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজোবাবু বললে, 'বাবা, ওখানে কি করছ?' আমি হেসে বললাম, 'মাঝিরা বেশ রাঁধছে।' সেজোবাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, 'বাবা সরে এস, সরে এস'!"[৩২]

বালকবৎ ঠাকুরের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর মজার বাসনার কথা বলে সকলকে হাসাতেন ঃ "কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি-ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বললুম—হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম, তার পরদিন আর কিছু খেতে পারলাম না।"[৩৩]

একদিন কলকাতা থেকে ফেরবার পথে বরানগরের চৌমাথায় এসে ঠাকুর রামলাল-দাদাকে বললেন ঃ "দেখ, পেটটা যেন খিদেয় জ্বালা করছে। কিছু কচুরী ফাগুর দোকান থেকে আন দিকিনি।" ফাগু ঠাকুরের জন্য যত্ন করে এক গ্লাস জল ও পানও দিত। রামলাল-দাদা কচুরী এনে দেখেন, ঠাকুর ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সোজা উত্তরমুখে হেঁটে চলেছেন। তিনি খাবার রেখে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে ভাবস্থ ঠাকুরকে ধরে নিয়ে এলেন।[৩৪]

ঠাকুর জিলিপি ও আইসক্রীম খুব পছন্দ করতেন। ব্রাহ্মপ্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ "দক্ষিণেশ্বর গেলে পরমহংস কোনদিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্যভবনে (কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটীরে) আসিয়া অনেক দিন লুচি-তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমনকি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'আমার গলা পর্যন্ত পূর্ণ, আর একটি

---

৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২৬৮-২৬৯ ৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৬৭৫-৭৬

৩৩ তদেব, পৃঃ ৪৯৩ ৩৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৩-১৪

সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।' কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে।' তিনি বলিলেন, 'যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ির অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ি আসে, অন্য অন্য গাড়ি সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্যদ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে'।"[৩৪ক]

প্রত্যক্ষদর্শী কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবী লিখেছেন ঃ "আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সঙ্কীর্তনের পর আমি বলিলাম, 'আপনি কিছু খান।' তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ি থেকে একখানি জিলিপি খেয়ে আসিস।' আমি একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাত করিয়া লইয়া খাইলেন। (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না) তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, 'দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন, কেশবের বাড়িতে যাইতেছ, একটি কুলপি বরফ খেয়ে এস।' তখন সেখানে কুলপিওয়ালা ছিল না, কেশব কুলপি কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুলপিওয়ালা আসিল; একটি কুলপি কেশব দিলেন। তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন।"[৩৫]

অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ 'একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি। (ঠাকুর) বললেন, 'সেই যে কাক (কর্ক) খুললে ফসফস করে উঠে, একটু টক, একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?' আমি বললাম, 'লেমনেড?' ঠাকুর বললেন, 'আন না?' মনে হয় একটা এনে দিলাম।... কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম—'আপনার কি জাতিভেদ আছে?' ঠাকুর—'কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি, তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা (মুসলমান খুব সম্ভব) বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হলো না, আবার একটু পরে একজন—তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল—ক্যাচর-ম্যাচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জান, জাতিভেদ আপনি খসে যায়।' "[৩৬]

ঠাকুর পান ও তামাক খেতেন। তাঁর ঘরে হুঁকো কলকে ও তামাকের সরঞ্জাম থাকত। রামলাল-দাদাকে প্রায়ই বলতেন ঃ "তামুক সাজনা রে, কৈ সাজলি না?" পরবর্তী কালে রামলাল-দাদা ঠাকুরের তামাক খাওয়ার রহস্য সম্বন্ধে বলেন ঃ "ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে বায়ুবৃদ্ধি হতো। আগরপাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ (বাঙাল) ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন। ঠাকুর কবিরাজকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁগা, তামুক খেলে কি হয়?' কবিরাজ বললেন, 'ওটাতে

৩৪ক আদি কথামৃত, পৃঃ ১০৫-৬

৩৫ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, ১৩৭৫, পৃঃ ৯৯-১০০

৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১২৫৬

বায়ু কম হয়। আপনি যখন তামাক খাবেন, তখন ছিলিমের ওপর কিছু ধনের চাল ও মৌরি দিয়ে খাবেন, তাতে উপকার পাবেন।' তা ঠাকুরকে দেখেছি তিনি ওরকম করে তামাক খেতেন।"[৩৭]

ঠাকুর আহারের পর পান খেতেন বা তাঁর বেটুয়া থেকে কিছু মুখশুদ্ধি মশলা খেতেন। ঐ মশলার মধ্যে থাকত সুপারি, যোয়ান, মৌরি, এলাচ, কাবাবচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি। তিনি নিজে খেতেন আবার শিষ্যদেরও খাওয়াতেন। নৈষ্ঠিক ব্রতধারী গঙ্গাধরকে (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ঠাকুর একদিন একটা পানের খিলি দিয়ে বললেন ঃ "খা, খাওয়ার পর দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়।"

ঠাকুর আগে খুব সুপারি খেতে ভালবাসতেন। তারপর কামারপুকুরের এক ওঝা ঠাকুরের ওপর ভূতাবেশ সরাবার জন্য চণ্ড নামাল। চণ্ড বলল ঃ "উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই।" পরে সে ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলল ঃ "গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারি খাও কেন? অধিক সুপারি খাইলে কামবৃদ্ধি হয়।" চণ্ডের কথাতে ঠাকুর ঐ সুপারি খাওয়া ত্যাগ করেন।[৩৮]

বৃহদারণ্যক উপনিষদের কহোল প্রশ্ন করলেন ঃ "স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ?" (৩।৫।১) অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ কিরকম আচারী হন? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন ঃ "যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব।" (ঐ) অর্থাৎ তিনি যেরকম আচারীই হোন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই বটে। যিনি নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে বিচরণ করেন তিনি সব বিধিনিষেধের পারে। ঠাকুরের এই উক্তিটি ঐ শাস্ত্র প্রমাণ করে—"আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, 'তুমি পান খাও কেন?' আমি বললাম, 'খুশি পান খাব—আরশিতে মুখ দেখব—হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব!' কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাঁকে বকতে লাগল, বললে, 'তুমি কারে কি বল?—রামকৃষ্ণকে কি বলছ?' "[৩৯]

ঠাকুর রাতে সাধারণত দু-একটি লুচি ও সুজির পায়েস খেতেন এবং সকালে প্রসাদী ফলমিষ্টি খেতেন। কলকাতার ভক্তেরা তাঁর জন্য নানা ফল—বেদানা, লেবু, মিষ্ট আম, জামরুল এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন—সর, দৈ, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, জিলিপি, ক্ষীর প্রভৃতি নিয়ে যেতেন। তিনি নিজে খেতেন এবং ভক্তদের খাওয়াতেন। মজা করে ঠাকুর বলতেন ঃ "মার নাম করি, তাই এসব ভাল ভাল জিনিস খেতে পাই।"

জীবনের শেষে যখন ঠাকুর ক্যান্সারে ভুগছেন, তখন শ্রীশ্রীমা সযত্নে পায়েস রান্না করে খাওয়াতেন। গলার ব্যথার জন্য তাও সবসময় খেতে পারতেন না। মুখের অরুচির জন্য অনেকসময় আমলকি চুষতেন। একদিন সেবকগণকে ঠাকুর বলেন ঃ "ভেতরে এত ক্ষিদে যে, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই। কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।"

৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৫

৩৮ দ্রঃ লীলাপ্রসঙ্গ ১ম ভাগ, সাধকভাব, পৃঃ ১৬৬

৩৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫৭৫

ঠাকুরের এই খিচুড়ি খাওয়ার রহস্য সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন : "আজীবন কার্যকলাপ যাঁর সবই নূতন, তাঁর খিচুড়ি খাইবার ইচ্ছাও এক নূতন ব্যাপার। অনুশীলনে দেখা যায়, অবতারপুরুষ মাত্রেরই এক-এক প্রকার ভোজ্য প্রিয় ছিল। অযোধ্যানাথের রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের ক্ষীরসর, অমিতাভের ফাণিত (একপ্রকার মিষ্টান্ন), শঙ্করের প্রিয় ভোজ্য কি জানা যায় না; তবে তাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভোজে পুরী-লাড্ডুর সমাদর হয়। নিমাইচাঁদের মালসা ভোগ (মৃৎপাত্র-পূরিত চিড়া মুড়কি দধি)। ভাবী কালে পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর, স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ এবং প্রভুর অন্যান্য অর্চনাস্থানকে দ্বিতীয় জগন্নাথক্ষেত্রে (যেথায় ভেদভাব ভুলিয়া সকল বর্ণই একসঙ্গে প্রসাদ পায়) পরিণত করিবেন ভাবিয়া দক্ষিণেশ্বরভূষণ প্রভু এক অভিনব সুখাদ্য খেচরান্ন ভোজনের ইচ্ছা করিলেন। তাই প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ প্রভুর জন্মোৎসবে তাঁহারই অভীপ্সিত খেচরান্ন দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপের এরূপ বিরাট ভোগের ব্যবস্থা করেন, যাহা ভারতের কেন, জগতের কোন প্রদেশেই দেখা যায় না।"[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাজার সখ

ঠাকুরের কোমরে কাপড় রাখাই কঠিন ছিল—তা আবার সাজগোজ! তিনি তাঁর আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক করে ফেলেছিলেন, তাই তাঁর দেহবুদ্ধি ছিল না বললেই চলে। অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখেছেন : "(ঠাকুরের) সমাধি ভঙ্গ হলো, পায়চারি করতে লাগলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের ওপরে তুলেছেন, এদিক দিয়ে খানিকটা মেঝে ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে, ওদিক দিয়ে খানিকটা অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপা-টেপি করছি আর চুপি চুপি বলছি, "ধুতিটা পরা হয়েছে ভাল!' একটু পরেই 'দূর শালার ধুতি' বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন।

"কিছুকাল পরে ঐভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—'ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছ?' আমি বললাম, 'না—আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' ঠাকুর—'আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোনরকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়।' "[৪১]

ঠাকুর 'শুকনো সাধু' ছিলেন না। একদিন তিনি ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে লালপেড়ে ধুতি পরে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। ঠাট্টা করে কেশবচন্দ্র বললেন : "আজ বড় যে রং, লালপেড়ের বাহার!" ঠাকুর হাসতে হাসতে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : "কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।"[৪২]

আরেকদিন (২ মার্চ ১৮৮৪) ঠাকুর ব্রাহ্মদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেন : "বাসনা না

৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, ১৩৪৩. পৃঃ ২২৮

৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১২৫৮

৪২ তদেব. পৃঃ ৮৫৪

থাকলে শরীরধারণ হয় না। আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম—মা, কামিনীকাঞ্চনত্যাগীর সঙ্গ দাও, আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করব, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!" ত্রৈলোক্য সহাস্যে—"সাধ কি মিটেছে?" ঠাকুর হেসে বললেন ঃ "একটু বাকি আছে।"[৪৩] বাসনা নিয়ে এরূপ ঠাট্টা একমাত্র মুক্ত পুরুষেরই সম্ভব।

ধনী মথুরবাবু ঠাকুরকে সাজাতে ভালবাসতেন। ঠাকুর যখন মধুর ভাবের সাধন করেছিলেন, তখন মথুর ঠাকুরের জন্য একসেট ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ি, ওড়না, ঘাগরা, কাঁচুলি, পরচুলা প্রভৃতি কিনে দিয়েছিলেন। ঠাকুর যখন জানবাজারে যেতেন মথুর ঠাকুরকে সোনারূপার থালা, বাটি, গ্লাসে খাওয়াতেন। মথুর একবার ঠাকুরকে এক হাজার টাকা দিয়ে (তখনকার কালে) একটা অপূর্ব শাল কিনে দিয়েছিলেন। ঠাকুরও বালকের ন্যায় শালখানি পরে এদিক ওদিক ঘুরে সবাইকে দেখাতে লাগলেন এবং নিজেও বারবার দেখে পরে তাঁর মনে অন্য ভাবের উদয় হলো। ভাবলেন ঃ " 'এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈয়ারি হয়েছে; আর শীতনিবারণ—তা লেপ-কম্বলেও যেমন হয়, এতেও তেমনি; অন্য সকল জিনিসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে! এতে এত দোষ!' এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, 'থু থু' বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে! মথুরবাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন, 'বাবা বেশ করেছেন!' "[৪৪]

১৮৮৫ সালের ১৩ জুলাই জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "যাঁরা অবতারদেহ ধারণ করে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা?" ঠাকুর সহাস্যে উত্তর দিলেন ঃ "দেখছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐরকম পরি। এখনো আছে। জানি কিনা আর একবার আসতে হবে।" বলরামবাবু হেসে বললেন ঃ "আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য?" "একটা সৎকামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে বলে।"[৪৫] উত্তর দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অবতারলীলার এসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মা জগদম্বার কাছে বাইরের শরীরের রূপ যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্য

৪৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পৃঃ ৪৭২-৭৩; ৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ২০০-১
৪৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯৭১

প্রার্থনা করেছিলেন। তবুও সেই সুন্দর দিব্যরূপ দেখবার জন্য লোকে ভিড় করত। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে'একটি অপূর্ব ছবি তুলে ধরেছেন ঃ

"একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাব-সমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পালকি, গাড়ি ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পালকি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পালকিতে উঠিতে আসিলেন। দেখেন, রাস্তায় পালকির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?'

"হৃদয়—কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।

"ঠাকুর—আমাকে তো রোজ দেখে, আজ আবার কি নূতন দেখবে?

"হৃদয়—এই চেলি পরে সাজলে-গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি!

"তাঁহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্ব ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন, হায় হায়! এরা সব এই দুইদিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি, রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না!

"রূপে বিতৃষ্ণা তো তাঁহার পূর্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্ধিত হইল। বলিলেন, 'কী? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেইখানেই তো লোকে এইরকম ভিড় করবে?' বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সেদিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না। হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ হেয়-বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার, হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ।"[৪৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত কাপড়, জামা, কোট, চাদর, চটি জুতা প্রভৃতি বেলুড় মঠের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তিনি লাল নরুনপেড়ে ধুতি পরতেন, লংক্লথের বা মার্কিনের (সস্তা কাপড়, যা দিয়ে লোকে বালিশে ওয়াড় দেয়) জামা, একটা কালো কোট, মাফলার, মোজা, বনাতের কানঢাকা টুপি প্রভৃতি পরতেন। ঠাকুর কাশীপুরে যখন অসুস্থ, তখন সিন্ধুদেশের হীরানন্দ বলেন, তাঁদের দেশের পাজামা পরলে ঠাকুর আরামে থাকবেন।

৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ২১২-২১৪

ঠাকুরও তেমনি রাজি হয়ে বলেন ঃ "তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও।"[৪৭] শীতের সময় শ্রীম একবার ঠাকুরের জন্য একটা জিনের জামা তৈরি করে আনেন, কিন্তু ঠাকুর তা গ্রহণ করেন নি। শ্রীম ঠাকুরের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করতেন। শ্রীম ঠাকুরের নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাট বস্তুসকল নিয়ে আসতেন—যেমন তেলধুতি, টুল, পাথরের বাটি, কলকে, ছুরি ইত্যাদি।

এখানে ওখানে ঘোরার বাসনা

দিনরাত দিব্যভাবে অবস্থানের ফলে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাখনের মতো নরম হয়ে গিয়েছিল। একবার মচমচে লুচি ভাঙতে গিয়ে আঙুল ফেটে যায়। ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামালে তাঁর গালে লাগত, তাই নাপিত কাঁচি দিয়ে তাঁর দাড়ি ছেঁটে দিত। খালি পায়ে তাঁর হাঁটতে কষ্ট হতো। অল্প দূর হলেও পালকি, ঘোড়ার গাড়ি বা নৌকা ভিন্ন যেতে পারতেন না। তিনি একদিন অনুশোচনা করে বলেছিলেন ঃ "গৌর নিতাই ঘরে ঘরে পায়ে হেঁটে যেতেন, কিন্তু আমি গাড়ি না হলে যেতে পারি না।" অবশ্য ঠাকুর যখন প্রথম কামারপুকুর থেকে কলকাতায় আসেন, তখন পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। পরে যখন দেশে যেতেন, তখন কিছুটা নৌকায়, তারপর বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে এবং সেখান থেকে গরুর গাড়িতে করে কামারপুকুর যেতেন।

কথামৃতে (২৭ অক্টোবর ১৮৮২) শ্রীম কেশব সেনের সহিত ঠাকুরের নৌকাবিহার (প্রকৃতপক্ষে স্টীমার) এবং তাঁদের হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ঠাকুর কেশবের সঙ্গে দুবার স্টীমারে ভ্রমণ করেছেন। প্রথমবার ১৫ জুলাই ১৮৮১ সালে কেশব সেন তাঁর জামাতা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে ঠাকুরকে নিয়ে স্টীমারে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের বিবরণ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিস্তারিতভাবে তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন। এই যাত্রায় হৃদয় এক ধামা মুড়ি ও সন্দেশ সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ব্রাহ্ম ভক্তদের মধ্যে পরিবেশন করেন।

এদিনের আরও অতিরিক্ত ভ্রমণ-সংবাদ 'সুলভ সমাচার'-এর (৩০ জুলাই ১৮৮১) প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র সেন পরবর্তী কালে (১৮৮৬ সালে) 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় লিখেছেন ঃ "পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। তিনি যে-সকল পদার্থকে দৃষ্টান্ত স্থল করিতেন, সেইগুলি এক-একবার তাঁহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইত। সেই মহৎ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াই ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় স্টীমারে চড়িবার সাধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ শক ১ শ্রাবণ, শুক্রবার কেশবচন্দ্র সেন আমাদের কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে স্টীমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংসদেবকে তুলিয়া লন। পরমহংসদেব স্টীমারের ঝকঝক শব্দ শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহাকে কোন বন্ধু জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিতে বলিলেন। তিনি এই

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১১৫৪

উত্তর প্রদান করিলেন, 'আমার মন এখন ঈশ্বরে বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি কি বল আমি তাঁহা হইতে উঠাইয়া লইয়া এই দূরবীক্ষণে বদ্ধ করিব'?"

২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশব ব্রাহ্ম ভক্তদের এবং আমেরিকান ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জোসেফ কুক ও মিস পিগটকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরকে স্টীমারে তুলে নেন। মিস্টার কুক ও মিস পিগট ঠাকুরের সমাধি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। এই যাত্রায় রামলাল-দাদা ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন: "একদিন কেশববাবু স্টীমারে সদলবলে এসে ঠাকুরকে বলেন, 'স্টীমারে কুক সাহেব বসে আছেন, তিনি খুব পণ্ডিত ও ভক্ত। চলুন না, একটু স্টীমারে আপনাকে বেড়িয়ে আনি।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'বেশ তো চল।' আমায় বললেন, 'ওরে রামলাল, তুইও চল না, একটু বেশ বেড়িয়ে আসবি।' আমি ও ঠাকুর স্টীমারে চড়ে বেড়াতে গেলুম। কেশববাবু কুক সাহেবকে ইংরেজী করে ঠাকুরের সব পরিচয় দিতে লাগলেন। তিনি শুনে মধ্যে মধ্যে হাসতে লাগলেন।

"স্টীমার যখন বড়বাজারে পোলের কাছে এল, তখন ঠাকুর কেশববাবুকে বললেন, 'কেশব, খিদে পেয়েছে, কি খাই বল দিকিনি?' কেশববাবু বললেন, 'কি খাবেন বলুন, যা খাবেন তাই এনে দিচ্ছি।' ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা, গরম গরম জিলিপি আনা হোক। তুমি যেও না, রামলাল যাক।' আমায় বললেন, 'রামলাল, তুই গিয়ে সব আন।' আমি গিয়ে গরম গরম জিলিপি, ছাঁচি পান, তামাক, টিকে, কলকে, হুঁকো সব আনলুম। তারপর ঠাকুর বললেন, 'গঙ্গা হতে জল তুলে বেশ করে জায়গাটা (স্টীমারের ভিতর একটি জায়গায়) ধুয়ে সব জিনিসগুলো রাখ।' আমি তাই করলুম। ঠাকুর খাবার খেয়ে তামাক খেলেন। পরে আমায় বললেন, 'দেখ, এগুলো করা হলো কেন জানিস? দিনু খাজাঞ্চি (কালীবাড়িতে খাজাঞ্চির কাজ করতেন) দেখেছে যে, আমি কেশবের সঙ্গে স্টীমারে বেড়াতে যাচ্ছি, হয়তো মনে করবে যে, আমি ওদের হাতে খাব। কত কি মনে করবে তাই তোকে ওসব করতে বললুম।' তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল, ঠাকুরকে স্টীমার হতে যখন নাবানো হলো তখন তিনি সমাধিস্থ। একটি গাড়ি করা হলো, তিনি টলতে টলতে গাড়িতে উঠলেন, আর সাহেবেরা ফিসফিস করে হেসে কেশববাবুকে কি বলতে লাগলেন। আমি কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওরা হাসছেন কেন?' কেশববাবু বললেন, 'ওরা বলছে যে, বাবুকে কি এত বেশি খাওয়াতে হয় (অর্থাৎ মদ) যে হুঁশ নেই? আমি বললুম তাদের যে, উনি মদ খাননি, উনি ভগবৎ-নামে মাতোয়ারা হয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন, তাই টলছেন।' তারা দেখেশুনে সব অবাক হলো।"[৪৮]

ঠাকুর মথুরের জমকালো ফিটনে চড়ে কলকাতা দেখতে আসতেন। পরে মথুরের দেহত্যাগের পর বেণী সা-র ভাড়া ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা ও

৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫২-৫৩

ভক্তবাড়িতে যেতেন। ঠাকুরের সখের অন্ত ছিল না। তিনি 'বাসা পাকড়ে' শহরের রঙতামাশা দেখে আনন্দ করতেন। তিনি রাধাবাজারের ফটো তোলা দেখেছেন; আর দেখেছেন মনুমেণ্ট, কেল্লা (ফোর্ট উইলিয়ম), গভর্নরের প্যালেস, ময়দান, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, সার্কাস ইত্যাদি। তিনি কলকাতায় বেশ কয়েকবার থিয়েটার দেখতেও গেছেন। তিনি দেখেছেন নববৃন্দাবন, চৈতন্যলীলা, বৃষকেতু, প্রহ্লাদচরিত্র, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি নাটক। বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়িতে তিনি দেবদেবীর ছবি দেখতে যান। ঠাকুর মথুরের সঙ্গে বৈদ্যনাথ, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও নবদ্বীপে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় ও সমুদ্র সবচেয়ে বড়। তাই ঠাকুরের ঐ দুটি দেখবার ইচ্ছা ছিল। শ্রীম দার্জিলিঙ দেখে এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হিমালয় দেখে তাঁর উদ্দীপন হয়েছিল কিনা? ঠাকুরের পদ্মা নদী দেখবারও ইচ্ছা ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানাবিধ খেয়ালী বাসনা

বেদান্ত-মতে মন সৃষ্টি করে শরীর। তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা সহায়ে মানব-মন মানব-শরীরকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়তে পারে। এসব কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে অসমর্থ। সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির জীবনী পড়লে জানা যায় যে, খ্রীস্ট সম্বন্ধে তীব্র চিন্তার দ্বারা তাঁর হাতে পায়ে ক্রুশচিহ্ন (stigmata) প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতেও দেখা যায় যে, দাস্যভাবে সাধনকালে তাঁর মেরুদণ্ডের নিচে হনুমানের লেজের মতো একটু স্ফীতি দেখা দিয়েছিল এবং মধুরভাবে সাধনকালে নারীশরীরের কিছু লক্ষণও দেখা দিয়েছিল।

ঠাকুর যখন যে-সাধনা করতেন, তখন তিনি তাতে সমস্ত মন, প্রাণ ও শরীর নিয়োজিত করতেন এবং দিনরাত ঐ ভাবে ডুবে যেতেন। সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ সাধনা ছাড়তেন না। স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের এক অদ্ভুত বাসনার উল্লেখ করেছেন : "অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে একপ্রকার বাসনায় উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রী শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রী শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষ-শরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত-কাপড়ের মতো কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়েঘরের পার্শ্বে দুই-এক কাঠা জমি থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই-পাঁচ প্রকার শাকসবজি উৎপন্ন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সুতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা

আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালক-বেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ-সকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে তাঁহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐভাবে পূর্ণ না হইলেও মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।"[৪৯]

বলিহারি ঠাকুরের বাসনা! ভাগবতে আছে—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ গোপীদের কাছে নিয়ে যান এবং বিদায়কালে গোপীদের প্রণাম করে প্রার্থনা করেন ঃ "আহা! এই গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতৌষধির মধ্যেও আমি যেন একটা কিছু হই।"

ঠাকুর তাঁর চির-আরাধিতা মা জগদম্বার কাছে যা প্রয়োজন তা চাইতেন ঃ "মা, একজন বড় মানুষ পেছনে দাও। তাই সেজোবাবু চৌদ্দবছর ধরে সেবা করলে।" পরে মা ঠাকুরের সেবার জন্য শম্ভু, সুরেন্দ্র, বলরাম প্রমুখ রসদদার জুটিয়ে দিলেন।

"মা, তোমার নাম-গুণ করে বেড়াব, দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও—সেখানকার মতো (এশিয়াটিক সোসাইটিতে দৃষ্ট তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ অর্থাৎ skeleton)।" "মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও।"—ঠাকুর যখন পেটের ব্যাধিতে দীর্ঘকাল কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন হৃদয়ের পরামর্শমত ঐরূপ প্রার্থনা করেছিলেন।

ঠাকুরের বাঁচবার সাধ কেন? তার উত্তরে তিনি নিজেই দিয়েছিলেন ঃ "শরীরটা দুদিনের জন্য। তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই।... হাত যখন ভেঙে গেল, মাকে বললুম, 'মা বড় লাগছে।' তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ির একটা-আধটা ইস্ক্রুপ আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার যেরূপ গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি সেইরূপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব; তাঁর নাম-গুণ গাইব, তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াব।"[৫০]

গীতায় আছে, চার শ্রেণীর লোক ভগবানকে ডাকে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আধিব্যাধিতে ভুগে মানুষ ভগবানের সাহায্য চায়। দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগেও ঠাকুর মাকে রোগ সারাবার কথা বলতে লজ্জা পেতেন। একদিন স্বামীজী ঠাকুরকে ধরে বসলেন ঃ "আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।"

ঠাকুর—আমার কি ইচ্ছা রে যে, আমি রোগে ভুগি! আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা, না সারা মা-র হাত।

স্বামী বিবেকানন্দ—তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।

৪৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, পৃঃ ২৬৮-৬৯
৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৪৭২-৮৭৩

ঠাকুর—তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও-কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় নারে!

স্বামীজী—তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।

ঠাকুর—আচ্ছা, দেখি, পারি তো বলব।

কয়েক ঘণ্টা পরে স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?"

ঠাকুর—মাকে বললুম (গলায় ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না; যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন, তোদের সকলকে দেখিয়ে, 'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।[৫১]

যোগশাস্ত্রে আছে যে, 'ধারণা, ধ্যান ও সমাধি'র দ্বারা 'সংযম' লাভ করলে যোগীদের মধ্যে নানাবিধ বিভূতির আবির্ভাব হয়। ঐ সিদ্ধাইয়ের বলে যোগীরা বহু অলৌকিক ব্যাপার দেখাতে পারেন। ঠাকুর মনেপ্রাণে সিদ্ধাইকে ঘৃণা করতেন, কারণ তা মনকে ভগবান থেকে দূরে রাখে। বলতেনঃ "যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া—এই সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে, 'মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও।' আমার বালকের স্বভাব—কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, 'মা, হৃদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে।' অমনি দেখিয়ে দিলে... বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে বকলাম আর বললাম, 'তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি! তোর জন্যই তো আমার এরূপ হলো!' "[৫২]

শাস্ত্রবাসনা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেনঃ "মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও; পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও।' তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।"[৫৩]

বাসনায় আগুন লাগিয়ে দাও

ঈশ্বরীয় পথের পথিককে শাস্ত্র নির্বাসনা হতে বলেছেন—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। (কৈবল্য-উপনিষদ্, ৩) বাসনায় বন্ধন। বন্ধনে দুঃখ। দুঃখ কেউ চায় না। মানুষ চায় আনন্দ। বাসনার মায়াজাল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ভক্তদের শেখাতেন কি করে বাসনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

"মনে ত্যাগ হলেই হলো।... বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো!"[৫৪]

"ধর্মের সূক্ষ্মা গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।"[৫৫]

---

৫১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮০-৮১

৫২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯১৩; ৫৩ তদেব, পৃঃ ৪৪২

৫৪ তদেব, পৃঃ ১১১৯; ৫৫ তদেব, পৃঃ ৬৭৪

"কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা।"[৫৬]

শ্রীম ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেনঃ "বাসনা যেমন ভাঁড়ে ঘি, লুকিয়ে থাকে।" একজনের একটা ঘিয়ের ভাণ্ড ছিল। ঘি ফুরিয়ে গেছে। আরেকজনের একটু ঘিয়ের দরকার। সে ঘি চাইলে অপর ব্যক্তি বলল, 'নেই'। সে বললে, 'রোদে দাও ভাঁড়টা'। অমনি কলকল করে এক পোয়া ঘি বের হয়ে এল। এমনি বাসনা—শুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকে। 'রোদ' পেলে মানে বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হলে তখন বেরিয়ে আসে। তবে তপস্যা করলে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, তাতে সব ভস্ম হয়ে যায়।[৫৭]

ধ্যানকালে সাধক যখন মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করে তখন প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল সামনে আসে। কিন্তু গভীর ধ্যানে সে-সকল আর আসে না। জপধ্যানকালে যত আজেবাজে বিষয় শুধু যে আমাদের মনেই আসে তা নয়, তা ঠাকুরের মনেও উঠেছিল। তাঁর আত্মকথাঃ "ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার—মন তুই কি চাস? কিছু ভোগ করতে কি চাস? মন বললে, 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম—যেমন, কাচের ঘরে সমস্ত জিনিস বার থেকে দেখা যায়!"[৫৮]

বাসনা মহা শত্রু। এই শত্রুকে মারবার নানাবিধ উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে, যেমন 'বৈরাগ্যবহ্নি', 'জ্ঞানাগ্নি', 'বিচার', 'নিষ্কাম কর্ম', 'ভগবদ্‌ভক্তি' ইত্যাদি। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের সাবধান করে বলেছিলেনঃ "ধ্যান করিতে করিতে মন-মধ্যে যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান, আমার এ-বাসনা পূর্ণ করিও না'।"[৫৯]

পূর্ণকামের সকল কামনাই যেমন নিত্য পূর্ণ হয়ে রয়েছে, পূর্ণকামের ভক্তেরও তদ্রূপ কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। ভগবানের রাজ্যে মানুষ আন্তরিকভাবে যা চায় তাই পায়। বিলম্ব বা শীঘ্রতা চাওয়ার দোষ-গুণে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ণকাম, অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম। তাঁকে ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল ও আশ্রয় স্পর্শ করতে পারত না। জীবের জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ, অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ও দেহাদিরহিত আত্মা বা পরম পুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ হতো না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমকে বলেনঃ "আমি বলতুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে করতুম, সেইটেই মিলে

৫৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৪৪৫ ৫৭ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, ১৩৭২, পৃঃ ১৭৮
৫৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯১৩; ৫৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশচন্দ্র দত্ত, ১৩৫৮, পৃঃ২০১

যেত।"

শ্রীম—আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, সে-সময় সব মিলত। সে-সময় তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত।[৬০]

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন জীবকে দেখাতে কিভাবে বাসনাকে নিয়ে খেলতে হয় ও জাগতিক বাসনাকে ভগবদ্-বাসনায় রূপান্তরিত করে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়।

৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ২৩৩-৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কলকাতার লোক

সেকাল আর একাল। জাগতিক নিয়মে স্থান ও কালের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।" কৃষ্ণের মথুরা, রামের অযোধ্যা এখন কোথায়? তবুও স্থান-দুটি এখনো নাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কবি ও সাহিত্যিকদের মানসপটে রাম ও কৃষ্ণের স্থান, লীলা, বাণী নানারূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের ঐসব বর্ণনা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষের মনে জীবন্ত করে তুলেছে লোকোত্তর পুরুষদের অমর জীবনকাহিনী। ঐসব প্রাচীন পুরাণকথা এখনো মানবহৃদয়ে জাগিয়ে তোলে আবেগভরা উত্তেজনা।

উনবিংশ শতকের কলকাতা ও কামারপুকুর। কত পার্থক্য! গঙ্গা, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর গ্রাম। কালচক্রে নতুন বিজ্ঞানসভ্যতার প্রভাবে ঐ সরল, সুন্দর গ্রামটি নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কামারপুকুরে এখন পাকা রাস্তা, সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, স্টুডিও, টেলিভিশন, ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন, মোটরগাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ—এককথায় আধুনিক সভ্যতার সবকিছু সেখানে পৌঁছে গেছে। শহর কলকাতায় যা মেলে, কামারপুকুরেও তা মেলে। কলকাতার বদ্ধ জীবন—"ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট"—এই যান্ত্রিক শহুরে জীবন থেকে কোন অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মানুষ দুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তারও উপায় নেই। এখন কামারপুকুর গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেখতে হয়।

দেড়শ বছর পূর্বের পল্লী কামারপুকুর। বঙ্গের পল্লীরানী "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" এ-চিত্র কাল্পনিক নয়, অতি বাস্তব, রূঢ় সত্য। ওপরে নীল আকাশ, নিচে সবুজ বনানী ও ধানখেত, চারিদিকে সাদা রোদ্দুর, সামনে ধূসর বা লাল মাটির রাস্তা, পাখির কূজন, ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়া মানবমনকে স্বতঃই উদাসী করে দেয়।

এই সেই কামারদের পুকুর, যে-পুকুরের নামে গ্রামের নামকরণ—পানায় ভরা। মেয়েরা কোন ঘাটে বাসন মাজছে আর সুখদুঃখের গল্প করছে, কেউ বা জলের ঝাপটা দিয়ে পানা সরিয়ে কলসে জল ভরছে। ভক্‌ভক্ শব্দ হচ্ছে। কলস যখন পূর্ণ হলো, আর শব্দ নেই। তেমনি ভগবানদর্শনের পর সাধক চুপ হয়ে যান। আবার ঐ পানা নাচতে নাচতে স্বচ্ছ জল ঢেকে দেয়। এ যেন সচ্চিদানন্দ ও মায়ার খেলা। উন্মোচন ও আবরণ।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে চাষীরা লাঙল বলদ নিয়ে চলেছে মাঠে। গামছায় বাঁধা মুড়ি। পথের পাশে মুদির দোকান। এখানে সব মিলবে—চাল-ডাল, তেল-মশলা, দেশলাই-

কেরোসিন, সাগু-বার্লি, লজেন্স, বিস্কুট আবার গ্রামবাসীদের খবর—কার জন্ম হলো, কার বিয়ে, কার মৃত্যু। সপ্তাহে দুদিন হাট। ভিন্ন গ্রামের লোকেরা সব বেচাকেনা করতে আসে। দূর থেকে 'হোহো' শব্দ শোনা যায়। অফিসের তাড়া নেই। নাকেমুখে দুটো গুঁজে ছুটতে হয় না। ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবিটিস, টেনশন, হার্টের ব্যাধি গ্রামবাসীদের অজ্ঞাত। গাঁয়ের লোকেরা সরল, ভদ্র, ধর্মপরায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের অদূরে হালদারপুকুর। নাইতে এসে গাঁয়ের মেয়েরা বলাবলি করছে ঃ "মাছের লেজাখানা চচ্চড়িতে দিলাম, মুড়ো দিয়ে ঝোল হলো।" ঠাকুর তা শুনতে পেয়ে ঘরে থাকতে পারলেন না। সোজা ঘাটপাড়ে গিয়ে বললেন ঃ "হাঁগা, শুধু কি লেজা, মুড়ো, চাকা—এই করবে না ভগবানেরও নাম করবে?" মেয়েরা লজ্জিত ও বিব্রত হলো।

ধন্যি গ্রাম কামারপুকুর! যুগীদের শিব, গোপেশ্বর শিব, পাইনদের শিব, আবার অদূরে মুকুন্দপুরের শিব। গ্রামখানি শিবময়। এখানে অশিবের কোন স্থান নেই। "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" শিবের গাজন, কৃষ্ণযাত্রা, রামায়ণ-কথা, দেবদেবীর ব্রত, উপবাস, উৎসব—বার মাসে তের পার্বণ গ্রামখানিকে মাতিয়ে রেখেছে।

গ্রামের দুপাশে দুই শ্মশান। ভূতির খালের ধারে ও বুধুই মোড়লের দীঘির পাশে যে ঝাঁকালো বটগাছ-দুটি আছে—সন্ধ্যায় সেখানে গেলে গা ছমছম করে। শ্মশান দুটি মনে করিয়ে দেয়—মানুষের দেহ নশ্বর, অনিত্য এ জগৎ। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ তালবীথি। রাখালেরা দিনের শেষে গোচারণ সেরে ঘরে ফিরছে। মেঠো রাস্তার ধুলোয় অস্তগামী সূর্যের লাল আলো সোনালী হয়ে গিয়েছে। প্রাণবন্ত রাখালেরা 'হেই হেই' করে গরুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ বা বাঁশের বাঁশিতে বিদায়সঙ্গীত গাইছে।

সন্ধ্যায় বিভিন্ন মন্দির ও গৃহ থেকে আরতির শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে। লাহাদের ঠাকুরদালানে জ্বলছে ঝাড়ের আলো। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে জ্বলল তেলের প্রদীপ। রাত নেমে এল কামারপুকুরে। শুরু হলো মা-ঠাকুরমাদের রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারতের অমরকথা। মাটির ঘরে প্রদীপশিখার লীলাচঞ্চল নৃত্য আর শিশুমনের সীমাহীন কল্পনা একটা আজব দুনিয়া সৃষ্টি করল।

এই পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। প্রাচীন যোগীদের মতো প্রকৃতির কাছ থেকেই তিনি পাঠ নেন, গোচারণভূমিতে বিচরণ করেন। জীবনের প্রথম সতের বছর পল্লীর সৌন্দর্য ও সুষমা, শান্তি ও ভালবাসায় তিনি নিজেকে পুষ্ট করেন। ভগবদ্প্রেমের দ্বারা কি করে দুঃখ, শোক, দারিদ্র্যকে দমন করা যায় তা শেখেন। খালি পায়ে, খালি গায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শীতগ্রীষ্ম, রোদবৃষ্টির মধ্যে বেড়ে ওঠেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "মহীয়সী প্রকৃতিদেবী যেন তাঁহার গুণময়ী ভাব মন্থনপূর্বক এই শুদ্ধসত্ত্ব বালককে প্রসব—অর্থাৎ তাঁহাকে লীন অবস্থা হইতে সমুত্থিত করিয়া, তাঁহার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানরাজি এতই যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা মাঠ, ঘাট, পত্র, পুষ্প, পশু, পক্ষী, শ্মশান, মন্দির এবং বিভিন্ন মানব

ও তাহাদের আচার-নিরীক্ষণে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা, অর্থাৎ সেই একেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া সর্বক্ষণ এক অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন।"

উনবিংশ শতকের কলকাতা

কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স সতের। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভাই রামকুমারের অনুরোধ সত্ত্বেও 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা' শিখতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন ঃ "আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের উদয় হয়ে মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" তিনি লক্ষ্য করলেন কলকাতার লোকদের চিন্তাপ্রবাহ। তারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে ছুটছে, আর টাকা ও নামযশের জন্য সারা শহর ঘুরছে। তিনি সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে বুঝলেন—এ ভোগসর্বস্ব জীবন শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ আনতে পারবে না। মানুষের দুঃখকষ্ট, মায়া-বন্ধন প্রভৃতি থেকে মুক্তি হবে না। তিনি ঐ বয়স থেকে কলকাতার লোকদের জন্য ভাবিত হলেন। এরা সংসারকে 'সার' এবং ভগবানকে 'অসার' মনে করে। এরা লেখাপড়া জানা অজ্ঞানী। এই কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী—পাশ্চাত্য ভাববন্যায় প্লাবিত। কলকাতার লোকেরা তর্কপ্রিয়, সন্দিগ্ধমনা, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। সব দেখেশুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভোগবাদীদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

উনবিংশ শতকের কলকাতার একটু ভূমিকা না দিলে ঠিক বোঝা যাবে না শ্রীরামকৃষ্ণ কি ধরনের লোকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। এই শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটি বিপ্লবাত্মক যুগ। ধর্মে, সাহিত্যে, শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতিতে দেখা দিল নবজাগরণ। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীস্টীয় সভ্যতা ও খ্রীস্টীয় ধর্ম দুর্বার শক্তিতে মহাপ্লাবনের মতো এসে হিন্দু সমাজ, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। পাশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার উৎকট ঔজ্জ্বল্যে সকলের চোখ ঝলসে গেল। খ্রীস্টান পাদরীগণ এই অন্ধ ও অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। কলকাতার লোক ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল। আত্মশক্তি হারাল। পরানুকরণকারী হয়ে উঠল।

বেদ, বেদান্ত, গীতাকে ঠেলে বাইবেল স্থান নিল; মহাভারত ও রামায়ণ আজগুবি বলে ধিকৃত হলো এবং Edgeworth's Tales সে-স্থানে জায়গা করে নিল। কালিদাস ও ভবভূতিকে সরিয়ে স্থান করে নিলেন শেক্সপীয়ার। নব্যবঙ্গের তিন দীক্ষাগুরুর হাতে কলকাতার লোকদের দীক্ষা হলো। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও এবং মেকলে সকলকে শেখাতে শুরু করলেন, প্রাচ্যের সবকিছু হেয় আর পাশ্চাত্যের সবকিছু শ্রেয়।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিওর জন্ম এবং বাইশ বছর বয়সে (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে) মৃত্যু।

আঠার বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক হন এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে দুটি যুবকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। এই তরুণ শিক্ষকের কাছে যুবকেরা শিখতে লাগল বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রিড, টমাস পেইন, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারা। ফলে তাদের মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি হলো। তারা সব জিনিস যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে শিখছিল। তারা শিখছিল প্রশ্ন করতে, সন্দেহ করতে এবং প্রাচীন বিধান বা নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে না নিতে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা, বিতর্ক, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, সমালোচনাতে বিদ্রোহের সুর বেজে উঠল। একাডেমীতে তরুণদের গর্জন শোনা যেত—"হিন্দুধর্ম ধ্বংস হোক", "গোঁড়ামী ধ্বংস হোক"। যুবকরা ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখলেই পথে চিৎকার করত—"আমরা গরু খাই গো", "আমরা গরু খাই গো"। তখন হিন্দু কলেজের ছেলেদের প্রধান সাহসের কর্ম ছিল মুসলমানদের রুটি ও বাজার থেকে সিদ্ধ মাংস এনে খাওয়া। এর সঙ্গে চলত সুরাপান। হাওড়াতে Rev. Hough নামে এক খ্রীস্টান মিশনারি বাস করতেন। তাঁর বাড়িতে যুবকদের সম্মেলন হয়। তাতে ঐ মিশনারির যুবতী মেয়ে গেলাসে মদ ঢেলে রামতনু লাহিড়ীকে খেতে দেন। এভাবে ছাত্রদের মধ্যে সুরাপানের দ্বার উন্মুক্ত হলো।

বিনয় ঘোষ 'কলকাতা কালচার' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "কলকাতা কালচার বলে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছে যেটা ঠিক বাঙালী কালচারও নয়, সাহেবী কালচারও নয়। একদিকে বাঙালীয়ানা, অন্যদিকে সাহেবীয়ানা—এই দুইয়ের জ্যোতিষিক টানাটানির ফলে 'কলকাতা কালচারের' উৎপত্তি।" অনুকরণপ্রিয় বাঙালীদের লক্ষ্য করে পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন ঃ "আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর

আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা বিলিতি ধরনে হাসি
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।"

বিক্ষুব্ধ কলকাতা। "নয়ী রোশনী" বা "নতুন আলোর" দলকে প্রতিরোধ করতে "পুরানী রোশনী" সৃষ্টি হলো। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ লর্ড বেণ্টিঙ্ক সরকারিভাবে ইংরেজী ভাষা চালু করে দিলেন। ভাষা ভাবের বাহক। এই ভাব ভোগবাদের। এই ভোগবাদকে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা পরাভূত করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কামারপুকুরে। যা হোক, "নয়ী রোশনীর" দল সতীদাহ নিবারণ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাগণ কখনো আপসের দ্বারা এবং কখনো বিরোধিতার দ্বারা

বিদেশীভাব রুখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। রামমোহন সৃষ্টি করলেন 'ব্রাহ্মসমাজ', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করলেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ নানা স্থানে 'হরিসভা'র মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করতে লাগল।

কলকাতায় যখন দারুণ বক্তৃতার ঝড়, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ধর্ম-আন্দোলন, সাহিত্য ও রাজনীতির মহড়া চলছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর নিচে ধ্যানমগ্ন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলো। তিনি বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহ। ঐ-বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হলো। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দেই কেশব সেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তারপর উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হলো। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের মূল ছিল বেদান্ত। কিন্তু যুবক কেশবের প্রেরণার মূল উৎস ছিল যীশুখ্রীস্টের জীবন ও উপদেশ। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কেশব "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সৃষ্টি করলেন। উঃ! কলকাতার অবস্থা তখন ভাবতেও বিস্ময় জাগে। একদিকে সংরক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজ, অন্যদিকে চরমপন্থী ডিরোজিওর ছাত্রশিষ্যবর্গ, আর মাঝখানে মধ্যপন্থী ব্রাহ্মসমাজ। কলকাতার আকাশ-বাতাস ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, ধর্ম ও সমাজ কম্পমান, মানুষের মন ভীত, ত্রস্ত, দিশেহারা। কেবল একটি প্রশ্ন ঃ এই ডামাডোলের গোলকধাঁধায় কে পথ দেখাবে?

"সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্"

রাম-অবতারে রাবণবধ, কৃষ্ণ-অবতারে কংসবধ, শিশুপাল-বধ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এবার সংশয়রূপ রাক্ষসকে নাশ করলেন। সংশয় সূক্ষ্ম। একে মারা কঠিন। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগে তাঁর অধ্যাত্মালোকের দ্বারা কলকাতার লোকদের সংশয়রূপী ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে নাশ করলেন। ভগবান আছেন কিনা—এই সংশয় নিয়েই নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। পেলেন অপূর্ব উত্তর পৌত্তলিক পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে ঃ "হাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি; তবে এর চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠরূপে।"

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ 'ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি মথুরবাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরেজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া 'আমিও একটা কেউ-কেটা নই, অপর সকলের সহিত সমান'—এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে-ভাবটাও মথুরবাবুর কম ছিল না।" তিনি ঠাকুরের অবতারত্বে সন্দেহ করতেন, পরে ঠাকুরের মধ্যে একাধারে শিব-কালী দর্শন করে বিশ্বাস হয়। কখনো তিনি কলকাতার লোকদের মতো ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করতেন।

একদিন মথুর ঠাকুরকে বলেন ঃ ‘‘ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।’’ ঠাকুর বললেন ঃ ‘‘ওকি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছা করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আরেকটা আইন করতে পারে।’’ পরদিন ঠাকুর একটা জবাফুলগাছের ডালে একটি লাল জবা ও অপরটি সাদা জবা দেখালেন। এভাবে মথুরের অবিশ্বাস নাশ করলেন।

ইয়ং বেঙ্গলদের কাছে ঠাকুরের পরীক্ষার অন্ত ছিল না। নরেন্দ্র বিছানার নিচে টাকা রেখে পরীক্ষা করে দেখলেন ঠাকুর কাঞ্চনত্যাগী কিনা। রাতদুপুরে যোগীন্দ্র নহবতে দৃষ্টি রেখে পরীক্ষা করেন ঠাকুর কামিনীত্যাগী কিনা। ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে বললেন ঃ ‘টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।’’

ডাক্তার ভগবান রুদ্র এম.ডি. পাস, একবার এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ ‘‘দেখ দেখি, আমার এ কি হলো, টাকাকড়ি ছুঁতে পারি না।’’ এই বলেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, আর বললেন ঃ ‘‘তুমি একটা টাকা রেখে দেখ হাতের ওপর।’’ যেই টাকা রাখা অমনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, আর হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখে তো ডাক্তার অবাক। তাঁদের সায়েন্সে এসব কথা নেই কিনা।

কলকাতার লোক কারা?

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় যোগী, ভোগী ও যোগী-ভোগী—এই তিন শ্রেণীর মানুষই দেখেছিলেন। তবে ভোগীদের সংখ্যাই অধিক। তাই ঠাকুর প্রথম দিনে নরেন্দ্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ছাপ দেখে সবিস্ময়ে ভেবেছিলেন ঃ ‘‘কলকাতার মতো স্থানে এমন সত্ত্বগুণী আধার থাকতে পারে!’’ তাঁর অধিকাংশ শিষ্যেরা এসেছিল কলকাতা ও তার নিকটবর্তী স্থান থেকে।

‘কলকাতার লোক’ বলতে সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতেন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বিষয়ী লোক। এদের লক্ষ্য কাম-কাঞ্চন ভোগ। এরা নামযশের কাঙাল। এরা ঈশ্বরবিমুখ বদ্ধজীব। ‘কলকাতার লোক’ বলতে ঠাকুর সারা পৃথিবীর সংশয়াত্মক ভোগীদের ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলে পাঠক মনে করবেন না যে, ঠাকুর কলকাতার সব লোককে নিম্ন অধিকারি মনে করতেন। তা যদি সত্য হতো, ঠাকুর কলকাতার লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজের জীবনটা দান করতেন না। ‘কলকাতার লোক’ ইউরোপে, আমেরিকায়, পৃথিবীর সব দেশে আছে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ‘‘বিষয়কর্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে।’’

ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত সন্ন্যাসীদের যেমন বলেছেন ঃ ‘‘সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোটকা গন্ধ; যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য করে, বাগ্দী উপপতি করেছিল।’’ আবার কলকাতার

বদ্ধজীবদের লক্ষ্য করে ঠাকুর অনেক কঠোর কথা বলেছেন, তাদের যাতে চৈতন্য হয়। ঠাকুর কাউকে ঘৃণা করেননি। ঠাকুরের উক্তিগুলি কঠোর কিন্তু সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ঃ "জালে রয়েছে, কিন্তু মনে করে বেশ আছি।" "হরিকথা হলে সেখান থেকে চলে যায়।" "তীর্থে গিয়ে পরিবারের পুঁটলি বইতে বইতে প্রাণ যায়।" "বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।" "এরা আঁশচুবড়ির গন্ধ সইতে পারে, ফুলের গন্ধে এদের ঘুম হয় না।" "এরা কাকে ঠোকরানো আম।" "এরা উটের মতো কাঁটা ঘাস খাবে—মুখ দিয়ে রক্ত পড়বে—তবুও খাবে।" "যেমন কুমিরের গায়ে অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়, তেমনি বদ্ধজীবের প্রাণে ধর্মকথা লাগাতে পারবে না।"

কলকাতা অভিযান

দ্বাদশ বছর কঠোর সাধনার পরে সিদ্ধিলাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভিন্ন মত ও পথ পরিক্রমা করে ঠাকুর আবিষ্কার করলেন—"যত মত তত পথ"। তারপর তিনি গেলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা জয় করতে। শরীর কোমল। তাই একদিন ঠাকুর কেঁদে বলেছিলেন ঃ "গৌর নিতাই ঘরে ঘরে পায়ে হেঁটে যেতেন, কিন্তু আমি গাড়ি না হলে যেতে পারি না!" নড়বড়ে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িতে ঠাকুর কলকাতায় যেতেন।

কাশীপুর-বরানগরের ইট-পাথরের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনিতে পেটের ভাত হজম হয়ে যেত—এখনো যায়। তাঁর সঙ্গে যেতেন নিরক্ষর লাটু, বাবুরাম বা রামলাল। তাঁর কাছে থাকত নিজের গামছাখানি এবং বেটুয়াতে মৌরী, কাবাবচিনি ও লবঙ্গ। ঐসব চিবোতে চিবোতে ঠাকুর যেতেন কলকাতা অভিযানে। গাড়িতে বসে হাসিঠাট্টা চলত আর দরজার ফাঁক দিয়ে ইতিউতি চাইতেন।

কলকাতায় পৌঁছে ঠাকুর তাঁর প্রথম মহাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ব্রাহ্মদের। ব্রাহ্মমন্দিরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন; তারপর ব্রাহ্মমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে "আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম" বলে মাথা নত করে প্রণাম করলেন। কেশব সেনের সঙ্গে "কলুটোলার বাড়িতে দেখা হলো; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল; তা আমাদের নমস্কার-টমস্কার করা নাই।... এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।" ঠাকুর ব্রাহ্মনেতার মাথা মাটিতে নত করে দিলেন।

ডঃ আব্দুল ওয়াজীজ রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে যান। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে বলেছেন ঃ "আমরা প্রণাম করিব না, ইহাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ আমাদের ধর্মানুসারে একমাত্র আল্লা ভিন্ন আর কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে

নাই। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) আমাদের সম্মুখে আসিয়া নতভাবে আমাদিগকে প্রণাম করিলেন, আমরাও তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে বাধ্য হইলাম।"

তারপর এল 'ইয়ং বেঙ্গল'। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়, "তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান পরিগণিত ছিলেন। বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়।" এই ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ঠাকুর স্টারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে গিয়ে নমস্কার করেন। গিরিশ প্রতি-নমস্কার করলে ঠাকুর আবার নমস্কার করেন। শেষে ঠাকুরের প্রণাম-অস্ত্রে পরাজিত হয়ে গিরিশ পরে বলেন ঃ "রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হযেছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জয় হবে প্রণাম অস্ত্রে।"

ঠাকুর বাগবাজারের সেরা গুণ্ডা মন্মথকে "কি গো?" বলে একটু ছুঁয়েই কাৎ করে দিলেন। সে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যোগীন-মার ভাইয়ের পরামর্শে মন্মথ ঠাকুরকে ভয় দেখাতে এসেছিল। পরবর্তী কালে মন্মথ ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হয়ে দিনরাত "প্রিয়নাথ প্রিয়নাথ" বলে কাঁদত।

হৃদয়ের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বসে ব্রিটিশ লাটসাহেবের বাড়িকে "কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজানো" দেখলেন। কী দৃষ্টি! তখনকার কলকাতার ভাইসরয়ের বাড়ি দেশী লোকের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাত। ব্রিটিশ গৌরবকে তিনি মাটির সঙ্গে তুলনা করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। তাঁর ভাব হলো ঃ ও আর কি দেখব? এসব দুদিনের সামান্য বস্তু। তিনি গাড়ি থেকে নেমেও বাড়িটা দেখলেন না।

তারপর ঠাকুর চললেন ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার 'ফোর্ট উইলিয়ম' দেখতে। মথুরের সঙ্গে ফিটনে ঠাকুরকে আসতে দেখে গোটা শিখ রেজিমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতেই 'জয় গুরু' বলে তাঁকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল। ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ অবাক। একটু পরেই সেনাধ্যক্ষ তাদের এরূপ কাজের জন্য প্রশ্ন করলে তারা বলল যে, গুরুদর্শনে শিখদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চিরাচরিত রীতি। এভাবে ব্রিটিশদের কেল্লা ঠাকুর জয় করলেন ঘোড়ার গাড়িতে বসে। নামবার প্রয়োজন হলো না। কলকাতার ফোর্টকে তিনি তুলনা করলেন পতনের রাস্তার সঙ্গে। তাঁর নিজের কথায় ঃ "কেল্লায় যখন গাড়ি করে গিয়ে পৌঁছিলাম তখন বোধ হলো সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তারপরে দেখি যে, চারতলা নিচে এসেছি। কলমবাড়া (sloping) রাস্তা। যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।"

বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যমদে মত্ত কলকাতার লোকরা এসে ঠাকুরের সঙ্গে খুব তর্ক করত। তিনি যখন দেখতেন এরা কিছুতেই তাঁর কথা নিচ্ছে না, তখন তিনি একটু কাছে গিয়ে তাদের অঙ্গস্পর্শ করতেন। ঐ মোহিনীস্পর্শে তাদের অহং-বেলুন (Ego-baloon) চুপসে

যেত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর বলেন ঃ "কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে-শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।"

ব্রিটিশ আমলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন সন্ধ্যার সময়। সারাদিন কাজের পর ক্লান্ত হয়ে কখনো ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন অধর ঠাকুরের কি সিদ্ধাই শক্তি আছে জানতে চাওয়ায় ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেন ঃ "যারা ডেপুটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে, মায়ের ইচ্ছায় আমি সেসব ডেপুটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।"

কলকাতার লোকদের নিম্নদৃষ্টি

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোড়ার গাড়িতে কলকাতায় যেতেন এবং মুখ বাড়িয়ে রাস্তার সব লোক দেখতেন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে মানুষের ভিতর-বার সব দেখতে পেতেন। কথামৃতে আছে—ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন ঃ "সেদিন কলিকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি, সবাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়াচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুই-একটি দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।" শ্রীম—"আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে। তাই অভাব বেড়েছে।" কলকাতার অধিকাংশ লোকদের মন নাভির নিম্নে।

কলকাতার লোকদের নিম্নদৃষ্টিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করার জন্য ঠাকুর সদা চেষ্টা করতেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর চির আরাধিতা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেন ঃ "যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি। এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল। ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হলো। অত করতে আমি পারব না; তোর সখ থাকে তুই করগে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দু-একটা কথা বলে দিলেই চৈতন্য হবে।"

কলকাতার লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্রমে ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার দেখা দিল। প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েকদিন পরে মা জগদম্বাকে তিনি বলছেন ঃ "এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাইবার সময় পাই না। একটা তো এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করে), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?"

বুদ্ধের মৃত্যু আসন্ন দেখে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ কেঁদে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "ভগবন্, আপনি চলে গেলে কে আমাদের শেখাবে?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন ঃ "আমার বাণী।" তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেছেন তাঁর দিব্য জীবন ও অমর বাণী, যা যুগ যুগ

ধরে মানুষকে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে নিয়ে যাবে।

কলকাতার লোকদের ত্যাগের কথা বলার যো নেই

ঠাকুরকে কত হুঁশিয়ার হয়ে কলকাতার লোকদের সঙ্গে মিশতে হতো। তারা সংসারজ্বালায় জ্বলেপুড়ে শান্তির জন্য তাঁর কাছে আসত। তিনি তাদের মধ্যে 'যে যেমন তাকে তেমন' করে উপদেশ দিতেন।

ঠাকুরের কাছে যারা যেত, কেশববাবু তাদের বলতেন ঃ "ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) এত যেয়ো না। মাঝে মাঝে যাবে। নয়তো কুটুস করে কামড়ে দেবেন একদিন।" অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়ে নেবেন। এই কথা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর উত্তর করলেন ঃ "কেন, আমি কি তাদের সংসার ছেড়ে দিতে বলি। এ-ও কর, ও-ও কর। যোগ ভোগ দুই-ই কর। বাবা, রক্ষে আছে কলকাতার লোককে সব ছাড়তে বলা। তাহলে আর আসবেই না। এক হাতে ঈশ্বরকে ধর, এক হাতে সংসার কর। বলি—তোমরা মনে ত্যাগ কর। তারপর আনাগোনাতে যখন বুঝতে পারবে নিজে, এসব কিছু নয়—স্ত্রী, পুত্র, পরিজন—তখন আপনিই ছেড়ে দেবে।"

কলকাতার লোকরা যাতে অমৃতের অধিকারি হতে পারে তার জন্য ঠাকুর খুবই ভাবতেন। তাদের নানাভাবে শান্তির উপায় বলে দিতেন। বলতেন ঃ "দু-একটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে ভাই বোনের মতো থাকবে। বেশি ছেলেপুলে হলে কাজ বেড়ে যাবে—অবসর হবে না। অর্থ রোজগার করা, মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া কত কি কাজ!. স্বামী-স্ত্রীতে মিলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এসব পাঠ করতে হয়। সর্বদা ভগবৎভাবে থাকা—যেন দুটি সেবক-সেবিকা।"

ভোগীরা ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। তাদের কাছে বিষয়ানন্দই প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; আর ব্রহ্মানন্দ ধরাছোঁয়ার বাইরে। কলকাতার ঈশান মুখার্জী এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি সংসার ত্যাগ করেছেন কেন? শাস্ত্রে সংসার-আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ভাল কি মন্দ অত জানি না; তিনি যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি।

ঈশান—সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে, তাহলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব্বাই ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল কুকুরের মতো কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুবরে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্‌টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা—তুমি বলছ। যখন স্ত্রীপুত্র মরে তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না—দারিদ্র্য—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন?

কলকাতার লোকদের কেবল লেকচার

উনবিংশ শতকের কলকাতায় বক্তৃতার ঝড় বয়েছিল। 'নববিধান', 'নব হুল্লোল', বিভিন্ন সমাজ, সভা, সমিতিতে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের ভাষণে কলকাতা তোলপাড় হতে লাগল। খণ্ডন-মণ্ডন চলল। তর্কযুক্তি, বিদ্যাবুদ্ধির লড়াই শুরু হলো। ঠাকুর এসব লক্ষ্য করেছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীম ঠাকুরকে দ্বিতীয় দর্শনকালে 'মাটির প্রতিমা পূজা' সম্বন্ধে তর্ক করেন। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ "তোমাদের কলকাতার লোকের ঐ এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনিই বুঝাবেন।... তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথাব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর।" শ্রীম লিখেছেন ঃ "ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।"

তখনকার দিনে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দুধর্মের প্রবক্তারা খুব লেকচার দিতেন সাইনবোর্ড মেরে। ঠাকুর চললেন কলকাতায় শশধরের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর কাছে শুনলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বক্তৃতার আদেশ পাননি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বললেন ঃ "যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচার কি হবে?... হেঁজি-পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে তবে লোকে মানবে।... হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? তরোয়ালের চোট মারলে কুমিরের কি হবে?... যে পণ্ডিতের বিবেক নাই সে পণ্ডিতই নয়। চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে।... প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না।" ব্রাহ্মদের ঠাকুর বললেন ঃ "ব্রাহ্মসভা না শোভা? ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল; কিন্তু ডুব দিতে হয়। শুধু উপাসনা, লেকচারে হয় না।"

কলকাতায় তখন ঢাক পিটিয়ে ধর্মপ্রচার হচ্ছে। কেবল হৈচৈ চারিদিকে। নিরক্ষর লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে তদানীন্তন কলকাতার একটি ছবি পাই—

"দশ-পনের কি বিশ বছর আগে এই কলকাতা শহরে কেমন ধর্মের ঢেউ উঠেছিল, জানেন তো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদ্রীর দল (Salvation Army) লিকচার দিত। সমাজে ব্রাহ্মরা সব বক্তৃতা দিত। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভায় কীর্তন হতো। তখনকার কথা মনে করুন। একদিন কোম্পানির (বিডন) বাগানে কিশুববাবু (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন)

বক্তৃতা দিলেন তো তার পরের দিন সেই বাগানে খ্রীস্টান কালী (Rev. Kali Krishna Banerjee) লিকচার দিল। লোকে তাদের কথা শুনল। আবার একদিন কৃষ্ণানন্দ স্বামী এলেন, তিনিও বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। লোকে তাও শুনল। একদল বক্তা হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিল, আর একদল সেই ধর্মের সুখ্যেতি করল। শশধর পণ্ডিতের দল তো ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা লাগিয়ে দিল। এতো জবরভাবে ধর্মের প্রচার হতে লাগল। বাকি তার ফলে কি হলো? যারা সভা করে বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করল তাদের দল বাড়ল? না, যারা তপস্যা করে তাঁকে জেনে ত্যাগের পথে এগিয়ে গেল, তাদের দলে লোক ভিড়তে লাগল? এতো যে দল দেখেছিলেন, সেসব এখন কুথায় মিলিয়ে গেল! তাদের আর যেমন জোর দেখতে পাচ্ছেন কি? তখন তো দেখতেন, ছেলে বুড়ো যুবা সবাই ধর্ম নিয়ে তর্ক করছে, ঝগড়া করছে, হৈহৈ করছে। বাকি এখন সেসব কুথায় গেল? আপুনারা ঠিক জানবেন—ভিতরে বস্তু না থাকলে ফাঁকা কথায় কুছু হয় না। ভিতরে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম চাই-ই চাই, তবে লোকে বিশ্বাস করে। ভগবানের চক্র এমনি। এই দেখুন না, স্বামীজী কঠোর করবার পর যেই লোককে উপদেশ দেবার আদেশ পেল, অমনি লোকে তার কথা গ্রহণ করে নিল। স্বামীজীর এক লিকচারে যে ফল হলো, তাতে জগতের লোকের নজর তার দিকে গিয়ে পড়ল। সেই লিকচারের আগে স্বামীজীকে জানত কে? তারপরই তো চাকা ঘুরে গেল। যা কেউ কখনো ভাবতে পারেনি, তাই হয়ে গেল।"

কলকাতার লোকদের কাঞ্চনাসক্তি

সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলে দুই-ই গঙ্গায় ফেলে দিলেন। আর সারা জীবন টাকা ছুঁলেন না। মথুর, লক্ষ্মীনারায়ণ টাকা দিতে এলে তাদের তাড়া করলেন। ধনী যদু মল্লিকের মা ঠাকুরকে বলেছিল ঃ "অন্য সাধু কেবল 'দাও দাও' করে, বাবা তোমার উটি নাই।" বরানগরের মহেন্দ্র কবিরাজ একবার ঠাকুরের সেবার জন্য রামলালের হাতে পাঁচটা টাকা দেন। সারা রাত ঠাকুরের ঘুম হলো না। রাত বারটায় রামলালকে ডেকে তুলে টাকা ফেরত দিয়ে আসতে বললেন। ভক্তদের পরে বলেছিলেন ঃ 'টাকা রাখায় বিল্লিতে যেন আমায় আঁচড়াচ্ছিল, ঘুমুতে পারিনি।" একান্ন বছর টাকা স্পর্শ না করে কিভাবে ঈশ্বরে নির্ভর করে বাঁচা যায় তা ঠাকুর প্রমাণ করে দেখালেন।

ঠাকুর জানতেন, কলকাতার বিষয়ী লোকরা টাকা ভালবাসে। তাদের অভয় দিয়ে বললেন ঃ "এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না।" তারপর ঠাকুর একটি গল্প বললেন ঃ "একখানে যাত্রা হচ্ছে। একজন দেখলে চুপি দিয়ে এখানে প্যালা দিতে হয়। অমনি পলায়ন। আর একখানে গিয়ে দেখে সেখানে প্যালা নেই। লোকের খুব ভিড়। অমনি কনুই দিয়ে ঠেলেঠুলে মাঝখানে গিয়ে আসন করে বসল। আর গোঁফে চাড়া দিয়ে গান শুনতে লাগল।"

কলকাতার কোটিপতি যদু মল্লিকের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন লাটু মহারাজ বিবৃত করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় ঃ

"একদিন ঠাকুর যদুবাবুকে বললেন, 'ইখানকার জন্য (অর্থাৎ ইহলোকের জন্য) তো অনেক সংগ্রহ করেছ, কিন্তু পরকালের জন্য কি যোগাড়-যন্তর করলে?' একথা শুনে যদুবাবু বললেন, 'পরকালের কাণ্ডারী তো তুমি আছ, ছোট ভট্চায! শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে, সেই আশায় তো বসে আছি। আমায় উদ্ধার না করলে তোমার পতিতপাবন-নামে কালি পড়বে। দেখো ছোট ভট্চায! শেষের দিনে ভুলো না।'... দেখো, যদু মল্লিকের এতো টাকা ছিল, তবু টাকার লোভ যাইনি। তাই উনি (ঠাকুর) একদিন তাঁকে বললেন, 'কিগো যদু! এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না!' তাতে যদুবাবু বলেছিলেন, 'দেখ ছোট ভট্চায! ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পার না, বিষয়ী লোক তেমনি টাকার লোভ ছাড়তে পারে না। আর টাকার লোভ ছাড়বে কেন, বল? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্য পাগল হতে পার, কিন্তু আমি যে তাঁর ঐশ্বর্যের জন্য পাগল হয়েছি। তুমি সব ছেড়ে তাঁকে চাইছ, আর আমি তাঁর ঐশ্বর্যের কাঙাল হয়ে টাকা টাকা করছি। আচ্ছা বল দিকিনি ছোট ভট্চায, টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?' এ-কথা শুনে ঠাকুর ভারি খুশি হয়েছিলেন, বললেন, 'এটা যদি ঠিক বুঝে থাক, তাহলে আর তোমার ভাবনা কিগো?' তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিগো যদু! সরলভাবে এ-কথা বলছ, না চালাকি করে বলছ?' এ-কথা শুনে যদুবাবু বলেছিলেন, 'সে তো তুমি জান, ছোট ভট্চায। তোমার কাছে মনের কথা লুকোতে তো পারব না!' "

ঠাকুর কলকাতার কৃপণ ও হিসাবি লোকদের নিয়ে রঙ্গ করতেন। তাদের কাঞ্চনাসক্তি ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি যাতে যায় তার জন্য উপদেশ দিতেন, কখনো-বা অপ্রিয় উচিত কথাও বলতেন।

ধনী সুরেন্দ্রকে ঠাকুর ধনী জয়গোপাল সেনের সম্বন্ধে বললেন ঃ "যার টাকা আছে, তার দান করা উচিত। জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। এক-এক জন টাকা থাকলেও হিসেবি (কৃপণ) হয়। টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই। সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান। আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" ঠাকুরের এ বর্ণনা নিখুঁত ও জীবন্ত। হিসাবি লোকদের চরিত্র চিত্রণ করে তিনি ভক্তদের ঐরূপ হতে নিষেধ করছেন।

তারপর এল সুরেন্দ্রের পালা। ঠাকুর তাকে বললেন ঃ "তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও, তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দানধ্যান আছে।... কৃপণের জিনিস খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়—এক মামলা-মকদ্দমায়, দুই চোরডাকাতে, তিন ডাক্তার খরচে, চার আবার বদ ছেলেরা সেইসব টাকা উড়িয়ে দেয়—এইসব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কলকাতার কম্যুনিস্টদের আদর্শ। তিনি ১৮৬৮ সালে ধর্মঘট শুরু করেছেন, যখন বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে কোন কম্যুনিস্ট নেতার আবির্ভাব হয়নি। তাঁর প্রথম অবস্থান ধর্মঘট শুরু হলো দেওঘরে। ধনী মথুরকে বাধ্য করলেন গরিবদের আহার ও কাপড় দিতে। তারপর আবার রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় গরিব প্রজাদের ট্যাক্স মকুব করালেন। মালিক মথুরকে দক্ষিণেশ্বরের কর্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "তুমি বড়লোক বলে মনে করো না তোমায় খোশামোদ করব।"

কলকাতার ধনী মণি মল্লিককে বললেন ঃ "দেখ, রাখাল বলছিল, ওদের দেশে (বসিরহাটে) বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন? তাহলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্যে) তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসেবি।" ঠাকুরের কথায় ভক্তেরা মুখ টিপে হাসল, কিন্তু কথাগুলি মণি মল্লিকের হৃদয়ে শূলবিদ্ধ করল। সার্জেন যেমন রোগীর মঙ্গলের জন্য ক্যান্সারাস টিউমার জোর করে কেটে বাদ দেয়, ঠাকুর তেমনি ভক্তের কল্যাণের জন্য অর্থাসক্তিরূপ আধ্যাত্মিক অন্তরায় দূর করতে চেষ্টা করলেন। কথায় কাজ হলো। মণি মল্লিক চুপ করে থেকে পরে বললেন ঃ "মহাশয়, পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার 'তেলি ফেলি' বলা কেন?"

কলকাতার লোকরা ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করত। ব্রাহ্ম ত্রৈলোক্য বললেন ঃ "সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান!" অমনি ঠাকুর বললেন ঃ "কি, আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর!... আর দান, ধ্যান, দয়া তো কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসাব করে দিতে হয়। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।"

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র বললেন ঃ 'টাকা মাটি! মহাশয় চারটি পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না।" ঠাকুর অমনি বললেন ঃ "দয়া, পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর!... সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা মাগ-ছেলে আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার—মাগ-ছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ। জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে, আর একজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়। বদ ছেলে, পরিবার হয়তো নষ্ট—উপপতি করে। তোমার ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে।"

কলকাতার লোক কামাসক্ত

"কামিনী-কাঞ্চনই মায়া"—শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশেষ মন্ত্র। এ-মন্ত্রে সিদ্ধ হলে ঈশ্বরদর্শন হবে। ঠাকুর বেদান্তের পণ্ডিতদের মতো মায়ার এক গজী, দু-গজী লম্বা সংজ্ঞা দিলেন না! "মীয়তে অনেন ইতি মায়া"—বলে ব্যাকরণ উদ্ধৃত করে মায়া বোঝালেন

না। এ-জগতে অধিকাংশ জীব ছুটছে কাম-কাঞ্চন ভোগের জন্য। ঠাকুর কলকাতার লোকদের বললেন ঃ "কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ। এই আছে, এই নাই। দুঃখের ভাগই বেশি। আর কামিনী-কাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।... কলকাতার লোকদের বলবার যো নাই, 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বলতে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।"

পাশ্চাত্যের অনেক মহিলা কথামৃতের "Woman and gold is maya" পড়ে বিশেষ আঘাত পান। ঠাকুর কখনোই মেয়েদের হেয়জ্ঞান করেননি, তিনি তাদের দেবীজ্ঞানে পূজা করেছেন। কলকাতার কামুক, মেরুদণ্ডহীন পুরুষ ভক্তদের মনে বৈরাগ্য আনবার জন্য এবং তাদের কামপ্রবৃত্তি নষ্ট করবার জন্য তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য করেছেন। পুরুষরা যাতে মেয়েদের ভোগ্যপণ্য, সন্তানতৈরির যন্ত্র বা দাসীর মতো না দেখে 'মা জগদম্বা', 'মা আনন্দময়ী'-রূপে দেখে—তার উল্লেখ করেছেন। নারীর প্রতি কলকাতার লোকদের তীব্র আসক্তি প্রসঙ্গে ঠাকুরের উক্তিগুলি বাংলার কথাসাহিত্যের চরম নিদর্শন।

"তোমাদের তো এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা ঐ-তেই (কামিনীতে) রয়েছ! মনে মনে বিচার করে দেখ। সকলেই দেখি মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম, তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, 'গাড়িভাড়া দাও।' কাপ্তেন তার মাগকে বললে। সে-মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে বললে, ওরাই (রামেরাই) দেবে। গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতরে!"

'টাকাকড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে। আবার বলা হয়, আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব।"

"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হয়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। বড়বাবু বলেন, 'এখন খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে দেখা কবো।' উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, 'তোর যেমন বুদ্ধি! ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে।' গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। তারপর গোলাপের কথায় বড়বাবু উমেদারকে পরদিনই চাকরি দেন।"

"যত সব দেখিস হোমরা-চোমরা বাবু ভায়া, কেউ জজ, কেউ মেজেস্টর—বাইরেই যত বোল বোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারো ক্ষমতা নেই।" এই প্রসঙ্গে ঠাকুর অপূর্ব ভঙ্গিতে এক ধনী কাপড় ব্যবসায়ীর কৃপণতার গল্প বলেন। সে তার গুরুকে পুঁথি বাঁধবার জন্য এক টুকরো কাপড় দিতে অস্বীকার করল, কিন্তু শেষে রাতে স্ত্রীর কথায় কাপড় এনে দেয় এবং স্ত্রী ঐ কাপড় গুরুকে পরদিন পাঠায়। ওপরের গল্প দুটি বড়—তাই সংক্ষিপ্ত করা হলো। কথামৃত সম্পূর্ণ পড়লে বোঝা যায়, ঠাকুর কত উচ্চস্তরের কথাশিল্পী ছিলেন।

"কেশবকে একদিন বললাম, আজ এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাক না। কেশব বললে, 'না কাজ আছে, যেতে হবে।' তখন আমি হেসে বললাম, 'কেন গো, তোমার আঁশচুবড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না'?" এই প্রসঙ্গে তিনি মালিনী ও মেছুনীর গল্প বলেন।

একদিন ঠাকুর অধরকে বললেন ঃ "দেখ, তুমি বিদ্বান, আবার ডেপুটি; তবু তুমি খাঁদি-ফাঁদির বশ।"

ঠাকুরের কাছে কলকাতার মেয়েরাও যেত এবং বলত ঃ "কেন ঈশ্বরে মন হয় না? মনস্থির হয় না?" ঠাকুর তাদের বলতেন ঃ "আরে গা থেকে এখনো আঁতুড়-গন্ধ যায়নি। আগে আঁতুড়-গন্ধ ছাড়ুক। এখন কিগো? ক্রমে হবে। এ-জন্মে এই দেখাটেখা হলো, পরজন্মে তখন হবে।"

কলকাতার লোক হুজুকে ও কথা রাখে না

কলকাতার লোক হুজুকে, জনরবকারী ও গুজবে বিশ্বাসী। সাময়িক উত্তেজনায় মত পরিবর্তন করে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় আছে ঃ "হুজুকে কলকেতা। হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক—আজগুব হুজুক।"

ইয়ং বেঙ্গলের নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে কলকাতায় খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেন, তার মনোজ্ঞ বর্ণনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় পাওয়া যায় ঃ "কোথাও পাদরী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্ছেন, কাছে ক্যাটিকৃষ্ণ ভায়া—সুবর্বন চৌকিদারের মতো পোশাক—পেন্টুলুন ট্যাংটাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ক্যাটিকৃষ্ণ কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না।"

এখানে খ্রীস্টধর্মের প্রতি তৎকালীন কলকাতার লোকের মনোভাবের একটি সরস ব্যঙ্গ-চিত্র পাওয়া যায়। হুজুকে পড়ে যারা খ্রীস্টান হয়েছিল, হুজুক কেটে গেলে তাদের দুর্দশার আর অন্ত রইল না। তারা না পারে মিশতে বিদেশীদের সাথে, না পারে মিশতে দেশীলোকের সাথে।

কালীপ্রসন্ন আরও লিখেছেন ঃ 'শহরে যখন যে পড়তা পড়ে, শিগ্‌গির তার শেষ হয় না। সেই হিড়িকে একজন ইস্কুল মাস্টার, কালীঘেটে হালদার, একজন বেনে ও কায়স্থ কৃশ্চান দলে বাড়ল—দু-চারজন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগল। কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগলেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চলতি লণ্ঠনের মতো প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো।"

তারপর ব্রাহ্মরা হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত

করলেন। কালীপ্রসন্ন এই নতুন হুজুকের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন ঃ "যখন ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম-অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্মজাতকর্ম, ব্রাহ্মসূতিকাপুজো ও ব্রাহ্ম-উপনয়ন প্রভৃতি চলচে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপুজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এসে কলকাতার লোকচরিত্র বুঝতে পারলেন। "গোঁফে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই।"—এরূপভাবে এরা ভগবানলাভ করতে চায়। তাই ঠাকুর স্টীমার ভ্রমণকালে কেশব সেনকে বললেন ঃ "লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুক তো জান! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুকে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে।—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিল, আরেক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করল—এইরকম।"

হুজুকে লোকের নিখুঁত চরিত্র ঠাকুর আঁকলেন দুটি উপমা দিয়ে ঃ ১) হুজুক হলো দুধের ফেনার মতো। ক্ষণিক এবং ২) হুজুকে লোকের চিত্ত অস্থির। ঠাকুর কলকাতায় বারোয়ারি পূজা দেখেছেন। তখনকার দিনে হাল ফ্যাশান, রুচি-খেয়াল কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। তিনি বারোয়ারির একজিবিশনে নানা দেবদেবীর মূর্তি দেখেছেন এবং হুজুকে লোকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ "যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই, তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—বারোয়ারিতে এমন মূর্তিও করে। ওসব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চিৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আরে ওসব (দেবদেবী) কি দেখছিস, এদিকে আয়, এদিকে আয়!' "

হুজুকে লোক কেবল মত বদলায়। সত্যে নিষ্ঠা নেই, চরিত্রেও দৃঢ়তা নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ইয়ং বেঙ্গলদের হুজুকে চরিত্র ব্যঙ্গ কবিতায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত,
খ্রীস্টীয় একনারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত।
বিশ্বাস হলো খ্রীস্টধর্মে—ছেড়ে দিলাম পথটা—বদলে গেল মতটা।...
চেয়ে দেখলাম নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট;
চক্ষু বোজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট।
কাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে,
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু form-এ।
—ছেড়ে দিলাম পথটা—বদলে গেল মতটা।..."

এই হলো হুজুকের লক্ষণ। এসব দেখে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "কলকাতার লোক হুজুকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই ক্ষুব্ধ হতেন কেউ যদি কথার খেলাপ করত। সত্য থেকে ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে ঠাকুর পোকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলতেন ঃ "লোক না পোক!" যদু মল্লিক

বাড়িতে চণ্ডীর গান দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু না দেওয়ায় ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ "সেকি! পুরুষ মানুষের এক কথা। 'মরদ কি বাত, হাতি কি দাঁত'।" ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কলকাতায় দেখতে যান এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ করেন। বিদ্যাসাগর অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় ঠাকুর বললেন ঃ "বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? 'সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান।' সত্যে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়।" শিবনাথ শাস্ত্রীও কথা না রাখায় ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন ঃ "কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই; আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা।"

ঠাকুর কলকাতার লোকদের সমালোচনা গ্রাহ্য করতেন না। বিষয়মদে মত্ত যারা তারা মাতালের সামিল। তাদের কথাও অর্থহীন প্রলাপ। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন ঃ "কলকাতার লোকেরা ভক্তি করতেও যেমন, অভক্তি করতেও তেমন। আমায় কেউ কেউ বলে, বাবুর লাল পেড়ে কাপড় পরা, পায়ে কালো বার্নিস চটি জুতো, তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসা— এসব না হলে চলে না। গঙ্গার জল সকালে দেখলুম বেশ ভরপুর রয়েছে, আবার দেখি না কমে গেছে। এসব লোকেদেরও কিরকম জানিস, ঠিক জোয়ার-ভাটার মতন। কত শালা কত কি বলে, ও-শালাদের ভাল কথায় মুতে দি, আর মন্দ কথায় মুতে দি। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আছে ভক্তিমান বিশ্বাসী। তাদের আর ওসব হবেনি। তারা যাকে ভক্তি করবে বা বিশ্বাস করবে, তাদের আর ভুল হবেনি। কিরকম জানিস, যেমন অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরিকে বলেছিল, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এইরকম থেকো, সে আর মাথা তুললে না।"

কলকাতার লোকদের শাসন ও ভালবাসা

পতিতপাবন, কপালমোচন, কর্মনাশা শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার ঈশ্বরবিমুখ লোকদের খুবই মঙ্গলচিন্তা করতেন। কথায় বলে, "শাসন করা তারই শোভা পায়, যে ভালবাসে।" ঠাকুর সংসারতাপে দগ্ধ, পতিত, দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করবার জন্য সদা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কখনো কখনো ঠাকুরের দৈবী আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মনে হতো এবং অনেকে ভুল বুঝত।

তাঁর আত্মকথা ঃ "উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম। কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।... কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, 'তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না; কেননা, সেটা মিথ্যা কথা হবে'।

"সেই উন্মাদ অবস্থায় আরেকদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্জে জপ করছে কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম!

"একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি সে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।"

ধন্য জয় মুখুজ্জে! ধন্য রাসমণি! অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁরা চিরদিনের মতো সমনস্ক হয়ে গেলেন। অনেক সময় ধ্যানজপকালে মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলে কেউ যদি ভাবে, ঠাকুর সামনে বসে আছেন, এখনি একটা চাপড় মারবেন; তবে তার মন ঠাকুরের ওপরেই থাকবে। ঠাকুর নিজে ধ্যানকালে দেখতেন, শাণিত ত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী তাঁর দেহমধ্য থেকে বের হয়ে তাঁকে বলতেনঃ "অন্য চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব।" চঞ্চল মনকে শায়েস্তা করতে আমাদেরও একজন ত্রিশূলধারীর প্রয়োজন।

বিষয়চিন্তা বিষসদৃশ—দুঃখদায়ী ও বন্ধনের কারণ। এই বিষয়চিন্তা থেকে কলকাতার লোকদের রক্ষা করবার জন্য ঠাকুর তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন, সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা তাদের মনকে ঊর্ধ্বমুখী করবার চেষ্টা করতেন। রোগশয্যায় শুয়ে ডাক্তার সরকারকে বলছেনঃ "মহীন্দ্রবাবু, কি টাকা টাকা করছ? মাগ মাগ, মান মান করছ? ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। ঐ আনন্দ ভোগ কর।"

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেনঃ "মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেনঃ "আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।" ঠাকুর ধিক্কার দিয়ে তখনি বললেনঃ "এঃ! তুমি তো বড়ো ছ্যাঁচড়া। তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্চে। লোক যা খায়, তার ঢেকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছ, আর ঐ-কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে।" তারপর ব্যথিত হৃদয়ে ঠাকুর কোমলভাবে বঙ্কিমকে বললেনঃ "আপনি কিছু মনে করো না।" "আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসিনি।"—উত্তর দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "Love Personified" অর্থাৎ মূর্তিমান প্রেম। জগতের দরিদ্র, অত্যাচারিত, দুঃখী মানুষদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। কলকাতার লোকরা দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর নানাভাবে তাদের আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, পান খাবেন? পান না খেলে বলতেন, তামাক খাবেন? তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বর তো একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। অত দোকানপাট ছিল না। অর্থসম্বলহীন ঠাকুর কলকাতার ভক্তেরা এলে কখনো জলযোগ না করিয়ে যেতে দিতেন না। কথামৃতের একটা ছবিঃ

"কেশব (সহাস্যে)—আজও কি মুড়ি?

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হৃদু জানে।

"পাতা পড়িল। প্রথমে মুড়ি, তারপর লুচি, তারপর তরকারি। সকলের খুব আনন্দ ও হাসাহাসি। সব শেষ হইতে রাত দশটা বাজিয়া গেল।"

মন্দির থেকে ঠাকুরের জন্য ফলমিষ্টি প্রসাদ বরাদ্দ ছিল। তিনি তা সামান্য একটু খেয়ে কলকাতার ভক্তদের খাওয়াতেন, যাতে তাদের একটু ভক্তি হয়। রাতের প্রসাদী লুচির কিছু অংশ বৃন্দেকে (কালীবাড়ির পরিচারিকা) দিতেন সকালে। কোন কোন দিন কলকাতার ভক্তদের খাইয়ে সভয়ে শ্রীশ্রীমাকে গিয়ে বলতেন, যাতে তিনি সকালে বৃন্দেকে কিছু খাবার তৈরি করে খাওয়ান।

ঠাকুরের দর্শন হয়েছিল—"ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান—তিনই এক।" তাই ভক্তসেবা মানে ভগবানের সেবা। ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন কিভাবে ভক্তদের সেবা করতে হয়। শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে কয়েকদিন সাধনভজন করবার জন্য যান। ঠাকুর তাঁর থাকবার জায়গা, দুধের ব্যবস্থা প্রভৃতি করে দেন। গিরিশ'কে নিজ হাতে পায়েস খাইয়ে দেন এবং কাশীপুরে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জলের কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ভরে খাওয়ান। কলকাতার ভক্তদের জন্য মায়ের প্রসাদ বেঁধে নিয়ে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে উঠতেন, রাস্তার মোড়ে পূর্ণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন, থিয়েটারে নট-নটীদের কৃপা করবার জন্য যেতেন। অধর সেন দিনের শেষে অফিস ফেরত দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ক্লান্ত অধরের শোওয়ার ব্যবস্থা করতেন। নাচ-গান, হাসি-ঠাট্টা ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের দ্বারা তিনি কলকাতার লোকদের আপ্যায়িত করতেন।

"কলকাতার লোকদের দেখো"

ক্যান্সার হওয়ার চার-পাঁচ বছর আগে একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন ঃ "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে, দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে, ঠাকুরের দেহরক্ষার সঙ্গে কলকাতায় রাত্রিবাসের কি সম্বন্ধ? তিনি জেনেশুনে কেন কলকাতার শ্যামপুকুরে বাস করতে এলেন?

স্বামী প্রভানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে কয়েকটা কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ "সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুরের সবকিছু—এমনকি দেহের ব্যাধিজনিত যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত বিশ্বমানবের কল্যাণ-অভিমুখী। কেউ কেউ মনে করতেন, ভক্তগণকে সেবার সুযোগ দিয়ে তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় ব্যাধিগ্রস্তের মতো অবস্থান করছিলেন। আবার কেউ বা মনে করতেন, দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে প্রেমময় ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের যে অসুবিধা তা দূর করবার জন্যই তিনি কলকাতার শ্যামপুকুরে অবস্থান করছেন। আরও কেউ কেউ বলতে থাকেন যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী ভোগসর্বস্ব কলকাতার মানুষকে ত্যাগের পথে প্রবর্তিত করবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতায় আগমন ও অবস্থান।"

কলকাতার লোকরা প্রায় বিগত তিরিশ বছর ধরে ঠাকুরের অবতারত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছেন। তারপর জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকটিত করে তাদের সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। তখন শুরু হলো তাঁর বিদায়ের তোড়জোড়। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুর আরও একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ "অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধাভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্ধান হইবে।" তাই-ই হলো। শ্যামপুকুরে কলকাতার ভক্তেরা তাঁকে কালীজ্ঞানে পূজা করল।

কাশীপুরেও একদিন শ্রীশ্রীমা খাবার নিয়ে গিয়ে দেখেন যে, ঠাকুর চোখ বুজে শুয়ে আছেন। শ্রীশ্রীমা বলেনঃ "এখন খাবে যে, ওঠ।" ঠাকুর যেন কোন দূরদেশ থেকে ফিরে এসে ভাবের ঘোরে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" শ্রীশ্রীমা আক্ষেপ করে বলেনঃ "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" ঠাকুর তখন নিজের শরীর দেখিয়ে আপন মনেই বলতে থাকেনঃ "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।"

কলকাতার লোকদের পাপ নিয়েই অপাপবিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের ক্যান্সার হলো এবং তাতেই তাঁর প্রাণ গেল। তাঁর দেহত্যাগের পরবর্তী চৌত্রিশ বছর শ্রীশ্রীমা কলকাতার লোকদের সেবা করে গেলেন। তাঁকেও এজন্য বহু কষ্ট পেতে হয়েছে। শ্রীশ্রীমা যে কিভাবে কলকাতার খ্যাপা ভক্তদের সামলাতেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কেউ এসে হাউমাউ করে কাঁদত। কেউ বলতঃ "আমার বুকের ওপর পা দিন।" একদিন জনৈকা মহিলা সেজেগুজে এসেন্স মেখে এসে স্বামীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মাকে ধরেন। আরেকদিন কয়েকজন মহিলা একটা মেয়ের পেটে টিউমার যাতে সারে তার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইতে আসায় মা খুবই দুঃখিত হন। তারা চলে গেলে মা বিছানায় শুয়ে জনৈকা ভক্তের হাতে পাখা দিয়ে বলেনঃ "বাতাস কর তো, মা, শরীর জ্বলে গেল! গড় (প্রণাম) করি, মা, কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু! সংযম নেই, কিছু নেই! ঠাকুর তাই বলতেন, 'ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল! কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি।' ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস কর মা, আজ বেলা চারটা হতে লোক আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।"

কলকাতার বদ্ধজীবনে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীমা কখনো কখনো তাঁর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে গিয়ে থাকতেন। সেখানে তিনি গাঁয়ের মেয়ে। ঘোমটা ছাড়া গ্রামের পথে স্বচ্ছন্দে বেড়াতেন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। শ্রীশ্রীমা কলকাতায় আসা বা যাওয়ার পথে কোয়ালপাড়ায়ও থাকতেন। একবার মা হেঁটে এক ভক্তবাড়িতে

গেছেন। জনৈক সাধু মায়ের হেঁটে আসতে কষ্ট হবে ভেবে পালকি নিয়ে হাজির। মা বিরক্ত হয়ে পালকিতে চড়লেন, পরে আশ্রমে এসে সাধুটিকে বললেন ঃ "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হলো আমার বৈঠকখানা। এইসব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি দেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামত পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না। শরৎকে লিখে দাও।" সাধুটি তখন মা-র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

কলকাতার লোকরা শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটীতেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তারা সেখানেও ধাওয়া করেছে সংসারে বিষজ্বালা মাকে সঁপে দিয়ে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। স্বামী ঈশানানন্দ 'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন ঃ "সকালে কলিকাতা হইতে কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন। বেশ ফিটফাট। কাপড়-জামার খুব প্রাচুর্য। মায়ের জন্য ফল প্রভৃতি অনেক জিনিস আনিয়াছেন। মা বিকালে আপন মনে বলিতেছেন, 'সব জ্বালিয়ে খেলে! আর পারিনে। এক-একটি ছেলে আসে, আমার সংসারটি যেন শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। কোথা থেকে সব তরিতরকারি জিনিস পত্রের যোগাযোগ হয়ে যায়। আমাকে কোন ভাবনাচিন্তা করতে হয় না। যা হলো, মুখটি বুজে খেয়ে পাতাটি গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেল। আহা, তাদের মুখের কথাটিতেও যেন প্রাণটি শীতল হয়! আর এই দেখ না, সকাল থেকে যেন উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। একগাদা ফল নিয়ে এল। তার অর্ধেক পচে গোবর হয়ে গেছে। সেগুলি ফেলি কোথায় তা খুঁজে পাইনে। এদিকে অমন ফরসা কাপড়-চোপড়, বলে, গামছা আনতে ভুলে গেছি। আমি গামছা পাই কোত্থেকে? তখন তো একটা দেখেশুনে দিলাম। এখন ভাবনা, রাত্রে কি যে তরকারি করি! আবার শুনছি, মশারির দড়ি নেই; হরি দড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গিয়ে। আমি তো আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাধি, আর ওদিকে এই সব।' "

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা কলকাতার লোকদের জন্য কি করে গেছেন এখনো তা বুঝবার সময় হয়নি। যত দিন যাবে ততই লোকে বুঝবে দেবমানব-মানবীদের চিন্তা, কথা ও কর্ম যে কত সুদূরপ্রসারী তা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। কলকাতার মেয়েদের দুর্দশা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ কাঁদত। স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকাতে (২য় খণ্ড) লিখেছেন ঃ "ঠাকুর একদিন ঊষাকালে বামহস্তে নহবতের নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের শাখা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে পুষ্পচয়নরতা গৌরী-মাকে বলিলেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।' গৌরী-মা সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এখানে কাদা কোথায় যে চটকাব? সবই যে কাঁকর!' ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এ-দেশের মায়েদের বড় দুঃখু—তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।' গৌরী-মার সাধনপ্রবণ ও নির্জনতাপ্রিয় মন যদিও তখন বলিয়াছিল, 'সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না—হৈহৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও,

আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।' তথাপি ঠাকুর হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, 'না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে—এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!' গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তখনো তিনি ঐজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।"

কলকাতা শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের "জল ঢালা ও কাদা চটকানো" লীলাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলের অপর নাম প্রাণ। শাস্ত্র বলেন ঃ "আপোময়ঃ প্রাণঃ", অর্থাৎ প্রাণ জলময়। শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা শহরে জল ঢেলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্লাবনের দ্বারা প্রাণময়, জীবন্ত করে তুললেন। পতিত মানবজমিনকে আবাদ করবার সব সুযোগ করে দিলেন। কুম্ভকার যেমন কাদা চটকে নানাবিধ মৃন্ময় পাত্রাদি তৈরি করে, ঠাকুর তেমনি গৌরী-মাকে এবং তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে কলকাতায় মানুষ তৈরির কারখানা সৃষ্টি করতে বলে গেছেন। কলকাতার ছেলে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১ মে কলকাতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করলেন, পরে ঐ শহরের অদূরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন।

ধন্য শহর কলকাতা! শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের পাদস্পর্শে পবিত্র। তাঁদের লীলাভূমি ও ভাবীকালের মানুষদের তীর্থক্ষেত্র।

★ আকরপঞ্জী ★

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ৫ খণ্ড
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২ খণ্ড
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ২ খণ্ড
শ্রীশ্রীমায়ের কথা—২ খণ্ড
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২ খণ্ড
কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ
হাসির গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
লক্ষ্মীমণি দেবী—কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত
যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩ খণ্ড
শ্রীরামকৃষ্ণকথাসার—সঙ্কলক ঃ কুমারকৃষ্ণ নন্দী
রামকৃষ্ণ মিশনের মিনিটস বুক
গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ২য় ও ৯ম খণ্ড
শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ জীবন ও সাধনা—বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
পরমার্থপ্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ—সুশীলকুমার গুপ্ত
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ১ম খণ্ড

পথে-প্রান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মঠে-মন্দিরে ঘরে পূজার সিংহাসনে, প্রাচীর-গাত্রে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তিনি কেবল সেখানেই? তাঁর কথা ছিল, 'ঘরে ঘরে (আমার) পূজা হবে।' এখন আর তিনি কেবল ঘরে ঘরেই নাই। তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। পল্লীর চাষীর কুটিরে, ধনীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে, পাহাড়ীদের কুঠিরায়, শহরের ট্যাক্সিতে ট্যাক্সিতে, দোকানে দোকানে, চলতি মানুষের পকেটে পকেটে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পথ চলতে ভালবাসতেন। তিনি নিজে চলে অপরকে দেখাতেন কিভাবে পথে চলতে হয়। শরীর তাঁর পটু ছিল না, তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, নিতাই-গৌর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলিয়ে বেড়ালেন, আর আমি ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না। তবুও তিনি ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায়, হেঁটে, রেলে, গরুর গাড়িতে, পালকিতে—যেমনভাবে পারেন তাপিতপীড়িত, সংসারের আবর্তে ঘূর্ণিত মানুষকে উঠাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন। যেখানেই আন্তরিকতা-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করতেন, সেখানেই ছুটতেন। তার জন্য কোন নিমন্ত্রণ বা সামাজিকতার বালাই ছিল না। তাঁর অন্তরের ভাব ছিল ঃ"ওগো, তুমি ভক্ত; ঈশ্বরের চিন্তা কর—তাই তোমার কাছে এসেছি। 'আমি এসেছি'—ঐটুকুই ছিল যথেষ্ট। 'মানুষ এক পা এগুলে তিনি শত পা এগিয়ে আসেন।' আবার এমন ভক্তও ছিল—যিনি সগর্বে বলতেন, 'আমি এক পা-ও এগুইনি; তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) শত-সহস্র পা ফেলে আমার কাছে এসেছেন।'

যদিও জাগতিক ব্যাপারে তাঁর হুঁশ থাকত না, তবুও ব্যাকুল আত্মার সন্ধানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কোন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, 'হ্যাঁ গা, তুমি অনেকদিন যাও নাই কেন বল দেখি? তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায়?' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের ঠিকানা মনে গেঁথে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন—তাদের মঙ্গলকামনায়। কোন ক্ষুধার্ত উন্নতিপিপাসু আত্মার তীব্র আর্তি তাঁকে রাতদুপুরে টেনে নিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায়। যদি তার সঙ্গে দেখা করার কোন বিশেষ বিঘ্ন থাকত, তবে পরিচিত ভক্তের বাড়িতে বসে তাকে ডাকিয়ে এনে তার প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে তবে ফিরতেন।

মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিতে। স্মৃতিকে ধরে সে হাসে, কাঁদে, উঠে, চলে, জীবনের রস সম্ভোগ করে। স্মৃতি কখনো থাকে বিলীন, কখনো বা ভাস্বর—জীবনদোলায় সদ্য দোদুল্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূল শরীরে হয়তো আমরা এখন আর কামারপুকুর-

জয়রামবাটীর রাস্তায়, কাশী-বৃন্দাবন তীর্থপথে, কলকাতার অলিতে গলিতে, রাজপথে—দেখতে পাব না। তবুও তিনি যেসব পথে চলতেন সেসব পথ এখনো রয়েছে। আমরা দিনের পর দিন সেসব পথ দিয়ে কার্যব্যপদেশে ছুটে চলি, বেড়াই। সংসারের ভারে অবনত, অভাব-অনটনে জর্জরিত, আধি-ব্যাধিতে প্রপীড়িত আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঐসব ভাববার অবসর কোথায়? কেউ যদি চলার পথে বলে দেয়—এ-পথ মাড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গেছেন—তখন ক্ষণিকের জন্যও মনকে সেই অপূর্ব দেব-মানবের পুণ্যস্মৃতি দোলা দিয়ে যায়। ঠনঠনের বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের উপর 'শ্রীম' (মাস্টার মহাশয়) যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন তখন পথচারীরা ভাবত—এ-লোকটা পাগল। আর সেই পাগল জানত—এ-পথ দিয়ে স্বয়ং ভগবান বিচরণ করে গেছেন। এ-পথ দিয়ে চললে মানুষ যোগী হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন।

মাস্টার মহাশয় শুধু নিজে ভগবৎস্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন না, পরবর্তী কালের অগণিত মানুষের জন্য রেখে গেছেন অমর সব স্মৃতিচিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ 'কথামৃত' ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণের পথচিত্র সংগ্রহ করে আমরা অনুপম আনন্দ উপভোগ করব। স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। চলার পথে তাঁর হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন শুনব। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা ভেসে উঠবে—তা থেকে শিক্ষা নেব। অবশ্য তাঁর সঙ্গে চলা সব সময় সুখকর হবে না; কারণ দিব্যভাবে গর্গর মাতোয়ারা ব্যক্তিটির যখন তখন accident (দুর্ঘটনা) হতে পারে সে উদ্বেগে আমাদের কাল কাটাতে হবে। অগ্রে আমরা এ-বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাব।

এ প্রবন্ধটিকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছি—কামারপুকুর পর্ব, তীর্থযাত্রা পর্ব ও কলকাতা পর্ব। কলকাতা পর্বে কলকাতার আশেপাশের সব জায়গা ধরে নিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের পথ-প্রান্তরের চিত্রগুলি আমাদের মনকে তাঁর সান্নিধ্য পাইয়ে দেয় যদি, তবেই এ লেখা সার্থক হবে।

কামারপুকুর পর্ব

শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কামারপুকুরের নিভৃত পল্লীর ক্রোড়ে কেটেছে। সেখানকার পথ, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। তিনি আপনমনে প্রকৃতির সৌন্দর্যনিচয়ের সঙ্গে একাত্মভাবে অবস্থান করতেন। তিনি পুঁথিগত বিদ্যার স্কুল ছেড়ে দুরন্ত পড়াশুনায় মগ্ন হলেন। তিনি পাঠ করতেন বিশ্বপ্রকৃতিকে! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো আমাদের মতো অপরের বমি (অর্থাৎ চিন্তা) খাননি। তিনি নিজের মনগ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে পাঠ করতেন। আর মানুষ যখন নিজের মন পাঠ করতে শুরু করে তখনই প্রকৃত মজা শুরু হয়ে যায়। পরবর্তী কালে তাঁর শিক্ষার অধিকাংশ এসেছে এই প্রকৃতিপাঠের ফল থেকে। সংসারীদের থাকতে

হবে কিভাবে?—নর্তকীর মতো, যে মাথায় কলসী রেখে হেলে দুলে চলেছে। অথবা ঢেঁকিতে চিঁড়েতৈরিরতা নারীর মতো—যে এলে দিচ্ছে, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, ধান ভাজছে, খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলছে; কিন্তু অত কাজের মধ্যেও মন রয়েছে হাতের উপর। বক্তৃতা দিতে গেলে ঈশ্বরের হুকুম বা চাপরাশ চাই; সেখানে দিয়েছেন হালদার পুকুরের ঘাটপাড়ে সিপাই-এর নোটিস টাঙানোর দৃষ্টান্ত। এরূপ অজস্র ছবি শ্রীরামকৃষ্ণের অমর কথায় রূপ পেয়েছে।

তিনি ঘুরতেন মাঠে মাঠে। কখনো মাঠের পথে যেতেন দূরে কোন এক তীর্থযাত্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনে দুবার সমাধি হয়; আর দুবারই হয় দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে অনন্ত আকাশের নিচে। প্রথমবারের ঘটনা তাঁর আত্মকথায় ঃ 'ওদেশে ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় মুড়ি খেতে দেয়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মতো বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল।' রং তুলি দিয়ে এ দৃশ্য যতটা ফোটানো যেত, তার চেয়ে বেশি ফুটিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাশৈলী। পড়তে লাগলে মনে হয় ছবি দেখছি।

দ্বিতীয়বারের ঘটনা ঃ আপনমনে দেবতাদের পুণ্যকথা, লীলাকীর্তন, ভক্তিপূর্ণ ভজন গেয়ে বেড়াতেন তিনি পল্লীর পথে মাঠে। যারা শুনত, বলত, 'গদাইয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবয়সের নাম) গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি। গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।' গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে একদিন চললেন তিনি দূর গ্রাম 'আনুড়ে—দেবী বিশালাক্ষীদর্শনে। প্রান্তরের মধ্যেই ঘটল অভাবনীয় ঘটনা। দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে পড়লেন সংজ্ঞাহীন।

যুবক শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁতিনী-বেশে সন্ধ্যার সময় তাঁর কোন পরিচিত বন্ধু যদি কামারপুকুরের রাস্তায় দেখত—সে নিশ্চয়ই চিনতে পারত না। এমনই ছিল তাঁর নিপুণ বেশবিন্যাস এবং অনুকরণের ক্ষমতা। তিনি ঐভাবে পল্লীর দুর্গাদাস পাইনের অভিমান চূর্ণ করেন এবং নারীদের অবরোধপ্রথার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন ঃ 'অবরোধপ্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখনো কি রক্ষা করা যায়? সৎ শিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন।'

হালদার পুকুরের ঘাটে স্নানরতা নারীদের দর্শনে বালক গদাইকে কেউ যদি গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারতে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন, 'দেখতে নেই' বলে তিরস্কার করবেন। কিন্তু সেই তিরস্কারকারিণী বর্ষীয়সী রমণীর প্রতি বালকের সগর্ব উক্তি ছিল ঃ 'পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয়জনকে এবং আজ আটজনকে ঐরূপ করিয়াছি; কিন্তু কৈ আমার কিছুই তো হইল না।' পরে জননী চন্দ্রার

কথায় বালক নিরস্ত হন। নিজেকে তিনি যাচাই করে নিতেন। কেউ কিছু বললেই তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মনের গতিই ছিল সিদ্ধান্তাভিমুখী।

নিভৃত প্রান্তরে এক বৃক্ষমূলে কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি প্রেমকম্পিত হস্তে দণ্ডায়মান বালক গদাইয়ের গলায় বনফুলের মালা পরিয়ে মুখে বড় বড় জিলিপী গুঁজে দেয়—সে দৃশ্যটা নেহাত অসুন্দর নয়। বৃদ্ধ চিনু দরবিগলিত নয়নে বলে চলল আপন প্রাণের কথা ঃ 'গদাই, আমি বুড়ো হয়েছি, বেশি দিন বাঁচব না। তুমি এবারে যে কত লীলা খেলা করবে, তা দেখতেও পাব না। সে যাই হোক, গদাই, আমার তায় ক্ষোভ নাই, আমায় কৃপা কর, আমার জন্ম সার্থক কর।'

প্রত্যেক মানবশিশুই শৈশবে ক্রীড়াকৌতুক করে থাকে—এ-কথা সত্য। কিন্তু নূতন কাপড় ছিঁড়ে কৌপীন পরে তিলক কেটে সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত মানবশিশুর সংখ্যা জগতে বিরল। বয়স্যদের সঙ্গে তিনি মানিকরাজার আমবাগানে রামযাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করতেন। লোকে তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি ও দক্ষ অভিনয়ে মুগ্ধ হতো।

প্রত্যেক মানুষই পরিণত বয়সে বাল্যস্মৃতি মন্থন করতে ভালবাসে। তখন তাদের থামানই মুস্কিল। তরতর করে বেরুতে থাকে সুখ-দুঃখ-মাখানো সব পুরান কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ 'ওদেশে (কামারপুকুরে) সদাব্রত অতিথিশালা যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম। গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শোনাতুম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।' [১]

শ্রীরামকৃষ্ণের কোন জীবনীপাঠক যদি তাঁকে সেজেগুজে মালা-চন্দন পরে তিন চার মাইল পথ হেঁটে বা পালকিতে বিয়ে করতে যেতে দেখে—সে ব্যক্তি মজা দেখবার জন্য নিশ্চয়ই রাস্তার পাশে বর ও বরযাত্রীদের দেখবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অসংসারী ভগবানের সংসার একটা দর্শনীয় বস্তু বৈ কি! পুঁথি-প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণের এ বিবাহযাত্রার সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীসহ শিবের বিবাহযাত্রার এক হাস্যোদ্দীপক ছবি তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে দেশে মনে হয় তিনি বর্ধমানের পথ দিয়েই যেতেন; তাঁর কথাতে ঐরূপই প্রকাশ পায়। পথে যা যা ঘটত তিনি ভক্তদের কাছে অকপটে বিবৃত করতেন ঃ 'আচ্ছা, আমার এ কি অবস্থা বল দেখি? ওদেশে যাচ্ছি। বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়িতে বসে—এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি। আবার গাড়িতে সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গের লোকেরা বলল—এরা ডাকাত। আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনো রাম রাম বলছি, কখনো কালী কালী, কখনো হনুমান হনুমান সব রকম বলছি; এ কি রকম বল দেখি?' [২]

'ও-দেশ থেকে বর্ধমান আসতে আসতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম—বলি

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫/৫৬-৬৬ ২ তদেব, ৩/৩৮

দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে। গিয়ে দেখি মাঠে মাঠে পিঁপড়ে চলেছে! সব স্থানই চৈতন্যময়।' [৩]

জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণকে একাধিকবার টানাটানি করা হয়েছে। তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কখনো জমি রেজিষ্ট্রি ব্যাপারে, কখনো বা মামলার সাক্ষ্য দিতে। পাঠক হয়তো এটাকে তাজ্জব ব্যাপার মনে করছেন—তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তুলে ধরছি। তাঁর সব কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জাগতিক মানুষের বন্ধনছেদের দিগ্‌দর্শন ঃ "আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজিষ্ট্রি করতে গিছলাম। আমায় সই করতে বললে, আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নেই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল।" [৪]

একবার হৃদয়ের ভাই রাজারামের সঙ্গে সিহড় গ্রামের এক ব্যক্তির মারামারি হয়। রাজারাম তার মাথায় আঘাত করলে সে বিষ্ণুপুরে গিয়ে ফৌজদারী মামলা রুজুকরে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষী মানে। সে জানত শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও রাজারামের মামা তবুও তিনি সত্যবাদী এবং সত্য সাক্ষ্য দেবেন। উপায় ছিল না। কোর্টের পরোয়ানা। তাই ঠাকুরকে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে সুদূর পথ অতিক্রম করতে হলো। তারপর ঠাকুরের তিরস্কার খেয়ে, ভয় পেয়ে রাজারাম মামলা মিটিয়ে নিল; আর তাঁকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে হলো না। ঐ অবসরে তিনি বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ও মৃন্ময়ী দর্শন করেন।[৫]

পরমহংসের স্বভাব বালকের মতো। আমরা যা সব অচেতন দেখি, সবকে চৈতন্যময় দেখে বালক। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা ঃ "পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতো। সব চৈতন্যময় দেখে। যখন আমি ওদেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪/৫ বছর বয়স—পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে—আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে, 'চোপ। আমি ফড়িং ধরব।' ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না। উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে বিদ্যুৎ—আর বলছে, 'খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকছে'।" ফড়িং ধরা, বিদ্যুৎ চমকানো আর চকমকি ঠোকার ভেতর দিয়ে আমরা পরমহংসচরিত্রের ছবি পেলাম।

সিহড়ের রাস্তায় শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি কোন ক্রন্দনরত বালকের সঙ্গে "মা-বাবা যাব" বলে কেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে দেখেন তবে পাঠকের আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। কারণ তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন হয়েছে ব্যাকুলতা আর অশ্রুর দ্বারাই। দেশে গেলে তিনি সিহড়েও যেতেন বেড়াতে। গ্রামের রাস্তার দুপাশে বনবীথি শহরের ইটের পর ইট দিয়ে সাজানো বাড়ির চেয়ে তাঁর ভাল লাগত। তিনি কখনো যেতেন হেঁটে, কখনো বা পালকিতে। একবার পালকি করে যাবার কালে তিনি দেখেন তাঁর ভিতর থেকে দুটি সুন্দর কিশোর বালক বেরিয়ে এল। তাঁরা কখনো বনমধ্যে বিচরণ, কখনো বা হাস্য-পরিহাস,

---

৩ তদেব, ৪/৪৩ ৪ তদেব, ৪/৬০ ৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২

কথোপকথন করতে করতে তাঁর সঙ্গে চলল। আবার তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঢুকে গেল। এই দর্শনের কথা শুনে পরবর্তী কালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেছিলেন, "বাবা, এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে তোমার ভিতর রয়েছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর ছিল এক অসম্ভব আকর্ষণী শক্তি। আর এই শক্তির জন্য তাঁর কাছে পিল পিল করে পিঁপড়ের সারের মতো লোক আসত। তাঁকে খেতে শুতে দিত না। দূরের সব গ্রাম থেকে "তাকুটী তাকুটী" করে খোল বাজাতে বাজাতে আসত সব কীর্তনীয়া। পল্লীর প্রান্তরে চলত রাতদিন কীর্তন। পাঁচিলে—গাছে লোক উঠে দেখত। এতই ছিল ভিড়। লাগ ভেল্কি লাগ! হরিলীলায় যোগমায়ার আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিড় সহ্য করতে না পেরে গ্রামের তাঁতীদের বাড়িতে আত্মগোপন করতেন—কিন্তু রেহাই ছিল না। তারপর পাছে তাঁর সর্দিগর্মি উপস্থিত হয়—তাই সেবক হৃদয় চুপি চুপি তাঁকে টেনে নিয়ে যেত খোলামাঠে। তাতেও যখন অব্যাহতি হলো না তখন রাতের অন্ধকারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেশে যেতেন, বিকালে ঘাটপাড়ে মা চন্দ্রমণির সঙ্গে ছোট বালকটির মতো বসে থাকতেন। মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসত, আর তাঁকে ঘিরে সব কথা শুনত। গদাইয়ের কথা শুনবার জন্য কেউ বা দু-মাসের গরুর জাব কেটে রাখত, কেউ বা বোনের কাছে কোলের বাচ্চাকে রেখে এসে ঘাটপাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেত।[৬]

তাঁকে দেখবার জন্য অনেক সময় রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ তিনি যখন বেরুতেন, হৃদয়ের ভাষায় "অপূর্ব দেখাত।" তিনি একদিন "তুচ্ছ হাড়মাসের খাঁচাদর্শনকারীদের" ধিক্কার দিয়ে ক্ষোভে পথে বেরুনো বন্ধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাসে কোন ভেজাল ছিল না। তিনি সবার কথা শুনতেন এবং এই শোনার দরুন অনেক সময় হিতে বিপরীত হতো। বিপরীত হলে তিনি আর সেই ব্যক্তির কথা নিতেন না। তাঁর সরল উক্তি ঃ "কামারপুকুরের ঘাসবনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম সাপে যদি আবার কামড়ায়, তাহলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বললে—ও কি কচ্ছেন? সাপ যদি সেইখানটায় আবার কামড়ায় তাহলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।"[৭]

"শরতের হিম ভাল শুনেছিলাম। কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলাম।" তারপর সর্দি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। তখনকার দিনে গাড়ি ঘোড়া কম ছিল, তাই বাঁচোয়া। এখনকার দিন হলে তাঁর মাথা ভেঙে যেত বাস বা লরীর ধাক্কায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পথ দিয়ে চলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। পথের কোন বিশেষ অংশের সঙ্গে যদি কোন ইতিবৃত্ত জড়ানো থাকত—তাও জেনে নিতেন। তারপর শুরু হতো সব গল্প

৬ Days in an Indian Monastery, Devamata

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/১৯১

তাঁর সেই তুলনাহীন ভঙ্গিতে ঃ "তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ওদেশে যাবার রাস্তায় রঞ্জিত রায়ের দীঘি আছে। রঞ্জিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন। এখনো চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়।" তারপর শুরু হলো সেই অপূর্ব কাহিনী। অতি সংক্ষেপে রূপ তুলে ধরছি। রঞ্জিত রায় জমিদার। তপস্যার জোরে সর্বগুণে বিভূষিতা ভগবতী কন্যা পান। একদিন ব্যস্ততার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে মেয়েকে "তুই এখান থেকে দূর হ" বলে গাল দেন। কন্যা বিদায় নিল। পথে এক শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পড়ে বাড়িতে কুলুঙ্গি থেকে টাকা নিতে বলে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। যখন বাপ সব জানলেন তখন কেঁদে আকুল হলেন এবং শেষবারের মতো দীঘির মধ্য থেকে কন্যার শাঁখাপরা হাতটি দেখলেন। সেই শেষ দেখা। বারুণীর দিনে সেই থেকে সেখানে ভগবতীপূজা এবং তদুপলক্ষে মেলা হয়।[৮]

ভক্তেরা কেউ ঈশ্বরদর্শনের পথ কি—উপায় কি—জিজ্ঞাসা করা মাত্র তিনি পথের উদাহরণ দিয়ে সব উত্তর দিতেন। সবাই বুঝত তাঁর কথা। তিনি গাঁয়ের পথ ও শহরের পথ—সব পথ দেখে চরম পথের কথা বলে দিতেন। "তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা করতে হয়। বিষয়চিন্তা যত পার ত্যাগ করতে হয়। তুমি চাষ করবার জন্য ক্ষেতে অনেক কষ্টে জল আনছ, কিন্তু ঘোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা বৃথা পরিশ্রম হলো।"

"চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে ব্যাকুলতা আসবে; তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবে। Telegraph-এর তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌঁছুবে না।" [৯]

ভগবানলাভ করলে সাধকের কি অবস্থা হয়? তাও সেই পথ-ঘাট, ঝোপ-ঝাড়ে যা দেখেছেন—তাই তিনি বলে চলেছেন ঃ "যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে তার শুচি অশুচি বোধ থাকে না। হয়তো বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মতো। তাঁর 'আমিটা' নাম মাত্র থাকে—যেমন নারকেলের বেল্লোর দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে—এখন কেবল দাগ মাত্র।" [১০]

আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে আমরা কামারপুকুর পর্ব শেষ করব। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেউ যদি সাহায্য চাইত বা শরণ নিত তার আর ভাবনা ছিল না—সে মানুষই হোক বা ইতর প্রাণীই হোক। ঠাকুর একদিন বর্ষাকালে জলপ্লাবিত পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একটা মাগুর মাছ উজিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করছে দেখে তিনি তাকে তুলে লাহাদের পুকুরে ছেড়ে দেন। হৃদয় সব শুনে বলল ঃ "মামা, ছেড়ে দিয়ে এলে? আনলে ঝোল রেঁধে খাওয়া যেত।" প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "নারে হৃদু, ও যে আমার শরণ নিয়েছে।" শরণাগতি থেকে মুক্তি।[১১]

তীর্থযাত্রা পর্ব

'তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি'—তীর্থযাত্রীরাই তীর্থ সৃষ্টি করে। মানুষ যুগযুগ ধরে জপ-তপ,

৮ তদেব, ৪/২২১; ৯ তদেব, ৫/১৪৯; ১০ তদেব, ৫/১৬২-৬৩; ১১ মাতৃসান্নিধ্যে পৃঃ, ২৪৫

ধ্যান-ধারণা, প্রার্থনা-উপাসনার দ্বারা তীর্থক্ষেত্রে একটা জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করে। তাই সেখানে গেলে সহজেই উদ্দীপন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ ''ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বেশি প্রকাশ। যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর ও হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না। যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, এই রকম।''

পাঠক লক্ষ্য করবেন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান আমাদের মতো কেবল পুঁথিপত্র থেকে আসছে না—আসছে পথ-প্রান্তর থেকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখি সত্যকামের জ্ঞান আসছে ষাঁড়, অগ্নি, হাঁস, মদ্‌গুপাখি থেকে। ঠাকুরের জীবনেও আমরা উপনিষদের পুনরাবৃত্তি দেখি ঃ ''ঝাউতলা থেকে আসছি। পঞ্চবটীর দিকে দেখি সঙ্গে একটা কুকুর আসছে। তখন পঞ্চবটীর কাছে দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান।'' [১২]

এ জগতে শুভকর্মে সব সময়ই বাধা পড়ে। তাই তীর্থযাত্রা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে একটা মধুর কোন্দল সৃষ্টি হলো। জগদম্বা মথুরকে বললে—হ্যাঁ গা, চল না আমরা তীর্থ করে আসি।

মথুর—তীর্থে গিয়ে কি হবে? যদি ঠাকুর-দেবতা দেখতে যেতে হয়, তো বাবাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখলেই হলো। আমার তো ওসব ভাল লাগে না; আমার মনে হয় ওতে কেবল কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ আর শরীরের কষ্ট। যাঁকে দেখলে সর্ব তীর্থের ফল হয়, যাঁর কটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে, সেই তিনি আমার ঘরে। তাঁকে ফেলে কোথায় যাব! আমি তো কোথাও যাচ্ছি না, তোমার যেতে ইচ্ছা হয় নিজে যাও। আমি যাব না।

জগদম্বা—তা কেন? বাবাকে ফেলে যাবে কেন? বাবাকেও নিয়ে চল।

মথুর—বেশ, বাবা যান তো যাব।

আদুরে মেয়ে যেমন ছুটতে ছুটতে নিজের বাবার কাছে কিছু আদায় করতে দৌড়ে যায়, তেমনি স্বামীর কথা শুনে জগদম্বা ঠাকুরের কাছে দ্রুত গিয়ে বলল, ''বাবা, আপনি যেতে রাজি হন। আপনি না গেলে হবে না, বাবা''। কি করেন আর তিনি, ভক্তের কাতরতা দেখে সম্মতি দিলেন।

শুরু হলো তীর্থযাত্রার আয়োজন। মথুরের আপত্তি পরিণত হলো উৎসাহে। তিনখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি, পাচক-ব্রাহ্মণ, দাস-দাসী, দারোয়ানদের জন্য এবং একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ, হৃদয় ও মথুরের পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট হলো। মোট যাত্রীর সংখ্যা হলো একশ এবং তীর্থযাত্রায় ব্যয় হয়েছিল তখনকার দিনে লক্ষ টাকার উপর।

প্রথম তীর্থ বৈদ্যনাথধাম। সাঁওতাল পরগনার এক পল্লীতে অর্ধনগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষুধায় কাতর সর্বহারাদের মধ্যে বসে শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি কেউ কাঁদতে দেখেন, তিনি হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন এসব কি? বাবা তো দিব্যি ধনী মথুরের সঙ্গে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন; বেশ বিলাসের সঙ্গে কাটাবেন। তা না কতকগুলি নিঃস্ব মানুষের দুঃখমোচনের জন্য ধনীর

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫/১০২

কাছে আবেদন-নিবেদন, তারপর "এদের ফেলে যাব না তীর্থে" বলে অবস্থান ধর্মঘট! হাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতেন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা। তাঁদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কাঁদতেন মায়ের কাছে। আর সেই দেবমানবের অশ্রুজড়ানো প্রার্থনা কি বিফল হবার? তিনি শুধু ধনী মথুরের আরাধিত নন, ঐ সর্বহারাদেরও দরদী।

পথে চলতে গেলে train fail, accident—এসব হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণও এসব ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। কাশী যাবার পথে মোগলসরাইয়ের এক স্টেশন আগে তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে কার্যান্তরে নামতে হয়। এমন সময় ট্রেন দিল ছেড়ে। মথুর বন্দোবস্ত মতো তাঁর রিজার্ভ কামরাগুলিকে কেটে দিতে বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পারলেন না। ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠে কাশীতে পৌঁছে 'তার' করলেন যাতে পরবর্তী ট্রেনে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবাকে ফেলে শূন্য মনে মথুর কাশীধামে নামলেন। অবশ্য পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। রেলের জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী, বাগবাজার নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি স্পেশাল গাড়িতে করে ঠাকুর ও হৃদয়কে কাশীধামে পৌঁছে দেন।

প্রবাদ আছে—ভারতবর্ষে যতদিন শিবপুরী কাশী থাকবে ততদিন ভারত থেকে কেউ ধর্ম সরাতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকাযোগে বারাণসী প্রবেশকালে ভাবচক্ষে দেখেন যে, শিবপুরী বাস্তবিকই সুবর্ণনির্মিত। যুগ-যুগান্তর ধরে সাধুভক্তদের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়েই এই কাশী স্বর্ণময়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন তো কথার কথা নয়। দর্শনের ফলে দেখা দিল আর এক দুর্ভাবনা। তাই তো, শৌচাদির দ্বারা কি করে তিনি এই সুবর্ণপুরীকে অপবিত্র করেন! তাঁর চোখে তো কাশী পথ, ঘাট, মাঠ, বাগান, মঠ; কূপ, তড়াগ সব জ্বল জ্বল করছে। এ তো ইট-কাঠ-মাটির পৃথিবী নয়। "তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পালকির বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসীর পারে গমন ও তথায় (বারাণসীর বাহিরে) শৌচাদি সারিয়া আসিতেন। পরে ঐ ভাবের বিরামে আর ঐরূপ করিতে হইত না।" [১৩]

প্রতিদিন প্রভাতে মথুর বাবাকে একখানি পালকিতে লইয়া, একপাশে নিজে অপরপাশে হৃদয় এবং আগে পিছে বহুসংখ্যক রৌপ্যমণ্ডিত ছত্রদণ্ডধারী দারোয়ান সমভিব্যাহারে দেবদেবীদর্শনে যেতেন। এ ছিল এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। ধনীর বেশে সুসজ্জিত মথুরকে মনে হতো বাবার দেহরক্ষী। যাঁর জন্য এত সব—তাঁর অবস্থা? কখনো অন্তর্দশা, কখনো অর্ধবাহ্যদশা। আপনভাবে বিভোর। হৃদয় জোর করে হাত ধরে মন্দিরে মন্দিরে নিয়ে যেত। কেদারনাথের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অধিক গভীর হতো।

মথুর বাবাকে নিয়ে নৌকায় কাশীর গঙ্গাবক্ষে ঘুরে বেড়াতেন। মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে এসে হঠাৎ ঠাকুর আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে ছুটে নৌকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মারাত্মক accident-এর ভয়ে মথুরের পাণ্ডারা, মাঝিমাল্লারা ছুটল ধরতে। তার প্রয়োজন হলো না। তিনি আপনভাবে হাসিমুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শনে মশগুল

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/১২৮-২৯

হয়ে রইলেন। বাবার ভাব বোঝা মুশকিল; তাই মথুর ও হৃদয় দুই দুরন্ত দেহরক্ষী তাঁকে ঘিরে রইল। মথুর যে কিভাবে তীর্থ করেছিলেন তা তিনিই জানেন। বাবার কখন কি ঘটে যাবে—সেই ভাবনাই তাঁর ভাবনা। তীর্থযাত্রার আগে তাই স্ত্রীকে বলেছিলেন, "বাবাই সব তীর্থ।" বাবার আবদার মিটাতে মথুর কখনো কার্পণ্য করেননি।

সাধারণ মানুষ উপকারী ধনী-মানী ব্যক্তির সামনে তাঁর দোষ বলা তো দূরের কথা, একটা কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত সঙ্কোচের মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ও-বালাই ছিল না। তুমি বড়লোক হতে পার তাতে কি আসে যায়। তিনি ধনীর ধার ধারতেন না। সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তীর্থে মথুরের মুখে বিষয়ের কথা শুনে তিনি তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়েছেন ঃ "আমায় তীর্থে এনে এ কোথায় রাখলি, মা? আমি দক্ষিণেশ্বরে তো বেশ ছিলুম। সেখানে কেমন সৎ চর্চা হতো। আর এখানে কি না, কেবল রাতদিন সাংসারিক কথা। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, মা। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।"

বন্ধুকে বন্ধু অভ্যর্থনা করে নানাভাবে। আলিঙ্গন, করমর্দন, নেশার বস্তু নিবেদন প্রভৃতি বহু রীতি আছে। পরমহংস ত্রৈলঙ্গস্বামী পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করেছিলেন এক টিপ নস্য দিয়ে। স্বামীজীকে সম্মান দেবার জন্য তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মিলন হয় মণিকর্ণিকার ঘাটে। ঐ ঘাটেই তিনি মৌনী হয়ে পড়ে থাকতেন। তিনি তখন গঙ্গার ধারে একটা ঘাট বাঁধাচ্ছিলেন। হৃদয়কে হৃষ্টপুষ্ট দেখে তিনি তাকে ইশারা করে চার কোদাল মাটি দিতে বলেন। হৃদয় প্রথমে অসম্মত, পরে ঠাকুরের অনুরোধে মাটি কেটে দেন।

প্রয়াগের পথে অঘটন কিছু ঘটেনি। প্রয়াগ সম্বন্ধে তাঁর একটি মাত্র মন্তব্য আছে ঃ "পইরাগে গিয়ে দেখলাম সেই পুকুর, সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা।" কেবল পার্থক্য দেখেছিলেন পশ্চিমের লোকের হজমশক্তির। প্রয়াগে প্রথামত মথুর প্রভৃতি মুণ্ডন করেন; কিন্তু ঠাকুর ওসব কিছু করেননি। সন্ন্যাসী সব প্রথার পারে, তাই তাঁর ওসব প্রয়োজন ছিল না।

ব্রজের পথ, মাঠ, ঘাট শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। সেখানে বিলাস-বিভব নেই, কপটতা নেই, বিষয়োন্মুখতা নেই—সে জায়গা শ্রীরামকৃষ্ণের মনঃপূত হবেই হবে। এ ব্রজমণ্ডল ঐশ্বর্যময় রাজা কৃষ্ণের নয়, নিরৈশ্বর্য বালকৃষ্ণের লীলাভূমি। ব্রজের অনুপম শোভা, ফলফুলে শোভিত বনরাজি, বনমধ্যে মৃগ ও ময়ূরেব নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু-তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় দিনযাপন, ব্রজবাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার, কালিন্দীর দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত তটভূমি আর তার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পরিক্রমার পথ—এসব মিলে শ্রীরামকৃষ্ণের উদাসী মনকে আরও বিহ্বল করে তুলেছিল। আমরা এবার ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শুনব তাঁর ব্রজতীর্থের কথা ঃ "মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলাম, অমনি দপ্‌ করে দর্শন হলো বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন।

যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর, বড় কুলগাছ, গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। যাই দেখা, আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো। উন্মত্তের ন্যায়—কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ—বলে বেহুঁশ হয়ে গেলাম।" [১৪]

এবার আমরা শুনব সেই অপূর্ব ছড়ার কথা ঃ "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন। মধুর মধুর বংশী বাজে (এই সে) বৃন্দাবন।" বাবা বায়না ধরলেন, "আমি বীণা শুনব।" মথুর তাঁকে খুশি করবার জন্য খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভাল বীণকার বৃন্দাবনে পাওয়া গেল না। তারপর কলকাতায় ফিরবার কালে সেই বীণা তিনি কাশীর মদনপুরায় অভিজ্ঞ বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের কাছে শোনেন। মধুর বংশী যখন শোনা হলো না, তখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন তো বাদ যেতে পারে না। বৃন্দাবনে তাঁহার বাসস্থান ছিল নিধুবনের কাছে। সেখান থেকে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড অনেক দূর। মথুর বাবার জন্য পালকি ঠিক করে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা ঃ "শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পালকি করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ—লুচি জিলিপি পালকির ভিতর দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম—কৃষ্ণ রে, তুই নাই কিন্তু সেইসব রয়েছে—সেই মাঠ, তুমি গরু চরাতে। হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিছলো—খুব হুঁশিয়ার! আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডর পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম। দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ির মতো করেছে। তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন-ভজন কচ্ছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশবন দেখবার উপযুক্ত।" [১৫]

বৃন্দাবনে ঠাকুর ভেক ধারণ করেছিলেন ১৫ দিন ধরে। কালীয়দমন ঘাটে হৃদয় তাঁকে রোজ স্নান করাতে নিয়ে যেত। তিনি চেয়েছিলেন বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে। বালককে যেমন নানারূপ ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়, মথুরও তেমনি পরিক্রমার নানারূপ কষ্টের কথা বলে ঠাকুরকে নিরস্ত করেন।

নিধুবনের সামনে রাস্তার উপর বা বাগানের ভিতর কেউ যদি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের এক হাত ধরে এক বর্ষীয়সী নারী "আমার দুলালী" বলে টানছে, আর অপর হাত এক জোয়ান মদ্দ "আমার মামা" বলে টানছে—তিনি নিশ্চয়ই মজার ব্যাপার দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। মথুরেরও আশঙ্কা হয়েছিল—তাই তো বাবা যদি বৃদ্ধা গঙ্গা-মার শ্রদ্ধা ও যত্নে বশীভূত হয়ে এখানে থেকে যান—তবে আমার উপায়! তিনি হৃদয়কে বলেন, "ভাই হৃদু, বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর।" হৃদয়—"তুমি ভেবো না, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাব।" তারপর শুরু হলো টানা হেঁচড়া আর ঝগড়া। হৃদয় ভয় দেখালে মামাকে যে তাঁর পেটের অসুখ হলে কে দেখবে? গঙ্গা-মা বললেন—"আমি

---

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/৫০ ১৫ তদেব. ৪/৩০

দেখব।" তারপর ঠাকুরের নিজের গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়ায় তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম হলো।

দূরপাল্লার পথে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া মুশকিল ছিল। 'একা একশ' মথুরই বাবার ঝক্কি পোহাতে পারতেন। বাবা সঙ্গে না থাকলে তিনি নিজেকে সঙ্গীহীন ও শূন্য বোধ করতেন। তখনকার দিনে বড়লোকদের একটা ফ্যাশান ছিল বজরায় গঙ্গাবক্ষে হাওয়া খাওয়া। মথুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। "সেজবাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সেজবাবু বলল, বাবা, ওখানে কি করছ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজবাবু বুঝেছে, ইনি এবার চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, বাবা, সরে এস, সরে এস!" [১৬] মথুর ভালবাসতেন তাঁর বাবাকে। এমনকি পীরসাধনকালে হিন্দু বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে খাইয়েছেন, সুতরাং মুসলমান মাঝির রান্না খাবার বায়না উঠবার আগেই বাবাকে সরিয়ে নিয়েছেন।

কাশীর মতো নবদ্বীপেও নৌকার উপর থেকে পড়ে ঠাকুর দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়ঃ "দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে হাসতে হাসতে নিকটে এসে এর (নিজের শরীর) ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেললে।" মথুরের সঙ্গে কালনায় ভগবান দাস বাবাজীকেও দেখতে যান।

বাবা হলেন নিজের লোক। তাই তাঁকে নিয়ে একঘরে শোয়া থেকে নিজের জন্মস্থান সুদূর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সোনাবেড়ে গ্রাম, নিজের জমিদারি রাণাঘাটের কলাইঘাটা গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় মথুর তাঁকে নিয়ে ঘোরেন। বাবার হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হতো। গ্রামের বাড়িতে যাবার কালে মথুর ঠাকুরের জন্য পালকি এবং নিজের জন্য হাতি ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাবার বায়না "আমি হাতিতে চড়ব।" ব্যস, বাবা হাতির পিঠে উঠে হেলে দুলে চললেন বালকের মতো সগর্বে সানন্দে।

রাণাঘাটে এসে মানুষের—দুঃখ দেখে বাবার হুকুম হলোঃ "এই গরিব প্রজাদের এক মাথা করে তেল, একখানা করে নূতন কাপড়, এক পেট করে খাবার এবং এক বছরের খাজনা মকুব করে দাও।" সে-কথার দ্বিরুক্তি করে কার সাধ্য! বিষয়ী মথুর ওজর-আপত্তি তুললে ঠাকুর বললেন, "তুমি মায়ের ভাঁড়ারীমাত্র! দীন-দুঃখীর সেবার জন্য মায়ের ঐশ্বর্য তোমার ঘরে।" লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন রাসমণির মন্দিরে ৭টাকা বেতনের পুরোহিত কর্মচারী মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মনেপ্রাণে মায়ের ছেলে আর মথুর 'মায়ের ভাঁড়ারি' মাত্র। সুতরাং 'মা আনন্দময়ীর রাজ্যে এত দুঃখকষ্ট' বোঝার ক্ষমতা পুত্রের অধিক এবং মায়ের কর্মচারীকে আদেশ করবার অধিকারও তাঁর।

---

১৬ তদেব, ২/১৪৪

কলকাতা-পর্ব

সমাজ-সামাজিকতা, বিধি-নিষেধ, আদবকায়দা, আইন-শৃঙ্খলা—এসব মানুষের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, সীমিত করে, জীবনযাত্রাকে যন্ত্রবৎ চালিত করে। স্বাধীনতার নামগন্ধ থাকে না যে জীবনে—সে কি আবার জীবন! তাই শহুরে সভ্যতা—কাপুড়ে সভ্যতা, যান্ত্রিক সভ্যতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ-সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি চলতেন আপন মনে। অপরের ভালমন্দ বলার তোয়াক্কা রাখতেন না। তিনি কোনদিন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চলেননি, চলেছিলেন তাঁর চির-আরাধিত মা জগদম্বার মুখপানে চেয়ে। বয়সে প্রৌঢ় হলেও তিনি ছিলেন জগদম্বার ক্রোড়ে ক্রীড়ারত শিশু।

কলকাতার রাজপথে তখন বইছিল এক দুরন্ত ঝড়। সে ঝড়ের উৎপত্তিস্থান ছিল জড়বাদী পাশ্চাত্য জগৎ। সেই ঝড়ের ধুলোবালি ছিল ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগলিপ্সা; গতি ছিল কামকাঞ্চনাসক্তির দিকে। ঐ ঝড়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, কামোন্মত্ততা, মদালুতা তোলপাড় করছিল ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র কলকাতাকে। ঐ ভোগের ঝড়ে তদানীন্তন সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ আপসের দ্বারা ঘরের ভিতর বসে চেষ্টা করছিলেন ঐ ঝড় রুখবার। কিন্তু ঐ দারুণ সাইক্লোন থামানো পিছন-টানা সংসারী ঘরমুখো মানুষের ক্ষমতার বাইরে ছিল। প্রয়োজন ছিল এমন একজন সাহসী বন্ধনহীন মানুষের, যে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে যুঝতে পারে, কলঙ্কের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক থাকবার হিম্মত রাখে। গড়ের মাঠে সাহেবপাড়ায় ঘুরে, গোরাপল্টনদের কেল্লার মধ্যে ঢুকে, লাটসাহেবের বাড়িকে চুনসুরকির ঢিপি বলে ধিক্কার দিয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধা রাখে। যুগ-প্রয়োজন মিটাতে এবং বিষয়রসকে বৈরাগ্যবহ্নি দিয়ে পোড়াতে এসেছিলেন ত্যাগীর বাদশা শ্রীরামকৃষ্ণ।

কলকাতার মানুষগুলোকে দেখলেন তিনি—কিলবিল করছে। সেইসব মানুষকে টেনে তোলবার কাজে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হতো কলকাতার পথে, মাঠে, ঘাটে, থিয়েটারে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না যায় মহম্মদকেই পাহাড়ের কাছে যেতে হবে। এ দায় কার? নিজের দেহ ভুলে কয়জন লোক তিল তিল করে অপরের জন্য দেহপাত করতে পারেন? এ দায় মানুষের নয়। স্বয়ং ভগবানের। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা : "সরকারি লোক—তাঁকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হবে সেখানেই তখন গোল থামাতে ছুটতে হবে।" [১৭]

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ঠিক করে নিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন পথ ধরে বেড়াতে যাব; কিন্তু কোন বাড়িতে ঢুকব না। কখনো ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে, কখনো বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার মতো লক্ষ্য করব দেবমানবের অপূর্ব গতিবিধি। অনিমন্ত্রিত হয়ে কারও বাড়ি যাওয়া দূষণীয় হতে পারে কিন্তু পথ তো সকলের। সেখানে সবাই স্বাধীন। তাই আমরা স্বাধীনভাবে তাঁর পথ-সান্নিধ্য ও পথ-কথাতেই তৃপ্ত থাকব।

এবার আমরা শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শরণ নেব ঠাকুরের পথচিত্র ও

---

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২০৭

অমৃতোপম কথা শুনবার জন্য।

৫ আগস্ট ১৮৮২

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ি করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ি রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাস্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "এইটি রামমোহন রায়ের বাটী" ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—"এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না।" ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

ঠাকুর গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। মাস্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ-করা চটি-জুতা। মাস্টার বলিলেন, "আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।" বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাড়ির ভিতর অনেক সব কথাবার্তা হয়েছিল। পথঘাটের কথাও হয়েছে। "ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না"—এ-কথা বোঝাতে ঠাকুর নুনের পুতুলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সমুদ্র মাপতে গিয়ে নিজেই গলে গেল। খবর দেওয়া আর হলো না। সমাধিমান পুরুষের কথা বলতে গিয়ে ঘাটপাড়ে মেয়েদের কলসিতে জলভরার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পুকুরে কলসিতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর হয় না।

বিদ্যাসাগর হাতে বাতি নিয়ে ঠাকুরকে তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে চলেছেন। ঠাকুর ফটকের কাছে এসে গাড়িতে উঠলেন। বিদ্যাসাগর গাড়ি-ভাড়া দিতে চাইলেন। নেওয়া হলো না। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলল। সকলে গাড়ির অদর্শন পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে। দর্শকের ভাবনাঃ কে এ মহাপুরুষ?—যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন আর বলছেন—ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

২৭ অক্টোবর ১৮৮২

কথামৃতের প্রথম ভাগের প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের কেশব ও বিজয়াদি ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে জাহাজ-ভ্রমণের উল্লেখ আছে। কেশবের সঙ্গে ঠাকুর দু-বার জাহাজে ভ্রমণ করেন।

প্রথমবার ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এদিন কেশবের সঙ্গে ছিলেন Joseph Cook, আমেরিকান পাদরি Miss Pigot, Tribune-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (কুচবিহারের রাজকুমার), প্রতাপ মজুমদার ও আরও অনেক ব্রাহ্মভক্ত। "প্রতাপ, কুকসাহেব আমার অবস্থা দেখে বললে, 'বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে।' "

দ্বিতীয়বারের (২৭/১০/১৮৮২) বর্ণনা ঃ জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ি আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার ও দু-একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়িতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাইবেন।

গাড়িতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ তিনি কৈ অর্থাৎ কেশব কৈ?" দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে এঁর সঙ্গে যাবে?" সকলে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন।

গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজ টোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুইধারে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়ম, পিয়ানো-সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বলিলেন, "আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?" কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকটে গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন। কাঁচের গ্লাসে জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটা ধোয়া তো?" নন্দলাল বলিলেন, "হাঁ।" ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

বালকের স্বভাব! গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন, গাড়িঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

ঠাকুরের উপরোক্ত চিত্রখানিতে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেউ যদি এখন স্ট্র্যাণ্ড রোডে, ইডেন গার্ডেন ও আকাশবাণীর সামনে দিয়ে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে যান, নিশ্চয়ই তিনি মানস চক্ষে দেখবেন যে একশ-বছর আগে ঠাকুর এ পথ দিয়ে কিভাবে গিছলেন। তাঁর পথে চলা অনেক মুশকিল ছিল। তখন তো আর মথুর নেই। ঠাকুরের গাড়িভাড়া ভক্তেরাই যোগাতেন। সেদিনকার গাড়িভাড়ার জন্য সিমলের সুরেন্দ্রের বাড়িতে হাজির হন। কিন্তু তিনি বাড়িতে না থাকায় জনৈক ভক্তকে বললেন, "ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরল স্বচ্ছ উক্তি আনন্দ ও হাসির ফোয়ারা বইয়ে দিল। তাঁর সরস গল্পগুজব পথে চলার ক্লান্তি দূর করে দিত।

১৫ নভেম্বর ১৮৮২

শ্রীরামকৃষ্ণকে এবার আমরা এমন এক জায়গায় দেখব যে সবার বিস্ময় লাগবে।

কোন ভক্ত হয়তো একটু মজা করে বলবেন ঃ বাপ রে বাপ! কী শখটাই না ছিল ঠাকুরের! আমরা যেমন দল বেঁধে কোন থিয়েটার বা প্রদর্শনী দেখতে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করি, ঠাকুরও ঐরূপ করছেন। সম্পূর্ণ ছবিটা আমরা 'কথামৃত' থেকে তুলে ধরছি ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের দ্বারে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। বেলা তিনটা হইবে। গাড়িতে মাস্টারকে তুলিয়া লইলেন। গাড়ি ক্রমে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়—মাতালের ন্যায়— গাড়ির একবার এধার একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দেখিতেছেন আর পথিকদের উদ্দেশে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, "দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি, পেটের জন্য সব যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই!"

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, "বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়।"

রঙ্গস্থলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার ring (চক্র)। রিং-এর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিংএর নিচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রিংএর মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্ বন্ করিয়া ঐ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও আবার ঐরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া।

সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ির কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত দিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। একজন ভক্তের হাতে বেটুয়াটি (মশলার ছোট থলেটি) রহিয়াছে। তাহাতে মশলা বিশেষত কাবাবচিনি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন, "দেখলে, বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্ বন্ করে দৌড়চ্ছে! কত কঠিন, অনেক দিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত পা ভেঙে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে।"

এখন গড়ের মাঠে কত প্যাভেলিয়ন হয়েছে। কত প্রদর্শনী ও সার্কাস হয়! গ্যালারির জন্য টিকিটের লাইন। সেকাল আর একালের ট্র্যাডিশান সমানেই চলছে। ঠাকুরের সার্কাস দেখাও হলো আর উপদেশ দেওয়া হলো।

১৮ জুন ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছেন পেনেটিতে চিড়ার মহোৎসবে। চৈতন্য-শিষ্য দাস রঘুনাথ এই উৎসব শুরু করেন নিত্যানন্দের মধুর তিরস্কার শুনে ঃ "ওরে চোরা, তুই বাড়ি থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদন করিস। আমরা কেউ জানতে পারি না। আজ তোকে দণ্ড দিব—তুই চিড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর।"

গাড়ি ম্যাগাজিন রোড ধরে চানকের বড় রাস্তায় (ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড) গিয়ে পড়ল। ঠাকুর পথে যেতে যেতে ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছেন।

মহোৎসবক্ষেত্র পৌঁছানোমাত্র দেখা গেল, ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমে একা তীরের ন্যায় ছুটছেন। নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তন দলের সঙ্গে মিশে কখনো উদ্দাম নৃত্য, কখনো বা বিভোর হয়ে কীর্তন করতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

দিনান্তে উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরছেন। পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুর মাস্টারকে অনেকদিন হইল বলিতেছেন—একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ির ঝিল দর্শন করিবেন —নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য।

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে। তথাপি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরবাড়ি দেখিবার জন্য গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ির পূর্বাংশে যে ঝিল আছে, তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে—তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন—"এই দেখ, কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ-সাগরে এই মাছের ন্যায় বিচরণ করা।"

২১ জুলাই ১৮৮৩

ঠাকুর কলকাতায় ভক্তদের মজলিশে চলেছেন। আজকের programme অধর সেন, যদু মল্লিক ও খেলাত ঘোষের বাড়ি। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পার হয়ে চলেছে। ফটকের মুখে মণির সঙ্গে দেখা। মণির হাতে চারটি ফজলী আম। ঠাকুর মণিকে দেখে গাড়ি থামাতে বললেন। মণি গাড়ির উপর মাথা রেখে প্রণাম করলেন। অন্তরঙ্গ মণিকে গাড়িতে তুলে নিলেন। খোস মেজাজে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছেন। অনেক কথাবার্তা হয়েছে চলতি পথে। আমরা দু-চারটে তার মধ্য থেকে বেছে নিচ্ছি।

মণি—আমার 'পূর্বজন্ম' ও 'সংস্কার' এসব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই। এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে—এই বিশ্বাস থাকলেই হলো। আমি যা ভাবছি—তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা, এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর

তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে?

একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন। হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জল পান করলে। জলটি স্ফটিকের মতো। দেখালে যে সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা যে সরিয়ে জল খায়, সেই পায়।

গাড়ি শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হলো। ঠাকুর খানিকক্ষণ মৌন থাকার পর একটা গুহ্য কথা—"ঐ দেখ, আমার মুখ কে যেন চেপে চেপে ধরছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে। এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে, সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে। কিন্তু এত তো দেখা যাচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।

মণি (সহাস্যে)—আপনার আবার অভিমান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়! ঠাকুরের দিব্যিগুলি শুনতে বড্ড মিষ্টি লাগে। কারণ ঐ দিব্যিগুলি সরস, সুন্দর ও সাবলীল। কথাগুলি অলঙ্কারে জড়ানো—ওতে গতি আছে, ছন্দ আছে, যতি আছে। শিশু খেলায় জয়-পরাজয় নিয়ে বাদানুবাদ হলে "কালীর দিব্যি" "চোখ ছুঁয়ে দিব্যি" করে। শিশুসম শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যিতে মিথ্যার প্রলেপ নেই। লাভ-লোকসানের টানাপড়েনে দোলায়িত মানুষ তো মিথ্যে-মিষ্টি কথার পসার সাজিয়ে নিয়ে চলেছে, তাই এই ধরনের দিব্যি দিতে ভয় পায়।

চলার পথে আবার কথা শুরু হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সঙ্গে কি আর কারু মিলে? কোন পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

মণি—আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকেদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন—যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে রামলালাদিকে)—ওরে, বলে কিরে?

ঠাকুরের হাসি আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন—মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়। ঠাকুর খিল খিল করে হাসছেন। সদা হাস্যময় পুরুষ তিনি। জীবজগতের মজা যিনি জানেন তাঁর কাছে তো দুঃখ বা কান্না থাকে না।

"যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" শ্রীরামকৃষ্ণ খোলা মন নিয়ে চলতেন। শুনে শিখতেন সব আধুনিক বিজ্ঞানের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার ইংরাজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি—ওদের নিয়ম অনুসারে নূতন আবিষ্ক্রিয়া (discovery) হতে পারে। ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীণ দিয়ে সন্ধান করে দেখলে যে নূতন একটি গ্রহ (Neptune) জ্বল জ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হয় বটে।

গাড়ি চলছে। ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ আর চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ভেসে আসছে। গাড়ি অধরের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। ঠাকুর মণিকে বলছেন—"সত্যেতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বরলাভ হবে।"

মণি—আর একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, "হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করো না! আমি তোমায় চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঐটি আন্তরিক বলতে হবে।

সার কথা কটি বলে ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমে অধরের বৈঠকখানায় ঢুকলেন। তারপর যদু মল্লিকের বাড়িতে সিংহবাহিনী দর্শন এবং খেলাত ঘোষের বাড়িতে বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে অধিক রাতে দক্ষিণেশ্বর ফিরলেন।

৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার পথে ঘুরতেন। চলার পথে তিনি ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে রাখতেন আর দেখতেন হাল ফ্যাশানের দুনিয়াদারি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কোন কিছু এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ভক্তদের কাছেঃ "সে দিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি, সবাইয়ের পেটের চিন্তা! সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুই একটি দেখলাম উর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।"

মণি—আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকেদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে। তাই অভাব বেড়েছে।

বিলাসের ফাঁস গলায় দিয়ে মানুষ হাটছে পথ ধরে। একজন মানুষ পথের ধারে দোকানের দাওয়ায় বসে মোজা পরছে। ঠাকুর দেখে বললেন—"এ লোকটি জীবনে প্রথম ভোগ করছে।" 'বাঃ বাঃ' বলে তারিফ করে তিনি এগিয়ে চললেন।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে মেয়েদের কথা তাঁর কানে আসত। আর ওগুলি ছিল তাঁর চাটনী। ভোগী ঈশ্বরবিমুখ ভক্তদের ঠুকবার জন্য তিনি ভণিতা করে ঐ চাটনীগুলি ব্যবহার করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে—মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্যন্ত! বাড়িতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে, মা—তবে হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত।

মণি—আজ্ঞে, এদেরই বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ছাদের উপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দনঘষা—এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটিও নেই। কি রাঁধতে হবে—আজ বাজারে কিছু পেল না—কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল।

ঠাকুর মানুষের ঈশ্বরবিমুখতা, প্রাণহীন পূজা প্রভৃতি দেখে ব্যথিত হয়ে বলেছেন—"দেখ দেখি ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথা!"

২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩

সাধারণ মানুষ গৃহপ্রবেশ বা নূতন কিছুর উদ্বোধন করতে গেলে পয়মন্ত বা কোন সাধু মহাত্মাকে আমন্ত্রণ করে। ঠাকুর আজ তাই চলেছেন রামের কাঁকুড়গাছির নূতন বাগানবাড়িতে। সুরেন্দ্রের বাগান তারই নিকট।

ঠাকুর গাড়ি করে চলেছেন। সঙ্গে মাস্টার ও মণি মল্লিক প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। ঠাকুর ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের লক্ষ্য করেছেন। তারা আনন্দের আস্বাদ পায়নি। তাদের চোখ মুখ শুকনো। নিরাকার ধ্যান কঠিন — সেইসব বোঝাতে বোঝাতে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি)—তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে উপাধিশূন্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্য-মনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ, দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।

ঠাকুর আপনমনে গোটা বাগানপথ পরিক্রমা করলেন। তুলসী-কানন দেখে বললেন—"বাঃ, বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়।" সরোবরের দক্ষিণের ঘরে একটু বসলেন এবং কিছু মিষ্টান্ন ও ফলাদি খেলেন।

রামের বাগান থেকে সুরেন্দ্রর বাগানে যাবার কালে ঠাকুর খানিকটা হাঁটা পথে চললেন। তারপর গাড়ি। পদব্রজে যেতে যেতে পথিপার্শ্বে এক খাটিয়ায় উপবিষ্ট এক সাধুর সঙ্গে দেখা। গাঁজাখোর যেমন সঙ্গী দেখলে ভিড়ে যায়, ঠাকুরও তেমনি আনন্দে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে হিন্দিতে বার্তালাপ শুরু করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাধুর প্রতি)—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের—গিরি বা পুরী কোন উপাধি আছে?

সাধু—লোকে আমায় পরমহংস বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ, বেশ। শিবোঽহম্—এ বেশ। তবে একটা কথা আছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রাতদিন হচ্ছে—তাঁর শক্তিতে। এই আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না। বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না।

একটু সদালাপ করে ঠাকুর গাড়ির দিকে চললেন। দূর পথের যাত্রী-বন্ধুকে যেমন বন্ধু বিদায় দিতে আসে, তেমনি সাধুটি ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিতে এলেন। আর ঠাকুর? তিনি কম যান না। অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় সাধুর বাহুর ভিতর বাহু দিয়ে গাড়ির দিকে চলেছেন। এ দৃশ্য অনুপম। শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাব যে কতটা স্বাভাবিক তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। সুরেন্দ্রর বাগানে গিয়ে রামকে বলছেন—"সাধুটি বেশ। তুমি যখন যাবে সাধুটিকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে লয়ে যেও।" আতিথেয়তাও সারা হলো।

২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা শ্রীম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন—"তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে।" এ উক্তি যে কত খাঁটি তার প্রমাণ 'কথামৃত'।

ঠাকুর কলকাতায় মেছুয়াবাজারে ভক্ত শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাবেন। এই যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীম যে ছবি ফুটিয়েছেন তা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের এবং মহাভারতে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গমনের ছবিদ্বয়ের সঙ্গে খুব মিল আছে। আমরা শ্রীমর ছবি তুলে ধরছি ঃ

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শোনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতী রাগে রোশনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুরস্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে-সকল দেবদেবীর মূর্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা। নহবতের কাছে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দিকে ফুলগাছ। সম্মুখে ভাগীরথী। দিকসকল প্রসন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন এবং মায়ের নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন। কেন না শীতকাল সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা গাড়ি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়াবাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নিচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন।

২৫ জুন ১৮৮৪

আজ রথযাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বাড়ি নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন বাটী। সেখানে আসিয়া শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ স্ট্রীটে চাটুজ্যেদের বাড়ি রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারী ইচ্ছা।

প্রায় বেলা ৪টার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহরক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়; প্রায় গাড়ি না হইলে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ, পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন—রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হলো। তারপর চললো পথ-প্রান্তরের কথা।

তাঁর শক্তি আসত বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে। তুলনাহীন উপমার ফুলঝুরি ঝরতে লাগল ঃ 'ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল—কর্ম ফুল।' চাপরাশ না পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না, এ ব্যাপারে দুটি উদাহরণ দিলেন ঃ 'প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না।' 'ওদেশে ধান মাপবার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়।'

আবার সন্ধ্যায় ঈশানের বাড়িতে ফিরলেন। অনেক কথার পর ঠাকুর আবার গাড়িতে উঠবেন। আসরে মানুষ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে, কিন্তু বিদায়ের বেলায় সব চেয়ে কাজের এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলে থাকে। লোকে এরূপই করে দেখা যায়। তাই গাড়ি ছাড়বার মুখে পথের উপর ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ "পিপড়ের মতো সংসারে থাক। এ সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মেশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে এক সঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গাঁ দেখ পরিষ্কার, উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।" বিবেক ও বস্তুবিচারের অপূর্ব পদ্ধতি সোজা কথায় ঠাকুর বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। ভক্ত মনোমোহন কোন্নগর থেকে সপরিবারে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে এসেছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন ঃ "এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।" ঠাকুর কুশলপ্রশ্ন করে বললেন, "আজ ১ তারিখ—অগস্ত্যযাত্রা, কলকাতায় যাচ্ছ? কে জানে বাপু!" অপূর্ব নজর। মানুষের মঙ্গলের দিকে ছিল তাঁর সদা দৃষ্টি; চিরাচরিত প্রথা, তিথি নক্ষত্র সব মেনেই তিনি চলতেন। বৃহস্পতিবারের শেষ বেলায় তিনি কখনো বেরুতেন না।

গৃহস্থদের উপদেশ দিচ্ছেন ঃ "একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবের যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর, করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে। ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।" কোথায় আপিস তা পর্যন্ত ঠাকুর বলে দিলেন। আরও বললেন যে, দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নেই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

কলকাতায় সুরেন্দ্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণাপূজা দেখতে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরে বিদায়ের মুখে রাখালকে ডেকে বলছেন—"ও রা-জু-আ?" ঠাকুরের এ কোড language বোঝা দায়। কথাটা হলো ঃ ও রাখাল, জুতা সব আছে না হারিয়ে গেছে? ঈশ্বর সাকার না নিরাকার—সেই দুরন্ত তাত্ত্বিক আলোচনার পর মধুর হাস্যরস মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে স্বাভাবিক করে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় আপন ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর বিগত দিনের কথাগুলি

বলতেন। প্রথম প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাঁর সেই পথে ঘুরে বেড়ানোর কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে কিছু শোনা যাক ঃ

"কি অবস্থাই গিয়াছে! এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) খেতুম না। বরাহনগরে কি দক্ষিণেশ্বরে কি এঁড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। বাড়ির লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলতুম—আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নেই। একদিন ধরে বসলুম, দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব। সেজবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখব, আমায় লয়ে যাবে? সেজবাবু—তার আবার ভারী অভিমান সে সেধে লোকের বাড়ি যাবে? এগুপেছু করতে লাগল। তারপর বললে, 'হাঁ, দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব।"

"একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীনু মুখুজ্যে বলে একটি ভাল লোক আছে—ভক্ত। সেজবাবুকে ধরলুম—দীনু মুখুজ্যের বাড়ি যাব। সেজবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম; তা বলে উঠল, ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজবাবু ফেরবার সময় বললে, 'বাবা! তোমার কথা আর শুনব না।' আমি হাসতে লাগলুম।"

যে ভগবানের চিন্তা করে, তাকে দেখতে বা আধ্যাত্মিক পথে কাউকে সাহায্য করতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত, অপমান এমনকি মার খেতেও রাজি। হরিনাম বিলাতে নিত্যানন্দের মাথা ফাটেনি? শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অপমানিত হননি? তাঁকে দেখে তো আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো! যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ লালায়িত, তিনি প্রথমে নিমন্ত্রণ করে, পরে কাপুড়ে সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ সভ্য নন বলে তাঁকে পত্র লিখে নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেননি? বাগবাজারের বিখ্যাত গুণ্ডা মন্মথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভয় দেখানোর জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়ায়নি? তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ পথে চলবেন। কেউ তাঁর চলা বন্ধ করতে পারবে না। "একজন আগুন করলে দশজন পোহায়।" ঠাকুর আগুন তৈরি করে দুর্বল ভেঙে পড়া নিরুৎসাহী মানুষগুলোকে তাতাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্যের গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। গাড়ির মধ্যে মহেন্দ্র মুখুজ্যে, মাস্টার ও আর দু-একজন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, "হাজরা আবার আমায় শেখায়!" কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "আমি জল খাব।" বাহ্য জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ঐ কথা প্রায় সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুজ্যে (মাস্টারের প্রতি)—তাহলে কিছু খাবার আনলে হয় না?

মাস্টার—ইনি এখন খাবেন না।

মহেন্দ্র মুখুজ্যের হাতিবাগানে ময়দার কল আছে সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন।

মহেন্দ্রের কলে তক্তপোশের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপর ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

কলবাড়িতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন—পানটা আনিয়ে লও। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন—"সন্ধ্যা কি হয়েছে? তাহলে আর তামাকটা খাই না। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না। লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইয়াছে।

ঠাকুরের প্রতিটি কথার, কাজের এবং ব্যবহারের একটা বিশেষ নিগূঢ় রহস্য আছে। মুসলমানদের পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে নমাজের বিধি আছে। হিন্দুদের পুরশ্চরণ, উদয়াস্ত জপ, মহানিশায় জপ, সন্ধিপূজা কালে দেবীর স্মরণ প্রভৃতির বিধি আছে। এসবের অর্থ হচ্ছে ক্ষণ-রহস্য অবগত হওয়া। যাঁরা সাধন জগতের গভীরে ঢুকতে চান, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ধ্যান ভজন করেন। তাঁরা ক্ষণের মাহাত্ম্য জানেন। ঐ নির্দিষ্ট ক্ষণে তাঁদের মন ভগবানের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ঠাকুরের তো আর ঘড়ি ছিল না। বোধ হয় গ্রামের লোকেদের দেখে শিখেছিলেন—কাক কোকিলের ডাক শুনলে সকাল এবং গায়ের লোম দেখা না গেলে সন্ধ্যা হয়।

ঠাকুরের গাড়ি বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাস্টার বসিলেন। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি সহাস্যে)—বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনি সব হয়েছেন।

মাস্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কত নেবে?

মাস্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মায়ের মাহাত্ম্য।

আমরা এবার বিদায় নেব। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা পথ ছেড়ে থিয়েটার পর্যন্ত গেছি এবং ড্রপসিন উঠবার পূর্ব পর্যন্ত কথাবার্তাও শুনেছি। আমাদের সীমা ঐ পর্যন্ত। থিয়েটারে যাবার আগে কেউ কেউ আপত্তি করে ঠাকুরকে বলেছিল—"বেশ্যারা অভিনয় করে।

চৈতন্যদেব, নিতাই এসব অভিনয় তারা করে।” ঠাকুর তাতে উত্তর দেন—“আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখব। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।”

থিয়েটার শেষ হলো। ঠাকুর গাড়িতে উঠছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—“কেমন দেখলেন?” ঠাকুর হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—“আসল নকল এক দেখলাম।” আমরা ঠাকুরের গাড়ির সঙ্গে আর দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাব না। রাত অধিক হলো। আমরা পথে দাঁড়িয়ে শুনলাম ঃ ঠাকুর গাড়ির ভিতর বসে প্রেমভরে বিভোর হয়ে আপনা আপনি বলতে বলতে যাচ্ছেন—“হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!”

২০ অক্টোবর ১৮৮৪

আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক স্ট্রীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। মারোয়াড়ী ভক্তেরা অন্নকূট করিতেছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। দুই দিন হইল শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। বড়বাজারে এখনও দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

মাস্টার ও ছোট গোপাল আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মল্লিক স্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি জমা হইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়িতে বসিয়া, গাড়ি আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুয্যে। গোপাল ও মাস্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

ঠাকুর গাড়ি থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাস্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখেন, নিচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও আসিয়া তাঁহাকে একটি তেতলার ঘরে বসাইল, সে ঘরে মা-কালীর পট রহিয়াছে। ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন, ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্যে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

বড়বাজারের যে উপরোক্ত ছবি মাস্টার মহাশয় এঁকেছেন তা প্রায় ১০০ বছরের পুরান। কিন্তু কোন দর্শক যদি এখনও বড়বাজারে যান সেই একই অপরিবর্তিত ছবি দেখতে পাবেন। সেই ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, পথ জ্যাম। কেবল ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা কম দেখবেন, তার বদলে দেখবেন মোটর ও লরী। আর একটা বিরাট পার্থক্য দেখবেন সেটা হচ্ছে জ্যামে পড়ে আরোহীদের বিরক্তভরা মুখ ও কোঁচকান ভ্রূ। জ্যামে পড়েও শ্রীরামকৃষ্ণের মজার হাসি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও কোন দর্শক দেখতে পাবেন না।

ঠাকুরের মারোয়াড়ী পট্টী থেকে রাস্তায় বেরুনো পর্যন্ত আমরা পথে অপেক্ষা করতে থাকি।

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, “আমরা না হয় গাড়ি থেকে নামি; গাড়ি পিছন দিয়ে ঘুরে যাক।” রাস্তা দিয়া

একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালা গর্তের ন্যায় একটা ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নিচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিলেন—"কি কষ্ট! এইটুকুর ভিতর বদ্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! ঐতেই আবার আনন্দময়।"

গাড়ি ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়িতে উঠিলেন। একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ির সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাস্টারকে বলিলেন, "কি গো, পয়সা আছে?" গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়বাজার দিয়া গাড়ি চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ি চিৎপুর রোডে পড়িল। সেস্থানেও আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় লোকে লোকাকীর্ণ। লোক হাঁ করিয়া দুপাশের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টান্নে সুশোভিত। কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ি একটি আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোশনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন—"আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে।" ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতেছেন—"ওরে এগিয়ে পড় না—কি করছিস?"

এ ছবির তুলনা হয় না। শ্রীমর লোহার শক্ত নিব সুদক্ষ শিল্পীর কোমল তুলিকে হার মানিয়ে দিয়েছে। কী মজা! কী মজা! আনন্দের হাটবাজারে এই সামান্য ঝলমলানি দেখে ভক্তদের বলছেন, যেন তারা এতেই তৃপ্ত না থাকে। সেই কাঠুরের গল্প স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন—"ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়।" চিৎপুর দিয়ে গাড়ি চলেছে। গাড়ির মধ্য থেকে আরও কিছু কথাবার্তা ভেসে আসছে।—শোনা যাক ঃ

মাস্টার কাপড় কিনিয়াছেন—দুইখানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন—"তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।"

মাস্টার—আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না হয় এখন থাক, দুইখানাই নিয়ে যাও।

মাস্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণী পাল রামলালের জন্য গাড়িতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বললুম—আমার সঙ্গে কোন জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার যো নাই।

গাড়ি একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। সেখানে কঙ্কে বিক্রি হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুজ্যেকে বলিলেন—"রাম, এক পয়সার কল্কে কিনে লও না।"

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাকে বললুম, কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস। তা বলে কি জান? আবার ট্রামে ৪ পয়সা ভাড়া লাগবে; কে যায়? (মাস্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, এ কি বল দেখি, এক আনা আবার খরচ লাগবে!

মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ? যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম। ঠাকুরকে (ময়ূরমুকুটধারী কৃষ্ণের বিগ্রহ) নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে! আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি।

হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে-সকল ধর্ম দেখছ এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।

আমরা চলার পথে ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগের কথা, হিন্দুধর্মের উপর তাঁর দৈববাণী প্রভৃতি শুনলাম। আর দুঃখ পেলাম সেই ভক্তটির জন্য, যে চার পয়সার জন্য শ্রীভগবানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। তীর্থে বা দেবমন্দিরের উদ্দেশ্যে পয়সা ব্যয়টাকে আমরা অপব্যয় মনে করি; কিন্তু সিনেমা, থিয়েটার, বনভোজন বা কোন চিত্তবিনোদনের জন্য পয়সা ব্যয় আমাদের নিকট অতি আবশ্যক। অনেকে বলবেন—শরীর মনকে একটু চাঙ্গা রাখবার জন্য recreation প্রয়োজন। উত্তম প্রস্তাব। আপনারা নিজেদের রুচিমত চলতে থাকুন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।

১১ মার্চ ১৮৮৫

তখন দক্ষিণেশ্বর ছিল একটা গ্রাম মাত্র। যাতায়াতেরও অসুবিধা ছিল। সেজন্য কলকাতার ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল একটা বৈঠকখানার। 'বলরাম মন্দির' সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কথামৃতকার লিখেছেন ঃ "ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ লেগেই থাকত। রাজপথেও এর ব্যতিক্রম হতো না।

গিরিশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা। ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন—"বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।"

দোতলা হইতে নিচে নামিতে নামিতে ভগবদ্‌ভাবে বিভোর। যেন মাতাল! একজন ভক্ত বলিতেছেন—সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন—একজন হলেই হলো। নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিতেছেন, "হাত ধরলে লোকে মাতাল

মনে করবে; আমি আপনি চলে যাব।"

বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন। কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ি। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! কে এ ভাব বুঝিবে?

দ্বারদেশে গিরিশ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন। ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দোতলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা; তাই অপবিত্র তাঁহার চক্ষে। তিনি ইশারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমর জীবন্ত বর্ণনার পর মন্তব্য দাঁড়ায় না। আমরা পথের উপর দাঁড়িয়ে মন-ক্যামেরা দিয়ে ঠাকুরের অপরূপ ছবিগুলি দেখে যাচ্ছি। আর আমাদের কানে শব্দগ্রহণের যে যন্ত্র বাসনো আছে তাতে দু-চারটে কথা ভেসে আসছে। বাগবাজারের কয়েকটা দুষ্টু ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মজার সঙ্গে টিটকারি কেটে বলছেঃ "হ্যারে, দ্যাখ দ্যাখ! পরমহংসের ফৌজ আসছে।"

বোসপাড়ার গলির মুখে ঠাকুর কথাটি শুনলেন। হাসতে হাসতে মাস্টারকে বললেন, "হ্যাগা, কি বলে? পরমহংসের ফৌজ আসছে? শালারা বলে কি" আমরা পরিষ্কার দেখছি টিটিকারি শুনে দলপতি ও তাঁর ফৌজ একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে।

নির্বাক প্রাণীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দরদের অন্ত ছিল না। তিনি কলকাতায় ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন ঠিকই কিন্তু ঐ ঘোড়ার জন্য ছিল তাঁর করুণা অনুকম্পা। হয়তো কলকাতায় চলেছেন এবং সঙ্গে তাঁর নির্দিষ্ট লোক রয়েছে। হঠাৎ যাত্রাপথে কলকাতাগত কোন বিশেষ ভক্তের সঙ্গে দেখা। আমরা হলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে কষ্ট সত্ত্বেও তাকে তুলে নিতাম; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেক্ষেত্রে বলতেন, "না বাপু, জায়গা হবে না।" সেই ভক্তকে নৌকায় বা শেয়ারের গাড়িতে ফিরে কলকাতায় দেখা করতে বলতেন। মূক প্রাণীর গাড়ি টানতে কষ্ট হবে—এ ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

একটি অপূর্ব কাহিনী স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় (২৪ পৃঃ) লিখেছেন ঃ "ঠাকুর বরানগরের বেণী পালের ভাড়াটে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি ছাড়া কখনো কোথাও যেতেন না। তার ঘোড়া ভাল ছিল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ—এই তার কারণ। ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেই ঠাকুর অস্থির হয়ে উঠতেন। বলতেন—"আমাকে মারছে।" বেণী পাল যখন শুনতেন যে পরমহংসদেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন যা খুব ভাল ঘোড়া তাই দিতেন। যাকে মারতে হবে না, একটু পা নাড়লেই ছুটে চলবে।"

ভক্তদের মধ্যে কারো কৃপণতা বা নিষ্ঠুরতা দেখলে ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে তাদের দোষ শোধরাতেন—"সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান। আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।"

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল দশদিক মুখরিত করল। সকলের শিক্ষা হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অজান্তে অক্লেশে, বিনা চেষ্টায় ভিতরে ঢুকে যায়।

ঠাকুর গরিব ভক্তদের জন্য ভাবতেন। শ্রীম একদিনের (৬/৪/১৮৮৫) ঘটনা লিখছেন ঃ

"ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ি যাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করছি তোমার বাড়িতে যাব। দেবেন্দ্রও বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বলবার জন্য আজ এসেছি; এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশি লোক বলো না। আর গাড়িভাড়া বড় বেশি। দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হলেই বা, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ (ধার করে ঘি খাবে)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসি আর থামে না।"

কী অদ্ভুত ভালবাসা গরিব গৃহস্থ ভক্তের প্রতি! দেবেন্দ্রের বাড়িতে নামামাত্র বলছেন, "দেবেন্দ্র, আমার জন্য খাবার কিছু করো না, অমনি সামান্য। শরীর তত ভাল নয়।" অসুস্থ শরীরের কথা বলে ভক্তের অর্থ বাঁচাচ্ছেন।

২৮ জুলাই ১৮৮৫

ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তদের মজলিশে বসে আছেন। নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলেছিলেন যে, নন্দ বসুর বাড়িতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাড়িতে গিয়ে বিকালে ছবি দেখবেন। পথে আরও দুজন স্ত্রীভক্তের বাড়িতে যাবেন ঠিক হলো। এদের মধ্যে একজন কন্যাশোকে সন্তপ্তা বিধবা।

পালকি আসিয়াছে ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়িতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পালকিতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্ণিস করা চটি-জুতা, পরণে লাল ফিতা পাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা জোড়াটি পালকির এক পাশে মণি রাখিলেন। পালকির সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার যাইতেছেন।

নন্দ বসুর গেটের ভিতর পালকি প্রবেশ করিল। গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাস্টারকে চটি-জুতা জোড়াটি দিতে বলিলেন। পালকি হইতে অবতরণ করিয়া উপরে হলঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরে চতুর্দিকে।

আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকব না ঠিক করেছি, তাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছি, ঠাকুর ছবি দেখা শেষ করে মিষ্টিমুখ সেরে উঠবার উপক্রম করেছেন।

নন্দ বসুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠাকুর চলেছেন বাগবাজারের শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ি। বাড়িটি পুরাতন ইষ্টকনির্মিত। প্রবেশ পথের বাঁ দিকে গোয়াল ঘর। ছাদের উপর বসবাস স্থান হয়েছে। ছাদে লোক কাতার দিয়ে কেহ দাঁড়িয়ে, কেহ বসে। সকলেই উৎসুক, ঠাকুরকে দেখবেন।

শ্রীম এখানে যে ছবি তুলেছেন—সে ছবি মার্থা-মেরী-পরিবৃত খ্রীস্টের ছবি। সেই দুই বোন, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপবিষ্টা বোনের প্রতি কর্মরতা বোনের আক্ষেপোক্তি, উপছে-পড়া ভক্তি, আনন্দের আতিশয্য, শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোজ্যবস্তু নিবেদন। বাইবেলে আছে—মেরী কর্তৃক Passover-এর ছয় দিন পূর্বে নৈশভোজে আমন্ত্রিত যীশুর সুগন্ধি অঙ্গরাগ লেপন, আর এখানে ভাবোল্লাসে কাড়াকাড়ি করে পদধূলিগ্রহণ—এমনকি পিদ্দিম ধরা পর্যন্ত।

রাতে মণি আশ্চর্য হয়ে ঠাকুরকে মার্থা-মেরীর কাহিনী শুনিয়ে বললেন—"যীশুখ্রীস্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল।"

এবার আমরা ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখব। তাঁর বিজ্ঞান-দৃষ্টি ও দেব-দৃষ্টি যুগপৎ কাজ করত। আমাদের বহুমুখী মন বহু বৈচিত্র্যময় বস্তু না দেখে তৃপ্ত হয় না। আর ঠাকুরের একমুখী মন একাত্মানুভূতির মধ্যে ঢলে পড়ত। সুতরাং তাঁর অনেক কিছু দেখবার সুযোগ হতো না। চিড়িয়াখানায় সব জীব-জন্তু দেখতে গেছেন। কিন্তু পশুরাজ সিংহ দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরীয় বাহন দেখে উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে? "সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।" [১৮]

ঠাকুরের দেখা আর আমাদের দেখার কত তফাত তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

"আমি একবার মিউজিয়ামে গিছলুম, তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে। জানোয়ার পাথর (fossil) হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।" [১৯]

"কেল্লায় যখন গাড়ি করে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বোধ হলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তারপরে দেখি যে চারতলা নিচে এসেছি। কলমবাড়া (sloping) রাস্তা। যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।" [২০]

"সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সে বন্ধন যাবার উপায় নাই!" [২১]

ঠাকুরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। নূতন কিছু শুনলে তিনি দেখতে যাবেনই। তার ভিতর কি শিক্ষনীয় আছে তা নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন।

ফটো কি করে তোলা হয়—দেখবার জন্য গাড়ি করে চললেন রাধাবাজারে বেঙ্গল

---

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত . ৪/৭৭; ১৯ তদেব, ৫/১৫৫; ২০ তদেব, ৪/৯৬; ২১ তদেব, ৫/প ১০০

ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে। ফটোগ্রাফার দেখালেন কি করে ছবি তোলা হয়। কাঁচের পিছনে কালি (Silver Nitrate) মাখানো হয়, তারপর ছবি উঠে। দুনিয়ার মজাটা নিজে দেখে তিনি খুশি হতেন না। হাঁকডাক করে সকলকে শোনাতেন। কারণ তিনি ছিলেন জন্মাবধি লোকশিক্ষক; আর সেই লোকশিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করতে কসুর করতেন না। ছবি তোলা দেখে এসে কেশবকে বলছেন ঃ "আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে, শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না। আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। যদি ভিতরে অনুরাগ-ভক্তিরূপ কালি মাখানো থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়।" [২২]

'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখানো' বলে একটা প্রবাদ আছে। ব্রিটিশ ভারতের ঐশ্বর্যভরা বড় বড় থামওয়ালা জাঁদরেল লাটসাহেবের বাড়ি মামাকে দেখাতে হৃদু ব্যস্ত। আর মামা? "মা দেখিয়ে দিলেন কতকগুলি মাটির ইঁট উঁচু করে সাজানো। ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দু-দিনের জন্য, ভগবানই সত্য।" [২৩] শোভনবুদ্ধি মামাকে বিমোহিত করতে পারল না।

"আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে—অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।" [২৪]

পথে চলতে চলতে ক্ষিদে পেলে তিনি বালকের মতো এদিক ওদিক তাকাতেন। "বড়বাজারের রং-করা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হলো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম—তারপর অসুখ।" [২৫]

দিব্যভাবে পথে যেতে যেতে accident-ও হতো। ঠাকুরের দাঁত ভেঙেছে, গাড়ির চাকা খুলে কাৎ হয়ে গেছে, ঘোড়ার ছটফটানিতে গাড়ি উলটে যাবার উপক্রমও হয়েছে। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের চলার বিরাম নেই। মানুষের ব্যথা ঘুচাবার দায় তো তাঁর। তাই মরি বাঁচি করে তাঁকে ছুটতে হবে।

রেলের ধারে পড়ে গিয়ে হাতভাঙার কারণ বললেন ঠাকুর ঃ "জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।" [২৬]

ঠাকুরের একখানি অভূতপূর্ব পথচিত্র আমরা উদ্বোধনের ৪৯তম বর্ষের ১০ম সংখ্যা থেকে তুলে ধরছি। ঘটনাটি স্বামী শান্তানন্দজী কর্তৃক সংগৃহীত।

"হরি মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—তাঁর ভাব কি সামান্য ছিল? কোন কোন সময় এমনকি বহির্জগৎও তাঁর ভাব অনুযায়ী বদলে যেত। একবার মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে ওঁর জুড়ি গাড়ি করে ঠাকুরকে ওঁদের জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি যখন চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে; তখন হঠাৎ ওঁর এরূপ ভাব হলো যে, উনি যেন সীতা হয়েছেন আর রাবণ ওঁকে হরণ

---

২২ তদেব, ৫/প. ১০৪; ২৩ তদেব, ৫/১৫৪; ২৪ তদেব, ২/৬৪; ২৫ তদেব, ৪/১৬৯
২৬ তদেব, ৪/২৩৭

করে নিয়ে যাচ্ছে। উনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ গাড়ির ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মথুরবাবু ভাবলেন—এমন কেন হলো? ঠাকুরের সমাধিভঙ্গের পরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমস্ত বিবরণ বললেন। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি দেখলেন যেন রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণের রথ আক্রমণ করেছে এবং সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মথুরবাবু শুনে বললেন—"বাবা, এমন হলে তো তোমার সঙ্গে রাস্তা চলা মুশকিল।"

মথুর যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ঠাকুরের রক্ষণাবেক্ষণ আদর-আপ্যায়ন, সখ মেটানো—কোন কিছুর জন্য চিন্তা ছিল না। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় মথুর তাঁর রাজকীয় ফিটনে করে ঠাকুরকে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতেন। কিন্তু মথুরের দেহাবসানে ঠাকুরের যাতায়াতের গাড়িভাড়া নিয়ে কখনো কখনো বিভ্রাট হতো। যার বাড়িতে যেতেন, সাধারণত ভাড়াটা সে-ই দিত; ব্যতিক্রমও হতো। ভাড়া নিয়ে বিভ্রাট ভদ্রসমাজে একটা লজ্জার বস্তু, আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঐ লজ্জাটা রূপান্তরিত হতো রঙ্গরসে।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মোৎসবে গেছেন। রাত হয়ে গেল। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারী ভক্তদের নিয়ে খাতির করতে করতে এত ব্যস্ত হলেন যে, ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)—কি রে কেউ ডাকে না যে রে!

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয়, চলে আসুন। দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোস—গাড়িভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাতে খাই কোথা?

গাড়িভাড়া সম্বন্ধে পরে ভক্তদের কাছে হাসতে হাসতে বললেন ঃ

গাড়িভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে। তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দু-আনা আর দিলে না। বলে, ঐতেই হবে।[২৭]

তারপর যদু মল্লিকের প্রসঙ্গে বললেন ঃ "একবার আমাদের পেনেটি নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল। যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল।"

"ভারী হিসেবি—যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া। আমি বলি—তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিও। তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়।"[২৮]

সাধারণ মানুষ হয়তো মনে করবে যে, ঠাকুর এ ধরনের লোকের বাড়িতে নির্লজ্জের মতো কেনই বা যেতেন? তাঁর কি একটুও আত্মসম্মানবোধ ছিল না? আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর বহুভাবে দিয়ে এসেছি। আর দু-টি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শোক, নিন্দা, অভিমান, জাতি, বংশমর্যাদা) থেকে মুক্ত। অপমান অভিমান, [illegible] ঘৃণা প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের হৃদয়কে সহজেই

২৭ তদেব, ৪/২০ ২৮ তদেব, ৪/১৬৫

দোলায়িত করে; তাই আমরা সদা আত্মসম্মান বাঁচাতে সচেষ্ট। আর দ্বিতীয়ত তিনি জীবনে কখনো স্বেচ্ছায় এক পা-ও পথে ফেলেননি। কোথাও যেতে যদি কোন বিভ্রাট দেখা দিত তবে তিনি তাঁর চির-আরাধিতা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আগে ঠিক করে নিতেন। তাঁর আত্মকথা ঃ "মা, এত হাঙ্গামা করিস কেন? মা, ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস্ তো যাব।"

দীর্ঘকাল ধরে কোন পথচারীর সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করলে তাঁর স্বভাব মোটামুটি জানা যায়। এই প্রবন্ধে আমরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি। ঘরে-বাহিরে, খোলামাঠে, পথে-ঘাটে তাঁকে বিভিন্নভাবে দেখবারও আমাদের সুযোগ হয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁর দিব্যভাব দেখে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বড় বড় কত বিশেষণে বিশেষিতও করেছি। কিন্তু তাই কি সব? আমরা কি এই অদ্ভুত পথচারীর পরিচয় ঠিক ঠিক পেয়েছি?

বুদ্ধি যতক্ষণ না বুদ্ধিহারা হয় ততক্ষণ আমরা এগুতে থাকি। দেখা যাক শেষ কোথায়? ক্রমাগত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান করতে থাকি। আর এই অনুধ্যানের ফলে, আমরা দেখব যে সমস্ত মত ও পথের সঙ্গমস্থল শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবন দ্বন্দ্বের উপর নহে অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল গৃহস্থও নন, কেবল সন্ন্যাসীও নন। 'দেহস্থোঽপি অদেহস্থঃ'—দেহ থেকেও দেহহীন। যেহেতু তিনি দেহহীন সেহেতু তিনি সর্বত্র। অপরিচ্ছিন্ন আকাশের মতো। তিনি মঠে-মন্দিরে, অরণ্যে-গিরিগহ্বরে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রান্তরে। তিনি ভূতে ভূতে বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ তোরণ; নাম-রূপের শেষ সীমা। তারপর?

তারপর—সেই "সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি?

মণি—যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে? ধু ধু করছে। সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি সেই ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়—সেই দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে।"

মণি—ঐটে বুঝা শক্ত কি না; পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন ঐটি বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারে কেউ চিনলি না রে। ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের

বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পথের পাঁচালী শেষ হলো। কিন্তু যেহেতু তিনি ইতি-নেতির পার, তাই একটা কথা বলবার জন্য 'ইতি'র পরে 'পুনশ্চ'কে টানতে হলো। কথাটি এই ঃ যেসব পথিক শ্রীরামকৃষ্ণের যাত্রাপথ পরিক্রমা করে মায়ারূপ পাঁচিলভেদী পথ দিয়ে ব্রহ্মরূপ দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে এসে পড়বেন, পান্থজনের সখা শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হয়ে তাদের গা চাপড়ে বলবেন—"বেশ হয়েছে।"

নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন একখানি নাটকের মহাউদ্বোধন আমরা করতে যাচ্ছি—যেখানে অভিনেতা জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। নাট্যশাস্ত্রে শিবকে নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই মহানট বলতে পারি, কারণ এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সমস্ত অভিনয়ের পশ্চাতেই তো তিনি। তাঁর সামনে কোন অভিনয় যদি অনুরূপ না হতো, তিনি বলে দিতেন—তা মঞ্চের উপরেই হোক বা দৈনন্দিন সংসার-জীবনেই হোক। এই 'নব বৃন্দাবন' নাটকে তাঁর খুঁটিনাটি মন্তব্য আমাদের মুগ্ধ করবে।

পাঠক যদি 'নব বৃন্দাবন' দেখার আগে চোখ বুজে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু অভিনয় দেখে নেন তবে প্রকৃত অভিনয় কি করে করতে হয় তার পরিচয় পাবেন এবং সে ভাবে 'নব বৃন্দাবনে'র রস আস্বাদ করতে পারবেন। "আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশের কাছাকাছি। ঠাকুরের কাছে যাবার পূর্বে মনে হতো ছোটছেলে নাচে অঙ্গভঙ্গি করে, তা লোকের বেশ লাগে। কিন্তু একটা বুড়ো মিন্‌সে, সাজোয়ান মরদ যদি ঐরূপ করে, তাহলে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। 'গণ্ডারের খেমটি নাচ কি কারো ভাল লাগে'—স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সব উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান করেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তাঁর সকলগুলিই কী মিষ্ট! বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিনসেকে নাচলে যে এত ভাল দেখায়, এ-কথা আমরা কখনো স্বপ্নে ভাবিনি।' —গিরিশবাবু এ-কথাটি বলতেন।" [১] প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের বালক বা স্ত্রীলোকের অভিনয় হুবহু হবার কারণ ভাবের সঞ্চার। তাঁর যখন যে-ভাব হতো সে ভাবের ষোল আনাই প্রকাশ পেত। তাতে কোন ভেজাল থাকত না—তাই তাঁর সব অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হতো।

নাটক হচ্ছে যাতে কিছু আটক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয়ও ঐরূপ ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, "বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত।"

'নব বৃন্দাবনের' দৃশ্যগুলি ঊনবিংশ শতকের জনমানসের প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক ভোগময় জীবন কি করে ভারতে দ্রুত প্রবেশ করছিল এবং ভারতবাসী কি করে ঐ-সব অনুকরণ করে সুমহান আর্যসভ্যতাকে ধিক্কার দিয়ে লালসা-মদিরাপূর্ণ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২৮৯

সভ্যতাকে নিজের করে নিচ্ছিল এবং নিজেদের ধর্ম ছেড়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করছিল—এ নাটকে সে-সব আছে। 'নব বৃন্দাবন' ঐ সাইক্লোনের মুখে ছিল। সে যুঝছিল ঐ দুরন্ত ঝড়ের সঙ্গে। আমরা অগ্রে দেখাব 'নব বৃন্দাবন' দপ্ করে জ্বলেই নিভে গেল। কারণ তার বনিয়াদেই ছিল একটা স্বদেশী-বিদেশী mixture ঃ "The highest Christian ethics was combined with the deepest spirituality belonging to India, and the result was a combination..."—Liberal, Dec. 10, 1882. নাটকখানির প্রচ্ছদে লেখা আছে—'নব বৃন্দাবন বা ধর্মসমন্বয় নাটক'। এ-নাটক যদি এখন অভিনীত হয় তবে প্রায় সমস্ত দর্শকই যে হতাশ হবেন—এ-কথা সুনিশ্চিত। অথচ এইটিই ছিল আমাদের তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি।

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাব নিয়ে 'নব বৃন্দাবন' রচনা করেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। অবশ্য তিনি 'শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ত্রৈলোক্যের নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' বহু জায়গায় আছে। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান খুব পছন্দ করতেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি ব্রাহ্মদের আমন্ত্রণে কেশবের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ নাটকের অভিনয় দেখেন। "The *Nava Brindaban* was again acted this afternoon. January 25th 1883, in connection with the 53rd Anniversary of the Brahmo Samaj and among those present we noticed the Venerable Paramhansa of Dakshineswar."—*The New Dispensation*, Feb. 18, 1883.

আমাদের হাতে 'নব বৃন্দাবনের' তিনটি সংস্করণ এসেছে। প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠাগুলি ছেঁড়া, তাই তার রচনাকাল গ্রন্থদৃষ্টে সম্ভব হলো না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে রয়েছে—প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটকের প্রথম উদ্বোধন হয় লিলি কটেজে (কেশব সেনের বাড়িতে) ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর। ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ঐখানেই দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ ১ অক্টোবর Liberal পত্রিকায় বেরিয়েছিল ঃ Among the audience... we noticed the Maharajah of Kuch Behar, Maharajah Sir Jotindra Mohun Tagore, Hon'ble Kristo Das Pal, Rai Kannye Lal Dey Bahadur, Pandit Mohesh Chunder Nayaratna, Doctor Mohendra Lall Sircar, Kumar Surendra Mullick, B. L. Gupta, Esq., Abdur Rahman, Esq. There is a general complaint that the drama is a little too long. It is proposed to curtail it so long as to bring the representation on the stage within three or four hours." এই নাটক পরে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে, শোভাবাজারের রাজবাড়িতে, গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস প্যাভেলিয়ান প্রভৃতি জায়গায় অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করতেন ভাই প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, উমানাথ, রমাচন্দ্র, কেদারনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, দীননাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় দেখেন। এই

সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীঃ-এর জানুয়ারি নাগাদ। খুব সম্ভব তখন ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। আমরা পূর্বেই The New Dispensation-এর বিবরণ উল্লেখ করে এসেছি। এই গ্রন্থ শ্রীরামসর্বস্ব ভট্টাচার্য কর্তৃক বিধান যন্ত্রে, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়। আর তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৭ শকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ঃ "নব বৃন্দাবন, প্রথম সংস্করণে যে-সকল গর্ভাঙ্ক ছিল তাহাদের কয়েকটি অভিনীত হইত না, এইজন্য তাহা এবার উঠাইয়া দেওয়া গেল। ...গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় করিতে পারিবেন না।—গ্রন্থকার।"

পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত (প্রথম সংস্করণে ছয়টি এবং তৃতীয় সংস্করণে সাতটি) এই নাটকখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করবার পূর্বে গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করছি ঃ "জননী বাগ্দেবী, বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জিনী এই 'নব বৃন্দাবন' রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রসগ্রাহী কবিকুলের চিত্ত বিনোদন করুন! স্বদেশ মাতৃভূমির মঙ্গলোদ্দেশে তাঁর প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, মা নিরাকারা জননীর প্রসাদে যেন আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হই। তাঁর পবিত্র পাদস্পর্শে এই রঙ্গভূমি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হউক।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।" এখানে লক্ষ্যের বিষয় ব্রাহ্মরা খ্রীস্টানী ধাঁচে 'জগৎপিতা' মানত; কিন্তু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তা 'জগন্মাতা'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এ নাটকে 'জগৎপিতা' ও 'জগন্মাতা' যে এক—তার উল্লেখ আছে।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বসু পরিবারের কাহিনী-অবলম্বনে এ নাটক। বাড়ির কর্তা নরহরি বসু। তিন পুত্র—তিন রকম। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ পেশাদারী উকিল, মাতাল ও কুক্রিয়াসক্ত। মধ্যম পুত্র রাখালমাধব সস্ত্রীক সাহেবীভাবাপন্ন। সাহেবদের সঙ্গে মেশেন, থাকেন এবং দেশীলোকদের তীব্র ঘৃণা করেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র হরিসুখ ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী ও নব ব্রহ্মজ্ঞানী।

নাটকের প্রথম অঙ্কে ফুটে উঠেছে সে সময়কার ছবি ঃ "কুলধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি কিছুই মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার দিকে সকলের ঝোঁকটা বেশি।" "বরং বিজাতীয় প্রভুত্ব সহ্য হয়, কিন্তু হেরো-তেরো রাম-কেষ্টা যে লাট মেজেষ্টর হবে তা সইবে না।" "ইংরেজরা এ-দেশের মঙ্গলের জন্যেই রাজা হয়েচে। ওরা বেশ রাজকর্ম কচ্চে, দেশ শাসনে রেখেচে, ওদের গায়ে খুব বলও আছে, ঐ বিষয় নিয়ে ওরা থাক; আমরা ফাঁকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নেই। ওরা ক্ষেত্রি (ক্ষত্রিয়) হয়ে দেশশাসন করুক, আমরা মুনি ঋষি হয়ে যোগসাধন করি। মিছে অসার বিষয় ভেবে কি হবে?" গৃহস্বামী নরহরিবাবু জবাবে বললেন ঃ "বেশ কথা বলেচ। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের যথেষ্ট মানতেন। তাঁর কাছে আমরা অনেক তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি।" "কি গো কবিরত্ন মশায়, ইন্দুরের লেজের মতো রিফাইণ্ড টিকি কোথায় পেলে?" "বেশি চালাকী করো না। এখনও ফোমেণ্ট কল্লে পেট থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে পড়বে।" "আজকাল যে নানারকমের ব্রহ্মজ্ঞানী দেখতে

পাই হে! রামমোহন রায়ের ধর্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই করে তুলেচে। খোল-কর্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, আবার নিরামিষও খায়। কালে কালে কতই হবে!" এর পরেই রয়েছে ক্লাইম্যাক্স—গুরু-পুত্রকে নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশের মাতলামি। মাতালের মাথায় জল ঢালায়, "কে রে বাবা, এত রেতে ঠাণ্ডা জল দেও, দেখো যেন আমার নেশা ড্যামেজ না হয়।"

তদানীন্তন সমাজের মনোভাব, কাজকর্ম সব সাজানো আছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, পাঠক কেবল চোখ বুজে চিন্তা করবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সূক্ষ্ম নিখুঁত মন নিয়ে নাটক দেখছেন। তাঁর মন্তব্য এখন করব না, কারণ তাতে রসভঙ্গ হবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাল অবিনাশের স্ত্রী চারুশীলা আদর্শ সতী নারী। স্বামীকে বিপথ থেকে ফিরাবার তাঁর কী প্রাণপণ চেষ্টা! স্বামী অনেক সময় বাড়িতেই আসে না। কনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ দেবর হরিসুখ মাঝে মাঝে বড় বৌদির খোঁজ নেন, তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এনে পড়তে দেন। 'সুখী পরিবার' গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে চারুশীলা বলছে, "ঠাকুরপো, এ যে কি বস্তু তার মর্ম জানলাম না।...মহর্ষি যীশুর জীবনচরিত পড়তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।" তারপর ননদ এসে ভাগ্যহীনা বড় বৌকে উপদেশ দিয়ে বলল, "তুই বড় হাবা মেয়ে। ফিকির জানিস নে স্বামী কেমন করে বশ কর্তে হয়।" মেজ জা হিরণ্ময়ী স্বামীর সঙ্গে মেম সেজে ঘোরেন। বড়-জাকে দেখতে এসে বলছেন ঃ "এখন সাহেবদের সঙ্গে বসে খেতে হয়। এই দেখ, এরূপ পোশাক পরতে হচ্ছে। কখনও ঘোড়ার ওপর চড়ি। টেবিলে কাঁটা চামচে ধরে খানা খাই। অন্য অন্য সবগুলো না একপ্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজী কথাটা মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না! হিন্দুর মেয়ে মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল।...কাঁচা গোরুর মাংসগুলো কি আর ভাল লাগে? গা যেন বমি বমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে। সাহেবদের ভেতর আবার এমন নিয়ম আছে যে, খেতে বসে যদি বমি আসে তা অমনি গিলে ফেলতে হয়।" স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাড়াছাড়ির আইন বলবৎ, তার উল্লেখ করলেন মেজ-বৌ ঃ "মেমেরা হলে কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত।"

আমরা তদানীন্তন নারীসমাজের গতিবিধির পরিচয় পেলাম।

খ্রীস্টানদের বাড়িতে নেমন্তন্ন, তারপর মদ খেয়ে টলতে টলতে অবিনাশ রাতে বাড়ি ফিরে সতী সাধ্বী স্ত্রীকে বলছে, "তুই নাচতে জানিস নে, গাইতে জানিস নে, একটু মদ তাও পেটে বরদাস্ত হবে না, পেঁয়াজের গন্ধে তোর বমি হয়। তোরে নিয়ে কোথায় বেড়াব?" জ্বরগ্রস্ত পুত্রকে মদ খাইয়ে ভাল করতে যাচ্ছে অবিনাশ। ঈশ্বর নেই বোঝাচ্ছে স্ত্রীকে। ঈশ্বরের কাছে সতীর প্রার্থনার উত্তরে অবিনাশ বলছে ঃ 'হাঁরে, তুই ভগবানকে ডাকছিস্ কি? তিনি যে মরেছেন। আহা! বিলাত থেকে সেদিন তার এসেছে তিনি নেই। বয়সও ঢের হয়েছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব তাঁর শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করে চুকেছে।"

তদানীন্তন কালে পাশ্চাত্য-জড়দর্শন ও বিজ্ঞানের কতদূর প্রভাব পড়েছিল ভারতীয়

সমাজের উপর তার একটু নমুনা ঃ "আজ ভাই, ল্যাবরেটরিতে এক মজার কথা শুনলেম—প্রাণকান্তবাবু বললেন, কুকুরের আত্মা ও মানুষের আত্মা একই জিনিস। তিনি একটা জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখেছেন। সেদিন ডঃ ডক্কিন গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্বন আর ফসফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে অ্যালকহল দিয়ে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য মনোবৃত্তিসকল তৈয়ের করছিলেন যে, সকলে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলেম।... সায়েন্সের সঙ্গে হাসি তামাশা চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত থেকে ফিরে আসবার সময় আফ্রিকা দেশের একটি নীল বাঁদর এনেছেন। সে হাসে মানুষের মতো। সাহেব বলেছেন বাঁদরের ভেতর থেকে মানুষ বের করে দেখাবেন।... এ যে সায়েন্সের কথা গা—আদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও নয়। মরাকাটার ঘরে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের শরীরের মধ্যে আত্মা-টাত্মা কিছুই নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে সব দেখা হয়েছে। সিলি সাহেব আরও বলেছেন, ঠিক মাল-মসলার যোগাড় হলে এবং মাপজোখ বুঝতে পারলে তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুলতে পারবেন।"

পাঠক, ভুলে যাবেন না—জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এসব অপূর্ব বিজ্ঞানের কথা বিভিন্ন বেশধারী অভিনেতার মুখ থেকে শুনছিলেন। এসব শুনে তিনি কি ভাবছিলেন—বলুন তো?

বসু পরিবারে দুর্দিনের কালমেঘ ঘনিয়ে এল। বিপদ আসে দল বেঁধে। কনিষ্ঠপুত্র হরিসুখ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ও আবগারি পলিসির সমালোচনা করায় এবং স্কুলে ধর্মালোচনা করায় চাকরি হারালেন। মেজপুত্র রাধামাধব নাস্তিক সাহেবঘেঁসা হয়ে এবং "নেটিভ বড় পাজি জাত, এ দেশের কিছুই ভাল নয়, আমার ইচ্ছে হয় ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করি"—এসব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ জালিয়াতি ও খুনী মামলায় জড়িত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হলেন। কর্তা নরহরি বসু পুত্রদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে সস্ত্রীক কাশীবাসী হলেন।

আন্দামানে অবিনাশের অনুতাপ এল। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুতাপ অশ্রুতে ধুয়ে মুছে যায়। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার এবং তার সদুপদেশে অবহেলা, পুত্র-কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—সব মিলে অবিনাশকে দাহ করতে লাগল। প্রচণ্ড দুঃখের পর বিধাতার কিঞ্চিৎ করুণা বর্ষিত হলো অবিনাশের জীবনে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে অবিনাশ পেলেন মুক্তি। ফিরলেন দেশে। স্ত্রী চারুশীলা ও কনিষ্ঠ সহোদর শত দুঃখের মধ্যেও ধর্মের অচঞ্চল দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে—এ-কথা খুবই সত্য।

অবিনাশ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বেরুলেন। অবশেষে নীলগিরি উপত্যকায় যোগিবর স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে নিলেন। পাঠক মনে রাখবেন—এই অভেদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখনকার নরেন্দ্রনাথ) এবং পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন কেশব সেন।

নব বৃন্দাবন নাটকে স্বামীজীর অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, তিনি "একবার ঋত্বিকের অংশ অভিনয় করেছিলেন।" শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন যে, তিনি সঠিক বলতে পারেন না, স্বামীজী কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আরও জানালেন যে, লোকমুখে তিনি শুনেছেন, যে, স্বামীজী বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ "নরেন্দ্রনাথ কেশবের সমাজে যখন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-প্রণীত 'নব বৃন্দাবন' নাটক অভিনীত হয়, তখন আমন্ত্রণ পাইয়া অভেদানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ...গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নব বিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'ও এই অভিনয়ের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দের কথা পরে উল্লেখ করব।

যাহোক, স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাত্মপিপাসু দম্পতিকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বললেন, "পাহাড়ীবাবার নিকট তোমরা নব বিধানের বীজমন্ত্র পাবে।" নাট্যকার অভেদানন্দের মুখে বাইবেল, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা লাগিয়ে একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত করেছেন। পরে শিষ্য-শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে বলছেন; 'ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, মহম্মদ, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পল, সক্রেটিস প্রভৃতি ভক্তসন্তানগণকে কোলে নিয়ে মা আনন্দময়ী জগদীশ্বরী তোমার হৃদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন। এই তাঁর নবীন মূর্তি।"

অবিনাশ ও চারুশীলাকে গৃহস্থাশ্রমে সদ্ভাবে জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে অভেদানন্দ বললেন, "আমি সম্প্রতি মক্কা, জেরুসালেম তীর্থে গিয়েছিলাম। এরপর বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকব।" তারপর গুহা থেকে উত্থিত হলেন পাহাড়ীবাবা। তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ "তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ কর। একহৃদয় হয়ে সংসারমধ্যে দ্বিজধর্ম পালন করবে। সুখ-সম্পদে, দুঃখ-বিপদে 'সচ্চিদানন্দ' এই মহামন্ত্র জপ করবে। তোমাদের বিপদ-পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সংসারের দুর্গম পথে বড় ভয়। সাবধান! বীজমন্ত্র ভুলো না।"

এখন কেশববাবুর নব বিধানের দু-চার কথা না বললে নাটকখানি কুহেলিকার মধ্যে থেকে যাবে। অভেদানন্দের কথাতে রয়েছে ঈশা-মুসা থেকে শঙ্কর-সক্রেটিস এবং অদ্ভুত তীর্থপরিক্রমাতেও রয়েছে মহাসমন্বয়ের কথা। তদানীন্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েছিল—পাশ্চাত্যের যুক্তিসম্মত বৌদ্ধিক ধর্মের সঙ্গে ভারতের সগুণ নিরাকার ঈশ্বর; নৈতিকতা, নিয়মিত স্বাধ্যায়, ভজন-প্রার্থনা; পুরোহিতকুল, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছেদ; প্রতিমাপূজাবর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিবিভাগের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহের প্রচলন ইত্যাদি। ধর্মের সঙ্গে সমাজসংস্কারের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। এই নাটকে বিধবা-বিবাহের একটা সুন্দর মন্তব্য আছে ঃ "বৃথা আন্দোলন করে কি হবে?"

এ-কথার উত্তরে পাড়ার নরকান্ত ডাক্তার বলছেন, "কেন? এই তো সেদিন আমার বিধবা জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজ-সংস্কারের কাজ মন্দ কি চলছে?" এই নাটকে দেশী দেবতাদের পরিবর্তে মহাযোগী ঈশার উল্লেখের ছড়াছড়ি দেখা যায়। উপরন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। আর আছে ব্রাহ্মদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার কথা—যেমন 'সুরাপান-নিবারণী সভা', 'আশালতা' প্রভৃতি।

খ্রীস্টানদের 'পাপবাদ'টিও এ-নাটকে বাদ যায়নি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমনকালে অবিনাশ ও চারুশীলা বনের ভিতর পাপপুরুষ কর্তৃক প্রলুব্ধ হন। অবশেষে স্বর্গীয় দূতরূপে বিবেক-বৈরাগ্যের উপস্থিতি ও উপদেশে তাঁরা রক্ষা পান। বিবেকের উক্তি ঃ "কে আছে হরিভক্তের প্রাণসংহার করতে পারে? সুবোধ ভক্ত, তোমাকে মহর্ষি ঈশা এই দুর্জয় অস্ত্র দান করলেন। এর অব্যর্থ সন্ধানে যুগে যুগে মহাযুদ্ধে অসংখ্য রিপুরা আহত হয়েছে। অতএব বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে এই ধনু ধারণ কর, সমস্ত পৃথিবী তোমার বশীভূত হবে।" নাটকের এ-দৃশ্যটা স্মরণ করিয়ে দেয় জন বুনিয়ানের বিখ্যাত রূপক-গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress'কে।

কুঞ্জবাবু ঐ পাপপুরুষের অভিনয় করেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "এমন কি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যাকথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে 'নব বৃন্দাবন' দেখতে গিছিলাম। কি একটা আনলে ক্রস! একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করচে। ভক্তের পক্ষে ওসব সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের কাপড়, যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।" [২]

চরম দুঃখের পর মিলনসুখ বেশি অনুভূত হয়। রোগশয্যায় বা মৃত্যুকালেই মিলনের ঘটা বেশি দেখা যায়। বসুপরিবারে দীর্ঘ তমিস্রার পর অরুণোদয় হলো। ধার্মিক হরিসুখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নব বিধানের পরিকল্পিত 'সুখী পরিবার'। মেজপুত্র সাহেব-ঘেঁসা রাখালমাধব কোন একটি হোটেলে ঢুকে একজন ইংরেজের গুঁতো খেয়ে বিদেশীয়ানা ছেড়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে ফিরে এল এবং খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করল।

সত্যি বলতে কি, প্রতিবেশীরা বসুপরিবারের ঐ নবীন ব্রাহ্ম মতটা যে কি, ধরতে পারত না। "মতটা যে কি, কিছুই বোঝবার জো নেই। ব্রহ্মও বলছে, হরি হরিও কচ্চে, আবার মা বলেও ডাকছে। কখনো দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ঈশা, মুসা, নিতাই, গৌর, মহম্মদ, শুক, শিব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ---যা মুখে আসে তাই বলে।" অপর প্রতিবেশী ঃ "স্বদেশ-বিদেশের সমুদায় ধর্মশাস্ত্র, সাধু, সত্য, সুনিয়ম-সদাচার—সমস্তকে দেশীয়ভাবে হিন্দু আকারে পরিণত করছে। বেশ চুম্বুক ধর্ম বটে!" অপর প্রতিবেশী ঃ "ওহে, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ও একরকম ঘাসিরামের গর্মাগরম চ্যানাচুর।"

ওদিকে পাপপুরুষের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অবিনাশ ও চারুশীলা নিজেদের বাড়ি

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/১০৪

রামকৃষ্ণপুর ফিরে এলেন। তারপর তিন ভাই একত্র বধূদের নিয়ে পিতামাতার অন্বেষণে বেরুলেন। এখান থেকেই নাটকটি মিলনান্ত হতে শুরু করেছে। বসুপরিবারের গৃহস্বামী নরহরি বসু ও তাঁর স্ত্রী অলকাসুন্দরী যথাক্রমে চরণদাস বৈরাগী ও রাইবিলাসিনী নাম ধরে বৃন্দাবনধামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখানে স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমে আপন পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে দৈবাৎ তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের যখন খুব দহরম-মহরম—নব বৃন্দাবন সেই কালে লেখা। বৃন্দাবন দৃশ্যে নাট্যকার অবিনাশের সমাধি দেখিয়েছেন। অবশ্য সমাধি কথাটার প্রয়োগ না করে তিনি বৈষ্ণবী ভাষায় 'দশাপ্রাপ্তি এবং দর্শনানন্দের উচ্ছ্বাস' বলে উল্লেখ করেছিলেন। "আহা! মুখের কি শোভাই হয়েছে! নয়নদ্বয় স্থির অথচ প্রেমনীরে ঢলঢল, শরীরে পুলক যেন কদম্বাকৃতি। ললাটে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।" এরূপ হুবহু জীবন্ত বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় নাট্যকার অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে ওখানে রূপ দিয়েছেন।

নব বিধানের প্রভাবে দুঃখী পরিবার সুখী পরিবারে পরিণত হলো। স্বামী অভেদানন্দ ঐ পরিবারকে যুগধর্মলীলার মাহাত্ম্য প্রচার করতে নির্দেশ দিলেন। গেরুয়াধারী সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী অভেদানন্দের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথকে কেমন মানিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঃ "ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল। তাতে স্বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু সেজে প্লে করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে ঐ-বেশেই নেমে আসবার জন্য বলতে লাগলেন। স্বামীজী ইতস্তত করছে দেখে কেশব বাবু বললেন, 'উনি যখন বলছেন, নেমে এস না।' তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে বললেন—'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে'।" [৩]

প্রথম সংস্করণে নব বৃন্দাবনে হাল্কাভাব ঢোকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাজিকর চোবেজীর দ্বারা নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নাট্যকার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বৃন্দাবনধামে সুখী পরিবার শুনলেন বাজিকরের ডাক ঃ লাগ লাগ ভেল্কী লাগ। লাগ ভাঙ্গা ধর্ম জোড়া লাগ। নগরবাসী জাগ জাগ, ভেদাভেদ দূরে ভাগ। হরি সচ্চিদানন্দকী খেলা, নব বৃন্দাবনকী মেলা।

ম্যাজিসিয়ান চোবেজী সকলের অনুরোধে নব বিধানের অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করলেন। এ-বাজি ভোজবাজি নয়। সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম ও ধর্মসমন্বয়—এই ছিল চোবেজীর ইন্দ্রজালের বিষয়বস্তু। চোবেজী প্রথমে জড় কলাগাছের পাতায় হরিনাম দেখালেন। তারপর উপস্থিত মানুষের গায়ে হরিনাম দেখালেন। শুধু নামে তৃপ্ত না হয়ে কলাগাছ থেকে হরিপ্রেম-রস বের করে সকলকে আস্বাদন করালেন। বসুপরিবারের সঙ্গে বসে স্বামী অভেদানন্দও ঐ ইন্দ্রজাল দেখছিলেন।

এরপর চোবেজী ধর্মসমন্বয় শুরু করলেন ঃ এই দেখুন, কত রঙের কাঁচ। লাল নীল সাদা সবুজ। এক এক ধর্মের এক এক রঙ। কিন্তু সকলি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন! এই নব বিধানের

৩ সৎকথা, পৃঃ ১১৪

সুতা দিবামাত্র সকলি একত্র বদ্ধ হলো। এই দেখুন। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল।

চোবেজী শুরু করলেন ঃ এই দেখুন—বেদ, বাইবেল, কোরান ও ললিতবিস্তর। এদের মধ্যে বড়ই বিরোধ। কিছুতেই মিল হয় না, কিন্তু নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক বাক্স মধ্যে রাখামাত্র সংযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারখানা গ্রন্থ এক হয়ে গেল।

আবার খেলা শুরু হলো ঃ আর একটা তামাশা দেখুন। হিন্দুদের ওঁকার, খ্রীস্টানদের ক্রুশ, মুসলমানদের চন্দ্রাংশ, শৈবদের ত্রিশূল, বৈষ্ণবদের খুন্তি। এরা কি কখনও মিলেছে, না মিলতে পারে? কিন্তু নব বিধানের সম্মিলনী শক্তির কাছে এরা হার মেনেছে। চোবেজী ম্যাজিকের সাহায্যে এক করে দিলেন; আর কেউ টেনে খুলতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়তে লাগল। তারপর চোবেজী ইংরেজদের ফ্লুট, হিন্দুর খোল, মুসলমানদের সারেঙ্গ, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতির সুর এক করে ব্রহ্মধ্বনিতে মিশিয়ে দিলেন।

এক মৃত কপোতের কাহিনী দিয়ে ইন্দ্রজাল শেষ হলো। খ্রীস্টানী ঢঙে উচ্চারিত হলো 'ঐ স্বর্গরাজ্য আসছে।' চোবেজী একটা মৃত কপোতের প্রাণদান করে আকাশে ছেড়ে দিলেন। উড়ন্ত পক্ষীর গলায় দেখা গেল একটা পত্র। তাতে লেখা আছে ঃ "নব বিধান সমুদায় ধর্মের সমন্বয় এবং পৃথিবীতে শান্তিধাম করবে।" ম্যাজিক শেষ। তারপর 'নব বৃন্দাবন' কবিতাপাঠান্তর নব বিধানের বিজয়-নিশান চতুর্দিকে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র এবং সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়ে নাটকের উপর যবনিকা পড়ল।

নাটকের ইতিবৃত্ত বিবৃত করবার কালে আমরা বেশি কথাবার্তা বলার সুযোগ নেইনি। কারণ তাতে পাঠকের রসভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। এবার নব বৃন্দাবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে দু-চার কথা বল্‌ব।

নাটক দেখার সময় পাশে বসে কেউ যদি গল্প করে তবে অন্যান্য দর্শক বিরক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণও বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথা ঃ "একজন ডেপুটি আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে (নব বৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছল। আমিও গিছলাম; আমার সঙ্গে রাখাল, আরো কেউ কেউ গিছল। নাটক শুনবার জন্য আমি যেখানে বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছল। ডেপুটি এসে ঐখানে বসল। ...যতক্ষণ নাটক হলো ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। ...একবারও কি থিয়েটার দেখলে না!" [৪]

পূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি ব্রাহ্মমতগুলি 'নব বৃন্দাবনে' কি করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিবৃত হয়েছে। এবার নব বিধানের আর একটু ইতিহাস অনাবৃত করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে। কোচবিহারের রাজবাড়িতে কেশবের কন্যার বিবাহ হয় ১৮৭৮ খ্রীঃ-এর ৬ মার্চ। ঐ বিবাহ সমাজের নিয়মমাফিক না হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার বলেন ঃ "কেশববাবু ঠাকুরের 'সর্বধর্ম সত্য—যত মত তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক লইতে না

---

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/১৮১

পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্ম্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নব বিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়— শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ...দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক (কেশববাবুকে) 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছেন।" [৫]

আমরা ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটিত করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ। সুতরাং ঐভাব অবলম্বনে রচিত নাটক তাঁর তো ভাল লাগবার কথা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয়, তাঁর ঐ নাটকখানি তত ভাল লাগেনি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ফিরে যাই ঃ "কেশব সাধু সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগল। আমার কিন্তু ভাল লাগল না। অভিনয় করে শান্তিজল!" [৬] পাপের অভিনয়ও ঠাকুরের ভাল লাগেনি—এ-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার-যাত্রার অদ্ভুত সমঝদার ছিলেন। স্টারে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' দেখবার কালে বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "আসল নকল এক দেখলুম।"

'নব বৃন্দাবন' নাটক হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো তার প্রয়োজনীয়তা। 'নব বৃন্দাবন' তদানীন্তন সমাজের সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েছে—এ-কথা অনস্বীকার্য।

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২/৪০৪ ৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/১০৪

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে শ্রীম ঃ বড়দিনের ছুটিতে

একশ দশ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে বাস করতেন। এখনো সেখানে গিয়ে আমরা দেখি সেই মা কালীকে, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করতেন; সেই কৃষ্ণকে, যাঁর ভাঙা পা ঠাকুর জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁর ঘরের সেই খাট দুখানি, যাতে তিনি বসতেন ও শুতেন; তাঁর সংগৃহীত ছবিগুলি এখনো দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে; সেই চাঁদনীর ঘাট, যেখানে তিনি স্নান করতেন; সেই পঞ্চবটী ও বেলতলা, যেখানে তিনি কত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মন্দিরের উঠানের টালিগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হয়—এগুলির ওপর দিয়ে স্বয়ং শরীরধারী ভগবান হেঁটে গেছেন। টালিগুলো কি ভাগ্যবান! অনেক সময় মনে হয়—এখন যাঁকে ধ্যান-জপের দ্বারা ধরতে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে যদি দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন কাটাতে পারতাম, তবে কী আনন্দটাই না হতো!

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্থূল শরীরে ছিলেন তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। অথচ কয়জনাই বা তাঁকে তখন দেখতে গেছে! কথায় বলে—প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। মহাপুরুষের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে চিনতে পারে না। দূরের লোকেরাই তাঁর মূল্য বোঝে। ছুটি পেয়ে মানুষ যায় দূরের দুর্গম তীর্থে। এই তীর্থযাত্রার জন্য কত প্রস্তুতি, কত অর্থব্যয়, কত সময় ও শক্তির অপচয়, কিন্তু ঘরের কাছের মহাপুরুষকে দেখার অবকাশ কোথায়?

মনুষ্যজীবনে অবকাশ-যাপনের মূল্য আছে। নতুবা একঘেয়েমি, ক্লান্তি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মানুষের জীবনে অবসাদ এনে দেয় এবং তা দুর্বিসহ করে তোলে। মনে হয় যেন বন্দি জীবন যাপন করছি। সংসার থেকে দূরে গিয়ে অবকাশ যাপনের কালে মানুষ অনুভব করে সে মুক্ত। সে ফুর্তিতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে বেড়ায়। সাময়িক বাঁধনছেঁড়ার আনন্দও তার দেহমনকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

কথামৃতকার শ্রীম বড়দিনের ছুটিতে ১৮৮৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়েছিলেন। এই তেইশ দিন অবস্থানের মধ্যে তিনি মাত্র চৌদ্দ দিনের দিনপঞ্জী লেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এই কয়েকদিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য শ্রীমর মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল—তা-ই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর শ্রীম নহবতের পশ্চিম বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। *ঠাকুর ঝাউতলা থেকে ফিরবার পথে শ্রীমকে দেখে বললেন ঃ* "কিগো, এইখানে বসে!

তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!" শ্রীম চমকিত হয়ে ঠাকুরের দিকে আশায় ও আনন্দে তাকিয়ে রইলেন। ঠাকুর আরও বললেন ঃ "তোমার সময় হয়েছে। পাখি ডিম ফুটোবার সময় না হলে ডিম ফুটোয় না।" এ-কথাগুলি শুনে শ্রীমর মন খুশিতে ভরে গেল। তিনি পূর্বে বহু ধর্মগ্রন্থ, দর্শন ও সাহিত্য পড়েছেন, কিন্তু তা তাঁকে শান্তি দিতে পারেনি। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তাঁর জীবনে রূপান্তর এনে দেয়।

যাহোক, শ্রীম আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চবটীর দিকে চললেন। ঠাকুর বলে চললেন তাঁর সব নানা দর্শনের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ডাল পড়ে গেছে, দেখছ; এর নিচে বসতাম।

মাস্টার—আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি—বাড়িতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন?

মাস্টার—দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে। (শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন)

৯ ডিসেম্বরের কথাবার্তায় শ্রীমর উদ্দীপন হলো। তিনি ঠিক করলেন, ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন থেকে তাঁর নির্দেশে জপ-ধ্যান করবেন। ১৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার, সকাল ৯টায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হলেন এবং ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কয়েকদিন আগে ঠাকুর 'সাধন' প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "কিছু করলেই কেউ বলে দেবে, 'এই, এই'।" এ-কথাটা শ্রীমর মনে চিরদিনের জন্য গেঁথে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি ভক্তদের প্রায়ই এই কথাটি শোনাতেন।

বাসস্থান প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন ঃ "পঞ্চবটীর ঘরে শোবে?"

শ্রীম বললেন ঃ "নহবৎখানার ওপরের ঘরটি কি দেবে না?"

শ্রীমর নহবতের ওপরের ঘর পছন্দ, কারণ তিনি কবিত্বপ্রিয়। সেখান থেকে আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ, ঠাকুরের ঘর—সব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "দেবে না কেন? তবে পঞ্চবটীর ঘর বলছি এই জন্য, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বর-চিন্তা হয়েছে।"

আহার-বিষয়ে ঠাকুর পূর্বেই শ্রীমকে বলেছিলেন যে, অতিথিশালার অন্ন তাঁর খাওয়া উচিত নয়, কারণ তা সাধু ও কাঙালের জন্য। সে যেন একজন রান্নার লোক সঙ্গে আনে। তাই শ্রীম একজন লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাঁর কোথায় রান্না হবে এবং কোথায় দুধ পাওয়া যাবে ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে দিলেন। সাধকের আহারের দিকে বেশি নজর থাকা ভাল নয়। ভাগবতে আছে ঃ "জিতং সর্বং জিতে রসে," অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় জয় করলে সব ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। ঠাকুর তাই শ্রীমকে ভাত, তরকারি, দুধ প্রভৃতি সাধারণ খাবার খেতে বলেছিলেন।

ফুল ফুটলে ভ্রমর চারিদিক থেকে আসে। নানা জায়গা থেকে লোক আসত ঠাকুরের

ভগবৎকথা শুনবার জন্য। ঐদিন বিকালে একদল ভক্তের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "বালকের মতো বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়; সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।" ঠাকুর জানতেন মানুষের মনে কিভাবে ভগবৎ-ক্ষুধা জাগাতে হয় এবং ঐ ক্ষুধানিবৃত্তি করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর জটিল বালকের গল্পটি বলেছিলেন। সে বনপথে স্কুলে যেতে ভয় পেত। তার মা বলেছিল যে, ভয় পেলে সে যেন মধুসূদন-দাদাকে (কৃষ্ণকে) ডাকে। মায়ের কথায় জটিলের পূর্ণ বিশ্বাস। তাই পরদিন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় তারস্বরে মধুসূদন-দাদাকে ডাকল। কৃষ্ণ জটিলের ক্রন্দন শুনে তার সামনে হাজির হলেন এবং তাকে স্কুলে পৌঁছে দিলেন। গল্পটি বলে ঠাকুর বললেন ঃ "এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা!"

শ্রোতাদের ওপর ঠাকুরের গল্প ও উপদেশের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

"নহবৎখানার উপরের ঘরে মণি (শ্রীম) একাকী বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ি, মন্দিরশীর্ষ, উদ্যানপথ, পঞ্চবটী চাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে। মণি একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন।

"রাত প্রায় তিনটা হইল। তিনি উঠিলেন। উত্তরাস্য হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর কথা বলিয়াছেন। আর নহবৎখানা ভাল লাগিতেছে না। তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, স্থির করিলেন।

"চতুর্দিক নীরব। রাত এগারোটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক-একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন!'

"আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন পঞ্চবটীর মধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত (লাটু মহারাজ) বসিয়া আছেন। তিনিই নির্জনে একাকী ডাকিতেছেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন!'

"মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন।"

অপরদের দেখে শ্রীম শিখতেন কিভাবে ঠাকুরের উপদেশ জীবনে পালন করতে হয়।

সাধারণত লোকেরা যখন ছুটিতে বা তীর্থে যায়, সারাদিন তারা ঘুরে বেড়ায় এবং এটা-ওটা দেখে, খায়, গল্প করে আর রাতে খুব ঘুমায়। শ্রীমও এসেছেন ছুটিতে। ঠাকুর তাঁর মনে এমন ভগবৎ-ক্ষুধা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর চোখে ঘুম নেই। জীবন সংক্ষিপ্ত। প্রতিটি মুহূর্ত যাতে ভগবদ্ভাবে তন্ময় হয়ে থাকা যায় তার জন্য শ্রীম চেষ্টা করতেন।

শনিবার, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীমর ছুটির দ্বিতীয় দিন। ঠাকুর অন্তর্যামী। কার কিসে মঙ্গল হবে তা তিনি

জানতেন। এদিন তিনি শ্রীমকে দারুণ বকুনি দিলেন ঃ "লজ্জা হয় না! ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রীসঙ্গ ! ঘৃণা করে না।—পশুদের মতো ব্যবহার!... যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।" শ্রীম তিরস্কৃত হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কথামৃতের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীম তাঁকে ঠাকুরের বকুনিগুলো পর্যন্ত লিখে রেখেছেন; সাধারণ মানুষের মতো নিজের দুর্বলতাগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। যাহোক, শ্রীমকে সংস্কারমুক্ত করে আধ্যাত্মিকপথে এগিয়ে দেবার জন্য ঠাকুর উত্তম বৈদ্যের মতো কাজ করেছেন। পরে আবার শ্রীমকে সান্ত্বনা দেবার ছলে ঠাকুর বলছেন ঃ "তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যদি কেউ পায় কামিনীকাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নাম গুণ সর্বদা কীর্তন করলে—তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয়।" এই বলে ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন—"সুরধনীর তীরে হরি বলে কে,/বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।" ঠাকুর সেদিন শ্রীমর মনে স্বর্গীয় আনন্দ ঢেলে দিলেন। পরে তিনি শ্রীমকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে গেলেন। দুই-একটি ফুল মায়ের চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল দিয়ে ধ্যান করলেন। তারপর আবার গান গাইলেন—

"ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার,
তারো তারো না তারো মা।"

পরবর্তী কালে শ্রীম বলতেন যে, ঠাকুর ঐ গানটির মাধ্যমে তাঁকে মা-কালীর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। পরে একদিন (২৪/১২/৮৩) ঠাকুর শ্রীমকে বললেন ঃ "আমার যারা আপনার লোক, তাদের বকলেও আবার আসবে।"

রবিবার, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীম দক্ষিণেশ্বরের সৌন্দর্য ও পরিবেশ উপভোগ করতেন। সকালে ঠাকুরের সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে আছেন। কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানা কুসুমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ।

হঠাৎ একটা গান গাইতে গাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন। শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা। শ্রীম ঠাকুরের সমাধির চিত্রগুলি হুবহু কথামৃতে ধরে রেখেছেন ভাবীকালের মানুষদের ধ্যানের সুবিধার জন্য।

কিছু সময় পরে আবার বলছেন ঃ "মা, সীতার মতো করে দাও—একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল, হাত, পা—কোনদিকেই হুঁশ নাই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম?" শ্রীম লিখেছেন ঃ "কিরূপ ব্যাকুল হলে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটি শিখাইবার জন্যই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল?"

ঐদিন বিকালে জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন—কি করে মন থেকে কামিনীকাঞ্চন-মাটি পরিষ্কার করতে হয়। ঠাকুর উত্তরে বলেন ঃ "তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে। যোগ তবেই হবে।"

সাধনকালে অস্তগামী সূর্য দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদে মাকে জানাতেন ঃ "মা আর একটা দিন চলে গেল, তবুও দেখা দিলিনি!" শ্রীম ঠাকুরের কাছ থেকে এসব শোনার পর সূর্যাস্তের সময়টা তাঁর কাছে বিশেষ রূপে প্রকটিত হয়েছিল। কথামৃতের বহু জায়গায় তিনি সূর্যাস্তের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা—কুলকুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। শীতকাল—সূর্যদেব এখনো দেখা যাইতেছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

"সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভক্তেরাও নির্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুরবাড়িতে মা-কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

"আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দিরশীর্ষ, চতুর্দিকের তরুলতা ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথীবক্ষে পড়িয়া অপূর্ব শোভাধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।"

শ্রীম বেদান্ত শাস্ত্র পড়েছিলেন এবং কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাওয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতও জানতেন। এঁরা ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ, সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। শ্রীম ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে বুঝেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বেদময়, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য, তাঁর মুখ দিয়ে শ্রীভগবান কথা কন, তাঁর কথামৃত নিয়েই বেদ-বেদান্ত-ভাগবত রচিত হয়েছে—সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

জগতের রহস্য জানবার জন্য শ্রীম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "জগৎ কি মিথ্যা?" "মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়—প্রতিমা চিন্ময়—বেদি চিন্ময়—কোশাকুশি চিন্ময়—চৌকাঠ চিন্ময়। মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়। ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দ রসে। কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম; কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্বল করছে দেখলাম। তাই তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম, মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত।"

শ্রীম মুগ্ধ হয়ে শুনলেন ঠাকুরের অনুভূতি। তিনি জীবনে কখনো এমন বর্ণনা

শোনেননি। কোথায় জড়ের শেষ এবং চৈতন্যের আরম্ভ—নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। শ্রীম বুঝলেন যে, জড়জগতের পিছনে রয়েছে চৈতন্যের সত্তা এবং উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আর শ্রীরামকৃষ্ণের একাত্মানুভূতি এক।

সোমবার, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩

ঠাকুর শ্রীমর মনে ভগবৎ-উন্মাদনা জাগাবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বললেন ঃ "কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম।... ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। গৌরী বলত, মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্যন্ত—মহাযোনি হয়ে যায়। এক-একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণসুখ বোধ হয়।" ঠাকুর আরও বললেন ঃ "ঈশ্বরদর্শন হলে রমণসুখের কোটিগুণ আনন্দ হয়।"

ঠাকুরের প্রাণমাতানো কথা শুনে শ্রীমর বৈরাগ্যের ভাব হলো এবং সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মঙ্গলবার, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীমর খুব তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল। তিনি দিনরাত ঠাকুরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিলেন। সমাধির প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, তাই তিনি ঠাকুরের সমাধি-চিত্রগুলি ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর পূর্বদিকের দরজার নিকট বসিয়া আছেন। শীতকাল। গায়ে Moleskin-এর র‍্যাপার। হঠাৎ সূর্যদর্শন ও সমাধিস্থ। নিমেষশূন্য, বাহ্যশূন্য।"

শ্রীম ঠাকুরের এই সমাধির সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্রের যোগ লক্ষ্য করে লিখেছেন ঃ "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি"।

সাধারণ ব্যক্তির কাছে সমাধি ভয়ের ব্যাপার। কারণ, সমাধিস্থ ব্যক্তিতে মৃতের সব চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সদাসর্বদা থাকতেন তাঁরা ভয় পেতেন না। তাঁরা জানতেন, ঠাকুরের সমাধিস্থ হওয়া যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, অথচ 'সমাধি' যোগ ও বেদান্ত শাস্ত্রে অনুভূতির শেষ ধাপ।

এদিন ঠাকুর তাঁর আপন অনুভূতির কথা বললেন ঃ "ওদেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম। বোধ হলো আমার লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্মশরীর) শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পায়ে বেড়াচ্ছে। জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঐরূপ কীর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য। সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।"

তারপর স্নান করে ঠাকুর শ্রীমকে বললেন ঃ "গোপীদের ঐ টানটুকু নিতে হয়।"

ঐদিন বিকালে শ্রীম ঠাকুর ও রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কলকাতায় যান। শ্রীরামকৃষ্ণ

রাখালের রোগনিরাময়ের জন্য ঠনঠনের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের কাছে ডাবচিনি মানত করেছিলেন। তিনি শ্রীমকে বললেন ঃ "তুমি ডাবচিনির দাম দেবে।" পথে সিমুলিয়া বাজারে ডাবচিনি কেনা হলো এবং মায়ের মন্দিরে নিবেদন করা হলো। মন্দিরের সামনে পূজারীরা বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে দেখে ঠাকুর আক্ষেপ করে বললেন ঃ "দেখেছ, এসব স্থানে তাস খেলা! এখানে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়।" বাইবেলে আছে, খ্রীস্টও ভণ্ডামি সহ্য করতে না পেরে গীর্জার সামনে ব্যবসায়ীদের টেবিল উলটে দিয়ে তছনছ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমার গৃহ হবে প্রার্থনার গৃহ, আর তোমরা তাকে চোরের আড্ডাস্থল করে তুলেছ।"

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধনীভক্ত যদু মল্লিককে দেখতে যান। যদুকে কতকগুলো অলস বাবু-পরিবৃত দেখে ঠাকুর হেসে বললেন ঃ "তুমি অতো ভাঁড়, মোসাহেব রাখো কেন?" যদু হেসে উত্তরে বললেন ঃ "তুমি উদ্ধার করবে বলে।" সবাই হেসে উঠল।

বুধবার, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩

আমরা যদি জানতে পারি যে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধ কোন জায়গায় একদিন কাটিয়েছেন বা কোন রাস্তা দিয়ে গেছেন, তাহলে সে-স্থানটি চিরদিনের মতো পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে তিরিশ বছর কাটিয়েছেন। শ্রীম তাঁর শক্তিশালী কলম ও কাব্যিক কল্পনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতি ও মন্দির-উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভবিষ্যতের তীর্থযাত্রীদের জন্য কথামৃতের পাতায় ধরে রেখে গেছেন। একশ দশ বছর পরে আমরা যখন ঐ বর্ণনা পড়ি তখন আমাদের প্রাণে জেগে ওঠে এক আবেগভরা আকুলতা।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

"বিল্বতল ঠাকুরের সাধনভূমি। অতি নির্জন স্থান। উত্তরে বারুদখানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউগাছগুলি সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে; পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দিকে এত গাছপালা, দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না।"

এই বর্ণনা পড়ার পর এখনকার দক্ষিণেশ্বর দেখলে কষ্ট হয়। মনে হয়—সেই রামও নেই আর সেই অযোধ্যাও নেই। সেই কৃষ্ণও নেই সেই মথুরাও নেই। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী প্রায় নিশ্চিহ্ন। মন্দির-উদ্যানের প্রবেশপথে এখন মনোহারী দোকান, রেস্টুরেন্টের ছাউনি। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে কাঠের বেড়া। সর্বগ্রাসী কালের মহিমা এরূপ। সে পুরানকে গ্রাস করে নতুনকে সৃষ্টি করে।

আজকাল অনেকে মনে করে, ঠাকুরের বই পড়ে এবং একটু মন্ত্রজপ করে সমাধি লাভ

করব। নিরাকার সাধন প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীমকে সাবধান করে বলছেন ঃ "ও পথ বড় কঠিন। আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ করত—ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব করত। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল। নিজেদের কুটির থেকে সকালবেলা বেরিয়ে যেত; সমস্ত দিন তপস্যা করে সন্ধ্যার পর আবার ফিরত। তারপর এসে একটু ফলমূল খেত।"

শ্রীমর জীবন ছিল ব্যস্ততায় ভরা। তিনি ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার; তাছাড়া বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-সংসারের দায়িত্ব। এই ছুটির সময় তিনি চেষ্টা করছিলেন, কি করে ঠাকুরের কাছ থেকে সাধনপ্রণালী জেনে নিয়ে সাধনসমুদ্রে ডুব দেওয়া যায়। শ্রীম শতরঞ্জি, আসন, জলের ঘটি নিয়ে বেলতলার জঙ্গলে ধ্যান করতে গেলেন। দুপুরের পর ফিরবার মুখে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পঞ্চবটীতে দেখা হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি যাচ্ছিলাম তোমায় খুঁজতে। ভাবলাম এত বেলা, বুঝি পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালালো। তোমার চোখ তখন যা দেখেছিলাম—ভাবলাম বুঝি নারায়ণ শাস্ত্রীর মতো পালালো। তারপর আবার ভাবলাম—না সে পালাবে না। সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে।"

ভগবান যেমন ভক্তকে আকর্ষণ করেন, ভক্তও তেমনি ভগবানকে আকর্ষণ করে। আমরা অনেক সময় ভাবি—ভগবান কি আমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, কর্ম এবং ব্যবহার আমাদের প্রাণে আশা-ভরসা দেয়। মানুষ এক পা এগুলে তিনি শত পা এগিয়ে আসেন। ঈশ্বর আন্তরিক প্রার্থনা শোনেন। প্রেম পারস্পরিক। কেউ ভালবাসলে সেও ভালবাসা পাবে—এই তো সনাতন রীতি।

শ্রীম সে-রাতে পঞ্চবটীর কুটিরে ছিলেন। পরদিন ভোরে তিনি আপন মনে গান গাইছিলেন—

গৌর হে আমি সাধন-ভজন-হীন।
পরশে পবিত্র করো আমি দীনহীন।।
চরণ পাবো পাবো বলে হে,
(চরণ তো আর পেলাম না, গৌর)
আমার আশায় আশায় গেল দিন!

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। "পরশে পবিত্র করো আমি দীনহীন"—এই কথা শুনে ঠাকুরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। শ্রীম ঠাকুরের কৃপা অনুভব করলেন।

শুক্রবার, ২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩

সকালে শ্রীম ঠাকুরের সঙ্গে একাকী বেলতলায় দেখা করলেন। ঠাকুর তাঁকে সাধনের নানা গুহ্য কথা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা, আর কখনো কখনো নিজের মনই গুরু

হয়—এসব কথা বললেন। মন যখন গুরু হয় তখন এই বোধ হয়—ভগবানই তার যথাসর্বস্ব এবং তিনি তার হৃদয়ে সদা বিরাজমান।

শনিবার, ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীম সংসারে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। সেই যন্ত্রণা তিনি ভুলেছিলেন ঠাকুরের অমৃতোপম কথায় এবং অপরেও যাতে শান্তি পায় তাই তিনি ঠাকুরের কথামৃত লিখে গেছেন।

"ভক্তি কিসে হয়?"—এটি সনাতন প্রশ্ন। ঠাকুর উত্তর দিলেন ঃ "এগিয়ে পড়। সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। সব দেউড়ি পার হয়ে গেলে তবে তো রাজাকে দেখবে।... বড় দীঘিতে বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেল, সেই চারের গন্ধে ঐ বড় মাছ আসবে। এক-একবার ঘাই দেবে। প্রেমভক্তিরূপ চার।"

ভগবানকে তো দেখিনি, তবে তাঁকে কি করে ভালবাসব?

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ "ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব। ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়। ... অবতারকে চিনতে গেলে সাধনের প্রয়োজন। ... অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হলো।"

রবিবার, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৩

ঈশ্বরীয় রূপদর্শন-কথা বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। শ্রীমর বর্ণনা ঃ "সমস্ত স্থির। অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাহিরের একটু হুঁশ আসিতেছে। এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দজ্যোতি বাহির হয়, সেইরূপ ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল। মুখে হাস্য। শূন্য দৃষ্টি। ঠাকুর পায়চারি করিতে করিতে বলিতেছেন, 'বটতলার পরমহংস দেখলাম—এইরকম হেসে চলছিল। সেই স্বরূপ কি আমার হলো'!"

ঠাকুর শ্রীমকে বলেছিলেন ঃ "ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা।" তারপর তিনি মা জগদম্বার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন ঃ "মা পূজা উঠিয়েছ। সব বাসনা যেন যায় না। পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না?... মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে।"

পরবর্তী কালে শ্রীম বলতেন যে, তিনি এমন একজনকে জীবনে দেখেছেন, যিনি তাঁরই সামনে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এ-যুগের নাস্তিকতাবাদের মারণাস্ত্র।

বাসনার জালে বদ্ধ মানুষ ঐ জাল কেটে মুক্তির চেষ্টা করে; আর শ্রীরামকৃষ্ণ কাতরভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন ঃ "মা, সব বাসনা যেন যায় না।" মন বাসনাশূন্য

হলেই সমাধি। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন—বাসনাক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বজ্ঞান একসঙ্গে হয়। যাহোক, ঠাকুর জীবের কল্যাণের জন্য বাসনাকে আঁকড়ে ধরে জাগতিক ভূমিতে থাকতে চেষ্টা করতেন।

সোমবার, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩

আজ শ্রীমর ঠাকুরের সঙ্গে একাদশ দিবস। বেলতলার কাছে সকালে ঠাকুর শ্রীমর সঙ্গে আবার অবতার বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন ঃ "অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।" তারপর তিনি শ্রীমর ধারণা যাচাই করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?" শ্রীম নিরুত্তর। তিনি ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে মশগুল হয়ে ছিলেন।

যাহোক, অহেতুকী কৃপাপরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বললেন তাঁর আত্মকথা ঃ "আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপ্ন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বললেন, 'ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা করব?'

"রঘুবীর বললে, 'তা হয়ে যাবে।'

"দিদি—হৃদের মা—আমার পা পূজা করত ফুলচন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বললে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

"সেজোবাবু বললে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বর আছেন।

"আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম। আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।... তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা--যেমন পিতা আর পুত্র।... যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে চিনতে পারবে। তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন।

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কথা, কর্ম, ব্যবহার, দৃষ্টির একটা নিগূঢ় রহস্য ছিল। যারা তাঁর সঙ্গে সদা থাকত, তারাই বুঝত তার মর্ম। শ্রীম তাঁর 'যোগীর চক্ষু' দিয়ে ঠাকুরকে তন্ন তন্ন করে না দেখলে কথামৃত লিখতে পারতেন না। শ্রীমর বর্ণনা ঃ "পঞ্চবটীতে আসিয়া যেখানে ডালটি পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্বাস্য হইয়া বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধনের স্থান। এখানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, কত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে। তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন!"

ভক্তিশাস্ত্রে আছে, "আদৌ শ্রদ্ধা।" ঠাকুর এভাবে ভক্তদের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিতেন।

ঠাকুর জানতেন, শ্রীমকে ভবিষ্যতে কথামৃতের লেখক ও প্রবক্তা হতে হবে, তাই তিনি

চাইতেন শ্রীম তাঁর সব কথা শুনুক, সব কাজের সাক্ষী থাকুক। বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলকাতা থেকে রাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা এসেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা হলো, তাদের কাছে 'শিবসংহিতা'য় যে-ষট্‌চক্রের কথা আছে সে-বিষয়ে বলবেন। তখন বেলা একটা। শ্রীম একা ঝাউতলায় বেড়াচ্ছিলেন। ঠাকুর হরিশকে পাঠালেন শ্রীমকে ডাকতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে—চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ—ডাল, পালা, ফল—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে।... ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে, গোপনে—

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।' "

মঙ্গলবার, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩

ঠাকুর পালাপার্বণ মানতেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। ঠাকুর শ্রীমকে বললেন ঃ "একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়।" তারপর তিনি শ্রীমর নির্জলা উপবাস কষ্ট হবে ভেবে খই-দুধ খেতে বললেন।

বুধবার, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীম ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান দেখতে। সেখানে ঠাকুর সমস্ত বাগান পরিক্রমা করেন, জনৈক বেদান্তবাদী সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ জানান।

বৃহস্পতিবার, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩

বুদ্ধ, খ্রীস্ট বা চৈতন্যের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানি। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যকার জীবনযাত্রা, চালচলন, কথাবার্তা হুবহু কথামৃতের পাতায় লিখে গেছেন। এসব পাঠকের চোখে অনায়াসেই ভেসে ওঠে এবং তা ধ্যানের খুব সহায়ক। "দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতীরাগে রোশনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে-সকল দেবদেবীর মূর্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক-এক করিয়া প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা... ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।"

কলকাতার ভক্ত ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীম ও বাবুরামকে সঙ্গে নিয়ে যান। ভোজনের আগে ও পরে ঠাকুর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন নিজ দার্শনিক মত ইঙ্গিত করেন ঃ "রামকে হনুমান বলেছিলেন, 'রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), তুমি প্রভু, আমি দাস (দ্বৈতবাদ), আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি (অদ্বৈতবাদ)'।" সব খণ্ড খণ্ড দর্শনশাস্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে মিশে এক হয়ে গেছে।

সব মহাপুরুষেরাই ভক্তদের শেখান—কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়। খ্রীস্টের প্রার্থনা বাইবেলে Lord's Prayer বলে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণ মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

"এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।
"এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।
"এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

শনিবার, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩

আজ অমাবস্যা। ঠাকুর দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে যাবেন। গাড়ি উত্তরের বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীম একবার বাড়িতে ঘুরে আসতে চান কয়েক ঘণ্টার জন্য। ঠাকুর মত দিলেন না। তিনি বললেন ঃ "এখানে বেশ আছ।"

শ্রীম যখন ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন, তখন ঠাকুর শ্রীমকে বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে।... এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে দিয়ে মাখন তোলাবেন বলে সেদিন বাড়ি যেতে দিলেন না।

রবিবার, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৩

২৬ ডিসেম্বর কাঁকুড়গাছিতে ঠাকুর যে-সাধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি আজ রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্ম-শক্তি বিষয়ে কথা বলতে বলতে সমাধিস্থ হলেন। সাধু অবাক হয়ে ঠাকুরের সমাধি দেখছেন। তিনি বইতে সমাধির বিষয় পড়েছেন, কিন্তু কখনো দেখেননি।

সোমবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা

করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়িতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ! মাকে বলিতেছেন—"ওমা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিসনে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব। বিলাস করব।"

শ্রীম খুব নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে দিয়ে কথামৃত লেখাবেন বলে তাঁর অহংকে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই শ্রীম হয় মেজেতে নতুবা পাপোশের ওপর বসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে তাঁর দান তুলনাহীন। তিনি রামকৃষ্ণ-নাটকের দৃশ্য ও সংলাপ সংযোজনা করেছেন। আনন্দময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে তাঁর লীলাবিলাসের সাক্ষী করে গেছেন।

বুধবার, ২ জানুয়ারি ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বেশি বিচার করতে বারণ করেছিলেন। কারণ, শুষ্ক বিচারের দ্বারা ভগবদানুভূতি হয় না। ঠাকুর অধিকারিভেদে উপদেশ দিতেন। তিনি জানতেন, শ্রীম ভক্তিপ্রবণ, তাই বলছেন ঃ "বেশি বিচার করলে শেষে হানি হয়—শেষে হাজরার মতো হয়ে যাবে। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ঐ কথা বলতে। আগে দরকার ঈশ্বরদর্শন। তারপর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ।... বল, আর (বিচার) করবে না।" "আজ্ঞা, না।" "ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।"

ঠাকুরের এ-কথায় আমরা জানতে পারি, ভগবান ভক্তের জন্য কতটা ভাবেন। শ্রীমর কল্যাণার্থে ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন যাতে তিনি আর বিচার না করেন।

ঠাকুর সরলভাবে শ্রীমকে বলছেন যে, তিনি কিভাবে জ্ঞানলাভ করেছেন ঃ "মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

শ্রীম হতবাক হয়ে ঠাকুরের কথা শুনলেন।

শুক্রবার, ৪ জানুয়ারি ১৮৮৪

শ্রীম অধিকাংশ সময় বেলতলা ও পঞ্চবটীতে সাধন-ভজন করে কাটাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর উপদেশ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে তাঁকে এগিয়ে দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। সখিভাব, দাসীভাব, সন্তানভাব বা বীরভাব। আমার সন্তানভাব। এভাবে দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন—লজ্জায়। বীরভাব বড় কঠিন। তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে?"

শ্রীম—"সব ভাবই ভাল লাগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-"সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে-অবস্থায় কামগন্ধ থাকবে না।"

শ্রীম ক্রমাগত ঠাকুরের কাছে সাধনরহস্য শিখছিলেন। এদিন তিনি ঠাকুরের মুখে একটা দৈববাণী শুনলেন ঃ "সনাতন ধর্ম ঋষিরা যা বলেছেন, তাই থেকে যাবে। তবে ব্রাহ্মসমাজ ও ঐরকম সম্প্রদায়ও একটু একটু থাকবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে।"

শনিবার, ৫ জানুয়ারি ১৮৮৪

এ-দিনটি ছিল শ্রীমর ঠাকুরের সঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস। তিনি দুপুরের আহারান্তে নহবতে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন, ঠাকুর নিজে উত্তরের বারান্দা থেকে ডাকছেন। আজকে শ্রীমর ছুটির শেষ দিন, তাই ঠাকুর তাঁকে ধ্যানের কিছু উপদেশ দিলেন এবং নিজ জীবনে কিভাবে ধ্যানের বিঘ্নগুলির সম্মুখীন হয়েছেন তাও বললেন ঃ "তোমরা কিরকম ধ্যান কর? আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানারূপ দর্শন করতাম। একদিন দেখলাম সামনে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, দুজন মেয়েমানুষ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—মন, তুই এসব কিছু চাস? সন্দেশ দেখলাম গু। মেয়েদের মধ্যে একজনের ফাঁদি নথ। তাদের ভিতর-বাহির সব দেখতে পাচ্ছি। মন কিছুই চাইলে না।

"তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল। নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা, মন সেই নিচের কাঁটা। পাছে ওপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ হয়, সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাকত। ভয় দেখালে—নিচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাত হলেই এর বাড়ি মারব।"

ঠাকুরের এসব অভিজ্ঞতা তুলনাহীন। যাঁরা ধ্যান করেন, তাঁরা জানেন—চিত্তবৃত্তি নিরোধ কি দুরূহ ব্যাপার। চঞ্চল মনকে ইষ্টে ধরে রাখা যুদ্ধসদৃশ। স্বয়ং অবতার না লুকিয়ে মানুষকে বলছেন যে, মন থাকলে বৃত্তি উঠবে—তাঁরও বৃত্তি উঠেছে এবং তিনি কিভাবে বিচারের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা তা অতিক্রম করেছেন।

ঠাকুর কারও ভাব নষ্ট করতেন না। বিকালে ঝাউতলা থেকে ফিরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীমকে বলছেন ঃ "তোমার মেয়ে সুর—এইরকম গান অভ্যাস করতে পার?—'সখি, সে-বন কত দূর? যে-বনে আমার শ্যামসুন্দর।' "

তারপর, কে আপন জন?—সে-প্রসঙ্গে শ্রীমকে ঠাকুর বললেন ঃ "দেখ, যারা আপনার তারা হলো পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হলো

আপনার।... এখন ভক্তরাই আত্মীয়।"

দিনটি ছিল শুভ শনিবার—মায়ের বার। ঠাকুর শ্রীমকে বললেন সন্ধ্যায় কালীঘরে গিয়ে ধ্যান করতে।

"সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি (শ্রীম) সেখানে মার চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

"সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। এখনও ভাবের পূর্ণমাত্রা। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আবদার করে কথা কয়। মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন ঃ 'ওমা, কেন সে-রূপ দেখালি নি? সেই ভুবনমোহন রূপ। এত করে তোকে বললাম! তা তোকে বললে তো তুই শুনবিনি। তুই ইচ্ছাময়ী।'

"ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ্‌গদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন ঃ 'মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। সব ত্যাগ করিও না মা। আচ্ছা, শেষে যা হয় করো। মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক-একবার দেখা দিস। না হলে কেমন করে থাকবে! এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!' "

প্রার্থনা থেকে মনে হয়, ঠাকুর মায়ের কাছে আবদার করেছিলেন শ্রীমর যাতে একটু দর্শন হয়; কিন্তু মা সে-আবদার পূরণ করলেন না। এখানে একটা কথা স্মরণীয়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর মানুষভাব ও দেবভাব যুগপৎ কাজ করত। মানুষরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ করুণায় বিগলিত হয়ে ইচ্ছা করেছিলেন, শ্রীমর দর্শন হোক; আবার ঈশ্বররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, এখনো সময় হয়নি। উপরন্তু ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বরের কৃপার ওপর নির্ভর করে। যাহোক, শ্রীম অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেই তৃপ্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে একটানা তেইশ দিন দিব্যানন্দে কাটিয়েছেন।

শ্রীম কথামৃতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—কখনো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে নির্বাক সাক্ষী, আবার কখনো সক্রিয় অভিনেতা। আবার কখনো বিভিন্ন নাম নিয়ে আত্মগোপন করে লীলাসম্ভোগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমর ভালবাসা অপরিসীম; তাঁর অহং শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তায় লীন হয়ে গিয়েছিল। ঐজন্য কথামৃত অত সুন্দর, মধুময় ও মর্মস্পর্শী। কথামৃতে শ্রীম ঠাকুরের ধ্যান, সমাধি, পূজা, প্রার্থনা, স্বপ্ন, দর্শন, কর্ম, ভক্তি, পবিত্রতা, বৈরাগ্য, নাচ, গান, হাস্য, কৌতুক, সাধনা, তীর্থযাত্রা, লোকব্যবহার, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম-দর্শন, সামাজিক ও বিজ্ঞানদৃষ্টি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী ধরে রেখেছেন।

শিল্পী দরজা-জানলায় একবার রঙের প্রলেপ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; কারণ, তা কাঠকে রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সে বারবার রঙের প্রলেপ দেয় যতক্ষণ না কাঠ ঢাকা পড়ে। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ তেইশ দিন ধরে শ্রীমর মনে ভক্তির প্রলেপ দিয়েছেন,

যাতে তাঁর মন সংসারে মোহগ্রস্ত না হয়। তাই বিদায় দেবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলছেন ঃ "তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এসব তো আমি জানি।... ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাকো। তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।... তুমি যা ভাবছ তাও হয়ে যাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শ্রীম বাড়ি ফিরলেন।

কথামৃত প্রবেশ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' যেন মিছরির রুটি। সিধে করেই হোক আর আড় করেই হোক, যে ভাবেই আস্বাদ করা যায় না কেন মিষ্ট লাগবেই লাগবে। কথামৃত পাঠ যেখান থেকে খুশি আরম্ভ করা যেতে পারে এবং শেষ করা যেতে পারে। এ গ্রন্থের উপক্রম থেকে উপসংহার পর্যন্ত একই ঈশ্বরীয় কথা। এ কথা শ্রবণে বা পাঠে বিরক্তি বা একঘেয়েমি আসে না কারণ ইহা নিত্য নূতন, অপূর্ব এবং অনন্তপ্রসারী। আনন্দময় ভগবানের কথা শুনলে কি নিরানন্দ আসতে পারে?

হিন্দুদের জনপ্রিয় শাস্ত্রদ্বয় গীতা ও চণ্ডী। দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীগ্রন্থে উহার পাঠের বিধি ও নিষেধের উল্লেখ আছে। গীতাশাস্ত্র-পাঠের বিধি ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে উল্লেখ আছে। আবার গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান নিষেধমুখে অর্জুনকে বলছেন, "গীতাশাস্ত্র তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জিত, শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কখনো বলবে না।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কিন্তু বিধিনিষেধের বহির্ভূত। এ গ্রন্থে আপামর জনসাধারণের অধিকার।

শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র পাঠক সাধারণত প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বা শ্রীমর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন থেকে পড়া শুরু করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, পাঠক যদি শ্রীম রচনাশৈলীর কয়েকটা মূল্যবান বিষয় পূর্ব থেকে জেনে নেন তবে আরও বেশি রসাস্বাদ করতে পারবেন। এই প্রবন্ধে আমরা চারটি বিষয় আলোচনা করব : **কথামৃতের মঙ্গলাচরণ, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, কথামৃতের পরিবেশ, কথামৃতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য।**

কথামৃতের মঙ্গলাচরণ

শাস্ত্রগ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য লেখক মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীম সেই সনাতনরীতি অনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত রাস-পঞ্চাধ্যায়ের গোপীগীতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি কথামৃতের মঙ্গলাচরণরূপে ব্যবহার করেছেন।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।

বহু লেখক এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও মনে হয় যেন আরও অনেক কথা ওতে লুকিয়ে রয়েছে। রাসলীলাকালে গোপীদের অহঙ্কার হয়েছিল, তাই কৃষ্ণ হলেন

অন্তর্হিত। যেখানে অহঙ্কার সেখানে ভগবান নাই। তারপর শুরু হলো কৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহবিধুর গোপীদের গীতি ও সকরুণ প্রার্থনা। শ্লোকগুলি যেন তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত এবং চোখের জলে সিক্ত। শুনলে পাষাণেরও হৃদয় গলে। অনুরাগ-অশ্রু জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি ধুয়ে দেয়। নিস্তব্ধ নিশীথে যমুনা সৈকতে গোপীদের হৃদয়বিদারী ব্যাকুলতা, কান্না, আন্তরিকতা দেখে কৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হলেন।

শ্রীম এই মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিত করছেন—ভগবান লাভ করতে হলে গোপীদের মতো নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জল দিয়ে অহঙ্কারকে ধুয়ে ফেল।

তব কথামৃতম্

তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। অমৃত খেলে মানুষ অমর হয়। কিন্তু ভগবানের কথা পান করে কে অমর হয়েছে? লোকে কথামৃত পড়ে, শোনে; কথামৃতের উপর বক্তৃতা দেয়, প্রবন্ধ লেখে; কিন্তু কথামৃত পান করতে জানে কয়জন? শ্রীভগবৎকথা পান করেছিলেন শাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎ। তিনি শুককে বলেছিলেন, 'গায়তঃ বিষ্ণুগাথা'। শুক সাত দিন সাত রাত ধরে গাইলেন ভাগবতের ১৮০০০ শ্লোক, আর তা প্রাণভরে পান করলেন পরীক্ষিৎ দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে। ভাগবতে বর্ণিত আছে—শুক কর্তৃক ভগবৎকথা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তরমুখে বসে মহাযোগসম্পন্ন সঙ্গরহিত ও সংশয়শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেলেন। তক্ষক এসে তাঁর প্রাণহীন দেহকে কামড়াল, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি অমরত্ব লাভ করলেন।

কথামৃতকার শ্রীম বুঝাতে চাইলেন যে, কথামৃত পান করলেও পরীক্ষিতের মতো ব্রাহ্মীস্থিতি হবে।

তপ্তজীবনম্

ভগবানের কথা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডা করে। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় যেমন শীতল জল শান্তি দেয়, তেমনি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবগণের পক্ষে কথামৃত। শ্রীমর মর্টন স্কুলে কথামৃত পাঠ্য ছিল। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলত যে, এই বই বেচার ফিকিরে স্কুলে উহা পাঠ্য করা হয়েছে। জনৈক শিক্ষক-মুখে সমালোচনা শুনে শ্রীম প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন, "এই পড়ার ফল বুঝবে ছেলেরা যখন সংসারে ঢুকবে। 'সংসার জ্বলন্ত অনল', ঠাকুর বলতেন। আর আমরাও তা ভাল করে বুঝেছি। সংসারে প্রবেশ করে যখন দুঃখকষ্টের পেষণে দিশেহারা হবে তখন তাঁর অমৃতময়ী কথা মায়ের মতো বাঁচিয়ে রাখবে। এর একটা কথাও যদি মনে থাকে, উহাই তখন সংসার-সমুদ্রে ভেলার ন্যায় শান্তির সীমানায় পৌছে দেবে।"

কবিভিরীড়িতং

ক্রান্তদর্শী কবিরা শ্রীভগবানের কথার স্তুতি করেন। প্রতি অবতারের জীবন ও বাণী উপজীব্য করে সৃষ্টি হয় নূতন সাহিত্য, কাব্য, গাথা, গান; স্তবস্তুতি, নাটক, গল্প, সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কথামৃত অবলম্বন করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হবে। একবার

গিরিশচন্দ্রকে তাঁর বিল্বমঙ্গল নাটকের সুখ্যাতি করায় তিনি বলেছিলেন, ''নাটক লেখা তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে শেখা।'' নরেন্দ্র বলে 'বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা'; মহেন্দ্র মাস্টার বলেন, 'মাস্টারী শেখা তাঁর কাছে।'

কল্মষাপহম্

কথামৃত কল্মষ, কালিমা, পাপবোধ দূর করে দেয় মন থেকে। প্রত্যেক অবতারকে পতিতপাবনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। কথামৃত পাঠে ও শ্রবণে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন শুদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ও তাঁকে চিন্তা করে গিরিশচন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে রূপান্তর হয়েছিল। পরবর্তী কালে তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে গেলে তিনি বলতেন, ''আমাদের দেখলে তোরা ঠাকুরের মহিমা আরও বেশি বুঝতে পারবি। দ্যাখ, তাঁকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি।''

শ্রবণমঙ্গলম্

মঙ্গলময় ভগবানের কথা শুনলে মঙ্গল হবেই হবে। শ্রীম বলতেন, ''ঠাকুরের প্রতিটি কথা মন্ত্র।'' জেনে বা না জেনে লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, তেমনি ঠাকুরের কথা শুনলে কল্যাণ হবে।

শ্রীমৎ

ভগবানের কথা শ্রী বা ঐশ্বর্যে পূর্ণ সৌন্দর্যে ভরা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য দিগ্বিদিক থেকে লোক ছুটে যেত দক্ষিণেশ্বরে। তিনি নিজেই বলতেন, ''কী আশ্চর্য, আমি মূর্খ! তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা।''

আততম্

তাঁর কথা সুদূরপ্রসারী এবং সহজপ্রাপ্ত।

ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ

যাঁরা ভগবানের কথা বিতরণ করেন তাঁদের মতো আর দাতা নেই। অন্নদান, ভূমিদান, অর্থদান প্রভৃতি বাহ্য। ভগবৎকথা দান দাতা ও গ্রহীতাকে ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দেয়। এ ধ্যান অজ্ঞানধ্বংসী। 'ভূরিদা জনাঃ'-র অপর অর্থ খুব উদার চিত্ত যাঁদের। সংসারের ভোগবাসনা যাঁদের চলে গেছে, যাঁরা কেবল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চান তাঁরাই কেবল তাঁর কথা বলবার যোগ্য। ভগবান যাদের ইচ্ছা করেন কেবল তারাই তাঁর কথা বলতে পারে। আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই বলতে পারেন।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও বাণী রাহোশিরের ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে ছেড়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন, আত্মকথা, সাধনকথা, দর্শন, উপদেশ কথামৃতের পাতায় পাতায় রয়েছে, তবুও শ্রীম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত প্রথম ভাগের

উপক্রমণিকাতে উল্লেখ করেছেন। এই জীবনী তথ্যপূর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ।

শ্রীম ঠাকুরের চরিতামৃতে লিখেছেন, "ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা। ঠাকুরের জগন্মাতা বলিয়াছেন, তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে।" এইসব ঈশ্বর-নির্বাচিত ও ঈশ্বর-প্রেরিত ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনই কথামৃত। শ্রীম এসব অপূর্ব ভক্তদের তালিকা চরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ রবিবার। * তিনি এই দর্শনের কথা চরিতামৃতে লিখেছেন, "গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দিরে। বসন্তকাল; ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ কুক্ সঙ্গে ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার (১২ ফাল্গুন, ১২৮৮, শুক্লা ষষ্ঠী) ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে।"

শ্রীম এখানে যে জন্মোৎসবের উল্লেখ করেছেন, তার বিবরণ প্রকাশিত হয় তত্ত্বমঞ্জরীর ১০ম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৯১৩ খ্রীঃ)। এই মূল্যবান তথ্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতের একটি বাড়তি উপাদান।

"অদ্য ঠাকুরের জন্মদিন। ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, শুক্লপক্ষ রবিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা আট ঘটিকার সময় হইতে ভক্তগণের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আগমন হয়। ৯টার সময় কেদারবাবু, নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত তথায় পৌছেন। ঠাকুর তৎকালে একটি বারান্দায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। কেদারবাবু উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর এককালে স্থির সমাধিতে চলিয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কীর্তন করিলেন কিন্তু কিছুতেই সমাধি ভঙ্গ হইল না। এমন সময় একজন পশ্চিমাঞ্চলের যোগী আসিয়া তাঁহাকে দুই-একবার নাড়াচাড়া করিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা জানিতেও পারিলেন না। যোগীকে ওরূপ অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইল। অনন্তর নরেন্দ্রকে 'চিন্তায় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' এই গীতটি গান করিতে অনুরোধ করা হইল। এই গানে ঠাকুরের সংজ্ঞা হইল—তিনিও গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আরও কয়েকটি গান হইল। ক্রমে সেই স্থানে ২৪/২৫টি ভক্ত আসিয়া পৌছিলেন, বেলা তখন প্রায় ১১টা হইবে। উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সংসারে জীব আহারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে হানি নাই, কিন্তু মনটা যেন সেই পরমাত্মায় থাকে, যেমন বালকরা যখন খুঁটি ধরিয়া ঘুরিয়া থাকে তখন সে অন্যান্য বালকের সহিত কত প্রকার রঙ্গভঙ্গ করিয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক তাহার মন কোথায়? তাহার মন

---

*কথামৃতে প্রথম দর্শনেব তারিখ নিয়ে মতভেদ ঃ

১। কথামৃত, ১ম ভাগ, ১০ম সংস্করণ, ১৩৩০ (শ্রীম-র জীবদ্দশায়) "ইংরাজী ১৮৮২ মার্চ মাস।"

২। কথামৃত ১ম ভাগ, ১৩শ সংস্করণ, ১৩৪১ ঃ "আজ রবিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৪ ফাল্গুন।"

৩। কথামৃত ১ম ভাগ, পুনর্মুদ্রণঃ ১৩৬৮ ঃ "আজ রবিবাব. ২৬ ফেব্রুয়াবি, ১৫ ফাল্গুন।"

৪। ইংরাজী গসপেলে মার্চ ১৮৮২ সালের উল্লেখ আছে।

সেই খুঁটিতে আছে, খুঁটি ভুলিয়া যাইলে হাত পিছলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

"বেলা দুই প্রহরের সময় অনুমান ৫০/৬০ জন ভক্ত মিলিয়া ঠাকুর পঞ্চবটী নামক স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। পঞ্চবটী—এই স্থানে ঠাকুর যোগসাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে এইস্থানে একখানি পর্ণকুটির ছিল এবং তাহার সম্মুখে বট, আমলকী, নিম্ব, বিল্ব ও অশ্বত্থ গাছ ছিল। বট বৃক্ষটি মাধবী ও মালতী লতিকা বেষ্টিত। এই বটবৃক্ষ অতিশয় পুরান, ইহার গোড়াটি ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধানো এবং এক পাশে সিঁড়ি আছে। এইস্থানে সূর্যকিরণ একেবারে যাইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব সেই বৃক্ষ শাখাই চন্দ্রাতপের কার্য করিয়াছিল।

"সেই স্থানে কেবল সঙ্কীর্তন হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্তন বেলা চারি ঘটিকা পর্যন্ত হয়। ইহার মধ্যে এক ঘণ্টা ঠাকুর অনুপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেই সঙ্কীর্তনের মধ্যস্থলে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। এমন অদ্ভুত নৃত্য কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। প্রেমের লহরী চলিয়াছিল, সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যেমন উল্লেখিত আছে—সঙ্কীর্তনে প্রেমের প্রবাহ চলিত, ভক্তগণ সেই শোনা কথা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন—ভক্তরা মনে করিলেন, মরি মরি কি শুভদিন আজ পোহাইয়াছিল। ভক্তবৎসল হরি, আজ কি পাপীদের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া প্রেম ঢালিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাল করিয়া দিলেন। ধন্য আমরা বঙ্গবাসী, এই ঘোর কলিকাল—যে সময়ে ধর্মের এতদূর অধোগতি, ধর্মের ভান করিয়া যে সময়ে লোকে কেবল নিরয়পথ পরিষ্কার করিতেছে, ভক্তি প্রেম মর্তলোক পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন সময় যে আবার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিতে বঙ্গবাসীদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে তাহা কাহারও মনে ছিল না। এইরূপ বোধ করি সকলের অভিপ্রায় হইয়াছিল—কেন না সেই সময়ে এই গীতটি সকলে উন্মত্ততার সহিত গান করিয়াছিলেন ঃ

'সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
ও তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে,
নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে।'

পরে 'এই আমাদের প্রেমদাতা' এই ধুয়া ধরিয়া অর্ধ ঘণ্টা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। ঠাকুর তখন একেবারে স্থির সমাধিতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। এই সময়ের ভাব লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যখন সকলে এই ভাবে নিমগ্ন, এমন সময়ে কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই সরল ও কোমল, প্রেমের স্রোতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া অনিমেষলোচনে ঠাকুরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইল যে, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। পুরুষেরাও তদ্রূপ কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন নিকটে আসিয়া কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ও ব্যক্তির (ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া) কি মরিবার পূর্ব লক্ষণ?

সে বলিল, ঈশ্বরের নামে ভাব হইয়াছে।

"এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিয়ৎকাল (বোধ হয় অর্ধ ঘণ্টা) অবাক হইয়া থাকিয়া কখন চলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখি নাই। সঙ্কীর্তনে নিত্যগোপালও সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের সঙ্গে তাহারও সমাধি ভঙ্গ হইল।

"বেলা অপরাহ্নপ্রায় দেখিয়া ঠাকুর রামকে আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। পরে সাড়ে চারটার সময় ঠাকুর, ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থগণ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলে প্রীতি-ভোজন করিলেন। ভোজনও অতি তৃপ্তিকর হইয়াছিল। অনুমান আশিজন ব্যক্তি ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার ব্যয় সুরেন্দ্রবাবু সহ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে সকলে কেহ শকটারোহণে এবং কেহ নৌকা পথে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।"

কথামৃতের পরিবেশ

কথামৃতে প্রবেশকারী পাঠককে শ্রীম একটি অপরূপ পরিবেশ পরিবেশন করেছেন। তিনি এই পরিবেশের নাম দিয়েছেন 'আনন্দ-নিকেতন।' শ্রীমর বর্ণনা ঃ "কালীবাড়ি আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবত হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। ... ধন্য রানী রাসমণি! তোমারই সুকৃতি বলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে!"

সংসারদাবানলে দগ্ধ ও চঞ্চলমান মানুষকে শ্রীম আনন্দ নিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাতে তারা আনন্দময়ীর নিত্যোৎসব দেখে নহবতের সঙ্গীতলহরী শুনে এবং সচল প্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে জাগতিক জ্বালাযন্ত্রণা ভুলতে পারে। অবশ্য শ্রীমর বাস্তব বর্ণনা এখন পাঠককে ভাবচক্ষে দেখতে হবে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

কথামৃতের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী কথা শোনানোর পূর্বে, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীম পাঠকের মনে দৃঢ় অঙ্কিত করতে চান দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি ও উদ্যান। তাঁর উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রসঙ্গ শোনাবার পূর্বে তীর্থপরিক্রমা করে মন শুদ্ধ করলে পর তাঁর কথা ভাল বোঝা যাবে। পরবর্তী কালে শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের সম্পর্কিত প্রতিটি স্থানের মাহাত্ম্য, ঘটনা প্রভৃতি বলতেন। তীর্থে করণীয় কি—সে প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন, "শাস্ত্রে পরিক্রমার কথা আছে। তীর্থে গেলে অন্তত তিনবার পরিক্রমা করা উচিত। পরিক্রমার মানে হলো ঘুরে ফিরে দেখা। তাহলে ভাল

করে মনে থাকবে। যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ধারণাশক্তি প্রবল তাদের একবার করলেও হয়।

"তীর্থে গিয়ে কি কি করতে হয়? প্রথম, চরণামৃত নিতে হয়। দ্বিতীয়, বসতে হয়। তৃতীয়, গান কি স্তোত্রপাঠ চেঁচিয়ে করতে হয়। চতুর্থ, কোথাও সাধু, ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। এসব করলে মনে হয় কিছু করলুম। এমনই আমাদের মনের গঠন। পঞ্চম, পুজোর জন্য ফল কি মিষ্টি কিছু হাতে করে নিয়ে যেতে হয়। ষষ্ঠ, বিত্তশাঠ্য না হওয়া। বিত্ত মানে ধন, শাঠ্য মানে শঠতা, কৃপণতা। টাকা পয়সায় ফাঁকি দিতে নাই।" [১]

শ্রীমর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও উদ্যানের বর্ণনা কথামৃতের প্রথম খণ্ডে রয়েছে, সুতরাং তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের জীবনীর সামান্য ঘটনাগুলিও মধুময় ও মূল্যবান। ঐ সব পুণ্য হারানো স্মৃতিগুলি পাঠকের মনে জাগিয়ে দেয় ব্যাকুলতা এবং জিজ্ঞাসা, "আজ যদি ঠাকুর স্থূল শরীরে থাকতেন?"

এবার আমরা শ্রীম প্রদর্শিত দক্ষিণেশ্বর-তীর্থ পরিক্রমা করব এবং কখনো কখনো 'শ্রীম দর্শন' গ্রন্থগুলি থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত করব। পাঠকের মনে রাখতে হবে শ্রীমর বর্ণনা একশ বছরের পুরান, কিন্তু তাঁর অমর লেখনী শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত করে রেখেছে।

চাঁদনী

কালীবাড়িটি কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা থেকে নেমে চাঁদনী দিয়ে কালীবাড়িতে ঢুকতে হয়। এখন যাঁরা বাসে যান তাঁরাও গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করে দেবদর্শনে চাঁদনী দিয়ে ঢোকেন। এই চাঁদনীর ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করতেন। পরবর্তী কালে শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন এই ঘাটে তোয়ালেখানা জলে চুবিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতেন এবং উপস্থিত ভক্তদের মাথায় ঐ গঙ্গাবারি সিঞ্চন করতেন। আপাতদৃষ্টিতে এসব কার্যকলাপ পাগলামি বলে মনে হয়, কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই দিব্য পাগলামির স্পর্শ লাভ করে।

"শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে আসিয়াছেন। উপরের দিক থেকে দ্বিতীয় সোপানে বসিলেন—উত্তর দিক হইতে আট হাত দক্ষিণে। বলিতেছেন—'এইখানে ঠাকুর এসে বসতেন কেশব সেনরা এলে'।" [২] পারাপারের কাণ্ডারি ঠাকুর বসে থাকতেন এই ঘাটে। যে আন্তরিকভাবে ভবসমুদ্র পার হতে চাইত, তাকেই পার করে দিতেন।

শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী

কথামৃতে শ্রীম মা-কালীর মূর্তির যে অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন আমরা মা-কালী দর্শনে যাই। একটু প্রাণভরে প্রণামও করতে পারি না এবং চোখ চেয়ে যে মাকে একটু ভালভাবে দেখব তাও হয়ে

১ শ্রীম দর্শন, ৪/১১৬ ১৭ ২ তদেব, ৬/৯০

উঠে না। লাইনে দাঁড়াই। ধাক্কা খেতে খেতে এক দিক দিয়ে ঢুকি এবং এক ঝলক মাকে দেখে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে আসি।

যে শ্রীম তৃতীয় দর্শনকালে 'মাটির প্রতিমার' প্রসঙ্গ তুলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করতে গিছলেন, সেই শ্রীমর কালীর বর্ণনা পড়লে মনে হয় তিনি কি ভাবেই না রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মায়ের যেসব গহনার উল্লেখ কথামৃতে আছে সেসব গহনা সম্বন্ধে আধুনিক মহিলারা ওয়াকিবহাল আছেন কি না সন্দেহ। মা-কালীর বর্ণনাকালে শ্রীম মাঝে মাঝে ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন ঃ "শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম পাঁজেব, চুটকী—আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। ... দেওয়ালের এক পার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। ... বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণ শিলা, একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর নির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি ও বাণেশ্বর শিব।"

মা ভবতারিণীর মূর্তির উচ্চতা ৩৩$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। এই মূর্তি সম্বন্ধে শ্রীম বলেছেন, "ঠাকুরের মুখে শুনেছি, নবীন ভাস্কর সারাদিনে বেলা তিনটার সময় একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। অত সংযত হয়ে—অত তপস্যা করে তবে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীকে বানিয়েছেন। তাই তো অত জীবন্ত। যে বানাবে তার মন ঐ দৈবভাবে একেবারে মিলে যাবে তবে হাত দিয়ে ঐ ভাব পাথরে ফুটে উঠে।" [৩] বাংলাদেশে কত কালীমূর্তি আছে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরীর মূর্তি দেখে সাধ মিটে না। মনে হয় যে বার বার দেখি। এর কারণ ঠাকুর মাকে জাগ্রত করে গেছেন। তিনি দেবীর নাকে তুলো ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন মা জীবন্ত! মন্দির শীর্ষে তিনি নূপুর পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা মাকে গঙ্গাদর্শন করতে দেখেছেন; তাই তিনি যখন পূজারী ছিলেন কালীমন্দিরের পশ্চিমের দরজা খুলে দিয়ে মাকে গঙ্গাদর্শন করাতেন।

চাতাল

নাটমন্দির ও মায়ের মন্দিরের উঠবার সিঁড়ির মধ্যস্থলে চাতাল। "শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে বসিতেন কখনও একাকী, কখনও ভক্তসঙ্গে। ঠিক সম্মুখে ভবতারিণী, পিছনে নাটমন্দির। ঠাকুর বসিতেন নাটমন্দিরের ভিত্তির অদূরে। একদিন ঠাকুর শ্রীমকে লইয়া আসিয়া এই স্থানে বসিয়াছিলেন। 'ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার। এবার তার তার না তার তারিণী।।'—ঠাকুর এই গানটি গাহিয়া শ্রীমকে মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।" [৪]

আর একদিন চাতাল ও নাটমন্দির সংলগ্ন পূর্বদিকের স্তম্ভের আধ হাত উত্তরে বসে ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন, "দেহসুখ চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, শতসিদ্ধি চাই না মা, লোকমান্য চাই না মা। শরণাগতি, শরণাগতি, শরণাগতি। আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" [৫]

---

৩ তদেব, ৪/২০০-০১ ৪ তদেব, ১২/১৭৫ ৫ তদেব, ৬/৯১

নাটমন্দির

নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে ঠাকুর মহাদেবকে হাতজোড় করে প্রণাম করতেন যেন তাঁর আজ্ঞা নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করছেন। নাটমন্দিরের ভৈরব ত্রিশূল নিয়ে ঠাকুরকে ধ্যানকালে পাহারা দিতেন।

"নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে এক সারি পিলার। তাহার দক্ষিণে আর এক সারি পিলার। এই দ্বিতীয় সারির বাম হাতের পিলারকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল রহিলেন। বলিলেন, 'এটিতে ঠাকুরের পবিত্র স্পর্শ রহিয়াছে। নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবেশে এই পিলারটিকে ভগবৎ বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন'।" ৬

এই নাটমন্দিরে এক সন্ধ্যায় শ্রীম দেখেছিলেন, "ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকের মধ্যে একাকী পাদচরণ করিতেছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্য মধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ!" ৭

ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিস্থান, দপ্তরখানা—চকমিলান উঠানের পশ্চিমদিকে দ্বাদশ শিবের মন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বদিকের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান এবং তার দক্ষিণে দপ্তরখানা বা অফিস।

শ্রীম এসব খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, কারণ এ হলো মা জগদম্বার সংসার। তীর্থযাত্রীদের কাছে এসব তত প্রয়োজনীয় না হলেও সাধু, অতিথি, ভক্ত ও কাঙালদের কাছে এসবের প্রয়োজন আছে।

দ্বাদশ শিবমন্দির

উঠানের পশ্চিমে দ্বাদশ শিবের মন্দির। মধ্যদেশে চাঁদনীর দেউড়ি। দ্বাদশ শিবের দ্বাদশ নাম। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর থেকে দেখে বলে থাকে, "ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ি।"

নিবেদিতা সুন্দর লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বর মন্দির রানী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মানবীয় দৃষ্টিতে দেখলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পেতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকলে পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্যও হতো না।"

"শিব মন্দিরশ্রেণীর উত্তরের সোপানকুঞ্জের নিম্ন হইতে দ্বিতীয় সোপানে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর তৃতীয় সোপানে ললাট স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন; উত্তর দিক হইতে আড়াই হাত দূরে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে সমাধিস্থ বসিয়াছিলেন। যে ফটো আজকাল সর্বত্র পূজিত হয় সেইটি ঐ সময়ে এখানে লওয়া হয়।" ৮ (প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের বসা ছবি তোলা

---

৬ তদেব, ১২/১৭৪; ৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/৪৫, ৮ শ্রীম দর্শন, ১৩/২২০-২১

হয় বিষ্ণু মন্দিরের সামনের চাতালে; ঐ স্থান উত্তরসারির শিবমন্দিরের সিঁড়ির উল্টোদিকে। মনে হয়, স্বামী নিত্যাত্মানন্দের ডায়েরীতে শ্রীমর কথা ঠিকমত লিপিবদ্ধ হয় নি।)

পাকা উঠান

সেই উঠান যার উপর দিয়ে ঠাকুর হেঁটে যেতেন কালীঘরে তারপর ভাবাবেশে মত্ত হয়ে ফিরতেন ঘরে।

শ্রীম তাঁর সাংসারিক কলহ ও যন্ত্রণাকে ভগবানের বর রূপে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তা তাঁকে নিয়ে গিছল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। প্রথম দর্শনের "সাত আট দিন পর উঠান দিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর। মণি (শ্রীম) বলছেন ঠাকুরকে, এসব যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্যা করাই ভাল। ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন, ওকথা কেন? বললেন, গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। যাকে কষ্ট ভাবছ তা যে তিনি ইচ্ছা করলেই দূর করে দিতে পারেন, সহজ করে দেন। অনেক গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজিকর কয়েক হাজার লোকের সামনে ফেলে দিল, কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না। কিন্তু বাজিকর হড়হড় করে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সবগুলি খুলে ফেলবে। ভাবনা, কি, গুরু সব মোড় ফিরিয়ে দেবেন।"[৯]

বিষ্ণুঘর—মায়ের মন্দিরের উত্তরে রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, পশ্চিমাস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রথম পূজারীর কার্যে ব্রতী হন ১৮৫৭-৫৮[৯ক] খ্রীস্টাব্দে। ঠাকুর মন্দিরের গোবিন্দের ভগ্ন পা জোড়া লাগান। এই মন্দিরের বারান্দায় ভাগবত শোনার কালে ঠাকুরের "ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান এক"—এই দিব্য অনুভূতি হয়। কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে থাকলে ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সর্বনিম্ন সিঁড়ির মধ্যস্থলে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতেন, লোকশিক্ষার জন্য।[১০]

ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দা

শ্রীম ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন এই বারান্দায়। এখানে ঠাকুরের সময় কীর্তনাদি হতো। এই বারান্দা ছিল হাজরার আড্ডাখানা। একটি ঘটনা ঃ "একদিন ঠাকুর ছোট খাটে রাত্রে শয়ন করিয়াছেন; বাবুরাম মহারাজ পাখা করিতেছেন। স্বামীজী হাজরা মহাশয়ের নিকট পূর্বের বারান্দায় তামাক খাইতেছিলেন। হাজরা মহাশয় স্বামীজীকে বলিতেছেন, 'তোরা ছেলে মানুষ ওঁর কাছে যাওয়া আসা করিস, আর উনি তোদের সন্দেশটা আমটা খাইয়ে ভুলিয়ে দেন। ওঁকে ধর। চেপে ধরে কিছু আদায় করে নে।' ঠাকুরের কানে এইসব কথা পৌঁছানো মাত্র তিনি ধড়মড় করে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় এক পাটি চটি ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সজোরে বললেন, 'নরেন, চলে আয়, ওখান থেকে চলে আয়। ওসব পাটোয়ারী বুদ্ধি শুনিসনি। যারা ভিকিরী তারা—বাবু একটা পয়সা দাও, বাবু একটা পয়সা দাও, বলে কানের পোকা বার করে। বাবুও—দে একটা পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে বলে, একটা পয়সা ফেলে বিদায় করে দেয়। তোরা যে আপনার লোক, তোদের

---

৯ তদেব, ১/৩৪০; ৯ক লীলাপ্রসঙ্গ অনুধাবনে আমরা এই তারিখ পাই ১২৬২, ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর পরদিন; ইং. ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে; ১০ তদেব, ৪/৬৭

কি চাইতে হবে; আমার যা কিছু আছে সবই যে তোদের।' " [১১]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর

এখানে ঠাকুর কাটিয়েছেন ১৪ বৎসর (১৮৭১-৮৫) ঠাকুরের ঘরের সে পুরান মেজে আর নেই। ১৯৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের শতবার্ষিকী উৎসবকালে লাল সিমেণ্টের পরিবর্তে মোজাইকের মেজে করা হয়েছে। কথামৃতের অধিকাংশ কথোপকথন এই ঘরে হয়েছে। এই ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অজস্র ঘটনা।

শ্রীম-র আত্মকথা ঃ "সিধু বললে, চল যাই আর একটা বাগান আছে রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন। আসা গেল মেইন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হবার আধ ঘণ্টা বাকি। বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। আমি একটু poet ছিলাম কি না। শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ। ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট—ভক্তরা সব নিচে বসে। আমি কাউকে চিনি না। প্রথম কথা শুনলাম, ঠাকুর বলছেন—যখন ঈশ্বরের নামে দুনয়নে ধারা বইবে, অঙ্গে পুলক হবে তখন বোঝা যাবে কর্ম ত্যাগ হয়েছে।" [১২]

যে সিধু শ্রীমকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যায় সে আর কোনদিন ঠাকুরের কাছে গেছে বলে উল্লেখ নেই। ভগবানের বিচিত্র লীলা!

পরবর্তী কালে শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেন তখন কি করতেন এবং কি বলতেন তা সব প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

"ছোট খাটের মধ্যস্থলে শ্রীম প্রণাম করিলেন, পশ্চিমাস্য। এই স্থলে ঠাকুরের পাপোশ থাকিত। শ্রীম শীতকালে ঠাকুরের আদেশে এই পাপোশের উপর বসিতেন। এই পাপোশের উপর শ্রীম বসিয়াছিলেন একদিন। রাত্রি তখন আটটা। ঘরে আর কেহ নাই। ঠাকুর ভাবসমাধি হইতে ব্যুত্থিত। তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইবে যেন মাতাল। শ্রীমকে জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, কেউ যেন মনে না করে, মায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করতে পারেন।" [১৩] শ্রীম সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন গৃহে থেকে লোকশিক্ষা দিতে, সংসার-সন্তপ্ত মানুষকে 'ভাগবত' শোনাতে।

শ্রীম বলেছেন, "দক্ষিণেশ্বরের সব দেখতে হয়। ... আর ঠাকুরের ঘরের সব—দুটি খাট, বিছানা, গঙ্গাজলের জালা, দেবদেবীর ছবি—কালী, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য সংকীর্তন; ধ্রুব, প্রহ্লাদ; যীশুর ছবি—পিটার জলে ডুবে যাচ্ছে, এ সবই দেখা উচিত। শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি—এটি লালাবাবুর স্ত্রী রানী কাত্যায়নী ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। আর একটি ছবি আছে ঠাকুরের বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে টাঙানো, বাগ্‌দেবীর ছবি। নতুন কেউ এলে ঠাকুর ঐ ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে নিতেন আর প্রার্থনা করতেন, 'মা আমি

---

১১ ঘটনাটি স্বামী শঙ্করানন্দজী পূঃ বাবুরাম মহারাজের কাছে শুনেছিলেন এবং অখিলানন্দজীকে ১৫/৪/১৯৩০-এর পত্রে লেখেন; ১২ শ্রীম দর্শন, ১/৩৪০; ১৩ তদেব, ১০/১৯১-৯২

মুখ্যু; তুমি এসে আমার কণ্ঠে বস।' তারপর কথা কইতেন।

"অতি সামান্য জিনিসটিও মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। ভাল করে দেখা থাকলে ধ্যানের সময় ঐসব মনে উঠবে। আপনার বাড়িতে মশারির নিচে বসেও একজন সারারাত দক্ষিণেশ্বরে কাটাতে পারে, ভাল করে দেখা থাকলে। ইচ্ছে করলে এও ভাবা যায়, আমি মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছি।" [১৪]

কত দর্শন, কত সমাধির তরঙ্গ বয়ে গেছে এই ঘরে। এখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়া তুলনাহীন, অনুভবসিদ্ধ।

পশ্চিমের গোল বারান্দা

এখানে ঠাকুর প্রায়ই বসে থাকতেন। কখনো দাঁড়িয়ে মা গঙ্গাকে দর্শন ও প্রণাম করতেন।

উত্তরের বারান্দা

একদিন এই বারান্দায় স্বামী বিবেকানন্দ "চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন" গানটি গেয়েছিলেন। গানটি শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ নির্দেশ করে শ্রীম বলেন, "এইখানে ঠাকুর দাঁড়ান। পিছনে দেয়াল। সব স্থির নয়ন পলকহীন। এক দিব্য আনন্দের ছটা মুখমণ্ডলে। শান্তি আর প্রেম যেন জমাট বেঁধে আছে।" [১৫]

ঐ বারান্দার বাইরে রোয়াকের উত্তর-পূর্ব কোণ নির্দেশ করে শ্রীম বলেন, "ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের বিদায় দিতেন।" [১৫ক]

উত্তরের বারান্দার উত্তরের রাস্তা

শ্রীম বলেন, "একদিন গিয়ে দেখি ঠাকুর ঝাড়ু দিচ্ছেন তাঁর ঘরের উত্তর দিকের রাস্তায়। আমায় দেখে বল্লেন, মা এখানে বেড়ান। তাই রাস্তাটা সাফ করছি।" [১৬]

নহবত

"এই নহবতপীঠ নবীন শক্তি পীঠ। মায়ের তপোভূমি। শ্রীশ্রীমা সুদীর্ঘকাল এখানে বাস করেন। বারান্দার চারদিকে দরমার বেড়া ছিল। এখানে মা থাকতেন যেন খাঁচায় পাখি।" [১৭] দোতলায় উঠবার সিঁড়ি নির্দেশ করে শ্রীম বলেন, "মা ঠাকরুণ সারাদিন এই সিঁড়িতে বসে জপ করতেন। বসে বসে বাত হলো—তা আর সারাজীবনে গেল না। এই টুকুন ঘর, সব জিনিসে পূর্ণ। স্ত্রীভক্তরাও কেহ কেহ থাকতেন। আবার মাছ জিয়ানো—কল কল শব্দ হচ্ছে। ঠাকুরের জন্য ঝোল হবে। উঃ, কী অমানুষিক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কী সংযম, কী ত্যাগ আর সেবা!" [১৮]

কথামৃতের একটি ছবি ঃ "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন।

১৪ তদেব, ৩/২-৩; ১৫ তদেব, ৩/২৪০; ১৫ক তদেব, ৩/২৪০; ১৬ তদেব, ৯/১১৯
১৭ তদেব, ১০/১৮৫; ১৮ তদেব, ৩/২৩৬

তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়েছিলেন, মুখ ধুইয়া ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'কিগো, এইখানে বসে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!' "[১৯] এ-কথাটি শ্রীমর মনে এত গভীর রেখাপাত করেছিল যে, পরবর্তী কালে তিনি প্রায়ই উহার উল্লেখ করতেন।

পোস্তা

শ্রীম বলেন, "ঠাকুর মাঝে মাঝে পোস্তার উপর বেড়াতেন—রাত দুটো তিনটের সময়। তখন অনাহত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় বলতেন। যোগীরা শুনতে পান।"[২০]

পুষ্পোদ্যান

"উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ।" শ্রীমর বর্ণনায়—কুঠির পার্শ্বে, গাজীতলায়, হাঁসপুকুরের পূর্ব পার্শ্বে ফুল বাগিচার উল্লেখ আছে। শ্রীমর পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা পড়লে মনে হয় যেন নন্দন কাননে প্রবেশ করেছি ঃ "অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গল আরতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়।" দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরোদ্যানে ঠাকুরের সময় কি কি ফুল ফুটত শ্রীম তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন; মল্লিকা, মাধবী, চাঁপা, গুলচী, ঝুমকাজবা, গোলাপ, কাঞ্চনপুষ্প, অপরাজিতা, জুঁই, শেফালিকা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, বেল, ধুতুরা, গন্ধরাজ, পদ্মকরবী, কোকিলাক্ষ, কৃষ্ণচূড়া, জবা, পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীম লিখেছেন, "মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। ... শ্রীরামকৃষ্ণ এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে—সেই দিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।"[২১]

বকুলতলা

নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করতেন এবং শ্রীশ্রীমাও রোজ ভোর তিনটার সময় স্নান করতেন।

শ্রীম বলেন, "এইখানে ঠাকুরের মায়ের অন্তর্জলি হয়। এইখানেই ঠাকুর গর্ভধারিণীর

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১০৩; ২০ শ্রীম দর্শন, ১/২৫২; ২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/১৭-১৮

চরণ ধরিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, তুমি কে গো আমায় গর্ভে ধারণ করেছ!' নিজেকে নিজে জানতেন কি না—অবতার। তাই বিস্ময়ানন্দে বলতেন, 'তুমি সাধারণ মা নও।' "[২২] "এই ঘাটের দক্ষিণের পোস্তায় বসিয়া নরেন্দ্র একটি আগমনী গান ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন, গানটি নূতন শিখিয়াছিলেন।"[২৩]

বকুলতলার অদূরে অল্প উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি ইটের বেদিকা আছে। শ্রীম বলেন, "এই আসনে একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই উহাতে বসে গঙ্গাদর্শন করতেন।"[২৪]

পঞ্চবটী

বকুলতলার কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সাধনা করেছিলেন এবং রাত্রে কখন কখন উঠে যেতেন। অস্তগামী সূর্য দেখে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে বলতেন, "মা, আর একটা দিন চলে গেল তবু দেখা দিলিনি।" বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—এই পঞ্চ বৃক্ষের সমাহারে পঞ্চবটী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করেছিলেন, বেড়া দিয়েছিলেন, বৃন্দাবনের রজঃ ছড়িয়েছিলেন।

শ্রীম বলেন, "পূর্বে এই স্থানে নীলকর সাহেবরা থাকিত। এই বটবৃক্ষ ও বেদী তখনকার। এই বেদীই ঠাকুরের আদি সাধনপীঠে।"[২৫] "পঞ্চবটী ও পুরাতন বটবৃক্ষ-বেদিকার মধ্যস্থলে মাধবীলতা বিদ্যমান। ইহা বেশ মোটা হইয়াছে! শ্রীম ইহা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবন হতে আনিয়া নিজ হাতে ঠাকুর রোপণ করেছিলেন। এই স্থানেই খোলা জায়গায় তোতাপুরী থাকতেন।' "[২৬]

স্বামী সুবোধানন্দ একদিন শ্রীমকে এই ঘটনাটি বলেন, "ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। পঞ্চবটীতে বসে বসে একদিন তৃণ বাচছি। একটি মেয়ে অভিমানে—কী সাধু আমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তোমার পেছনে। আর তুমি একবারও ফিরে চাইলে না, একটি কথাও বললে না! আমি যে আখড়ায় গেছি সেখানে এমন একটি লোকও দেখি নাই যে আমার সঙ্গে কথা কয় নাই, আর আমায় ওখানে থাকতে বলে নাই। আহা, এই সাধুটি ভাল। একবারও ফিরে চাইলে না।"[২৭]

শ্রীম ঠাকুরের এই অপরূপ দর্শনটির কথা বার বার বলতেন; "ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

"ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

"ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্তলোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি

---

২২ শ্রীম দর্শন, ৪/৬৪; ২৩ তদেব, ১০/১৮৪. ২৪ তদেব. ৫/১১২. ৪/৮১. ২৫ তদেব, ৩/২৩৭
২৬ তদেব, ৫/১১৩; ২৭ তদেব. ৬/২৯২

উপস্থিত — তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুর প্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ; প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে।" [২৮]

ধ্যানঘর বা সাধন কুটির

পঞ্চবটীর পূর্বগায়ে সাধনকুটির। এখানেই শ্রীতোতাপুরী ঠাকুরকে বেদান্তের চূড়ান্ত সাধনফল নির্বিকল্প সমাধি লাভে সহায়তা করেন। শ্রীম বলেন, "পূর্বে এই কুটিরটি ছিল মৃন্ময়, তখনই এই ঘরে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হয়। পরে হয় এই ইটের ঘর; ঐ ঘরে তখন কিছুই ছিল না। এখন এই শিবমূর্তি স্থাপন করেছে। কালে কত কিছু হবে। আর ঠাকুরের নামে চালাবে। সর্বত্রই এইরূপ হয়। " [২৯]

ঝাউতলা

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়ে লোহার তারের রেলিং আছে। এতে পা আটকে গিয়ে ঠাকুর পড়ে যান ও হাত ভাঙেন। ভাবে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিছলেন। তার ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। শ্রীম বলেন, "ঝাউতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন নিজ মুখে, আমি অবতার, আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি। বলেছিলেন, আবার একবার আসতে হবে।" [৩০]

বিল্ববৃক্ষ

"ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহা সাধনপীঠ। তন্ত্রের প্রায় যাবতীয় সাধন এইখানেই হইয়াছে। এই স্থানেই সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষের চার-দিকে একটি গোলাকার বেদী, দুইফুট উচ্চ। শ্রীম পশ্চিম-উত্তর দিকে আসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। এইস্থানে একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সশরীরে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন। শ্রীম বেদীর উপর বসিয়া হৃদয়ে যাঁর ধ্যান করিতেছিলেন, নয়ন মেলিয়া তাঁহাকেই সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। আহা, মনুয্যজীবনে এই দৃশ্য কি সুদুর্লভ!" [৩১]

হাঁসপুকুর আস্তাবল ও গোশালা

পঞ্চবটীর পূর্বদিকের পুষ্করিণীর নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। বর্তমানে আস্তাবল ও গোশালা আর নাই। গোশালার পূর্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায়।

হাঁসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, "দ্যাখ, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কি না! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন পতি। কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন ঃ "হাঁ, চেষ্টা করব।" [৩২]

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/১২৬; ২৯ শ্রীম দর্শন, ৮/২২; ৩০ তদেব, ৬/২২৪
৩১ তদেব, ৩/২৩৮; ৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/৪৩

ঠাকুরবাড়িতে আসলে রানী রাসমণি, মথুরবাবু প্রভৃতি এই দ্বিতল কুঠিতে থাকতেন। তাঁদের জীবদ্দশায় ঠাকুর এই কুঠির নিচের পশ্চিমের ঘরে থাকতেন। শ্রীম বলেন, "এখানে ষোল বছর ছিলেন ঠাকুর। অক্ষয়ের মৃত্যুর পর ঐখানে গেলেন, এখন সেটি ঠাকুর ঘর। ঠাকুরের মা শোকে আর এই ঘরে থাকতে চাইলেন না।" [৩৩]

এই কুঠি থেকে মথুরবাবু ঠাকুরঘরের পূর্ব-উত্তরের বারান্দায় ভ্রমণরত ঠাকুরের মধ্যে শিব ও কালী দর্শন করেছিলেন।

বাসন মাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক

উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরে কিছু পূর্বদিকে গেলে ডান হাতে একটা বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসন মাজার ঘাট এবং পথের অনতিদূরে অর্থাৎ পুকুরের উত্তর পার্শ্বের ঘাটের কাছে গাজীতলা। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ইসলাম সাধনা করেছিলেন। ঐ পথ ধরে একটু এগোলেই সদর ফটক। কলকাতার লোক এই ফটক দিয়ে কালীবাড়ি প্রবেশ করেন। শ্রীম লিখেছেন, "কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।" [৩৪]

যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি

কালীবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই বাগানবাড়ি। ঠাকুর সেখানে কখনো বেড়াতে যেতেন এবং ঐ বাড়ির বৈঠকখানার ঘরে তাঁর খ্রীস্টের দর্শন হয়।

কথামৃত যে কেবল দক্ষিণেশ্বরেই সংগৃহীত হয়েছে তা নয়; ইহা রূপ নিয়েছে বিভিন্ন পরিবেশে, যেমন কলকাতার বিভিন্ন ভক্তগৃহে উৎসব ক্ষেত্রে, চলতি ঘোড়ার গাড়িতে, স্টীমারে, সার্কাস ময়দানে, থিয়েটারে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে। লোকে সাধারণত ধর্ম-উপদেশকে নীরস ও কঠিন মনে করে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎ প্রসঙ্গগুলি সরস ও সহজ। তার উপর শ্রীম কথামৃতকে কাব্যিক ও গতিশীল পরিবেশের মধ্যে ফেলে আরও মধুময় করে তুলেছেন।

কথামৃতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সম্বন্ধে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে' একটি সুবিস্তৃত গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করেছেন যে, এ গ্রন্থ 'সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনসাহিত্য।' তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর প্রশস্তি ও সমালোচনা উল্লেখ করে কথামৃতের অনন্যত্ব দেখিয়ে কতিপয় বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। যেমন কথামৃতের প্রাণবান ভাষাসম্পদ, তুলনাহীন উপমা, অনবদ্য কাব্যিক বর্ণনা, নিরপেক্ষ বস্তুদর্শন, নিখুঁত চিত্র, উচ্চাঙ্গের নাটকীয়তা, সরস রসিকতা, শিক্ষাপ্রদ নীতিকাহিনী,

---

৩৩ শ্রীম দর্শন, ৪/৭৬ ৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/১৬

তদানীন্তন সমাজচিত্র, নিরাকার অদ্বৈততত্ত্ব থেকে সাকার উপধর্ম, সমন্বয়ের বার্তা। কথামৃতের মুখ্য লক্ষণ প্রসঙ্গে শঙ্করীবাবু লিখেছেন, "কথামৃতের মুখ্য লক্ষণ 'রামকৃষ্ণ'—ক্ষণে ক্ষণে বিকিরিত রামকৃষ্ণ। হাস্য, পরিহাসে, গভীরতায়, গহনতায়, অবস্থানে, প্রস্থানে, প্রত্যাবর্তনে—রামকৃষ্ণ। সম্মোহক রামকৃষ্ণ।" ৩৫

কথামৃতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রামাণিকতা। শ্রীম এর উপকরণ সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি "নিজে যে-দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবা ভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।"

দ্বিতীয়, কথামৃতের গভীরতা ও হৃদয়গ্রাহিতা। শ্রীম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঠাকুর সর্বত্রই দেখতেন নারায়ণ। মানুষ দেখে কেবল বাইরের ছবিটা। ঠাকুর দেখতেন ভিতর বাহির দুই-ই। সকল বস্তুর ভিতর বাহির নারায়ণ, সকল জীবের ভিতর বাহির নারায়ণ—নারায়ণময় জীবজগৎ। ঠাকুরের দৃষ্টি সর্বদা ঐ depth-এ (গভীরে), ঐ মূলে। সমাধির পর হয় এই অবস্থা। মন একেবারে বিলীন সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে। তারপর যখন নিচে নামতে থাকে নাম-রূপে, তখন দেখে ঐ সচ্চিদানন্দই এই নামরূপ ধারণ করে রয়েছেন। একে ঠাকুর বলতেন বিজ্ঞানীর অবস্থা। তাই ঠাকুরের ভাষা, তাঁর কথা অত attractive (হৃদয়গ্রাহী)। কথামৃতের charm (সৌন্দর্য) এইখানে। তিনি যা বলেছেন সব গোড়ায় বসে বলেছেন, সকল ভাবের প্রান্তদেশে বসে বলেছেন। যে শোনে তার প্রাণে গিয়ে প্রবেশ করে। এ শক্তি অবতারাদির হয়।" ৩৬

তৃতীয়, কথামৃতের জীবন্ত বর্ণনা ও রচনাশৈলী। শ্রীম বলেন, "এমন অনেক রিপোর্টার আছে তারা একটা ঘটনাকে একেবারে visualize (প্রত্যক্ষ) করিয়ে দিতে পারে। তাদের art (কৌশল) এমনই জীবন্ত। এটা একটা খুব উচ্চস্তরের শক্তি। ঠাকুরের এ শক্তি ছিল অসাধারণ। একজন নিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তিনি এমনি বর্ণনা করতেন যে বাধ্য হয়ে তাকে মনে ঐ ছবিকে আসন দিতে হতো। যেমন একজন বলেছে, খাবে না; কিন্তু তরকারির অমনি সুগন্ধ যে সামনে ধরতেই সে এক থালা ভাত খেয়ে ফেলল। পেইন্টিং দুরকম আছে—তুলি দিয়ে আর ভাষা দিয়ে। কারো কারো realistic faculty (রূপায়ণ শক্তি) এমন strong (প্রবল) যে সমস্ত ঘটনা যেমন দেখছে ঠিক তেমনি পেইন্ট করে দিতে পারে তুলি দিয়ে, আবার ভাষাতেও তাই হয়। ভগবান দর্শন হয়েছে যাঁদের তাঁদের এই faculty (শক্তি) জীবন্ত, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ঠাকুরের ঐ শক্তি ছিল।" ৩৭

চতুর্থ, কথামৃতের মৌলিকতা ও অপূর্বতা। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমকে লিখেছিলেন, "বইটি সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতঃপূর্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক এইভাবে নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না করে প্রকাশ করেনি।" ৩৮

৩৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (২য়) পৃঃ ২৯৯ ৩৬ শ্রীম দর্শন, ৬/১৯৯
৩৭ তদেব, ৬/১৯৮-১৯৯ ৩৮ বাণী ও রচনা, ৮/১৭-১৮

পঞ্চম, কথামৃত সৎসঙ্গের প্রতিভূ। এ-গ্রন্থের পাঠক স্থানকাল ভুলে অনুভব করেন দিব্যমানবের সান্নিধ্য। কথামৃতের বর্ণনা পড়লে মনে হয় উৎসব চলছে—গান, বাজনা, নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার, হাস্যকৌতুক, বনভোজন, পূজা, ধ্যান, সমাধি। এতে বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি নেই। যারা হৃদয়ে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেন তাঁদের মঙ্গল হয় এবং আনন্দ লাভ করেন।

কথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবীলীলানাট্য। এতে রয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ—জ্ঞানী, গুণী, সাধু, যোগী, পণ্ডিত, খেপা, ভণ্ড, লম্পট, মাতাল। এরা কেউ কম নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে মূল নট শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ষষ্ঠ, কথামৃতের বাণী—সব ছেড়ে ঈশ্বরকে ধর। কারণ এই পথই শান্তির পথ, আনন্দের পথ। শ্রীম বলেন, "ঠাকুরের উপদেশ প্রধানত দুই শ্রেণীর লোকের জন্য—সর্বত্যাগী অর্থাৎ যোগী-সন্ন্যাসী আর যোগী-ভোগী অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। এক শ্রেণী সিধে চলছে আদর্শের দিকে। অপর শ্রেণী চলেছে একটু ঘুরে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের বলেছেন সর্বদা প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গ করতে। নইলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।" [৩৯]

১৯৮২ একটি শুভ বৎসর। এই বছরে চলছে কথামৃতের শতবর্ষপূর্তি উৎসব। শ্রীমর জীবদ্দশায় কথামৃতের বার্ষিক জন্মোৎসব পালনের প্রসঙ্গ উঠেছিল। যদু মল্লিকের বাড়িতে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবতের উৎসব করতেন। ঠাকুর সেই উৎসবে যেতেন। শ্রীম বলেন, "ঠাকুরের কথা সব বেদবাক্য। নিজে বলেছেন, 'ভক্ত-ভাগবত-ভগবান' এক। ভগবানের কথা ভাগবত। 'কথামৃত' তাঁরই কথা তাই ভাগবত। এই কথায় আর একটি কথা মনে হলো। ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন'।" [৪০]

জনৈক ব্যক্তি একবার শ্রীমকে বলেন, "কথামৃত পড়ে মনে হয়, আপনি সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন।" এর উত্তরে শ্রীম বলেন, "না। তবে তিনি বলতেন 'অমৃত সাগরের এক কণা খেলেও অমর হয়, আর কলসী কলসী খেলেও অমর হয়'—এই ভরসা। আমরা তাঁর এক কণা মাত্র রাখতে চেষ্টা করেছি। তাঁর কথা লিখে শেষ করা যায় না।" [৪১]

৩৯ শ্রীম দর্শন, ১০/৫০   ৪০ তদেব, ২/১৩৪   ৪১ তদেব, ২/১৮৭

'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দী

ডায়েরীগুলি সত্যি অমর হয়ে রয়েছে ও থাকবে। এক-শ বছর আগে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) শ্রীমর ডায়েরীগুলির মধ্যে জন্ম নিল ভাবীকালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিশ্বের অধ্যাত্মপিপাসুরা 'কথামৃত'কার শ্রীমকে জানাচ্ছে মৌন প্রণতি ও ব্যক্ত অভিনন্দন। ব্যক্তিগত ডায়েরী যে পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে সর্বোচ্চ অধিকার পাবে শ্রীম কখনই তা ভাবেননি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত থাকতে চেয়েছিলেন গুপ্ত, কিন্তু পারেননি। লুকিয়ে কলেজের চিলের ছাদে বসে ডায়েরী পড়তেন, যাতে কেউ জানতে না পারে, কিন্তু ব্যর্থ হলেন সে প্রচেষ্টায়। ভক্তেরা ঐ ডায়েরীর অমৃত আস্বাদ করতে চাইলে বলতেন, "ও কিছু না, নিজের জন্য লিখেছি।" কথায় বলে—"যত হয় গুপ্ত, তত হয় পোক্ত। যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।"

পৃথিবী সুন্দর; কারণ এর স্রষ্টা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি কখনো লোকসমক্ষে জাহির করে বলেন না, "আমি বিশ্বের স্রষ্টা।" শ্রীম নানা নামে কথামৃতে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছেন, যেমন—মাস্টার, মণি, মোহিনীমোহন, একটি ভক্ত, সেবক, ইংলিশম্যান। কৌতূহলী মানুষ ছুটে এসেছে শ্রীমর কাছে কথামৃতের চরিত্রগুলিকে আরও ভাল করে জানবার জন্য। জনৈক ভক্ত জটিল-চরিত্র হাজরার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীম বলেন, "হাজরা একদিন দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসে মালা নিয়ে জপ করছে। ঠাকুর মা-কালীর মন্দির থেকে এসে ভাবে হাজরার হাত থেকে মালা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—বললেন, 'এখানে (অর্থাৎ তাঁর কাছে থেকে) আবার মালা জপ করা! কলকাতায় তো অনেকে মালা জপ করে—কেউ কুড়ি বছর—কেউ পঁচিশ বছর ধরে, তাদের কি হচ্ছে? ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হয় না। এখানে (অর্থাৎ তাঁকে) দেখলেই চৈতন্য হয়ে যায়!' "

হাজরার শেষটা কি হলো জানতে চাওয়ায় শ্রীম বললেন, "ঠাকুরের নাম করতে করতে তাঁর শরীর যায়।"

জনৈক ভক্ত—"কথামৃতে 'মণি' বলে যে ভদ্রলোকের কথা আছে, তাঁর শেষ অবস্থা কি হলো?"

শ্রীম—"বলতে পারিনে কি হবে।"

উত্তর শুনে সকলে হাসল।

কথামৃতের মণি, যিনি পরবর্তী কালে অগণিত মানুষের মাথার মণি হয়েছেন, তিনি বসতেন অধিকাংশ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের পাপোশের ওপর। কী বিনয়! কী শ্রদ্ধা! কী

ভালবাসা। ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেন, "তুমি এখানে কিছু চাও না কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাস, তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে; কেমন আছে—কেন আসে না—এইসব ভাবি।" ভাবতেও ভাল লাগে—দেহধারী ভগবান ভক্তের জন্য কী ভাবেই না ভাবেন। ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নিজের কাছে টেনে বসিয়ে দু-হাত দিয়ে উদ্ধবের ডান হাতখানা চেপে ধরে করুণকণ্ঠে বললেন, "গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য।" কী অপূর্ব দৃশ্য! সৌম্য সম্বোধন বুঝাচ্ছে—তোমার মুখখানি শান্তিতে, শুচিতার মধুরতায়, স্নিগ্ধতায় ভরা। ব্রজে আমার প্রিয়জনদের দুঃখবেদনা দূর করা। কথামৃতের পাতায় পাতায় আমরা দেখি ভগবানের ভক্তের জন্য ভাবনা। এতে মনে আশা ও আশ্বাস জাগে।

শ্রীম ছিলেন অন্তঃসার, গম্ভীরাত্মা, ফল্গু নদী; তিনি ছিলেন মুখচোরা, বর্ণচোরা, গুপ্তযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে তিনি বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—লিপিকার, দূত, অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সেবক, 'ছেলেধরা মাস্টার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে দু-টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—ছবি ও কথামৃত। অন্যান্য অবতারদের কল্পনার দ্বারা চিন্তা করতে হয়, কারণ তখন তো ক্যামেরা ছিল না। ঠাকুরের তিনখানি ছবিই সমাধিকালে তোলা। ভক্তদের ধ্যানের পক্ষে খুব সুবিধা। আর কথামৃতের কথা, বর্ণনা, চরিত্র—সব বাস্তব ও টাটকা। শ্রীম জীবদ্দশায় প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, "শ্রীম বা মাস্টার বা M (a son of the Lord, and a servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে-সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তদিগকে নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী Diary-তে লিপিবদ্ধ ছিল। যে দিনেই দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diary-তে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।"

ডায়েরীর উৎস সম্বন্ধে শ্রীম আরও বলেছেন ঃ "ঈশ্বরের কাজ আমরা কতটা বুঝতে পারি? আমার ডায়েরী লেখার অভ্যেস আগে থেকেই ঠাকুর করিয়ে নিলেন। হেয়ার স্কুলে থার্ড ক্লাশে যখন পড়ি (১৮৬৭) তখন থেকেই ডায়েরী লিখছি ক্রমাগত, দৈনন্দিন কি করলাম, কোথায় গেলাম—এইসব। আর ১৮৮২ ফেব্রুয়ারির শেষে ঠাকুরের দর্শন হলো। তখন এই অভ্যাসটা কাজে এল। অনেকেই তো ছিলেন, কিন্তু আমার দ্বারা ডায়েরী লিখালেন। তবে তো এই বই (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত) বের হলো। পনের বছর apprentice খাটতে হয়েছিল। ওতে কত উপকার হতো memory sharp (স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ) হতো লিখবার কৌশল বাড়ত। ছয় সাত ঘণ্টা, এমনকি সারাদিনের ঘটনা পর পর রাত্রিতে মনে পড়ত। এমনতর করেছিলেন ঠাকুর। গানগুলিরও একে একে প্রথম পদ মনে রাখতে চেষ্টা করতাম।"

'কথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণের কথার প্রতিচ্ছবি। শ্রীম কাগজের ওপর কলম দিয়ে যে

অনবদ্য কথার ছবি এঁকেছেন, তা অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী। 'কথামৃত' কিভাবে রূপ নিল? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম বলেছিলেন, "আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম. এবং বাড়িতে এসে ডায়েরীতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় এক-একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম। তাঁর এক-একটি কথার জন্য আমি চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম। ডায়েরীর নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে 'কথামৃত' লিখিত হয়। এক-একটি scene আমি হাজার বারেরও বেশি ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে আসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম—পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এইভাবে বলা যেতে পারে যে, ঠাকুরের সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হতো না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হতো। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে ইহা সদ্য-অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হতো।"

কথামৃতের বাণী—"আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।" এ-বাণী বুঝতে গেলে চাই সাধুসঙ্গ। সৎসঙ্গ দুর্লভ, কিন্তু 'কথামৃত' সুলভ। কথামৃতপাঠ শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ। চরিতামৃতকার বলছেন চৈতন্যোক্ত পঞ্চসাধন—"সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম, ব্রজে বাস—এই পঞ্চসাধন প্রধান।" কথামৃত-কার বলছেন, "সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নেই আমাদের। ঠাকুরের কথার আদি মধ্য অন্ত ঐ এক কথা—সাধুসঙ্গ।" সৎসঙ্গে সংসারীদের ভবরোগ দূর হয়, সন্ন্যাসীদের মায়াজাল ছিন্ন হয়। কথামৃতের চরিত্ররাজি ঐ সৎসঙ্গের প্রতিভূ।

পথিকৃতের অলঙ্কার লোকনিন্দা। ধম্মপদে বুদ্ধের একটি সুন্দর কথা আছে, "পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহই নাই। একান্ত নিন্দিত-পুরুষ কিংবা একান্ত-প্রশংসিত পুরুষ কখনও হয় নাই, হইবে না, এখনও নাই।" শ্রীম 'কথামৃত' লিখে কেবল প্রশংসাই পাননি; তাঁকে অনেকে অভিশাপ দিয়ে চিঠি দিয়েছে। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্বামীজী লিখছেন, কেউ curse (অভিশাপ) দিবে, কেউ reward (পুরস্কার) দিবে—কথামৃত পড়ে। যাদের, মনে কর, interest-এ (স্বার্থে) হাত পড়বে, তারাই curse দিবে। ত্যাগের কথা আছে কি না এতে। যাদের ভোগে মন আছে, তারাই রেগে যাবে। মা হয়তো বলবে, হায় আমার ছেলেটা সাধু হয়ে বের হয়ে গেল! ঐ লোকটাই তো তার মাথা খারাপ করে দিল বইটা (কথামৃত) লিখে। কোন স্ত্রী হয়তো বলবে, আমার সাজানো বাগান নষ্ট করে দিল ঐ লোকটা। পতিও বলতে পারে, ঐ বইটি পড়েই আমার স্ত্রী বিগড়ে গেল। যাদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা অল্প বাকি আছে, তারা ঠিক এর উলটো কথা বলবে। তারা বলবে, কথামৃত অমৃতই বটে—জীবনামৃত বটে—জীবনামৃত। ঐ-টি আমাদের শান্তি দিল, জ্বলে যাচ্ছিলাম।"

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রীমকে কথামৃত ধারাবাহিকভাবে পুনরুক্তিগুলি বাদ দিয়ে

পুনরায় সুন্দরভাবে লিখতে পরামর্শ দেন। শ্রীম তাঁকে বলেন, "Repetition (পুনরুক্তি) ছাড়বার যো আছে? একটা কথাই হয়তো পাঁচ জায়গায় বলেছেন। ছেড়ে দিলে কথাটার link (সম্বন্ধ) ভেঙে যায়। আর, একই কথা পাঁচ জনকে বলেছেন পাঁচ জায়গায়। তাতে কার উপর কিরূপ act (কাজ) করেছে তা বোঝা যায়।... ফিল্ডে brilliance (উজ্জ্বলতা) বাড়ায় কি না ডায়মণ্ডের। সেটিং-এর জন্য ডায়মণ্ডের সৌন্দর্যের কমতি-বৃদ্ধি হয়। কাঠের উপর রাখ, এক রকম দেখাবে। ভেলভেটের উপর রাখ, তখন সৌন্দর্যের পূর্ণতা লাভ করবে।" ঠাকুরের প্রতিটি কথা শ্রীমর কাছে ছিল ডায়মণ্ডের চেয়েও মূল্যবান।

কথামৃতের ওপর বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ভাষ্য, টীকা রচিত হবে। গত এগার বছর ধরে দেখছি, 'কথামৃত' এই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কিভাবে ছড়াচ্ছে! অনেক সময় বিস্ময় লাগে। বাবুরাম মহারাজের কথা স্মরণ হয়, "ওরে, প্রচার কে করবে? ঠাকুরকে প্রচার কাকেও করতে হবে না। তিনি স্বয়ং প্রচারিত হচ্ছেন। আমি গিয়ে কেবল দেখলুম ঠাকুরের মহিমা। তিনি নিজে কিভাবে তাঁর ভাব ছড়াচ্ছেন, তাই দেখবার জন্য তিনি কৃপা করে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন।"

গত বছর এপ্রিলে (১৯৮১) ক্যানসাস সিটির বেদান্ত কেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। একটি মেয়ে ঠাকুরের বই পড়ে সেন্ট লুইসে চিঠি দেয়। তাকে ক্যানসাসে দেখা করতে বলি। সে চাষীর মেয়ে এবং বিদুষী। সুদূর ক্যানসাসের একটা খামারে কাজ করে। Midwest-কে বলে আমেরিকার Bread basket। মেয়েটি ৩/৪শ মাইল গাড়ি চালিয়ে এল। তার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। সে বলল—খামারের একটা ছোট কুটিরে সে শুয়ে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দর্শন দিয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। সে মন্ত্রটি আমাকে বলল। আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলুম ঠাকুরের অশেষ কৃপা। আমেরিকার Midwest-এর হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত প্রান্তরে প্রান্তরে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে দেখছেন কার ব্যাকুলতা জেগেছে!

ক্যানসাসের আর একটি মেয়ে কথামৃত কিনে পড়ছে। আমি বললুম, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—Woman and gold are maya (কামিনী-কাঞ্চনই মায়া)। তোমার মনে এতে আঘাত লাগে না?" সে বলল, "না। যেখানে woman আসে, আমি man-এ পরিবর্তন করে নি।" খুশি হয়ে বললুম, "তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।" আমেরিকায় এখন Women Liberation, Equal Rights প্রভৃতি আন্দোলন চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে তো তাদের তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কথা। আমি কতিপয় মহিলাকে জানি, যারা কথামৃতের (Gospel-এর) Woman and gold are maya পড়ে ঠাকুরের ওপর বিরূপ ভাব পোষণ করে।

যা হোক স্বামী নিখিলানন্দজী Gospel of Sri Ramakrishna-তে কামিনী-কাঞ্চনের অনুবাদ করেছেন 'Woman and gold'। অবশ্য তিনি পাদটীকায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন ওটা মূলত 'lust and greed'। স্বামী বিবেকানন্দও কামিনী-কাঞ্চন অর্থে কাম-

কাঞ্চন (lust and greed)-এর উল্লেখ করেছেন।

ভক্তদের বুঝিয়ে বলতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্ট ছিলেন মা-কালী; গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী; প্রথম শিষ্যা সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবী, যাঁকে তিনি জগজ্জননীরূপে পূজা করেছিলেন; গর্ভধারিণী মা মনে কষ্ট পাবেন বলে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েও গেরুয়া পরলেন না এবং তীর্থবাস ত্যাগ করলেন; তারপর তিনি জগতে মাতৃভাব প্রচার করলেন। তিনি শিষ্যদের কখনো মেয়েদের ঘৃণা করতে শেখাননি। নারীজাতিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের উপবাসক্লিষ্ট মুখ তাঁকে কষ্ট দিত। এহেন ব্যক্তি কি কখনো নারীবিদ্বেষী হতে পারেন? চতুরাশ্রমীদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে নারীজাতির অটুট মাতৃসম্বন্ধ।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামিনী-কাঞ্চনকে ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন বলেছেন, তখন শ্রোতা সবাই পুরুষ। স্ত্রীভক্তদেরও তিনি পুরুষদের থেকে পৃথক থাকবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপদেশ দিতেন। তাছাড়া ইংরেজী কথামৃতের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের মেয়ে মিস মার্গরেট উড্রো উইলসন।

সেদিন এক কাগজে দেখলাম, একটা কাউন্টিতে (জেলায়) এক বছরে ৯০০০ বিবাহ, ৮০০০ বিবাহবিচ্ছেদ। বিচ্ছেদে জ্বালাযন্ত্রণা। ঐ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের "কামিনী-কাঞ্চনই মায়া" মন্ত্র খুবই ফলপ্রদ। যখন স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যায়, তখন সে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়; এমনকি অনেকে আত্মহত্যা করে বা স্ত্রীকে হত্যা করে। এ তো কাগজে হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু ঐ-সময় কেউ যদি ঠাকুরের বৈরাগ্যোদ্দীপক "কামিনী-কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়" কথা পড়ে, সে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাবে এবং জীবনের নতুন পথের সন্ধান পাবে।

আমাদের একজন সাধু আমেরিকার একজন নাম-করা অধ্যাপককে ইংরেজী 'কথামৃত' পড়তে দেন। তিনি ওতে Woman and gold are maya দেখে আর বেশি দূর এগোননি। তিনি বইখানি ফেরত দিয়ে ভাল না লাগার কারণ বললেন। সাধুটি তাঁকে বললেন, "দেখুন এই বইয়ের সব নেবেন না। আপনার যেটুকু প্রাণে লাগে, সেটুকুই নেবেন।" তারপর অধ্যাপকটি সমস্ত বইখানি পড়ে বললেন, "I think Ramakrishna is the answer to our society. I love this book very much. Our society is guided by two things : Dollar-king and Sex-queen. The teachings of Ramakrishna is a nice solution to those crucial problems."

শ্রীরামকৃষ্ণকে হক-কথা বলতেই হবে। মুখরোচক চাটুবাক্য বা মিষ্টি মিথ্যে কথা বলবার জন্য তাঁর জন্ম নয়। স্বামীজী বলেছেন, "যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলে, তার পথ কুসুমাবৃত; আর যে তা করে না তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।"

কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়াতে ক্যাথলিকদের ইউক্যারিস্টিক কংগ্রেসে কলকাতার মাদার টেরিসা একটা স্লোগান তোলেন—Hunger for God। আমেরিকায় অনেকে তাতে বেশ নতুনভাবে উৎসাহ পান। একটা বক্তৃতায় বলতে হলো—"দেখ, ঐ

স্লোগানটা তোমাদের কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা একটা পুরান উক্তি। অবতার আসেন মানবমনে ভগবৎক্ষুধা জাগাবার জন্য। খুলে দেখ ১১৬৩ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের 'গসপেল'খানা। ওর পাতায় পাতায় রয়েছে ব্যাকুলতার কথা। লীলাপ্রসঙ্গে দেখবে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদগ্রহণের পরে রয়েছে, "ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন"। তাঁর প্রথম ঈশ্বরদর্শন সাধনার দ্বারা হয়নি—হয়েছে ব্যাকুলতার দ্বারা। ব্যাকুলতাবিহীন সাধনা যান্ত্রিক, প্রাণহীন।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের প্রতি মানুষের ভালবাসার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের প্রতি ভগবানের ভালবাসার বিবরণ বড় একটা পাওয়া যায় না। কারণ মানুষ ভগবানের অনন্ত প্রেম প্রকাশে সমর্থ নয়। শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "কেউ ব্যাকুল হয়েছে—শুনলেই ঠাকুর নিজে তার কাছে দৌড়ে যেতেন। একদিন অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ি করে একজন ভক্তের বাড়ি গিয়ে পড়লেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। ঠাকুর এসেছেন, শুনে ভক্তটি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি এই অন্ধকার রাত্রে কষ্ট করে এসেছেন কেন? আমাকে বললে আমি যেতাম।' ঠাকুর তখন বললেন, 'দেখ, কখনো ভক্ত ছুঁচ হয়, ভগবান চুম্বক হন; আবার কখনো ভগবান ছুঁচ হন, ভক্ত চুম্বক হয়; ব্যাকুল হলে সে ভগবানকে পায়'।"

গত গ্রীষ্মে (১৯৮১) মেক্সিকোতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। প্রতি সোমবার সেখানকার ভক্তরা ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে ধ্যান করে এবং পরে তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করে। আমি বেদান্তের ওপর একটা বক্তৃতা দিলাম। কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট তা স্প্যানিশে অনুবাদ করে ভক্তদের শোনালেন।

গত আগস্ট মাসে লণ্ডনের ভব্যানন্দজীর সঙ্গে কথা হলো। তিনি বলছিলেন, তাঁর রোম-ভ্রমণের কথা। আগে ক্যাথলিকরা নিজেদের স্বতন্ত্র করে রেখেছিল এবং অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। উদার পোপ জন্ ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে (২) ঘোষণা করেন ঃ "Let them reflect attentively on how Christian religious life may be able to assimilate the ascetic and contemplative traditions whose seeds were sometimes already planted by God in ancient cultures prior to the preaching of the Gospel."—Vatican Council II (Ad Gentes) এর পর থেকে ক্যাথলিকরা রুদ্ধদ্বার খুলে বেরিয়ে অপর ধর্ম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়।

যা হোক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কতিপয় বেনিডিক্‌টিন (Benedictine) সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণে ভব্যানন্দজী যান ইতালিতে। তাদের মঠে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ধর্মের পূজা, প্রার্থনা ও ধ্যান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা ও অনুষ্ঠান হয়। তিনি দু-দিন বেদিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে রেখে ফুল, ধূপ, প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে পূজা করেন, এবং "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" সুর-তান যোগে গান করেন। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরাও তাতে যোগ দেন। ইতালির টেলিভিশন তা তুলে দেখায়।

রোমে তখন পোপ ছিলেন বৃদ্ধ পল। বহুভাষাবিদ্ গুণীব্যক্তি ভব্যানন্দজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পোপ পল পৃথকভাবে দেখা করেন এবং যখন সমবেত ছবি তোলা হয়, পোপ ভব্যানন্দজীর হাত ধরে নিজের কাছে বসান। ঐ সময় ভব্যানন্দজী পোপ পলকে The Gospel of Sri Ramakrishna উপহার দেন এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুরের বিষয় পূর্ব থেকেই অবগত আছেন।

এ-দেশে এখন যত যোগী, গুরু, বাবা আছেন, তাঁদের অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' পরিবেশন করেন। কেউ তাঁর নাম উল্লেখ করেন, কেউ করেন না। আমেরিকায় যত ধর্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ বেরুচ্ছে, অধিকাংশ বইয়ের নির্ঘণ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। লস এঞ্জেলস সিটি কলেজের একটি ছাত্রী আমাকে একখানা The Portable World Bible (Edited by Robert O. Ballou, Penguin Books) পাঠিয়েছে। ওটা ঐ কলেজের পাঠ্য। দেখলাম, ঐ গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠা 'কথামৃত' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কয়েক বছর আগে খ্রীস্টোফার ইশারউড আমাকে A Treasury of Traditional Wisdom উপহার দেন। ঐ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের Simon and Schuster; ওতে দেখলাম, ইংরেজী 'কথামৃত' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ১৬৭ বার।

'কথামৃতে' মধু আছে, মজাও আছে—তাই ছড়াচ্ছে। আমাদের এক বন্ধু আমেরিকার এয়ারফোর্সে মেজর ছিল। দিলখুস ভদ্রলোক। সে বলে, 'খুব সম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণের সময় I was that troublemaker Hazra!' আমরা তাকে হাজরা বলেই ডাকি। সে এখন আমেরিকার একটা জুডো পত্রিকার সম্পাদক ও জুডো শিক্ষা দেয়। সে একদিন বলছিল, "কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আমি আমার সঙ্গীদের খুঁজি। তারা হচ্ছে কথামৃতের বিভিন্ন চরিত্র। ঐ সব বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি বেশ আনন্দ পাই।"

বছর দশেক আগেকার কথা। তখন সবে হলিউডে এসেছি। একদিন বক্তৃতার পর হ্যাণ্ডশেক করবার সময় একটি ভক্ত নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "I am Girish"; মুখ দিয়ে ভুর ভুর করছে মদের গন্ধ। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা—আমার সব ভক্ত দেশ-বিদেশে আছে। যে যেভাবে পারুক ঠাকুরের সঙ্গে যোগ থাকলেই হলো। গীতাকার বলেছেন "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"।

আমাদের আর এক বন্ধু ঠাকুরের উগ্র ভক্ত। একটি লোক তাকে এক যোগীর বই পড়তে দেয়। বন্ধুটি খুব বুদ্ধিমান ও উচিত-বক্তা। সে বইখানি ২ পৃষ্ঠা পড়ে গুণে দেখল ১৮টা 'I' রয়েছে। সে তখন ঘর থেকে ঠাকুরের বিরাট 'গসপেল'খানা বের করে তাকে বলল "তোমার যোগীর 'I'-র ছড়াছড়ি দেখলাম, এবার এই কথামৃত উলটে দেখ শ্রীরামকৃষ্ণ কতবার 'I' উল্লেখ করেছেন।"

ইংরেজী কথামৃতে অনেক জায়গায় "All Laugh", "Laughter" আছে। অনেক সময় আমেরিকান ভক্তেরা বলে, "স্বামী, আপনি হাসেন, কিন্তু আমরা তো ওখানে হাসির

কিছু দেখি না।" বললুম—হাসি-হিউমার লুকিয়ে থাকে ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিমায়, সামাজিক প্রথায়, দেশাচারে, লোকাচারে এবং প্রকাশ পায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি-ঠাট্টা বুঝতে গেলে তাঁর ভাব-ভাষা-সামাজিক প্রথার সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। আমার একখানা বই আছে "10,000 Jokes, Toasts and Stories"। আমি মাঝে মাঝে ঐ বই পড়ি। কোনটা ধরতে পারি, কোনটা পারি না। অপরকে জিজ্ঞাসা করে তবে জানি। একটা প্রবাদ আছে—বোকা তিনবার হাসে: প্রথম—না বুঝে, দ্বিতীয়—বুঝে এবং তৃতীয়—বুঝতে এত দেরি হলো কেন, এই ভেবে।

সেদিন একজন কমেডিয়ানের কাহিনী শুনছিলাম। সে বলছিল কোন এক গ্রাম্য শহরের চার্চে যাজক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলে চললেন, "ক্রাইস্টই একমাত্র সম্পূর্ণ (perfect), আর সব পাপী ও অসম্পূর্ণ। তোমরা কি কেউ সম্পূর্ণ মানব দেখেছ বা তার কথা শুনেছ? যদি কেউ দেখে বা শুনে থাক তবে হাত তোল।" গির্জা গমগম করতে লাগল। যাজকের চ্যালেঞ্জে কেউ হাত তুলল না। অবশেষে একটি মধ্যবয়স্ক লোক উঠে দাঁড়াল। যাজক হুংকার দিয়ে বললেন, "তুমি সম্পূর্ণ?" "না"। "তুমি দেখেছ এমন কাউকে যে সম্পূর্ণ?" "হ্যাঁ।" "কে সে?" "আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী।" শুনে সবাই হাসল। আমি হাসলুম না। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "ঐ দ্বিতীয় স্বামী যা কিছু করে, তার স্ত্রী বলে—আমার প্রথম স্বামী এ ব্যাপারে perfect ছিল। বেচারা বর কিছুতেই স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে না পেরে গির্জায় শান্তির জন্য হাজির হলো এবং সেখানে সেই একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো।" আমরা পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি ভালভাবে জানি না। তাই তাদের হিউমার ধরতে পারি না; এরাও তেমনি 'কথামৃতে'র সব হিউমার ধরতে পারে না। তবে বুঝিয়ে দিলে খুব খুশি হয়। Love for freedom (স্বাধীনতাপ্রিয়তা) এবং Sense of humour (কৌতুকরসবোধ) আমেরিকানদের রক্তে মেশানো।

একবার জনৈক যুবক একজন প্রাচীন সাধুর কাছে উপদেশ চাওয়ায় তিনি বলেন, "রোজ 'কথামৃত' পড়বে। মানবমনে যত রকম আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তর 'কথামৃতে' আছে। যদি ঠাকুরের কথা তোমার মনের সন্দেহ ভঞ্জন করতে না পারে, তবে তুমি কি মনে কর—আমার কথা তোমার সমস্যা সমাধান করবে?"

আর একবার একটি যুবক 'কথামৃত' পড়ে সাধু হতে আসে। জনৈক সন্ন্যাসী রহস্য করে তাকে বলেন, "ওহে, কথামৃত পড়ে কেউ সাধু হতে পারে না। স্বামীজীর বই পড়। তাহলে ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগবে—তখন সাধু হতে পারবে। 'কথামৃত' পড়লে তো ভগবান দর্শন হয়, তখন তোমার সাধু হবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত যে কতভাবে ছড়াচ্ছে আমরা জানি না। কিছুকাল আগে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের বক্তৃতা শুনতে গেলাম। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন, ঠাকুরের "আসন্নপ্রসবা ব্যাঘ্রী ও মেষপালের" গল্প বলে। ইলিনয়ের একটা ব্যাপটিস্ট চার্চে ধর্ম-সম্মেলন হচ্ছিল। সেখানকার যাজক একজন নিগ্রো। তিনি সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করলেন ঠাকুরের

গল্প—"চার অন্ধের হস্তী দর্শন" অবশ্য এঁরা কেউ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেননি। তাতে কিছু আসে যায় না। যিনি "নামযশে হ্যাক থু" করতেন, এবং "লোকমান্যিতে ঝাঁটা" মারতেন, তিনি কি আর নামের কাঙাল হবেন?

'কথামৃত' যে কিভাবে কার মনে কাজ করছে বলা মুশকিল। কয়েক বছর আগে এক বক্তৃতায় (Yearning for Illumination—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা) ঠাকুরের কথামৃতের একটি ছোট্ট কথা বলেছিলাম, "কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।" শুনে একটি actress (অভিনেত্রী) বাসায় গিয়ে কাঁদতে শুরু করল। মেয়েটি দুপুর রাত পর্যন্ত কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরে সে আমায় বলেছিল, "কত তো কাঁদলুম, ঠাকুর তো এলেন না।" আমি বললুম, "তুমি তো মাত্র দশ-বার ঘণ্টা কেঁদেছ। ঠাকুর বলেছেন, 'একদিন একরাত' অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা কাঁদতে। তোমাকে আরও কাঁদতে হবে।" জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়। সরলতার প্রতিমূর্তি মেয়েটি। এ-সব ভক্তদের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা দেখলে বা শুনলে আনন্দ হয়।

আর একবার Portland এ বক্তৃতা দিতে গেছি। সেখানে কথা প্রসঙ্গে বললুম, ঠাকুর বলেছেন—মানুষ মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে ঈশ্বরের কৃপা ও দর্শন হয়। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন আমেরিকায় পুরুষদের কাঁদা অশোভনীয় এবং কাপুরুষতার পরিচায়ক।" আমি বললুম, ঠাকুর বলেছেন নির্জনে গোপনে কাঁদতে। Signboard না মেরে দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবেন।

'কথামৃতে'র কথা আঁকড়ে ধরে এ-সব ভক্ত জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের একটা আশ্বাসবাক্য মনে পড়ে, "দেখ, বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বলছি; আমরা লোক ঠকাতে আসিনি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে; কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে, আমরা ডুবব না, আর তোমারও ডুববে না।"

আফিংখোর ময়ূরের যেমন মৌতাত লেগে থাকে শ্রীম তেমনি ঠাকুরের কথামৃত পান করে গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন। তিনি নিজে কথামৃত আস্বাদ করে অমর হয়ে রয়েছেন এবং ভাবীকালের পথিকদের ঐ অমৃতের অধিকারি করে গেছেন।

'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দীর শুভলগ্নে কথামৃতকার শ্রীমর প্রতি অশ্বিনী দত্তের পত্রাংশ প্রণিধানযোগ্য ঃ "ধন্য তুমি! এত অমৃত দেশময় ছড়ালে! আমি তো আর শ্রীমর মতো কপাল করে আসিনি যে, শ্রীচরণদর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখব।... ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা।... ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।"

কৃপাপ্রাপ্ত রসিক

রসিকের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘান্তর্গত ভক্তজন ছাড়া প্রায় সবাই ভুলে গেছে। ভুলে যাবারই কথা। কারণ? কারণ বহু। মানুষের কাছে সে ছিল ঘৃণ্য। সমাজে সে দরিদ্র, অস্পৃশ্য ও অবহেলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলানাট্যে সে স্টেজের বাইরে পার্ট করেছে। স্টেজে ঢুকবার অধিকার তার ছিল না। রসিক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পথ সাফ করেছে; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-চত্বরে ঝাড়ু লাগিয়েছে; সে ময়লাস্থান সাফ করেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সে জীবন কাটিয়েছিল। তাই তাকে না চিনবারই কথা। সেও বড় একটা কাউকে চিনত না। কারণ তার পেশা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মেথর। তার মাসিক বেতন নিশ্চয়ই এক টাকার বেশি ছিল না, কারণ যেখানে পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের মাসিক বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাকা, পরে সাত টাকা হয়। যা হোক নিঃসন্দেহে সে চিনত একজনকে—'অচিন গাছ'কে।

বোঝা—ভুল বোঝা—না বোঝা—এসব বোঝা-বুঝির বুচকি রসিককে বইতে হয়নি রসজ্ঞ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়। "আমি না ধরা দিলে কি পারিস ধরিতে?" এ বড় সত্যি কথা। শাস্ত্র-জপ-তপ-ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভগবানকে ধরতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'।

অচিন গাছকে চেনা মুশকিল। রসিক কিন্তু চিনেছিল বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা নয়, সরলতার দ্বারা। যারা ধার্মিক তারা সরল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর মুখের দিকে তাকালে বা কথামৃত পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি কী অপূর্ব সরল ছিলেন। কোথাও ঘাঁটঘোঁট নেই। পণ্ডিতেরা বুদ্ধির মারপ্যাঁচে ধর্মটাকে জটিল করে দিয়েছেন। আমরাই মিথ্যা, শঠতা, ক্রূরতা, পলিটিকসের ফাঁসে নিজেদের গলা আটকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। নিজেদের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছি। সা চাতুরী চাতুরী—যে চতুরতা ভগবানকে পাইয়ে দেয় সেই বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

"সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।" এই কৃপার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 'সৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে[১] ঃ "রামলালদাদার কাছে শুনেছি রসিকের প্রতি ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে রসিক নামে একজন মেথর ছিল। ঠাকুরকে সে দেখত প্রত্যহ দূর থেকে। কত লোক তাঁর কাছে আসছে যাচ্ছে। রসিক ভাবত ঃ আমি এমন কী পাপ করে এসেছি যে এত কাছে থাকতেও যেতে পারি না ওঁর কাছে। তাঁর কাছে কত পাপীতাপী যাচ্ছে। সবাইকে তিনি উদ্ধার করছেন। আর আমার কী দুর্ভাগ্য! তাঁর চরণধুলাও নিতে পারি না—দক্ষিণেশ্বর বাস করেও। দূর থেকে দেখা যায়, কাছে যেতে পাই না। মনের ভেতর তাই ঝড় বইছে, প্রাণে শান্তি নেই। এইভাবে দু-চার বছর গেল। অবশেষে একদিন শুভ মুহূর্তের উদয় হলো। রামলালদাদা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর

১ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০

শৌচে গেছেন, এখনই ফিরবেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রসিক ভাবছে ঃ আজ ভাগ্যে যা থাক, আর সহ্য করতে পারছি না। নহবতখানার এদিকে আসতেই তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমার কি হবে?' কথাটা এইভাবে বলতেই ঠাকুর চমকে উঠেছেন। তারপর সমাধি। এমনি করে বহুক্ষণ কেটে গেল। রসিক চোখের জলে পা ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভেতর থেকে তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জ্বালা ধুয়ে যাচ্ছে। সমাধি থেকে নেমে তার মাথায় হাত দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তোর সব হলো'।"

"সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।" দীনহীন কাঙালের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা জীবের ঘরে ঘরে। প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "রসিক (রস্‌কে হাড়ি) দক্ষিণেশ্বর গ্রামেরই লোক (মেথর) ছিল। ঠাকুরকে তার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে শুনেছি—তারই খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে। যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, 'থাক্ বুঝেছি, মদটা একটু কম করে খাস।' সে লুটিয়ে পড়ে বলত, 'কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে নটবর পাঁজার মা মরেছিল! কাদের মা আর রোজ মরছে। আমি মলে মরবে।' "[২]

খ্রীস্টোফার ইশারউডের একটা কথা মনে পড়ছে ঃ "A great guru is first and foremost a great disciple." শ্রীরামকৃষ্ণ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমাগত শিখতেন। হৃদয়দুয়ার তিনি কোনদিন বন্ধ করে রাখেননি। মেথর, মাতাল, সার্কাসের বিবি—সবার কাছ থেকেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সেজন্য তাঁর শিক্ষায় একঘেয়েমি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রসিকের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ইতিহাস এখন লুপ্ত বা লুক্কায়িত রয়ে গেছে।

ধ্যানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছুটে গেছে রসিকের বাড়ি—এ-কথা শুনে পাঠক হয়তো আঁতকে উঠবেন। তবে শুনুন তাঁর আত্মকথা ঃ "সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি! রস্‌কে ম্যাথর, মনকে বললুম, থাক শালা ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানযোগে মনকে রসিকের বাড়িতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি। তমিস্রা রজনীতে সশরীরে রসিকের বাড়ির নোংরা স্থানে শুরু করেছেন এক উগ্র তপস্যা। এ তপস্যার কথা মন্দিরের লোকরা জানত না। জানলে দারুণ হট্টগোল শুরু হতো। অবশ্য যিনি অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক ও নিন্দা) ছিন্ন করবার জন্য মরিয়া, তিনি কি আর মানুষের সমালোচনা গ্রাহ্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একে ব্রাহ্মণ, তারপর আবার কালী মন্দিরের পূজারী। "প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এরূপ নীচজাতির মুখ দেখে ফেলে, তবে তাকে সারাদিন উপবাসী থেকে এক হাজার গায়ত্রী জপ করতে হবে। এ সকল শাস্ত্রীয় নিষেধ বাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম যে স্থানে বসে নীচজাতিরা আহার করে, সে স্থান পরিষ্কার করতেন, তাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎ-প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। শুধু কি তাই, রাত্রে গোপনে উঠে ময়লা পরিষ্কার

২ উদ্বোধন ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭২

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫/৯৮

করে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে নিজের সমত্ব বোধ করবার চেষ্টা করতেন।"[৪]

স্বামীজী My Master বক্তৃতায় আরও বলেছেন, "My Master would go to a Pariah and ask to be allowed to clean his house... The Pariah would not permit it; so in the dead of night, when all were sleeping, Ramakrishna would enter the house. He had long hair, and with his hair he would wipe the place, saying, 'Oh, my Mother, make me the servant of the Pariah, make me feel that I am even lower than the Pariah."[৫] অর্থাৎ, "আমার প্রভু এক মেথরের কাছে গিয়ে তার বাড়ি পরিষ্কার করবার অনুমতি চাইতেন।... মেথরটি রাজি হতো না; তাই গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকত তিনি সে বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর যে দীর্ঘকেশ ছিল তা দিয়ে সেই স্থান মুছে দিতেন; বলতেন, 'মা আমাকে ঐ মেথরের সেবক কর, আমি যে এমনকি মেথরের চেয়েও নীচু তা আমাকে অনুভব করতে দাও।' "

এ পারিয়া ভক্তচূড়ামণি রসিক মেথর।

শ্রীরামকৃষ্ণের এ নর্দমা পরিষ্কার লীলাটির সাক্ষ্য দিয়েছেন আর একজন ব্যক্তি—যিনি ঠাকুরের অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং উত্তরকালে তাঁরই স্মৃতিতে বেঁচেছিলেন। ইনি কথামৃতকার শ্রীম। তাঁরই উক্তি ঃ "ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি নিজের মাথার চুল দিয়ে রসকে মেথরের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করেছিলেন। আর কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, মা, আমি ব্রাহ্মণ এ অভিমান বিনাশ কর।"[৬]

যা হোক জাত্যভিমান, ঘৃণাবুদ্ধি মন থেকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ নিশা অভিযান। স্বামীজী 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতায় আরও উল্লেখ করেছেন, "মেথরের প্রতিও যাতে তাঁর ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠে তাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন।" এভাবে তিনি দীনতার সাধন শেষ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমর বর্ণনায় রয়েছে ঃ "হঠাৎ একদিন দেখি দক্ষিণেশ্বরের পথে ঝাড়ু দিচ্ছেন, আর বলছেন, 'মা এই পথ দিয়ে বেড়াবেন।' কথা বলতে বলতে তন্ময়তা।"[৭] শ্রীম আরও বলেছেন ঃ "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা watch (পর্যবেক্ষণ) করে দেখেছি এক নিমেষের জন্যও ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হন নাই। নিদ্রার সময়ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে অজানাভাবে 'মা মা' বলছেন। ... একদিন বসে বসে 'গৌর গৌর' নাম করছেন গুন-গুন করে। একজন বললে, আপনি মায়ের নাম করুন, 'গৌর গৌর' করছেন কেন? ঠাকুর তক্ষুণি উত্তর করলেন, কি আর করি বাপু বল? তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকাকড়ি, কিন্তু আমাব এই এক অবলম্বন। তাই কখনো গৌর বলি কখনো মা, কখনো রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, এই করে সময় কাটাই।"[৮] এই অহংবিবর্জিত দেবমানব ভক্তদের শপথ করে বলতেন, "মাইরি বলছি, আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না।" "কথায় বিশ্বাস করো। এখানে ঢং ফং নাই।" এই ঢং ফং নাই বলেই সরল রসিক চিনেছিল সরল শ্রীরামকৃষ্ণকে।

---

৪ মদীয় আচার্যদেব, বাণী ও রচনা ৮/৩৯৪; ৫ Complete Works of Swami Vivekananda IV p 175
৬ শ্রীম-দর্শন ৭/১৮৬; ৭ উদ্বোধন ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৩৫; ৮ শ্রীম-দর্শন, ৭/১৭৯, ১৭৮

রসিকের মহাপ্রয়াণ বিষয়ে কয়েকটা কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটা ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা দেখে অনেকেই হকচকিয়ে যান। বিস্মিত হবার কিছুই নাই। বাইবেল পড়লে দেখা যায়, খ্রীস্টের একই কাহিনীকে ম্যাথিউ, মার্ক, জন ও লুক নিজেদের ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা হোক আমরা রসিকের দেহত্যাগের বর্ণনাগুলি একে একে লিপিবদ্ধ করছি ঃ

প্রথম বর্ণনা ঃ রসিক পরম ভক্ত। বাড়িতে তুলসীমঞ্চ ছিল। নীচ জাত বলে সর্বদা লোকজন থেকে দূরে দূরে থাকত। ঠাকুরকে দূর থেকে দেখে প্রাণ ভরাত। ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যখন যেতেন তাঁর পায়ের দাগে দাগে মাথা ঘসে ঘসে অনুসরণ করত। ঠাকুর তাকে এইভাবে মাথা ঘসতে দেখে একদিন তার দিকে তাকালেন। রসিক বললে, "বাবা, আমার কি কিছু হবে না?" ঠাকুর বললেন, "হবে বৈ কি। এত ভক্ত এখানে আসে, তুই তাদের কত সেবা করছিস।" ঠাকুরের শরীর যাবার পর রসিক মুষড়ে পড়ল। তার শরীরও ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগল—আর কাজকর্ম করতে পারে না। মন্দিরের আঙিনায় আর ঝাঁট দিতে আসে না। তার মেয়ে ঝাড়ু দিয়ে যায়। রসিক অসুস্থ। যেদিন শরীর ছাড়বে সেদিন পরিবারের সকলকে ডেকে বলল, "তোরা সকাল সকাল খেয়ে নে, কেউ আমার কাছে আসবি না, যতক্ষণ আমি না ডাকি।" বেলা তখন দশটা, হঠাৎ তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সে বলে উঠল, "বাবা তুমি এসেছ, আমায় ভোলনি তাহলে।" [৯]

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প শোননি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল, "বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?" তখন ঠাকুর বলেছিলেন, "ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।" ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল, "এই যে, এসেছ। বাবা এসেছ!" এই বলতে বলতে মারা গেল।[১০]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ তোমরা মার কাছে রয়েছ, কত ভাগ্যবান। দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর মন্দিরে রসিক মেথর ঝাড়ু টাড়ু দিত। একদিন ঠাকুরের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, "প্রভু, আমার কি উপায় হবে?" ঠাকুর "তুই মায়ের কাজ করছিস, তোর আবার ভয় কি?" সে নিজের বাড়িতে তুলসী-কুঞ্জ করে ওখানে বসে ভজন করত। একদিন দুপুরবেলা স্ত্রীকে বলল, "ছেলেদের ডাক। আমাকে তুলসী-কুঞ্জে নিয়ে শুইয়ে দাও।" সে তখন ঠাকুরের নাম করতে করতে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করল।[১১]

যিনি বলতেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নাই," তাঁর আশীর্বাদ যে কী অমোঘ ছিল—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রসিক।

৯ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা, ৩৮ ১০ শিবানন্দ বাণী, ২/১৩৫

১১ শ্রীম-কথা, ১/২৬৪ এবং শ্রীম-দর্শন, ৭/১৭০

‘শেষ জন্ম’ রহস্য

১

“যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।”[১] শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এটি বড় আশা-ভরসার বাণী। ঠাকুরের মুখ থেকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বেরোয়নি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যারা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিল, সকলেরই তবে শেষ জন্ম। ‘এখানে’ বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণত নিজেকেই নির্দেশ করতেন। ‘আমি’ ‘আমার’ সর্বনাম প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। যদি নিতান্তই বলতে হয় তবে, ‘শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস বা সন্তান আমি’ এই অর্থে বলতেন। ‘অহং’কে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। এখন দেখা যাক, যারা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিল তাদের সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন। “অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারও বা শেষ জন্ম।”[২] ঠাকুর বলছেন না—সকলেরই শেষ জন্ম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমকে বলছেন ঃ “আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?”[৩] ভক্তশ্রেষ্ঠ মথুর মারা গেলে পর জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ “(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হলো মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।” ঠাকুর শুনে উত্তর করলেন ঃ “কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।”[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ নানাবিধ উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা তাঁর কাছে এসেছিল—সকলেরই শেষ জন্ম হয়নি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলেছিলেন ঃ “ঠাকুরকে দেখার পরও যাদের মন কামকাঞ্চনে আসক্ত থাকে, তারা প্রকৃত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেনি, তারা শ্রীরামকৃষ্ণরূপ ভূত দেখেছে।”[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটিকে আমরা শাস্ত্রের দিক থেকে, বিচারের দিক থেকে, বিশ্বাসের দিক থেকে প্রভৃতি নানা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করব। শেষ জন্মের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন ঃ “শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয়-কর্ম থেকে মন সরে আসে।”[৬] “শুদ্ধবুদ্ধি না হলে ঈশ্বরকে

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২০৯ ২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১৬/১
৩ তদেব, ৪/৮/২; ৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৩/২২৩; ৫ স্বামী অভয়ানন্দের কাছে শ্রুত
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১৯/২

জানতে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।"[৭] "ভগবানের কথায় যাঁর গা রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে ও চোখে জল পড়ে, সেইটি তাঁর শেষ জন্ম বুঝতে হবে।"[৮]

শাস্ত্র বলেন, 'জ্ঞানাৎ মোক্ষ' অর্থাৎ জ্ঞান হলেই মুক্তি। গীতাতে আছেঃ 'ব্রাহ্মীস্থিতি' হলে 'ব্রহ্ম নির্বাণ' হবে; অবতারের দিব্য 'জন্মকর্ম' তত্ত্বত জানলে, 'পুনর্জন্ম' হবে না।[৯] কঠ উপনিষদে আছেঃ "যিনি বিবেকী, সংযতমনা, পবিত্রচেতা, তিনি সেই পদই (ব্রহ্মকে) লাভ করেন, ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"[১০] বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছেঃ "যিনি কামনার অধীন নন, যিনি কামনাশূন্য, বাসনাহীন, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁর ইন্দ্রিয়সকল উৎক্রমণ করে না; তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ব্রহ্মে লীন হন।"[১১] ছান্দোগ্যের ঋষি বলেছেনঃ "ব্রহ্মযানে গমনকারীরা আর এই মানবীয় আবর্তে পুনরাবর্তন করেন না।"[১২]

কথায় বলেঃ "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" গিরিশের বিশ্বাস ছিল, যারা শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছে সব মুক্ত হয়ে যাবে। একবার কাশীপুরে ঠাকুরের গলা থেকে পুঁজ রক্তাদি পড়েছে, পাত্র তখনও পরিষ্কার হয়নি। গিরিশ কাশীপুরে এলে ঠাকুর ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেনঃ "আবার বলে অবতার!" গিরিশ বিনা দ্বিধায় বললঃ "এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে—তাই এই রোগ।"[১৩] আর একবার স্বামী অখণ্ডানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ "দেখ, গিরিশবাবুর ঠাকুরের প্রতি কি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল! একদিন একজন ঠাকুরের পিকদান পুকুরে ধুতে গিয়েছিল। যেমনি পিকদানের গয়ের পুকুরে ফেলেছে অমনি এক ঝাঁক মাছ এসে গয়েরগুলো কপ্ কপ্ করে খেয়ে ফেলল। তাই না শুনে গিরিশবাবু গদ্গদভাবে বললেন, 'আহা, মাছগুলো তরে যাবে রে, মাছগুলো তরে যাবে, মাছগুলোর এই শেষ জন্ম।' দেখ দেখি কত বড় বিশ্বাসের কথা!"[১৪]

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বিশ্বাস ছিল, যারা ঠাকুরকে দেখেছে তারা সব মহাভাগ্যবান এবং তাঁর কৃপায় তরে যাবে। একবার যুবক হরিপদ (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) রামবাবুকে বলেছিলঃ "শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?" রামবাবু রেগে উত্তর দেনঃ "পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর কিনা বলিতেছিস তাঁহাকে মাঝি-মাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানবি যে, যে মাঝি-মাল্লা সুকৃতিবশত তাঁহার শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান।"[১৫]

৭ তদেব, ৪/২১/২; ৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশচন্দ্র দত্ত, (১৮৯২) পৃঃ ৮৮
৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৭২, ৪/৯, ৮/১৬; ১০ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/৮ ১১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৬
১২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩/১৫/৫
১৩ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা (২য় খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ২৬৮
১৪ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (১৩৭১) পৃঃ ৬১০
১৫ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ (১৯৮৩), পৃঃ ১৬২

এখন বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে জানা যায়—পুনর্জন্মের কারণ কামনা-বাসনা। যার কামনা-বাসনা নেই সে মুক্ত এবং এই তার শেষ জন্ম। ভর্জিত বীজের যেমন অঙ্কুরোদগম হয় না, তেমনি বাসনাশূন্যের আর নবজন্ম হয় না। স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের শেষজন্মের উপর উক্তিটির একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা লীলাপ্রসঙ্গে করেছেন ঃ "ঠাকুর উহা আমাদিগকে স্বয়ং অনেক সময় বলিতেন। বলিতেন, 'যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।' কথাগুলি শুনিয়া কত লোক কত কি যে ভাবিয়াছে তাহা বলিয়া উঠা দায়। কেহ উহা একেবারে অযুক্তিকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে; কেহ ভাবিয়াছে, উহা ঠাকুরের ভক্তিবিশ্বাস-প্রসূত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র; কেহ বা ঐ সকলে ঠাকুরের মস্তিষ্ক-বিকৃতি অথবা অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়াছে; কেহ বা—আমরা বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন উহা বাস্তবিকই সত্য, এইরূপ বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করাটা বিশ্বাসের হানিকর ভাবিয়া চক্ষু-কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছে; আবার কেহ বা ঠাকুর যদি উহা কখনো বুঝান তো বুঝিব ভাবিয়া উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই একটা পাকা না করিয়া উহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে যাহা বলিতেছে, তাহা অবিচলিত চিত্তে শুনিয়া যাইতেছে।"[১৬] যাই হোক অহংবর্জিত শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করে মা জগদম্বা লীলা করেছেন। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন ঃ "ঠাকুরের এই কথাগুলির ভিতর 'এখানে' কথাটির অর্থ যদি আমরা 'মার অভিনব উদারভাবে' এইরূপ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অযুক্তিকর হইবে না। এবং কাহারও আপত্তি হইবে না।"

পরবর্তী কালে জনৈক ব্যক্তি এই শেষ জন্মের রহস্য সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ "এর একটা rational (যুক্তি-সঙ্গত) অর্থ করাই ভাল। যারা তাঁর ভাব নেবে তাদের জন্মের একটা শেষ, একটা limit (সীমা) হয়ে যাবে। কারো কারো এই জন্মেই হয়ে যাবে, কারো কারো একাধিক জন্ম লাগবে, তবে অনন্তকাল ধরে জন্ম-মৃত্যু হবে না যে যত খাটবে তার তত শীঘ্র হবে।"[১৭]

২

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'তে শেষ-জন্মের উপর বহু উক্তি আছে। তিনি ঠাকুরের কথাও উদ্ধৃত করেছেন এবং নিজেও কারো কারো শেষ জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমরা উদ্ধৃতিগুলিকে সাজিয়ে দিলাম। পাঠক এই কথাগুলির মধ্যে শাস্ত্র, যুক্তি, বিশ্বাস ও অনুভবের ইঙ্গিত পাবেন।

"বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনি।

---

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪/২০৯-২১২

১৭ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ২য় সং, পৃঃ ২৩১

বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।... যখন পুরীতে জগন্নাথদর্শন করি, এত লোকে জগন্নাথদর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম। ভাবলুম—আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে! শেষে দেখি যে না, যারা বাসনাশূন্য সেই এক-আধটিই মুক্ত হবে। যোগেনকে বলায় সেও তাই বললে, 'না মা, যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্ত হবে।' "[১৮]

"ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা।"[১৯]

"আমি—মা, ঠাকুর বলতেন যে ঈশ্বরকোটি নির্বাণের (নির্বিকল্প সমাধির) পরও ফেরে, আর কেউ পারে না, এর মানে কি?

"মা—ঈশ্বরকোটি নির্বাণের পরও মনটি গুছিয়ে আনতে পারে।

* * *

"আমি—সবাই কি নির্বাসনা হতে পারে?

"মা—তা পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে—পুনঃপুনঃ জন্মাচ্ছে।

"আমি—যদি গঙ্গায় দেহত্যাগ হয়?

"মা—বাসনা ফুরুলেই হয়, নইলে কিছুতেই কিছু নয়।"[২০]

"কর্ম শেষ হলেই ভগবান-দর্শন হয়। সেটি শেষ জন্ম।"[২১]

"ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কূলকিনারা নেই।' নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙ্গালী। কর্মবিপাকে ওদেশে জন্মেছি। তা দেখবে আমরাও এমন বাঙ্গালী হয়ে যাব যে ঠিক ঠিক। ওদের (নিবেদিতা প্রভৃতির) এই শেষ জন্ম।"

* * *

"মা এইরূপ মাঝে মাঝে অনেকের 'শেষ জন্ম' বলিতেন। তাই মনে করিয়া আজ তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, 'শেষ জন্ম' কথাটার মানে কি? ঠাকুর অনেকের শেষ জন্ম বলেছেন, তুমিও বলছ।

"মা—শেষ জন্ম মানে—তার আর যাতায়াত হবে না, এই জন্মেই শেষ হয়ে গেল।

"আমি—এদের তো অনেকের বাসনা আছে দেখা যায়—সংসার, ছেলেপুলে, পরিবার। বাসনা না গেলে কি করে যাতায়াত ফুরুবে?

"মা—তা তিনি (ঠাকুর) যাকে যা বলেছেন সব সত্য তো। মিথ্যা তো হবার জো

১৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ (৬ষ্ঠ সং), পৃঃ ৩৭-৩৮
১৯ তদেব, পৃঃ ৭৩
২০ তদেব, পৃঃ ৭৭ ৭৮
২১ তদেব, পৃঃ ৮১

নেই। এখন বাসনা থাকুক, আর যাই করুক, তিনি দেখেছেন শেষে তা থাকবে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

"আমি—তাহলে শেষ জন্ম মানে কি নির্বাণ?

"মা—তা বই কি? হয়তো দেহ যাবার সময় মন নির্বাসনা হবে।"[২২]

"ললিতবাবু—মরলে পর ঠাকুর কোলে করে নেবেন, সে আর বেশি কি? যদি এই দেহেই নিতেন!

"মা—এই দেহেই কোলে করে রয়েছেন। মাথার উপরে তিনি আছেন, ঠিক ধরে রয়েছেন।

"আমি—ঠিক আমাদের ধরে রয়েছেন?

"মা—হাঁ, ঠিক ধরে রয়েছেন।

"আমি—সত্যি বলছ?

"মা—হাঁ, সত্যি বলছি, ঠিক ধরে রয়েছেন।

"আমি—ঠিক?

"মা—(দৃঢ়তার সহিত) হাঁ, ঠিক।"[২৩]

"জনৈক ত্যাগী ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মা, আমাদের এত রোগভোগ কেন হয়?' মা তদুত্তরে বলেন, 'তোমাদের এই শেষ জন্ম, তাই বাকি সব জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ হয়ে যাচ্ছে।' "[২৪]

"প্রবোধবাবু—মা, তিনি যে ত্যাগ ভালবাসতেন। আমাদের ত্যাগ কোথায়?

"মা—হবে, ক্রমে ক্রমে। এ জন্মে খানিকটা হলো, পরজন্মে আবার হবে। খোলটাই তো বদলায়, আত্মা তো একই থাকে। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি বলতেন, 'আমি ইচ্ছা করলে কামারপুকুরটাকে সোনা করে দিতে পারি। কিন্তু ওতে কি হবে? ওগুলো তো অনিত্য।' কারো কারো তিনি বলতেন শেষ জন্ম। বলতেন, 'আরে, এর কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই রে! এর শেষ জন্ম।' "[২৫]

একবার উদ্বোধনে গোলাপ-মা পায়খানা পরিষ্কার করে, কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের ফল কাটতে যাওয়ায় নলিনীদিদি প্রতিবাদ করে বলে, "ওকি গোলাপদিদি, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।" গোলাপ-মা বললেন ঃ "তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না।"

মা বললেন ঃ "গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উচ্চমন। তাই ওর অত শুচি-অশুচি-বিচার নেই। অত শুচিবাইটাই-এর ধার ধারে না। ওর এই শেষ জন্ম! তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।"[২৬]...

"মা—ভগবানের উপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে যে পড়ে থাকে, এইটিই তাদের সাধন। আহা, নরেন বলেছিল, 'লাখ জন্ম হলেই বা, তাতে ভয় কি?' তাই তো জ্ঞানীর

---

২২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, [illegible]য় ভাগ (৬ষ্ঠ সং). পৃঃ ৯৫-৯৬ ২৩ তদেব, পৃঃ ১২৪;
২৪ তদেব, পৃঃ ১৪৩; ২৫ তদেব, পঃ ১৬৩ ২৬ তদেব, পৃঃ ১৯০

জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না। অজ্ঞানীরই যত ভয়। তারাই বদ্ধ হয়, পাপে লিপ্ত হয়। কত লাখ লাখ জন্ম ভুগে ভুগে, যাতনা পেয়ে পেয়ে শেষে ভগবানকে চায়।"[২৭]

"আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মা, ঠাকুর বলেছেন, যারা তাঁর কাছে যাবে তাদের শেষ জন্ম। আপনার কাছে যারা আসবে তাদের কি হবে?'

"মা—কি আর হবে, বাবা? এখানেও তাই হবে।

"আমি—মা, আপনার কাছ থেকে যারা মন্ত্র নিয়েছে, তারা যদি কোনরকম জপতপ না করে, তবে তাদের পরিণাম কি হবে?

"মা—কি আর হবে? তোমরা অত ভাবনা কর কেন, মনের বাসনা-কামনা যা আছে পূরণ করে নাও, পরে রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে চিরশান্তি ভোগ করবে। ঠাকুর তোমাদের জন্য নূতন রাজ্য তৈরি করেছেন।"[২৮]

"কথায় কথায় গৌরীমার কথা উঠল। মা বললেন, 'আশ্রমের মেয়েদের ও বড় সেবা করে—অসুখ-বিসুখ হলে নিজ হাতে তাদের গু-মুত পরিষ্কার করে। সংসারে ওর-ও-সব তো আর বড় একটা করা হয়নি, ঠাকুর যে সবই করিয়ে নেবেন—এই শেষ জন্ম কি-না!' "[২৯]

"আমি বলিলাম, 'মা, ভয় হয় তোমার মতো মা পেয়েও কিছু যেন হলো না মনে হয়।'

"মা—ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পিছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুটবেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।"[৩০]

"আমি—ঠাকুর বলেছেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আবার স্বামীজী বলেছেন, 'সন্ন্যাস না হলে কারও মুক্তি নেই।' গৃহীদের তবে উপায়?

"মা—হ্যাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামীজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃসন্ন্যাসের দরকার নেই। তাদের অন্তর-সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃসন্ন্যাস কারো কারো দরকার। তোমাদের আর ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে। আর সর্বদা জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পিছনে আছেন।"[৩১]

"মা—আন্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে। দেখছ না এখন তারকব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি। একটু সার থাকলে কেউ বড় বাদ যাবে না।"[৩২]

"প্রবোধবাবু বলেন : পূর্ববঙ্গের জনৈক ভক্ত (দ্বারকানাথ মজুমদার) জয়রামবাটীতে

২৭ তদেব, ১৯১; ২৮ তদেব, পৃঃ ২৮০; ২৯ তদেব, ১ম ভাগ (৯ম সং), [illegible]; ৩০ তদেব, পৃঃ ১৯১
৩১ তদেব, পৃঃ ১৯৭-৯৮ ৩২ তদেব, পৃঃ ২৪৫

দীক্ষা নিয়া কোয়ালপাড়ায় গিয়া কঠিন রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। অন্তিমসময়ে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলে তিনি জোড়হাতে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক দিন পরে শ্রীশ্রীমার কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করিতেই তিনি অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'আমার সোনার চাঁদ একটি ছেলে চলে গেল! আহা-হা বাছার আমার শেষ জন্ম।''[৩৩]

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ ''একদিন আমারই বয়সী এক যুবকের সঙ্গে গ্রামের পথে দেখা। বিষ্ণুপুর থেকে সারারাত হেঁটে এসেছে। ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দু-চোখ জবাফুলের মতো লাল। শুধাল, 'মার বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন?'

''আমি সেখানেই এসেছি, আসুন আমার সঙ্গে। নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতেই সে উচ্চহাস্য করে উঠল, 'নাম? আমার নাম নেই, গোত্র নেই, বংশ নেই, আমি মায়ের পুজোর বলি। কেবল উৎসর্গের অপেক্ষা।' ভক্তের বিচিত্র স্বভাব।... নিস্তব্ধ হলাম। উন্মাদ নয়,মার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি স্নান করে আসতে বললেন। শোনামাত্র পুকুরে ডুব দিয়ে এল। মার পাশে বসে ডালায় করে মুড়ি জিলিপি খেতে লাগল শান্ত শিশুর মতো। আদর করে মা গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, এইবার জল খাও বাবা। তারপর ওর হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঠাকুরের সম্মুখে নিয়ে গেলেন। আমি সরে গেলাম। কি কথা হলো জানিনে, তবে বুঝলাম মা ওকে দীক্ষা দিলেন। দুপুরে অন্নপ্রসাদ পেয়ে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল—গভীর নিদ্রা। পরে মা বলেছিলেন, 'এবার ওর শেষ জন্ম। এরা এমন অশান্ত হয়।' ''[৩৪]

৩

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ 'শেষ জন্মে'র জন্য মোটেই লালায়িত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন কেউ ঈশ্বরকোটি, কেউ নিত্যমুক্ত, কেউ ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁরা যুগে যুগে প্রতি অবতারের সঙ্গে আসেন ভগবানের লীলা সহায়ক হিসাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না যে, যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছে ও সঙ্গ করেছে তারাই মুক্ত হবে এবং যারা দেখেনি তাদের মুক্তি হবে না। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন ঃ ''ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সঙ্ঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।' ''[৩৫]

স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন ঃ ''তিনি (ঠাকুর) কোন একজনকে বললেন, 'এ জীবনে তোমার ধর্মলাভ হবে না।' সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি যেন দেখতে পেতেন। বাইরে থেকে যে মনে হতো—তিনি কারও কারও উপরে পক্ষপাতিত্ব করছেন, এই ছিল তার

৩৩ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য, (১০ম সং), পৃঃ ৮৫
৩৪ উদ্বোধন, শ্রীশ্রী[illegible]শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা, পৃঃ ২৪৫
৩৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ২৪৮

কারণ।... যারা তাঁর দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না, আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—একথা সত্য নয়।"[৩৬]

মুক্তি মানে জন্মমৃত্যুর ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি। মুক্তিতেই হয় শেষ জন্ম। তাই শেষ জন্মটা খুবই রহস্যময়। স্বামীজীর কাছে বিভিন্ন লোক আসত এই রহস্যটা জানবার জন্য। কারণ তিনি ছিলেন জীবন্মুক্ত পুরুষ। স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতিকথাতে রয়েছে ঃ "একদিন সকালে এক ছোকরা এসে বললে, 'স্বামীজী আপনি তো দেশ-বিদেশে নতুন এক ধর্ম প্রচার করে এলেন?' স্বামীজী বললেন, 'নতুন ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ?' সে বললে, 'আপনি তো—গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—এসব মানেন না?' স্বামীজী বললেন, 'সে কি! আমি রোজ গঙ্গাস্নান করি, তা সম্ভব না হলে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিই, মুখে দিই।' সে তো সব বুঝে চলে গেল। একটু পরে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে বলছেন, 'স্বামীজী, আপনি তো আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মই সারা পৃথিবীতে প্রচার করে এলেন! ধন্য আপনি!' স্বামীজী বললেন, 'সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে আপনি কি বোঝেন?' 'এই কাশীতে মরলে মুক্তি হয়—এটা তো আপনি মানেন?' 'না, জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। জ্ঞান হলে যেখানেই মরুক মুক্তি হবে। জ্ঞানের চর্চা করুন, আমি সর্বদা জ্ঞানের চর্চা করি!' আমি তো দুজনের সঙ্গে দু-রকম কথা শুনে অবাক! নতজানু হয়ে বললুম, 'স্বামীজী, ওরা তো যে যার চলে গেল, আমি যে পড়লাম মহা ফাঁপরে?' স্বামীজী বললেন, 'তুই জিগ্যেস কর, তোকে তোর মতন উত্তর দেব।' আমি বললুম, 'বলুন তাহলে কিসে মুক্তি?' স্বামীজী গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'গুরুসেবায়।'"[৩৭] স্বামী প্রেমানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "মাকে ঠাকুর একদিন বলছেন—'যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া) মানত করলেই সব হবে।' চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ।"[৩৮]

এক সময় জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মহারাজ, ঠাকুর নাকি বলতেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আপনারা তাঁকে কখনও একথা বলতে শুনেছেন?" মহাপুরুষ মহারাজ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—এ-কথা তো বইয়েই আছে।

সন্ন্যাসী—ঠাকুরের ও-কথার অর্থ কি? ওতে কি কেবল যারা ঠাকুরকে দর্শন করেছে এবং তাঁর কৃপায় ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করেছে তাদের কথাই বোঝাচ্ছে, না যারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সকলেরই শেষ জন্ম?

মহাপুরুষ মহারাজ—তাঁর কথায় সকলকেই বোঝাচ্ছে। যারাই তাঁর উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তা তাঁকে দর্শন করেই হোক, আর যে করেই হোক, যারা তাঁকে আন্তরিক ভক্তি করে, ভগবানজ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাঁতে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের শেষ জন্ম,

---

৩৬ তদেব, ৮ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৪১৩;   ৩৭ উদ্বোধন ঃ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ৭ সংখ্যা, পৃঃ ২৬৩-২৬৪

৩৮ প্রেমানন্দ—ওঁকারেশ্বরানন্দ, (১৩৪৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩১

তারাই মুক্ত হবে। তবে আত্মসমর্পণ চাই।

সন্ন্যাসী—মহারাজ, যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করে এখানে এসেছে তারাও মুক্ত হবে?

মহাপুরুষ মহারাজ—হাঁ, তা বৈকি। যারা শ্রীভগবানজ্ঞানে তাঁর শ্রীচরণে অনন্য শরণ নিয়েছে তাদের শেষ জন্ম। তবে ঠিক ঠিক মুক্ত হতে গেলে ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন চাই। এখানে আসা, সেই কি কম সৌভাগ্যের কথা?[৩৯]

আর একবার জনৈক ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'মা, যারা এখানে আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়।' লীলাপ্রসঙ্গেও পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখেছেন—'যাদের শেষ জন্ম, তারাই কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসবে।' এইসব কথার মানে কি?"

মহাপুরুষজী—"মানে আর কি। যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করেছে, তাঁর নাম স্মরণ মনন করছে, তাদের শেষ জন্ম। এতে আর সন্দেহ কি?"[৪০]

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর মহাপুরুষ মহারাজ একখানি চিঠিতে লেখেন : "যে-বিষয় জানিতে চাহিয়াছ অর্থাৎ 'ঠাকুরের একটি কথা আছে যে, যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসবে'—তুমি বহু চেষ্টা করিয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সক্ষম হও নাই। আমি যাহা বুঝি তাহাই তোমায় লিখিতেছি :

"প্রথমত, শেষ জন্ম, কি প্রথম জন্ম, কি দ্বিতীয়, কি তৃতীয়—ভক্তেরা এ-সকল চিন্তা কখনই মনে আনে না। ভক্ত কেবল কি করিয়া ভগবানকে ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, কি করিয়া পবিত্র থাকিবে—এই চিন্তাই কেবল করে। আর কেবল তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করে। জীবনমরণের কথা তাহারা মনেই করে না; সব প্রভুর ইচ্ছা—ইহাই ভক্তের বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, 'যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসবে'—এর অর্থ আমি এই বুঝি যে, যে কায়মনোবাক্যে অন্তরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করে, সেই তাহার ঘরে আসে, আর তাহারই শেষ জন্ম।"[৪১]

'শেষ জন্ম' বিষয়টি বিতর্কিত। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথাতে লিখেছেন : "একদিন এই বহু-বিতর্কিত প্রশ্নটি আমি তাঁকে (মহাপুরুষজীকে) জিজ্ঞেস করেছিলুম—'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে যারা এসেছে, এ-জন্মই তাদের শেষ জন্ম—কথাটি কি সত্য?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সত্য বলেই তাঁরও বিশ্বাস। আমি তর্ক উত্থাপন করে বলেছিলুম যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নির্বাসনা না হলে পুনর্জন্ম এড়ানো যায় না। আর নির্বিকল্প সমাধি-যোগে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন না হলে নির্বাসনা হওয়া সম্ভব নয়। তবে এটি সত্য হবে কিভাবে? মহাপুরুষ মহারাজ তখন বলেছিলেন—'দেখ, আমি পণ্ডিত নই, শাস্ত্রও আমি জানি না। কিন্তু পুনর্জন্মের হেতু কি বল দেখি? অপূর্ণ

৩৯ শিবানন্দ বাণী, ১ম ভাগ, (১৩৯২) পৃঃ ৮৭-৮৮; ৪০ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা, (১৩৬৭) পৃঃ ১১৪-১৫ ৪১ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী (১৩৬০), পৃঃ ১৭৯-১৮০

বাসনাই কি তার হেতু নয়?' আমি বলেছিলুম, 'আজ্ঞে—হ্যাঁ, তাতো বটেই।' 'তবে কল্পনা কর, তোমার মৃত্যুক্ষণটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রশ্ন করছেন—তোমার এমন কোন অপূর্ণ কামনা রয়েছে কিনা যার জন্য আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাও। তখন তুমি তাঁকে কি বলবে?' আমি বলেছিলুম—'বলব, আমার এমন অপূর্ণ বাসনা আছে বলে মনে হয় না, যার জন্য আবার আমাকে পৃথিবীতে আসতে হবে। 'তবে? তাহলে এই তো তোমার শেষ জন্ম। এ নির্বাসনার ভাবটি প্রভুর কৃপায়ই লাভ হয়ে থাকে।'—এ-উত্তর দিয়েছিলেন মহাপুরুষজী।"[৪২]

শেষ জন্ম যার অবিচলিত বিশ্বাস তার। শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করে বলেন : " 'আমার (অর্থাৎ ঠাকুরের) ধ্যান করলেই হবে'—এতে যার বিশ্বাস হয়, সে বেঁচে গেল। জন্ম জন্ম দুঃখভোগ তাকে আর করতে হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার সময় এসেছে, বুঝতে হবে। জন্ম-মরণ-চক্রের অবসান হবে শীঘ্র।... শেষ জন্ম তার, যার ঠাকুরের উপর বিশ্বাস অবিচলিত। ঠাকুর এসেছিলেনই এইজন্য, এই কথা বলতে। বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য, শান্তি-সুখ প্রেম-সমাধি, আমার ঐশ্বর্য।' "[৪৩] একবার স্বামী সুবোধানন্দ জনৈক ভক্তকে চিঠিতে লেখেন : "আমি তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কাছ থেকেই শুনিয়াছি; 'এখানকার হাব, ভাব, চাল, চলন, কথাবার্তা যাদের খুব ভাল লাগবে, তাদের এই শেষ জন্ম।' ...ঠাকুর 'আমি বলিতেছি' এ-কথা ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন, 'এখান থেকে যা বলা হইয়াছে।' "[৪৪]

৪

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন খ্যাতনামা সন্ন্যাসী নানাভাবে শেষ জন্ম সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। স্বামী বিরজানন্দ পরমার্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "যারা সব সময় সব কাজের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ মনন ও তাঁর নাম জপ করে, তাঁকেই একমাত্র সার ও সম্বল বলে জানে, তাদের আপদ-বিপদের সময়ও তাঁকে ভুল হয় না। মৃত্যুকালেও তাঁর চিন্তায় তাদের রোগযন্ত্রণা ভুল হবে, সংসারে ধনজনে আসক্তি দূর হবে, তাঁর ভাবে চিত্ত তদগত হবে।—যাদের শেষ জন্ম তাদেরই এই রকম হয়। তাঁর চিন্তা ও সান্নিধ্যের অভ্যাসের গুণে এটা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়।"[৪৫] আবার বলেছেন : "তবে সে ব্যাকুলতা, সে অনন্যশরণভাব কি সহজে আসে? জন্ম-জন্মান্তর ধরে সাধনভজন করলে সাধকের শেষ জন্মেই তা হয়। নাগমশায়ের জীবনেই এটি সর্বাবস্থায় জ্বলন্তভাবে দেখা গিয়েছিল। সর্বদা কি এক অপূর্ব নেশায় বিভোর—দেহজ্ঞানশূন্য তন্ময় ভাব।"[৪৬]

৫

শেষ জন্ম প্রসঙ্গে আমরা ঠাকুরের উক্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছি। এখন ঠাকুরের

৪২ শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ, ১ম খণ্ড (১৩৭৪), পৃঃ ৩৬; ৪৩ শ্রীম-দর্শন, ৯ম খণ্ড (১৩৭৯), পৃঃ ৭৫
৪৪ উদ্বোধন, ৬৯ বর্ষ, পৃঃ ১৭৫; ৪৫ পরমার্থ প্রসঙ্গ (১৩৯৩) পৃঃ ৩৯; ৪৬ তদেব, পৃঃ ৪৩

একটি দিব্য দর্শন এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করব। শাস্ত্রে আছে এবং লোকপ্রবাদও আছে কাশীতে মরলে শেষ জন্ম অর্থাৎ মুক্তি হয়। কাশীতে নৌকাভ্রমণকালে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে ঠাকুরের একটি দিব্যদর্শন হয় এবং উহা তিনি মথুর প্রভৃতিকে বলেন ঃ "দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতেছেন!—সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে বহুকল্পের যোগ-তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।"

"মথুরের সঙ্গে যে-সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের পূর্বোক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'কাশীখণ্ডে মোটামুটিভাবে লেখা আছে, এখানে মৃত্যু হইলে বিশ্বনাথ জীবনে নির্বাণপদবী দিয়া থাকেন; কিন্তু কিভাবে যে উহা দেন তাহা সবিস্তারে লেখা নাই। আপনার দর্শনেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে উহা কিরূপে সম্পাদিত হয়। আপনার দর্শনাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কথারও পারে চলিয়া যায়।' "[৪৭]

কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং কাশীখণ্ডের বিবরণ প্রসঙ্গে স্বামী অরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের যে-কথা হয়েছিল তা এইরকম ঃ

"মায়ের ওখানে 'কাশীখণ্ড'-পাঠ হইত। সন্ধ্যায় পাঠের পর কথাবার্তা হইতেছে।

"আমি—কাশীতে মলে কি সবারই মুক্তি হয়?

"মা—শাস্ত্রে বলছে—'হয়'।

"আমি—তুমি কি দেখলে? ঠাকুর তো দেখেছিলেন শিব তারকব্রহ্ম-মন্ত্র দেন।

"মা—কি জানি বাপু, আমি তো কিছু দেখিনি।

"আমি—তোমার মুখে না শুনলে বিশ্বাস করিনে।

"মা—ঠাকুরকে বলব, 'ঠাকুর, এ বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে কিছু দেখিয়ে দাও।'...

"পরদিন সকালে খগেন মহারাজ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীতে এতসব দর্শন করেছিলেন, আপনি কি দেখলেন?' উত্তরে মা বলিলেন, 'রাত্রে বিছানায় শুয়ে জেগে আছি, হঠাৎ দেখি যে বৃন্দাবন শেঠের বাড়ির নারায়ণ মূর্তি পাশে দাঁড়িয়ে। মূর্তির গলায় ফুলের মালা পা পর্যন্ত ঝুলছে। ঠাকুর ঐ মূর্তির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। আমি মনে ভাবছি, 'ঠাকুর এখানে কি করে এলেন?' বললুম 'ও বিশ্বাস করতে চায় না।' ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস করবে বই কি, সব সত্য।' (অর্থাৎ কাশীতে মরলে

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব (১৩৭৯) উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৩০

মুক্তি হয়)।...

"সকালে পূজার পর যখন প্রসাদ আনিতে গিয়াছি, পূর্ব দিনের কথা মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বল, কাশীতে মলে মুক্তি হয় কিনা, কি দেখলে'?

"মা—শাস্ত্রাদিতে আছে, আর এত লোক আসছে—মুক্তি হয়। তাঁর শরণাগত যে তার মুক্তি হবে না তো হবে কি?

"আমি—শরণাগত যে তার তো মুক্তি হবেই। যে শরণাগত নয়, ভক্ত নয়, বিধর্মী—এদের মুক্তি হবে কিনা?

"মা—তাদেরও হবে, কাশী চৈতন্যময় স্থান। এখানের সব জীব চৈতন্যময়—পোকাটা মাকড়টা পর্যন্ত। ভক্তাভক্ত, বিধর্মী, যে এখানে মরবে—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত—তারই মুক্তি হবে।

"আমি—সত্য বলছ?

"মা—হাঁ, সত্য বই কি? নইলে আর স্থান-মাহাত্ম্য কি?

"প্রসাদী মিষ্টির গন্ধে আমার হাতে একটি মাছি বসিয়াছিল, সেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই মাছিটারও?'

"মা—হাঁ, মাছিটারও হবে।"[৪৮]

"একবার স্বামী শান্তানন্দ কাশী থেকে কোয়ালপাড়ায় মাকে দেখতে যান। কথায় কথায় তিনি মাকে বললেন ঃ "কাশীতে যারা মরবে বলে যায়—বুড়ীরা, তাদের, মা, বড় কষ্ট। হয়তো বাড়ি থেকে টাকা পাঠাত, বন্ধ করে দিয়েছে। নিচের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়।

"মা—হ্যাঁ, বুড়ীদের খুব কষ্ট দেখেছি, যখন কাশীতে বংশীদত্তের বাড়িতে ছিলুম। সামান্য চাল ভিক্ষে করে এনে হয়তো ভিজিয়েই তা খেয়ে ফেলতো, রাঁধতো না।"

"শান্তানন্দ—বুড়ীরা মরতে গিয়ে আবার দীর্ঘজীবী হয়।

"মা—বিশ্বনাথ-দর্শন-স্পর্শনে পাপক্ষয় হয়, তাতেই দীর্ঘজীবী হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায়ে দেয়; প্রসাদ খাওয়ায় বলে দীর্ঘজীবী হয়।"[৪৯]

স্বামী গিরিজানন্দ 'শ্রীশ্রীমার স্মৃতিকথা'তে লিখেছেন ঃ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে মা যখন কাশীতে যান, তখন মা 'কাশীখণ্ড' শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি পাঠক হইলাম। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয়—এইকথা কাশীখণ্ডে লেখা আছে। একদিন রা—(রাসবিহারী) মাকে বলিল, 'এই যে মাছিটা মরে পড়ে আছে, এটাও কি মুক্ত হলো?' মা জোরের সহিত বলিলেন, 'হাঁ ওটাও মুক্ত হলো?' একদিন আমি মাকে বলিলাম, 'মা, এই যে কাশীতে কত গুণ্ডা রয়েছে, এরা এখানে মরে উদ্ধার হয়ে যাবে—আর অন্যত্র হয়তো একজন তপস্বী সামান্য কামনার জন্য আসবে যাবে, এটা কি ঠিক?' আমি রাজা ভরত ও তাহার মৃগশিশুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম। আরো বলিলাম, 'শঙ্করাচার্য বলেছেন

৪৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ (১৩৭২), পৃঃ ১৪৪-৪৬;

৪৯ তদেব, ১ম ভাগ (১৩৮৪), পৃঃ ২৪১-৪২

জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই মুক্তি হতে পারে না।' মা বলিলেন, 'বাবা, তোমার পড়েছ—ঘুরবে। ঠাকুর আমাদের বলে গেছেন, কাশীতে মলেই মুক্তি হবে। ভগবানের এই তো অহৈতুকী কৃপা। সব জায়গায় সাধন করে মুক্তি হবে। এখানে তিনি বিনা সাধনেই জীবকে মুক্তি দেন।' পরে উপনিষদে ঠিক এইরূপ কথা পাই, 'অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষু উৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ।' (জাবাল উপনিষদ্, ১)—'প্রাণ উৎক্রমণকালে রুদ্রদেব এইখানে জীবকে ত্রাণকারক মন্ত্র দান করেন, ইহা দ্বারা জীব মৃত্যুরহিত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। সুতরাং মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে সর্বদা বাস করিবে। কাশীবাস ত্যাগ করিবে না।' "[৫০]

শাস্ত্রের উক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন প্রভৃতির উপর বাদানুবাদ চলে না। তা অভ্রান্ত সত্য। তবুও অবিশ্বাসী মন সন্দেহের বাতাসে ক্রমাগত দোলায়িত হয়। একবার জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ "কাশীতে মলে শেষ জন্ম আপনি বিশ্বাস করেন?" সাধুটি সুন্দর উত্তর দেনঃ "আমার যদি সে বিশ্বাস থাকত, তবে ত কাশীতে গিয়ে আত্মহত্যা করতুম।" মঠ-জীবনের প্রারম্ভে বিদ্যারণ্য মুনির 'জীবন্মুক্তি বিবেক' খুব পড়তুম এবং কি করে মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান—তিনটি একই সঙ্গে হয় তা নিয়ে খুব চিন্তা করতুম। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে কাশীতে এক প্রবীণ সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ "মহারাজ, বাসনাক্ষয় না হলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, এবং তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া শেষ জন্ম সম্ভব নয়। অথচ শাস্ত্র, ঠাকুর ও মা বলেছেন, 'কাশীতে মলে মুক্তি'। তাহলে শাস্ত্র পড়া নিরর্থক। বেদান্তাদি শাস্ত্র গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে কাশীবাসী হওয়াই ঠিক।" সাধুটি তো আমার উপর ভয়ানক রেগে গেলেন। তিনি বললেনঃ "আমরা বৃদ্ধেরা ঐ ভরসায় মৃত্যুর জন্য বসে আছি, আর তুমি ছোকরা এসে আমাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাও?" আমি বললুমঃ "না মহারাজ। আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রজ্ঞ সাধু। আমি আপনার কাছে সত্য জানতে চাই।" তিনি তখন শান্তভাবে বললেনঃ "তুমিও ঠিক, আমিও ঠিক—অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না, আবার কাশীতে মলে মুক্তি হয়।" আমি বললুম—"দুজনে কি করে ঠিক হবে?" তিনি একটু হেসে বললেনঃ "বাবা বিশ্বনাথ শেষকালে জ্ঞানটি দিয়ে দেন।" জনৈক সাধু একবার মহাপুরুষ মহারাজকে কাশীতে বাসের অনুরোধ করায় তিনি বলেনঃ "আমাদের বাবা, সকল জায়গাই কাশী; যেখানে যে-অবস্থায়ই শরীর যাক না কেন, সবই কাশীপ্রাপ্তি।... যার হৃদয়ে সেই বিশ্বনাথ ঠাকুর বিরাজ করছেন, তাঁর হৃদয়ই তো কাশী।"[৫১]

৬

বর্তমান নিবন্ধটিতে আমি নানা উদ্ধৃতি দিয়ে ঠাকুরের 'শেষ জন্ম' কথাটির তাৎপর্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি। ঠাকুরের প্রতিটি কথা যে কী গভীর, বিশাল ও

৫০ উদ্বোধন, ৩৯ বর্ষ, পৃঃ ৬৪৬-৪৮ (জাবাল উপনিষদে কাশী নয়, কুরুক্ষেত্রপ্রসঙ্গে এ-কথা বলা হয়েছে)
৫১ শিবানন্দ বাণী, ১ম ভাগ (১৩৯২), পৃঃ ৫৪

ভাবোদ্যোতক—তা বুঝবার জন্য এই প্রয়াস। স্বামীজী একবার তাঁর বন্ধু হরমোহনকে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" স্বামীজী তিনদিন ধরে 'হাতী-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ' গল্পটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত অবলম্বন করে নানাবিধ বিচার, ব্যাখ্যা, তাত্ত্বিক আলোচনা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ইত্যাদি শুরু হয়ে গেছে; এবং ভবিষ্যতে নানাবিধ ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনীও লেখা হবে।"

ইতির পরে থাকে পুনশ্চ। তাই উপসংহারে আরও দু-চারটি কথা বলে লেখাটি শেষ করব। ঠাকুরের কথাটি আবার উদ্ধৃত করছি—"যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে।" এই 'এখানে' কথাটি সত্যই বিতর্কমূলক। 'এখানে' মানে সোজা কথায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট'। এখন তিনি যখন মরজগৎ থেকে অন্তর্হিত হলেন, তখন 'এখানে' বলতে কি বুঝব? 'এখানে' মানে এখানকার অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রভাবে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম। আবার প্রশ্ন উঠবে ঃ শিক্ষার প্রভাবে এলেই শেষ জন্ম? উত্তর—শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তির 'ছাঁচ' তৈরি করে রেখে গেছেন। গলিত তরল পদার্থ যেমন ছাঁচে পড়ে সেই আকারে আকারিত হয়, তেমনি, মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে জীবন গঠন করলে শেষ জন্ম বা মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

শেষ জন্ম প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

মযি এব মন আধৎস্ব মযি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মযি এব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥[৫২]

—হে অর্জুন, তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থির কর। তাহলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধব্রহ্মে) অভেদভাবে স্থিতি করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন শ্রীকৃষ্ণের এই 'ময়ি' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 'এখানে' শব্দ দুটিকে আমরা একার্থক রূপে মনে করতে পারি। শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যে 'ময়ি'-র অর্থ করেছেন 'বিশ্বরূপ ঈশ্বরে'। স্বামী কৃষ্ণানন্দ তাঁর 'সন্দীপনী-তে (১২/৮) বিষয়টিকে আর একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ "সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা-পরায়ণ সাধকগণ দেহান্তে ইষ্ট দেবের কৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ লাভ করেন। 'দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে' (নৃসিংহ পূর্বতাপনী উপনিষদ্' ১/৭) এইরূপে সগুণব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সাধক ইহলোকেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া দেহান্তে একেবারেই বিদেহকৈবল্যভাগী হয়েন।" এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা থেকে অনুমিত হয় যে অবতারকে মনে প্রাণে ধরতে পারলে শেষ জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

---

৫২ গীতা, ১২/৮

ভগবান কৃষ্ণের নিজমুখের কথা ঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥[৫৩]

—"যে মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে আমাকে লাভ করে (অর্থাৎ অমর হয়), এতে কোন সন্দেহ নেই।" এখন ধরা যাক, কোন ভক্তের জীবদ্দশায় অনেক কামনা-বাসনা ছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে সে অনন্যমনে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগল। অবশ্য সাধন ভজন না থাকলে মৃত্যুকালে ভগবৎ চিন্তা মনে উঠে না। যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ তার সামনে উপস্থিত হলে সে কি চাইবে? সে কি বলবে—"ঠাকুর, গাড়ি বাড়ি দাও, অর্থ দাও, যশ দাও, রূপ-যৌবন দাও, স্ত্রী-স্বামী-পুত্র-পরিবার দাও"? তার মন তখন বিষয়ানন্দ ছেড়ে ঈশ্বরানন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় রূপ তার সব বাসনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। মন শুদ্ধ হয়ে 'পরাং শান্তিং' লাভ করবে। এই হবে তার শেষ জন্ম।

৫৩ তদেব, ৮/৫

রহস্যময় কল্পতরু

পয়লা জানুয়ারি। কল্পতরুর মেলা বসেছে। চারদিকে হৈ-চৈ। ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে বাসনা পূরণ করতে এসেছে মানুষ বহু দূর থেকে। মেলার মাঠের এক কোণে এক বিরাট আমগাছ। সেই গাছের তলায় বসে এক ভূয়োদর্শী কথক কল্পতরুর ইতিকথা বলে চলেছেন। তাঁর কেশ শুভ্র, বর্ণ গৌর, চর্ম কুঞ্চিত, গলায় কণ্ঠি, মুখে মধুর হাসি।

কথক গল্প শুরু করলেন ঃ

আজকের প্রসঙ্গ—রহস্যময় কল্পতরু। এ এক অচিন গাছ। কেউ দেখেনি। তবে লোকে শুনেছে—এ গাছের কাছে যে যা চায় তাই পায়। এ এক মজার ব্যাপার। বছরে একদিন এ সুযোগ আসে। সারা বছর মানুষ ঐ দিনটির জন্য আশায় বুক বেঁধে বসে থাকে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টার বুকে জেগেছিল বাসনা। তিনি বাসনা নিয়ে বহুভাবে লীলা করে মানুষকে দিলেন সেই চঞ্চলা বাসনা। আর নিজে রইলেন 'অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম' হয়ে। মানুষকে বললেন, "এবার তোমরা, বাসনা নিয়ে খেল। খুব মজা পাবে। আমি নিজের জন্য একটুও বাসনা রাখলাম না, সব তোমাদের দিয়ে ফতুর হলুম। আমি যদিও বাসনাশূন্য তবুও আমি বাসনার ঈশ্বর। আমি কল্পতরু।"

বাসনা মায়াবী, ছলনাময়ী। তার আদি নেই, অন্ত নেই। মানুষ বৃদ্ধ হলেও সে বৃদ্ধ হয় না। সে চির যৌবনা। সে তুফানী। সে মানবমনে তুফান তুলে হেলে দুলে নাচতে ভালবাসে। বাসনা-মদিরা পান করে মানুষ কেবল বলে—দাও আরও দাও। রূপযৌবন দাও। টাকাকড়ি দাও। বাড়িগাড়ি দাও। ভোগ্যবস্তু দাও। নীরোগ শরীর দাও। মনোরমা ভার্যা দাও। রূপবান স্বামী দাও। সুখ দাও। সন্তান দাও।

বাসনার ফর্দ নিয়ে মানুষ যায় মন্দিরে। দেখ গিয়ে তারকেশ্বরে। শিবের মন্দিরের চারিদিকে ঝুলছে ইট-পাথরের ডেলা। এগুলি আর্ত ও অর্থার্থীর প্রার্থনা। গলায় দড়ি দিয়ে দুলছে। মন্দিরের পাথুরে মেঝেতে দুমদাম মাথা ঠোকাব শব্দ হচ্ছে। ওসব চণ্ডীর নীরব মন্ত্র—'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি!'

এ-কথা বলে কথক গল্পরতা দুই আধুনিকার দিকে তাকিয়ে একটু কটাক্ষ করলেন।

কল্পলতা—এই হেমা, চল এখান থেকে। ঢের হয়েছে। আমরা সাধারণ সংসারী, আর কামনাবাসনা নিয়েই মানুষের জীবন। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন—ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে চাইতে হয়। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তাঁর কাছে চাইব ছাড়া কি বামুনপাড়ার লোকের কাছে চাইব? চল ঐ প্যাণ্ডেলে গিয়ে একটু কীর্তন শুনি।

হেমাঙ্গিনী—বোস না রে আর একটু। কীর্তন তো অনেক শুনেছি। আজ বিশেষ দিনে

একটু রহস্যময় কল্পতরুর কথা শোনা যাক।

কথক—এ-কথা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ভগবান কানখড়কে। সব শোনেন। তাঁর কাছে যে যা আন্তরিক প্রার্থনা করে সে তাই পায়। আবার সাবধান করে দিয়েছেন, কল্পতরুর কাছে যা তা চাইলে বিপদে পড়তে হবে।

একবার এক পথিক মরুপথে চলতে চলতে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথ পার্শ্বে একটা গাছ দেখে সে বসে পড়ল।

সে ভাবতে লাগল ঃ এ সময় কেউ যদি একটু ঠাণ্ডা জল ও খাবার দেয় তবে প্রাণটা বাঁচে। অমনি একটা লোক জল ও খাবার এনে দিল। পথিক খুব খুশি। তার পা দু-খানি ব্যথায় টনটন করছিল। তার মনে জাগল—এ সময় যদি কোন নারী এসে একটু পা টিপে দেয় তো একটু সুখে নিদ্রা যাই। ক্লান্তিটাও চলে যাবে। অমনি এক যুবতী এসে তার পদসেবা করতে শুরু করল। পথিক আনন্দে আটখানা। এ তো তাজ্জব ব্যাপার। যা ভাবি তাই এসে যাচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—এ সময় যদি একটা বাঘ এসে পড়ে তা হলে কি হবে? অমনি একটা বাঘ এসে পথিককে খেয়ে ফেলল।

এসব রহস্যময় কল্পতরুর খেলা। সংসারী মানুষ ঈশ্বরের কাছে বিষয়, ধন, জন, মান, যশ চাইছে এবং পাচ্ছে; কিন্তু শেষে রয়েছে বাঘের ভয় অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান, দুশ্চিন্তা। চিতা মানুষকে একবার পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা অহরহ দগ্ধ করে।

নিখিলবাবু কথকের কথা অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিলেন। তিনি বই খুলে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়ার কাহিনীটা একটু ঝালাই করে নিচ্ছিলেন। তাঁর মনে উঠল—আজকের এই শুভ দিনে ঠাকুর বলেছিলেন, "চৈতন্য হোক।" তাতে কত লোকের ভাব, সমাধি, দর্শন হয়েছিল। আজ যদি রহস্যময় কল্পতরুর কাছে 'অহর্নিশ ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ' হবার ইচ্ছাটা প্রকাশ করি তো বেশ হয়।

কথক—শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমাধির যাদুকর। নিজে তিনি দিন-রাত ভাবে গর্গর মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন এবং কেউ চাইলে স্পর্শ দ্বারা বা জিভে মন্ত্র লিখে সমাধি করিয়ে দিতে পারতেন। সাধারণ সাধক নিজে অনুভব করেন, কিন্তু অপরকে অনুভূতি করিয়ে দিতে পারেন না।

মথুর একদিন আব্দার করে ঠাকুরের কাছে ভাবসমাধি চায়। ঠাকুর বললেন—তুমি তো বেশ সেবা করছ এবং মায়ের পাদপদ্মে ভক্তিও আছে। ঐ নিয়ে থাক।

মথুর নাছোড়বান্দা। শেষে কয়েকদিন পর তার ভাব হলো। তার চোখ দু-টি জবাফুলের মতো লাল হলো, বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কান্না। সে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে রইল। যেন ভূতে পেয়েছে। কাজকর্ম কিছুই করতে পারল না অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে ধরে বলল, "বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাইনে!" ঠাকুর বুকে হাত বুলিয়ে ভাব প্রশমন করে দিলেন।

হৃদয়ও সমাধি চেয়ে বিপদে পড়েছিল। সেও ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীতে চিৎকার শুরু করল—"ও রামকৃষ্ণ, তুইও যা আমিও তাই। চল দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করে আসি।"

ঠাকুর দেখলেন হৃদয় বড় বাড়াবাড়ি করছে। তখন তার বুকে হাত দিয়ে বললেন, "মা দে শালাকে ঠাণ্ডা করে।" হৃদয় চুপ হয়ে গেল।

আর একবার একটি ভক্তের জিভে ঠাকুর কী লিখে দেন। সে ভাবস্থ হয়ে মাতালের মতো 'মা মা' করতে থাকে। ঠাকুর তাকে লোক দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। তার বৌ তো ক্ষেপে আগুন। "ওগো, কাদের সঙ্গে মদ খেয়ে মতিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। মাতাল। কথা বলে না। ওগো, একে, কে ওষুধ, গুণ করেছে গো! খেতে দিলেও খায় না। কি হবে গো? ছেলে পুলে নিয়ে আমি কি করব গো?"

খবর নিয়ে মহিলা জানল এ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের। অমনি সে কোমরে কাপড় জড়িয়ে একজন সঙ্গী নিয়ে ছুটল দক্ষিণেশ্বরে! "কৈ গো, পরমহংস কোথায়?" বলে সে ঠাকুরের কাছে হাজির। সে আর্তনাদ করে বলল, "ওগো, তুমি আমার স্বামীকে কী করে দিয়েছ? আমি এখন ছেলে পুলে নিয়ে কি ভেসে যাব?"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর সব শুনে বললেন, " আচ্ছা, তোমার স্বামীকে এখানে একবার আনতে পার?" মহিলা তখুনি স্বামীকে নিয়ে এল।

"হুঁ মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা জিভ দেখি।" এ-কথা বলে ঠাকুর তার জিভে কী লিখে দিলেন, অমনি সে প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল।

সমাধি সহ্য করবার শক্তি কোথায়? কল্পতরু দিবসে ঠাকুর একজনকে স্পর্শ করা মাত্র তার শরীর বেঁকে গিছল।

এসব দেখে শুনে সমাধির বাসনা আসে কি?

একটু পরে আমতলায় এসে বসলেন তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ। পরণেঁ তাঁর লাল চেলি, মাথায় ঝাঁকালো চুল, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখ দু-টি গঞ্জিকার কৃপায় রক্তাভ। ইনি কাশীপুরের শ্মশানে থাকেন। মহানিশায় জপ করেন। ভিতরে ভিতরে একটু সিদ্ধাই-এর বাসনা। অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির একটা পেলেও বেশ তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। নামযশে বুকটা উঁচু হয়।

কথক—আমাদের শাস্ত্র বলছেন, "অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং ঘোর রৌরবং, প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।"—অর্থাৎ হে মানুষ যদি সুখী হতে চাও তবে অভিমান, আত্মপ্রশংসা, নামযশ ত্যাগ কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধাইকে বড়ই ঘৃণা করতেন এবং উহা যোগের বিঘ্ন বলে সাধককে সাবধান করেন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—সিদ্ধাই "এক পয়সার বিদ্যা" ও বিষ্ঠাতুল্য।

আপনাদের অবশ্যই মনে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিকগুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর চন্দ্র নামে একটি শিষ্য ছিল, সে গুটিকা সিদ্ধি লাভ করেছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করে সে অদৃশ্য হয়ে দুর্গম স্থানে গমনাগমন করতে পারত। পরে তার কাম-কাঞ্চনে আসক্তি বেড়ে যায়। সে এক ধনীর যুবতী কন্যার প্রেমে পড়ে; এবং সিদ্ধাই-এর দ্বারা সে মেয়েটির ঘরে গোপনে যাতায়াত শুরু করে। শেষে অকার ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধির ফলে ঐ শক্তি চলে যায়। সে ধরা পড়ে এবং দারুণভাবে লাঞ্ছিত হয়।

পরমহংসদেব আমাদের একটা সুন্দর প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছেন "মা, দেহসুখ চাই না। লোকমান্যি চাই না। অষ্টসিদ্ধি চাই না। শতসিদ্ধি চাই না। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি চাই। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।"

সব শুনে ভৈরবানন্দ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগলেন।

বরানগরের মৃন্ময় বি. এ. পাশ করে বসে আছে। বেকার। আজ বিশেষ দিনে ঠাকুরের কাছ থেকে একটা চাকুরি চেয়ে নিতে এসেছে কাশীপুরে। দারুণ ভিড়। মন্দিরে ঢোকার লাইন রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। রোদ্দুর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সে-ও আমতলায় গিয়ে বসল। কথকের 'রহস্যময় কল্পতরু'র ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তার মনে পড়ল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত সোনা তৈরির কিমিয়া বিদ্যার কথা। হঠাৎ সেই সুপ্ত বাসনাটা সোনালী স্বপ্নের মতো মৃন্ময়ের মনে ঝিলিক দিয়ে জাগল।

কথক—লোকে রহস্যময় কল্পতরুর কাছে এসে বলে—'ধনং দেহি।' সোনা, রূপা, টাকা দাও।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে পাঠকের মনে জাগে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী 'কিমিয়া বিদ্যা' জানতেন; যার দ্বারা তিনি সোনা তৈরি করতে পারতেন। তোতা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়েছিলেন কি না জানা নেই, তবে তিনি একবার তাঁর ভাইপো রামলালকে বলেছিলেন, "ওরে যদি জানতুম জগৎটা সত্যি, তবে তোদের কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম।"

লোভী মানবমনে ইচ্ছা জাগে ঠাকুরের কাছ থেকে যদি সোনা তৈরির ফিকিরটা জানা থাকত তাহলে দিব্যি রাতারাতি ধনী হয়ে যাওয়া যেত। সংসারের অভাব অনটন চিরদিনের মতো চলে যেত।

এই প্রসঙ্গে গ্রীক দেশের একটা প্রাচীন উপকথা মনে পড়ে। মাইডাস (Midas) নামে একজন স্বর্ণলোভী ব্যক্তি ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল ধন দৌলতই আনন্দের উৎস। সে দিবানিশি সোনার সন্ধানে ঘুরত, সোনার স্বপ্ন দেখত, সোনা সঞ্চয় করত। তার মন সোনার ধ্যানে এত তন্ময় হয়ে গিছল যে, বিত্তদেবতা তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলেন। মাইডাস বলল, "প্রভু, এই বর দিন, আমি যা ছোঁব তা যেন সোনা হয়ে যায়।" "তথাস্তু" বলে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

তার পরদিন সকালে মাইডাস আনন্দে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে টুথ ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজতে গেল। স্পর্শ মাত্র ব্রাস সোনা হয়ে গেল। মুখ ধোয়া হলো না। মাইডাস তো আনন্দে আত্মহারা। সে ঘরের যাবতীয় বস্তু ছুতে লাগল এবং সব সোনা হয়ে গেল।

তারপর মাইডাস ব্রেকফাস্ট খেতে গেল। আঙুর, টোস্ট, ডিম, কফি ছোঁয়া মাত্র সোনা হয়ে গেল। সে বিরক্ত বোধ করতে লাগল। পেটে ক্ষুধা অথচ খাবার উপায় নাই, এ তো বড় জ্বালা। সে ভাবল একটু বাগানে বেড়ানো যাক। শিশিরস্নাত গোলাপের পাপড়িগুলোর ওপর হাত বোলাতেই সেগুলো সোনা হয়ে গেল। ফুলগুলি গন্ধ ও সৌন্দর্য হারাল। সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পায়চারি করতে লাগল। এমন সময় তার ছোট্ট মেয়েটি আনন্দে

ছুটতে ছুটতে তার কাছে এল। কন্যা-স্নেহে আত্মভোলা হয়ে যেই সে দুহাতে তাকে কোলে তুলে নিতে গেল, অমনি মেয়েটি প্রাণহীন সোনা হয়ে গেল। উঃ, আর না! মাইডাস চিৎকার করে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলল, "হে ভগবান, ফিরিয়ে নাও তোমার বর।"

মৃন্ময় উঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়াল।

কথক—ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। যারা ঐশ্বর্য চায় তারা ঐশ্বর্য পায়, কিন্তু ঈশ্বরকে পায় না। আর যারা ঈশ্বরকে চায় তারা ঈশ্বরকে পায়, এবং ঈশ্বরও কল্পতরু হয়ে তাদের যা প্রয়োজন জুটিয়ে দেন। ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন গীতাতে, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

বিষয়মুগ্ধ মানুষকে রহস্যপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ 'মরা' মন্ত্র জপ করতে বলেছেন। 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর 'রা' অর্থাৎ জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য। কি করলে 'মরা' মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে? রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ উপায় বলে দিয়েছেন, "যো সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক, পগার ডিঙিয়েই হোক, কোন মতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়! আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজেই হয়ে যাবে। আবার বাবুর সঙ্গে দেখা হলে আমলারাও মানে।"

ঠাকুর জানতেন জগতের অধিকাংশ মানুষ অর্থের দাস, ধনের কাঙাল। তাই তিনি ঐ অর্থলোভীদের সামনে তাঁর প্রিয় ভক্ত কলকাতার কোটিপতি যদু মল্লিকের উপমা দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কথক বাসনার জালে বদ্ধ মানুষদের একটা হিন্দী দোঁহা বলে কথা শেষ করলেন ঃ

চাহী চামারী তুহী সব নীচ্ উনকো নীচ্।
ইয়ে তু পূরণ ব্রহ্ম থা যব তু নেহী হোতী বীচ্।

অর্থাৎ হে বাসনা, তুই চামারনী; তুই অস্পৃশ্য নীচ। আমি ছিলুম পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু তোর সংস্পর্শে এসে আমার এই অধোগতি।

অদূরে এক উদাসী সাধু কথকের কল্পতরুর রহস্যকথা শুনছিল। তার মনেও আজ দ্বিধা। কি চাইব? শান্তির জন্য সে ঘুরছে আখড়ায় আখড়ায়, মঠে আশ্রমে, উত্তরাখণ্ডের জঙ্গলে পাহাড়ে। তার মনে পড়ল জীবনের প্রারম্ভে সে জিজ্ঞাসা করেছিল এক বৃদ্ধ সাধুকে, "সাধুজী, ঘরবাড়ি ছাড়লাম। কিন্তু কিছুই তো হলো না।" বৃদ্ধ সাধু—"বাবা, তুমি কল্পতরুর নিচে এসেছ। ঐ বৃক্ষে অজস্র ফল ঝুলছে। একদিন না একদিন ঐ ফল পড়বেই পড়বে। তবে যদি ঐ ফল এখুনি চাও তবে Shake the tree Shake the tree—অর্থাৎ ঐ গাছে দারুণ ঝাকুনী লাগাও। তীব্র পুরুষকার প্রয়োগ করলে মুক্তিরূপ ফল পাওয়া যায়।"

সন্ধ্যার দীপ জ্বলেছে। আরতির ঘণ্টা বাজছে। আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উদাসী সাধু ভাবছে ঠাকুরের কথা "তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও।" কতদিন চলে গেছে। এখনো অমৃত ফলের পসরা সাজিয়ে বসে আছেন সেই রহস্যময় কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ।

পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ শিষ্য

অবতারের 'মিশন'

স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ-রূপ ধারণ করে মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'অবতার'। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় তাঁর অবতরণের প্রধান কারণ। বিষ্ণুপুরাণে আছে ঃ

"স্বধর্মকর্মবিমুখাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাদিনঃ।
তে হরের্দ্বেষিণো মূঢ়া ধর্মার্থং জন্মতে হরিঃ।।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যেমন একই চাঁদ আকাশে বারবার ওঠে, তেমনি একই ঈশ্বর বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন যুগপ্রয়োজনে আবির্ভূত হন। অবতার একা আসেন না। তিনি তাঁর 'মিশন' পূর্ণ করবার জন্য সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে আসেন। তাঁরা সাধারণ মানুষ নন —তাঁদের কেউ ঈশ্বরকোটি, কেউ নিত্যমুক্ত। মানুষের কল্যাণে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন।

পৃথিবীতে তিনটি ধর্ম মিশনারি—বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল মৈত্রী ও ভালবাসার দ্বারা, আর খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামধর্ম বলপ্রয়োগ করে বিস্তারলাভ করেছিল।

বুদ্ধ মর্তলীলা সাঙ্গ করে যখন মহাপরিনির্বাণলাভের সঙ্কল্প করলেন, তখন তাঁর শিষ্যেরা কাঁদতে শুরু করলেন। অনুরুদ্ধের অনুরোধে আনন্দ বুদ্ধকে চারটি শেষ প্রশ্ন করেন ঃ ১) বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর শিক্ষাসূত্রগুলি যখন গ্রথিত হবে, তখন সেগুলি যে বুদ্ধের তা কিভাবে নির্দেশ করা যাবে? বুদ্ধ ঃ "এই চারটি শব্দ ব্যবহার করবে— 'Thus I have heard' (আমি এরূপ শুনেছি)।" ২) আপনার দেহত্যাগের পর আমরা কোথায় বাস করব? বুদ্ধঃ "এই চারটি মননক্ষেত্রে বাস করবে—শরীর অশুদ্ধ, অনুভবগুলি দুঃখপূর্ণ, চিন্তাগুলি অস্থায়ী, ধর্মগুলি অনাত্মা।" ৩) আপনার অবর্তমানে আমাদের শিক্ষক কে হবেন? বুদ্ধ ঃ বিনযপিটক—আমার শিক্ষাগুলি। ৪) আপনি চলে গেলে এই দুষ্ট সাধুগুলিকে কে শাসন করবে? বুদ্ধ ঃ "এ তো খুব সোজা ব্যাপার। তাদের সঙ্গে কথা বলো না, উপেক্ষা করবে। তাহলে তারা আপনা-আপনি চলে যাবে।" বুদ্ধের 'মিশন' অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

যীশুর জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। মাত্র ৩৩ বছর। যীশুর শিষ্যেরা তাঁদের গুরুর কার্যাবলীর সাক্ষী ছিলেন। তাঁরা দেখেছেন যীশু কিভাবে অসুস্থকে সুস্থ, মৃতকে জীবিত করেছেন, জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছেন, জলের ওপর দিয়ে হেঁটেছেন এবং মুখের কথায়

ঝড় থামিয়েছেন। তিনবছর প্রচারের পর যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন।

সেই যীশুর অন্তর্ধানের দুই মাসের মধ্যে পিটার ও অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে নব উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। তাঁরা তাঁদের গুরুর 'মিশন'—প্রেম, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা প্রচার শুরু করলেন। যে-পিটার প্রাণভয়ে যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তিনি নির্ভয়ে জেরুজালেমে বললেন ঃ "হে ইজরায়েলবাসিগণ, ন্যাজারাথের যীশু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাঁর দৈবী শক্তি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছ। তারপর তোমরা তাঁকে নির্মমভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছ।" জনতার মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে পিটার বললেন ঃ "তোমরা অনুতপ্ত হয়ে খ্রীস্টের নামে দীক্ষিত হও। এর ফলে তোমরা পাপমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে।" পিটারের এই প্রথম বক্তৃতায় ৩০০০ লোক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলো। এভাবে যীশুর 'মিশন' চলল।

যীশুর শিষ্যেরা তাঁদের গুরুর পুনরভ্যুত্থানের সাক্ষী। তাঁদের ভিতর ঐশী শক্তি ভর করে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু করল। একদিন পিটার ও জন মন্দিরে ঢুকছিল, তখন একজন জন্মাবধি খঞ্জ ব্যক্তি পিটারের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিটার তাকে বললেন ঃ "সোনারূপা আমার নেই। আমার যা আছে, তা তোমাকে দিচ্ছি। ন্যাজারাথের যীশুখ্রীস্টের নামে তুমি ওঠ ও হাঁটতে শুরু কর।" সঙ্গে সঙ্গে লোকটির খঞ্জত্ব সেরে গেল। সে হেঁটে মন্দিরে ঢুকল। লোকেরা যীশুর শিষ্যদের শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো শিষ্যদের ওপর অত্যাচার।

অবতারের বাণী বহন করা খুবই কঠিন। অবতারের জীবন ও বাণী অধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান। তাই অবতারের শিষ্যেরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যান এবং ভণ্ড, দুষ্ট, স্বার্থান্বেষীদের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করে ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন।

বুদ্ধের এক উৎসাহী তরুণ শিষ্য তাঁর প্রতিবেশীদের বৌদ্ধধর্মে আনবার অনুমতি চাওয়ায় বুদ্ধ বলেন ঃ "আমি শুনেছি, সুরাপরন্তের লোকেরা বড় দুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী। তারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করলে কি করবে?" "আমি চুপ করে থাকব।" "তারা যদি তোমাকে ধরে মারে?" "আমি তাদের মারব না।" "যদি তোমাকে বধ করার চেষ্টা করে?" শিষ্য উত্তর দিল ঃ "মৃত্যুর হাত এড়াবার উপায় নেই। অনেকে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করব না। মৃত্যুকে ডেকে আনব না, আর এলে বারণও করব না।" বুদ্ধ খুশি হয়ে প্রচারে অনুমতি দিলেন।

যীশু শিষ্যদের প্রচারে পাঠাবার আগে বলেছিলেন ঃ "সঙ্গে টাকাকড়ি নিও না। অতিরিক্ত জামাকাপড়, জুতো, ছড়ি ও ঝুলি নিও না। তোমাদের যা প্রয়োজন ভগবান দেবেন।... শোন, মেষ যেমন নেকড়ে বাঘের সামনে যায়, আমি তেমনি তোমাদের দুষ্টলোকদের মধ্যে পাঠাচ্ছি। সাপের মতো সতর্ক ও ঘুঘুর মতো নম্র থাকবে। তোমাদের আটক করে বিচারালয়ে নেবে, কশাঘাত করবে।... ভয় পেও না। তারা তোমাদের দেহ

ধ্বংস করলেও কিন্তু আত্মাকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

অবতাররূপী ঈশ্বরের শক্তি তাঁর শিষ্যদের ভর করে কাজ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব শিষ্যদের ভিতর কমবেশি শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিশন' এত ব্যাপক ও গভীর, যা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। তবে তাঁর মূল শিক্ষাগুলি ছিল ঃ মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, ত্যাগ ও সেবা, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-যোগের সমন্বয়, সর্বধর্মসমন্বয় এবং কর্মজীবনে বেদান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তাঁদের গুরুর 'মিশন' লোকসমক্ষে প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, লোকশিক্ষা দিতে গেলে 'চাপরাস' দরকার; নতুবা লোক গ্রহণ করবে না। ঠাকুর কাশীপুরে এক টুকরো কাগজে লিখেছিলেন ঃ "নরেন শিক্ষে দিবে।" তিনি নরেন্দ্রের ভিতর শক্তিসঞ্চার করে বলেছিলেন ঃ "তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফতুর হলুম।" শ্রীমকেও বলেছিলেন ঃ "তোমাকে ভাগবত শোনাতে হবে।"

কাগজ-কলমে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম ১ মে ১৮৯৭ কলকাতার বলরাম-ভবনে লিপিবদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে মিশনের জন্ম দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাঁর মিশনের রূপরেখা নিজেই তৈরি করেন সকলের অজান্তে এবং কাশীপুরে তার বাস্তব রূপ দেন শিষ্যদের গেরুয়াবস্ত্র দান করে। তিনি জানতেন যে, এই ত্যাগী শিষ্যরাই তাঁর 'মিশন' সারা পৃথিবীতে বহন করে নিয়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে বলেন ঃ "দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কী ভক্তি!"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি-পথে পাশ্চাত্য দেশে গেছেন এবং সে-কথা রামলাল-দাদা ও অন্যান্য শিষ্যদেরও বলেছেন। আমেরিকায় শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তদের বলেন ঃ "আমাদের ঠাকুর আমাদিগকে বলেছিলেন যে, তাঁর অনেক ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চালচলনও ভিন্ন। তারাও আমার পূজা করবে। তারাও মায়ের সন্তান।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ

(পাশ্চাত্যে প্রায় ৫ বছর ঃ জুলাই ১৮৯৩ থেকে ডিসেম্বর ১৮৯৬, জুলাই ১৮৯৯ থেকে নভেম্বর ১৯০০)

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজে স্বামীজী একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, ঠাকুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং তাঁকেও যেতে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ "যাও।" স্বপ্নটির যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্য স্বামীজী কলকাতায় শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) লেখেন ঃ "দ্যাখ শরৎ, আমার একটা 'ভিশন'

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪০১, পৃঃ ৩০১
২ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৯৩, পৃঃ ১০১

হয়েছে—ঠাকুর আমাকে আমেরিকায় যেতে বলছেন। কিন্তু আমি মনস্থির করতে পারছি না। তুই মাকে (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী) সব বিষয় জানাবি এবং এ-ব্যাপারে ওঁর কি মতামত জানাবি।" শরৎ মহারাজ মাকে চিঠিটা শোনান এবং দুদিন পরে মা শরৎ মহারাজকে বলেন : "নরেনকে যেতে লিখে দাও।"[৩]

বিবেকানন্দ প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিশন' বহন করে গেলেন পাশ্চাত্যে। তিনি প্রায় ৫ বছর (জুলাই ১৮৯৩ থেকে ডিসেম্বর ১৮৯৬ এবং জুলাই ১৮৯৯ থেকে নভেম্বর ১৯০০) আমেরিকা ও ইউরোপে সর্বজনীন বেদান্তধর্ম প্রচার করলেন। বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পৃথক নয়। স্বামীজী ঠাকুরকে "বেদমূর্তি"-রূপে বর্ণনা করেছেন। ১৮৯৪ সালে স্বামীজী আমেরিকায় বলেন : "পাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটা বাণী আছে, যেমন প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধের একটা বাণী ছিল।" এ-বাণী বেদান্তের বাণী—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। স্বামীজীর পাশ্চাত্যে প্রচারকাহিনী মেরী লুইস বার্ক (সিস্টার গার্গী) 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries' গ্রন্থের ছয়টি খণ্ডে বিশদভাবে লিখেছেন। স্বামীজীকে ঠাকুরের 'মিশন' বহন করতে গিয়ে কত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, অপমানিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে, অনাহারে-অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে! তাঁর অদ্ভুত পোশাক দেখে লোকে ধাক্কা মেরেছে, ঢিল ছুঁড়েছে; এমনকি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন পাশ্চাত্যে কত ভারতীয় যোগী, গুরু, 'বাবা', 'মা' বিনাবাধায় ধর্মপ্রচার করছেন; কিন্তু এ-ব্যাপারে বিবেকানন্দ ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি গোঁড়া খ্রীস্টানদের দেশে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির জন্য জীবনপণ করে খেটেছেন। তিনি ভাবীকালের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের কর্মপ্রণালী সুগম করে দিয়ে গেছেন। বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী রবার্ট ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলেছিলেন : "পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হইত বা পুড়াইয়া মারা হইত। এমনকি আরও কিছু পরে আসিলেও আপনাকে ঢিল মারিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত।"[৪]

শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে অন্যান্য প্রতিনিধিরা যে যাঁর নিজের ধর্মের মহিমা কীর্তন করেন, কিন্তু স্বামীজী সকল ধর্মের গৌরব ঘোষণা করে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার কলুস আবহাওয়া সরিয়ে স্নিগ্ধ, সতেজ, সর্বজনীন ভাব বিস্তার করেন। পরবর্তী কালে একজন ইহুদি পণ্ডিত স্বামী নিখিলানন্দকে বলেছিলেন : "After hearing Swami Vivekananda [in the Parliament] I realized that my religion was also true."[৫] স্বামীজীর মুখে পৃথিবীর লোক শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের নতুন বার্তা শুনল।

পাশ্চাত্যে খ্রীস্টধর্মের আদিম পাপবাদ মানুষকে ছোট, অপরাধী, পাপী করে দিয়েছে;

---

৩ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ—স্বামী ওঁকারানন্দ, পৃঃ ১২৭

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৯, পৃঃ ৯২

৫ Vivekananda Centenary Volume, p. 170

সেখানে স্বামীজী তাদের "অমৃতের সন্তান" বলে সম্বোধন করে দেবত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কোন মানুষকে মেরে ফেলা সোজা, কিন্তু কারও মনের সন্দেহ ও জন্মগত পাপবোধ সরানো খুবই কঠিন। অন্যান্য প্রচারকদের মতো স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদের তোষামোদ করে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ "I am a plain-spoken man, but I mean well. I want to tell you the truth. You are my children. I want to show you the way to God by pointing out your errors. Therefore, I do not flatter you, or always say fine things about your civilization."[৬]

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'বিবেকানন্দ দু-মুখো ছুরি' প্রবন্ধ তাঁর নিজস্ব স্টাইলে রসিয়ে লিখেছেন ঃ "বিবেকানন্দ দু-মুখো ছুরি। এই ছুরির কোন মুখই ভোঁতা নয়। দুই-ই চকচকে, ধারাল, জোরাল। বিবেকানন্দ 'মিছরির ছুরি' নয়। এই ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম—কোন কোন লোকের পক্ষে, কোন কোন দলের পক্ষে, কোন কোন চিন্তাপ্রণালীর পক্ষে, কোন কোন কার্যপ্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দের ব্যবসা দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাকা, আহাম্মকদের বেঅকুফিগুলাকে কুচিকুচি করিয়া কাটা, আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাত-পা-কে গুঁড়া করিয়া ফেলা।...

"পশ্চিমাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলে, 'আরে ভাই মার্কিন, আরে ভাই ইয়াঙ্কি, বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা। দেখা যাক, কার কত মুরদ, কার মগজে কতখানি ঘি, কার চরিত্রে কতখানি মনুষ্যত্ব।'... পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল, 'তাই তো, এ যে বিপ্লব, দুনিয়ার যুগান্তর!' "[৭]

পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে স্বামীজীর দান এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার দ্বিশতবর্ষ স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে একটা প্রদর্শনী হয়। সেখানে ৩১জন বিদেশীর জীবন ও কার্যাবলীর পটমণ্ডপ সাজানো হয়; এঁরা আমেরিকার চিন্তা ও ভাবধারায় অবদান রেখে গেছেন। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

স্বামীজীর বিষয়ে এখনো অনেক তথ্য পুরান পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজে (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) এই সংবাদটি পাওয়া গেছে। স্বামীজী ঐ পত্রিকার একজন রিপোর্টারকে বলেন ঃ "আমি মিনিয়েপোলিস থেকে ট্রেনে যাচ্ছিলাম। একজন আমেরিকান এসে আমার পাশে বসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি স্পেনদেশীয়?'

"না, ভারতীয়।

"ভারত? সে কোথায়? আমি কখনো ভূগোল পড়িনি।

---

৬ Prabuddha Bharat, January 1945, p 45

৭ উদ্বোধন, ৩৬ বর্ষ, পৃঃ ১২৯-১৩১

"আমি বললুম, 'ভূগোলোকের উলটোদিকে—এশিয়ায়'।

"ও—আপনি একজন 'হিদেন' অর্থাৎ অসভ্য পৌত্তলিক?

"হ্যাঁ, এ-দেশের লোকেরা আমাকে ঐরূপ বলে।

"তাহলে আপনি নরকে যাবেন।

"আশা করি, না। আপনারা যেমন শীতকালে থার্মোমিটারের শূন্য ডিগ্রির নিচে তাপ গেলে বিচলিত হন না, আমরাও তেমনি গরম দেশে বাস করি, যেখানে ছায়াতেও ১২০ ডিগ্রি গরম। এর চেয়ে গরম জায়গায় যেতে চাই না।

"যা হোক, আপনি নিশ্চিতই তপ্ত নরকে যাবেন।

"তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কে?'

"আমি একজন cowboy।

"হ্যাঁ, আপনাদের বিষয় শুনেছি। আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী?

"আমি একজন প্রেসবিটেরিয়ান।"

তারপর স্বামীজীর সঙ্গে লোকটির পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে কথাবার্তা হয় এবং সে তাতে বিশ্বাসী জানায়। স্বামীজীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে যাওয়ার সময় স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ "আপনি একজন হিদেন, আপনি অবশ্যই নরকে যাবেন—এ-কথা ভুলবেন না।"

স্বামীজী অজ্ঞ cowboy-এর কথা শুনে নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছিলেন। আমরা জানি না cowboy-এর কোথায় গতি হয়েছিল। ঘটনাটি নগণ্য, কিন্তু তা তখনকার সাধারণ আমেরিকানদের ভারতীয়দের প্রতি কি মনোভাব ছিল তা মনে করিয়ে দেয়।

স্বামী সারদানন্দ

(পাশ্চাত্যে ২ বছর ঃ মার্চ ১৮৯৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)

বিবেকানন্দ ক্রমাগত আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের কাজের জন্য স্বামী সারদানন্দকে ডেকে পাঠান। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করে স্বামী সারদানন্দ ১ এপ্রিল ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে উপস্থিত হন। পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ ঝড়ে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাতে তিনি মোটেই বিচলিত হননি। জাহাজ রোমে থামলে তিনি সেণ্ট পিটারের চার্চ দর্শন করেন। কথিত আছে , তিনি সেণ্ট পিটারের মূর্তির সামনে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঠাকুর পূর্বে বলেছিলেনঃ "শশী ও শরৎকে দেখেছিলাম ঋষিকৃষ্ণের (যীশুখ্রীস্টের) দলে।"

স্বামীজী এপ্রিলের শেষে লণ্ডনে পৌঁছে সারদানন্দজীকে বক্তৃতার কাজে লাগান। ২৮ মে ১৮৯৬ অক্সফোর্ডে স্বামীজীর সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের সাক্ষাৎ হয়। ম্যাক্সমূলার ঠাকুরের ওপর 'A Real Mahatman' নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন এবং স্বামীজীকে বলেন যে, উপাদান পেলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে রাজি আছেন। পরে তিনি

"শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ" গ্রন্থ লেখেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ বলেন ঃ "ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার যা প্রকাশ করেছেন তা আমি লিখে দিয়েছিলুম। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করেন। স্বামীজী নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বললেন। আমি আপত্তি করলে বলেছিলেন, 'আমি লিখলে বুড়োর মাথায় আমার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' আমি যা জানি সব লিখে দিলুম। ভেবেছিলুম স্বামীজী কাটছাঁট করে দেবেন, কিন্তু তিনি দুই-একটি কথার বদল করে, আর দুই-এক জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্মরণ হয়, ম্যাক্সমূলারও কিছুমাত্র পরিবর্তন না করেই তা ছেপেছিলেন।"[৮]

জুন মাসের শেষে স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে তাঁর স্টেনোগ্রাফার গুডউইনের সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিউ ইয়র্ক, বস্টন ও গ্রীন একরে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা ও ক্লাস শুরু করেন। স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেন ঃ "শরৎ যা করে, মূল ধরে করে। শরতের কাজ গভীর।" মিসেস ওলি বুল বলেছিলেন ঃ "স্বামীজীর প্রভা মার্তণ্ড-সম, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ চন্দ্রমা-সম স্নিগ্ধ।"

স্বামী সারদানন্দ নিউ জার্সির অন্তর্গত মণ্টক্লেয়ারে মিস্টার ও মিসেস হুইলারের বাড়িতে নিয়মিতভাবে ক্লাস নিতেন। স্বামী অতুলানন্দ "With the Swamis in America" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "স্বামী সারদানন্দ হুইলারদের বাড়িতে থাকাকালে এক মজার ঘটনা ঘটে। তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতেন এবং তাঁর ছবি মিসেস হুইলারকে দেখান। 'ও স্বামী', তিনি বলেন, 'সেই একই মুখ!' 'কি বলছেন আপনি?'— স্বামী সারদানন্দ উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন। মিসেস হুইলার বলেন যে, বহুবছর আগে তাঁর যৌবন বয়সে, বিবাহের পূর্বে, তিনি স্বপ্নে এক হিন্দুকে দর্শন করেন; সেই স্বপ্নদৃষ্ট মুখ আর এই ছবির মুখ একই। 'ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ', বিস্ময়ে তিনি বলেন, 'এর পূর্বে আমি জানতাম না। সেই দর্শন এত দৃঢ় ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে, আমি সেই মুখখানি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। সেই থেকে আমি যখনই শুনি, কোন হিন্দু আমেরিকায় এসেছেন, আমি তাঁকে দেখবার জন্য এখানে-সেখানে যাই। কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হই। অবশেষে এখন আমি খুশি যে, স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলাম।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে সারদানন্দজী বলেন ঃ "ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য নিজের ভক্তদের বেছে নেন। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। তাঁর পতাকার নিচে কাজ করা গৌরবের বিষয়। আমেরিকায় তিনি আমার কাজের সব যোগাড় করে দিয়েছিলেন; আমি কখনো একাকী ছিলাম না। তিনি বহু উন্নত চরিত্রের নারীপুরুষকে আমার কাছে এনেছিলেন, যারা আমাদের কাজে সহায়তা করেছে এবং ঠাকুরকে বিশেষভাবে ভালবেসেছে।"

সারদানন্দজী যখন আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন স্বামীজী ভারতের কাজের জন্য

৮ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৮

তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ১২ জানুয়ারি ১৮৯৮ তিনি মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হলেন। ফেরার পথে লণ্ডন, প্যারিস, রোম হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পৌঁছালেন। স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা হাওড়া স্টেশনে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। স্বামী সারদানন্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্বপালনে সহায়তা করেছিল।

স্বামী অভেদানন্দ

(পাশ্চাত্যে ২৫ বছর ঃ আগস্ট ১৮৯৬ থেকে নভেম্বর ১৯২১)

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠিয়ে স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনের কাজের জন্য আহ্বান করেন এবং নিজে ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। তিন মাস স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে পাশ্চাত্য জীবনের স্তাতন্ত্য বিষয় শেখালেন এবং পল ডয়সন ও ম্যাক্সমূলার প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি প্রায় এক বছর ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত প্রচার করেন। পরে স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে ভারতের কাজে ডেকে পাঠান এবং স্বামী অভেদানন্দকে আমেরিকায় যেতে বলেন। অভেদানন্দজী ৯ আগস্ট ১৮৯৭ নিউইয়র্ক পৌঁছান এবং স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির কার্যভার গ্রহণ করেন।

অভেদানন্দজী নিউ ইয়র্ককে কেন্দ্র করে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বেদান্ত প্রচার করেন। আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন ও এলমার গেটস, প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিনলে ও আলাস্কার গভর্নর জন ব্রাডির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। বস্টন ও কেম্ব্রিজের বিখ্যাত অধ্যাপক ল্যানমান, রয়সি, শীলার, উইলিয়ম জেমস, লুইস জেনস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি কেম্ব্রিজ ও গ্রীন একর কনফারেন্সে যোগদান করে বেদান্তের বাণী প্রচার করেন।

আমেরিকায় যখন তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করে সুনাম অর্জন করেন, তখন কতিপয় ঈর্ষান্বিত খ্রীস্টান মিশনারি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে। নির্ভীক বেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ তাদের নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ না করে কাজ করে যান। তাঁর আত্মকথা ঃ 'আমেরিকাতে যখন ছিলাম, মনে যদি কষ্ট হতো, নিজের মনে নিজে গান গাইতাম। দুঃখকষ্ট সব শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাতাম। কখনো কখনো জপধ্যান করতাম, কখনো পড়াশুনা করতাম, এমনি করে দিন কাটাতাম। সেখানে তো নিজের ভাবের লোক ছিল না, নিজের ভাবে নিজে একলা থাকতাম।...

"সত্যকে ধরে থাকলে বেশি বাধাবিঘ্ন আসে বটে, কিন্তু সত্যকে ছাড়তে নেই। খুঁটি জোর করে ধরে রাখতে হয়। খুঁটি ছাড়তে নেই। দেখছ না, আমার ওপর কত বাধাবিঘ্ন আসছে, কত ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,

আমার কিছু করতে পারবে না। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে রয়েছি।"[৯]

১৮৯৯ সালের আগস্টে স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্কে পৌঁছান এবং মিস্টার লেগেটের রিজলির বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামী অভেদানন্দ তখন গ্রীন একরে। স্বামীজীর তার পেয়ে তিনি রিজলিতে এসে দেখা করেন। ৭ নভেম্বর নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির সভ্যরা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানায়। স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দের কর্মের প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তৃতায় ৬০০ শ্রোতা হতো এবং কার্নেগী লাইসিয়াম ভাড়া করে বক্তৃতার আয়োজন করতে হতো। অভেদানন্দজী প্রচুর ঘুরেছেন—কানাডা থেকে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়েছেন। শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গেও কিছুদিন ছিলেন।

পাশ্চাত্যে ১০ বছর কাজ করার পর স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ সালে ৬ মাসের জন্য ভারতে যাওয়ার পূর্বে স্বামী বোধানন্দ তাঁর সহকারী হয়ে আসেন। তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৭ সালের প্রথমে আমেরিকায় ফিরে যান। তিনি স্বামী বোধানন্দকে পিটসবার্গ বেদান্ত কেন্দ্রে পাঠান এবং স্বামী পরমানন্দকে নিউইয়র্কের কাজের ভার দেন। তারপর স্বামী পরমানন্দ বস্টনে যান এবং স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের ভার নেন। ১৯১১ সালে স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক থেকে ১০৭ মাইল দূরে বার্কসায়ার আশ্রমে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে নিউ ইয়র্কেও বক্তৃতা দিতেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামী অভেদানন্দ ১৭ বার আটলাণ্টিক মহাসাগর জাহাজে পার হয়েছেন। তিনি কেবল আমেরিকায় নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ঘুরেছেন এবং বেদান্ত প্রচার করেছেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় তৎকালীন চেকোশ্লাভাকিয়ার বিখ্যাত শিল্পী ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। তা এখন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সংরক্ষিত আছে।

বিদেশে ঠাকুর কিভাবে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেছেন, সে-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেন ঃ "আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলি শোন—যার পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা ও করুণা ছিল! তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনো সদাসর্বদা করেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি ভূরিভূরি পেয়েছি। তাঁর presence-ও (উপস্থিতি) জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—এ-কথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।

"একবারের কথা। লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার

৯ যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ, ১৩৭৭, পৃঃ ১৬২, ১৭০

সব ঠিক। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে যে-জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল 'লুসিটেনিয়া'। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ মে ১৯১৫) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনব, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে-সেদিকে তাকালাম, কাউকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে, কিন্তু সেবারেও ঠিক সেরকম। তখন টিকিট কেনা আর হলো না, বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা—S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এল। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন।"[১০]

দীর্ঘ ২৫ বছর পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তার কিছু নিদর্শন রয়েছে তাঁর ১১ খণ্ড গ্রন্থাবলীর মধ্যে। তাঁর রচিত Doctrine of Karma, Life Beyond Death, Reincarnation প্রভৃতি গ্রন্থ এখনো আমেরিকায় জনপ্রিয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্বামী অভেদানন্দের ভ্রমণপঞ্জী ও বক্তৃতার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯২১ সালে তিনি ভারতে ফিরতে মনস্থ করেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ তা অনুমোদন করেন।

স্যানফ্রান্সিসকো ছাড়বার সময় স্বামী অভেদানন্দ বলেন ঃ "ভগবানের ইচ্ছায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একদিন মিলিত হবে। এ-ব্যাপারে কালের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্যে ব্যাপক ভ্রমণ ও দীর্ঘকাল অবস্থান আমায় দৃঢ় ধারণা এনে দিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব আমাদের বাড়ি ও সব নারীপুরুষকে ভাইবোনের মতো ভালবাসা সম্ভব। ঈশ্বরের শক্তি সর্বত্র কাজ করছে। সে-ই ভাগ্যবান—যে এই কাজ দেখে এবং দৈবী শক্তি অনুভব করে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ

(পাশ্চাত্যে ৩ বছর ঃ জুন ১৮৯৯ থেকে জুলাই ১৯০২)

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বাধ্যায় ও তপস্যা ছেড়ে আমেরিকায় যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। স্বামীজীর তখন শরীর খারাপ। ভারতের কর্মভার থেকে সাময়িক অব্যাহতি ও দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ভেবে মহানন্দ কবিরাজের পরামর্শে ও গুরুভাইদের অনুরোধ স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যেতে রাজি হন। স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে আলিঙ্গন করে সাশ্রুনয়নে বললেন ঃ "হরিভাই, আমি ঠাকুরের কাজের জন্য বুকের

১০ ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের যাত্রীবাহী জাহাজ (liner) 'লুসিটেনিয়া' (S S Lusitania) জার্মানদের কোন একটি সাবমেরিনের আক্রমণে আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্ক-এর (Cork) উপকূলের কিছু দূরে ৭ মে ১৯১৫ তারিখে ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজডুবিতে ১১৯৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও ছিলেন। (মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৩৬৬, পৃঃ ৩৩০-৩১)

রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এ-কাজে সাহায্য করবে না?" স্বামী তুরীয়ানন্দের আর "না" বলা সম্ভব হলো না। ১৮৯৯ সালের ২০ জুন তিনি স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে পাশ্চাত্যে রওনা হলেন। জাহাজে একদিন তিনি নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "সেখানে কিরকম চলতে হবে?" তদুত্তরে নিবেদিতা একটা ছুরির অগ্রভাগ ধরে হাতটা তাঁর দিকে এগিয়ে বললেন ঃ "স্বামী, লোককে কিছু দিতে হলে এরূপভাবে দেওয়া চাই। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অসুবিধা ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধার ভাগটা অন্যকে দিতে হবে।"

জাহাজ প্রথমে ইংল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে থামল। তারপর আগস্টের শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক পৌছালেন স্বামীজীর সঙ্গে এবং মিস্টার লেগেটের রিজলি ম্যানরে দুমাস থাকেন। রিজলিতে থাকাকালীন একটা ঘটনা মিস ম্যাকলাউড স্বামী নিখিলানন্দকে বলেন ঃ "মিসেস লেগেট স্বামীজীর কটেজে বিছানাপত্র সব ঠিক আছে কিনা তদারক করতে গিয়ে দেখেন স্বামী তুরীয়ানন্দের বিছানা মেঝেতে। তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামী, কি ব্যাপার? বিছানার কি কোন ত্রুটি আছে?' তুরীয়ানন্দজী উত্তরে বলেন, 'না, না, বিছানা ঠিক আছে। দেখুন, আমি স্বামীজীর সঙ্গে এক লেভেলে শুতে পারি না, তাই বিছানাটা খাট থেকে নিয়ে মেঝেতে পেতেছি।' " স্বামীজীর প্রতি স্বামী তুরীয়ানন্দের কত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে তা প্রকাশ পায়।[১১]

স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ মন্টক্লেয়ারে মিসেস হুইলারের বাড়িতে বেদান্তের ক্লাস শুরু করেন। স্বামীজী বলেন ঃ "ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। হরিভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভুলে যাও।" স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে সপ্তাহে দু-দিন ক্লাস নিতেন, শনিবার শিশুদের নীতিশিক্ষা দিতেন গল্পের মাধ্যমে। একবার আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কেম্ব্রিজ কনফারেন্সে শঙ্করাচার্যের ওপর বক্তৃতা দেন। তিনি নিউ ইয়র্কে প্রায় এক বছর ছিলেন।

একদিন ব্রহ্মচারী গুরুদাস (পরে স্বামী অতুলানন্দ) স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "স্বামীজী, সর্বদা সৎপ্রসঙ্গ করা কিরূপে আপনার পক্ষে সম্ভব হয়? আপনার ভাণ্ডার কি নিঃশেষিত হয় না?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "দেখ, আমি যৌবন থেকে এই জীবন যাপন করে আসছি। এটি আমার জীবনের অভিন্ন অংশস্বরূপ হয়ে গেছে। মনে মা ধর্মভাবের রাশ ঠেলে দেন। তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত। যা খরচ হয়ে যায়, মা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করে দেন।"[১২]

স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন বেদান্তের প্রতিমূর্তি এবং সর্বদা ঐভাবে থাকতেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত—"হরি ওঁ, হরি ওঁ, তৎসৎ, শিব শিব।" একদিন নিউইয়র্কের রাস্তায় বেড়াবার সময় হঠাৎ বলে উঠেন ঃ "গুরুদাস! সিংহতুল্য হও, সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর

১১ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, 1987, p 112

১২ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ৫৭

ভগ্ন করে মুক্ত হও। একটা বড় লম্ফ দাও এবং কাজ শেষ কর।"[১৩]

বক্তৃতার চেয়ে ঘরোয়া কথাবার্তার মাধ্যমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ধারণা করিয়ে দিতেন। ঠাকুরের ও বেদান্তের কথা তাঁর মুখে সদা লেগেই থাকত ঃ "সর্বদা খাঁটি হও। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। সত্যসঙ্কল্প হও। অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ো না। ঈশ্বরলাভের পথে সোজা চল। অসীম সাহসে বুক ভরে রাখ। যৌবনেই আমি বেদান্ত অধ্যয়ন ও অভ্যাস আরম্ভ করেছিলাম। আমি সর্বদা চেষ্টা করতাম স্মরণ রাখতে যে, আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।"[১৪]

একদিন গুরুদাসকে বিষণ্ণ দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিজ জীবনের একটা ঘটনা বলেন। বরানগর মঠে একবার তাঁর খুব বিষাদ ভাব হয় এবং রাতের অন্ধকারে ছাদে পায়চারি করতে থাকেন। হঠাৎ গাঢ় মেঘ সরে গিয়ে পূর্ণচাঁদ দেখে তিনি ভাবলেন ঃ "দেখ, চাঁদ সবসময় আকাশে ছিল, কিন্তু আমি তা দেখতে পাইনি! সেইরূপ আত্মা নিত্যবস্তু, অজর, অমর, দুঃখের অতীত, স্ব-মহিমায় সদা জ্যোতিষ্মান। কিন্তু আমি তা জানতে পারিনি। অজ্ঞানমেঘ আমার বুদ্ধি এবং আত্মার মধ্যে এক পর্দা সৃষ্টি করেছিল।"[১৫]

মিস মিনি বুক নামে এক বেদান্তের ছাত্রী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৬০ একর জমি দান করেন। স্বামীজী ঐ দান গ্রহণ করে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মিস বুককে সঙ্গে নিয়ে ৪ জুলাই ১৯০০ নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হন। স্বামীজী ট্রেন থেকে ডেট্রয়েটে নেমে পড়েন এবং তুরীয়ানন্দজীকে শেষ নির্দেশ দেন ঃ "যাও, ক্যালিফোর্নিয়াতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর। সেখানে বেদান্তের পতাকা তোল। এখন থেকে ভারতের স্মৃতি মুছে ফেল। বাকি সব মা-ই করবেন।" এই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ। মে মাসে সানফ্রান্সিসকো ত্যাগকালে স্বামীজী ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের কাছে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাব। আমি তোমাদের নিকট বেদান্তের ওপর বক্তৃতা দিয়েছি, তুরীয়ানন্দের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সে জীবনের প্রতিমুহূর্তে তা অভ্যাস করে। সে আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী। সে তোমাদের পবিত্র অধ্যাত্মজীবন যাপন করতে সাহায্য করবে।"

৮ জুলাই ১৯০০ মিস বুকের সঙ্গে তুরীয়ানন্দজী লস এঞ্জেলেসে পৌঁছান। তারপর প্যাসাডেনাতে ২ সপ্তাহ মীড সিস্টারদের বাড়িতে থেকে ২৬ জুলাই সানফ্রান্সিসকোতে যান। সেখানকার ভক্তেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে স্বামীজী তাঁদের যা বলেছেন তা উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে নিরভিমান তুরীয়ানন্দজী বলেন ঃ "আমি একটি ছোট ডিঙি। আমি মাত্র ২।৩ জনকে এই সংসারসমুদ্রের অপর পারে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু স্বামীজী হচ্ছেন আটলান্টিক মহাসাগর পারাপারকারী বিশাল জাহাজ—তিনি হাজার হাজার লোককে পার করতে পারেন।"[১৬]

স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্বদা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতেন এবং আদর্শের সঙ্গে কখনো

১৩ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ৫৮ ১৪ তদেব, পৃঃ ৬০ ১৫ তদেব, পৃঃ ৬০-৬৯
১৬ Vedanta and the West, 1952, p. 135

আপস করতেন না। অনেক ধর্মনেতা টাকার জন্য ধনীদের তোষামোদ করেন, আশ্রম বা চার্চ চালাবার জন্য আদর্শের সঙ্গে আপস করেন। বস্টনের এক ধনী মহিলা খুব প্রভুত্বপ্রিয়া ছিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন ঃ "যদি আপনি আমার মতানুবর্তী না হন, তাহলে আমি আপনাকে সকল সাহায্যদান বন্ধ করব।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ধীরভাবে উত্তর দিলেন ঃ "আমি সন্ন্যাসী। ঈশ্বর আমার সহায়। আপনি যদি আমাকে বস্টনের রাস্তায় ফেলে দেন, আমি চিন্তিত হব না।" আরেকবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লঙ বীচে এক ধনী বৃদ্ধা স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় তিনি বলেন ঃ "আপনি আমাকে কয়েক ডলার দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি আপনার কাছে মাথা বিক্রয় করেছি।"[১৭]

২ আগস্ট ১৯০০ তুরীয়ানন্দজী ১২।১৩ জন উৎসাহী নারীপুরুষকে সঙ্গে নিয়ে সানফ্রান্সিসকো থেকে স্যান হোসে ট্রেনে, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে মাউণ্ট হ্যামিণ্টনের ওপর দিয়ে ৪০ মাইল দূরে স্যান আন্টনিও উপত্যকাতে পৌছালেন। এখানে মিস বুকের সম্পত্তিতে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। জনৈক পাশ্চাত্য ভক্ত বলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার তীব্র জ্যোতিতে বহির্মুখ জড়বাদী পাশ্চাত্যবাসীদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্য মানবের নবজন্ম হইল, পাশ্চাত্য মনের সুপ্ত সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইল। সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব রাখিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্য মনকে সুশিক্ষিত ও সঞ্চালিত করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনে 'শান্তি আশ্রম' জন্মলাভ করিল।"[১৮]

স্থানটি একটি জনশূন্য মরু উপত্যকা। ঘরবাড়ি নেই, বিদ্যুৎ নেই। জল কয়েক মাইল দূরে, বাজারঘাটও বেশ কয়েক মাইল দূরে। সঙ্কীর্ণ মেঠো রাস্তা, যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি সম্বল। গাছপালা খুব কম। স্থানটি সাপ, বিছা ও বিষাক্ত মাকড়সায় ভরতি। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী আমেরিকানদের বেদান্ত শেখাতে শুরু করলেন। ভোরে গুরুদাস "ওঁ, ওঁ, ওঁ" শব্দে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে সকলের ঘুম ভাঙাতেন। সকাল ৫টায় ধ্যান, ৮টায় ব্রেকফাস্ট, তারপর কাজ। ১০-১২টায় গীতা ক্লাস ও ধ্যান এবং ১টায় লাঞ্চ। বিশ্রাম। তারপর কাজ শুরু হতো। ক্রমে স্থায়ী কেবিন ও ধ্যানঘর তৈরি হলো। সন্ধ্যা ৭টায় সাপার, ৮-১০টায় ধ্যান ও ধর্মপ্রসঙ্গ। তুরীয়ানন্দজী আশ্রমবাসীদের বলতেন ঃ "আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করা উচিত। তাহলে আমাদের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।... ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।"

একদিন শান্তি আশ্রমে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নিজের গুরু সম্বন্ধে ভাবের সঙ্গে বললেন ঃ "ঠাকুর এসেছিলেন পুরাতন বাণীকে নব জীবন, নব ব্যাখ্যা দান করতে। প্রাচীন

১৭ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ৭৫ ১৮ তদেব, পৃঃ ৭১

বাণীসমূহের তিনি ছিলেন জীবন্ত মূর্তি এবং তিনি কিছু অভিনব বাণীও দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, আন্তরিক অনুরাগ দ্বারা সকল ধর্মপথে একই ঈশ্বরের দর্শনলাভ হয়। যা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন তাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তাঁর জীবন অদ্ভুত অভূতপূর্ব। তাঁর বাণী বুঝতে ও নিতে জগৎকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তিনি কোন কৃতিত্বের দাবি করেননি। তিনি সদা বলতেন, 'মা-ই সব জানেন, আমি কিছু জানি না।' তাঁর নম্রতাও যেমনি, সরলতাও তেমনি। আমরা প্রায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছি; কিন্তু তাঁর মতো আর একটিও মহাপুরুষ দেখিনি।"[১৯]

অধিক কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে তুরীয়ানন্দজীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। ৩ বছর পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে তিনি স্বামীজীকে দেখবার জন্য ভারতে ফেরা মনস্থ করলেন। এই কালে এক সন্ধ্যায় মা জগদম্বা তাঁকে দর্শন দিয়ে ভারতে ফিরতে বারণ করেন এবং বলেন, তিনি যদি থাকেন তবে ভবিষ্যতে সেখানে অনেক বাড়ি হবে এবং প্রচুর ভক্ত আসবে। তুরীয়ানন্দজী অস্বীকার করায় মাতৃমূর্তি অন্তর্হিত হলো। পরে তিনি গুরুদাসকে দর্শনবৃত্তান্ত সব বলেন ঃ "আমি ভুল করেছি, কিন্তু এখন তা আর শোধরাবার নয়।" কেন তিনি মাতৃ-আদেশ অমান্য করলেন, কেউ জানে না। এটা রহস্যাবৃত হয়ে রইল।[২০]

শান্তি আশ্রম ছাড়বার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাসকে আশ্রম পরিচালনার ভার দিয়ে বলেন ঃ "ক্রোধ, হিংসা ও গর্ব প্রভৃতি রিপু দমন কর। কারো পেছনে তার নিন্দা করো না। সব বিষয় সরলভাবে সাক্ষাতে আলোচনা করো। কোন কিছু করণীয় হলে তুমিই অগ্রণী হবে। তখন অন্যেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে যোগ দেবে। তুমি প্রথমে না করলে কেউ করবে না। তুমি জান, এইজন্যই আমি এখানে সবরকম দৈহিক কাজও করেছি।" গুরুদাস বললেন ঃ "ক্লাসগুলি সম্বন্ধে কি করা যাবে? আমি কি শিক্ষা দেব? আমি তো নিজে ছাত্রমাত্র।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "তুমি এখনো বোঝনি বাবা, আদর্শ জীবনযাপনই আসল কথা। জীবনই সৃষ্টি করে জীবন। সেবা কর, সেবা কর, সেবা কর—এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র হও। সকলের সেবক হও। যিনি সেবা করতে প্রস্তুত, একমাত্র তিনিই শাসন করতে সমর্থ। তুমি আমাদের কাছে বহু বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জান তাই শিক্ষা দাও। তুমি যেমন দেবে তেমনি পাবে।"[২১] তিনি আরও বলেছিলেন ঃ "বাবা, ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমি তোমাদের দিয়েছি মুক্তহস্তে। এই অমূল্য রত্ন সযত্নে রক্ষা করো।"[২২] "তোমরা বিষাক্ত সর্প কর্তৃক দষ্ট হয়েছ। বিষের ক্রিয়া অনিবার্য। তোমাদের জীবনে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর কৃপা করেছেন।"[২৩] "শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন। তিনি তোমাদের ধর্মপথে নিশ্চয়ই চালিত করবেন।"[২৪]

স্বামী তুরীয়ানন্দ ৬ জুন ১৯০২ জাহাজে সানফ্রান্সিসকো ত্যাগ করেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে

১৯ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ১০৩ · ২০ Prabuddha Bharata, 1925, p. 2

২১ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ১১৬-১৭; ২২ তদেব, পৃঃ ১১৮; ২৩ তদেব, পৃঃ ১১৯; ২৪ তদেব, পৃঃ ১০৮

তিনি স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে দেখে খুবই মর্মাহত হন। অবশেষে ১৪ জুলাই কলকাতায় পৌছান।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

(পাশ্চাত্যে ১২ বছর ঃ নভেম্বর ১৯০২ থেকে জানুয়ারি ১৯১৫)

স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর ভেঙে যাওয়ায় সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিস্টার এম. এইচ. লোগান স্বামীজীর কাছে অপর একজন সন্ন্যাসী পাঠাতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে মনোনীত করেন এবং অব্যবহিত পরে ৪ জুলাই ১৯০২ দেহত্যাগ করেন। ত্রিগুণাতীতানন্দজী 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদনার কাজ স্বামী শুদ্ধানন্দের ওপর সমর্পণ করে নভেম্বরে কলম্বো-জাপান হয়ে ২ জানুয়ারি ১৯০৩ সানফ্রান্সিসকোতে উপস্থিত হন এবং সাদরে গৃহীত হন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সোমবার সন্ধ্যায় গীতা ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপনিষদ্ ক্লাস এবং রবিবার সকাল ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যের আগমনে ভক্তমহলে খুব সাড়া পড়ে গেল। জনসমাগম প্রচুর হওয়ায় ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ভক্তেরা জমি ক্রয় করে মন্দির নির্মাণ করতে মনস্থ করেন। ১৯০৬ সালের ৭ জানুয়ারি মন্দিরের উদ্বোধন হয়। এটি পাশ্চাত্যের প্রথম হিন্দুমন্দির এবং এখনো তা স্যান ফ্রান্সিসকো শহরের ঐতিহাসিক চিহ্নিত স্থান। মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ত্রিগুণাতীতানন্দজী বলেন ঃ "যদি এ-মন্দির ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তাহলে এটি তাঁর কাজের জন্য সগর্বে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকবে।" আশ্চর্যের বিষয়, ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে সান-ফ্রান্সিসকোর ভয়াবহ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড হিন্দুমন্দিরের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নতুন মন্দিরে সাধুনিবাস গড়ে তুললেন। ১০ জন পুরুষ ভক্ত বাইরে কাজ করত এবং তাঁর অধীনে ভারতের ব্রহ্মচারীদের মতো জীবনযাপন করত। তিনি নিজে রান্না করে তাদের খাওয়াতেন, ঠাকুরের পুণ্য জীবনকথা শোনাতেন এবং নানাবিধ নীতিবাক্য ছাপিয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁর প্রিয় নীতিবাক্যগুলি—(১) সাধুর মতো জীবনযাপন করবে, কিন্তু ঘোড়ার মতো কাজ করবে, (২) এই কাজটি এখনি কর, (৩) সদা সজাগ থাক ও প্রার্থনা কর এবং (৪) কর বা মর, কিন্তু করলে তুমি মরবে না। কারও চরিত্রে ত্রুটি দেখলে তিনি কঠোরভাবে শাসন করতেন। স্বামীজীর মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উৎকৃষ্ট চরিত্রই ধর্মজীবনের প্রকৃত ভিত্তি। প্রেমিক গুরুর ন্যায় অসংযত শিষ্যকে তিনি বলতেন ঃ "আমি তোমার দেহের প্রত্যেক অস্থি ভেঙে ফেলতে আদৌ ইতস্তত করব না, যদি তার দ্বারা আমি তোমাকে অমৃতসাগরের তীরে টেনে নিয়ে যেতে পারি এবং তন্মধ্যে নিক্ষেপ করি। কারণ তাহলে আমার কর্তব্য শেষ হবে।"[২৫]

২৫ নবযুগের মহাপুরুষ, ২।৮

১৯০৪ সালে ত্রিগুণাতীতানন্দজী লস এঞ্জেলেসেও প্রচারকার্য শুরু করেন। কিন্তু সানফ্রান্সিসকো আশ্রম চালিয়ে ৫০০ মাইল দূরে আরেকটা আশ্রম চালানো কষ্টকর হওয়ায় তিনি বেলুড় মঠ থেকে একজন সহকারী চাইলেন। তদনুযায়ী স্বামী সচ্চিদানন্দ লস এঞ্জেলেসে আসেন; কিন্তু এক বছরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি দেশে ফিরে যান। ১৯০৬ সালে স্বামী প্রকাশানন্দ ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে সাহায্য করতে সানফ্রান্সিসকোতে আসেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। সকলের শেষে শুতেন এবং সকলের আগে উঠতেন। তাঁর কোন বিছানা ছিল না। মেঝেতে কার্পেটের ওপর কম্বল বিছিয়ে, নিজ বাহুতে মাথা রেখে শুতেন এবং ওপরে আরেকটা কম্বল থাকত। সকালে কম্বলদুটি ভাঁজ করে অফিসের টেবিলের নিচে রাখতেন।

যোসেফ হরভাথ নামে এক হাঙ্গেরীয় যুবক বাইরে এক প্রেসে কাজ করত এবং আশ্রমে থাকত। ত্রিগুণাতীতানন্দজী হরভাথের সাহায্যে হিন্দুমন্দিরের নিচের তলায় ছাপাখানার যন্ত্রাদি কিনে মুদ্রণকার্য শুরু করেন। দূরস্থ ও কর্মব্যস্ত ভক্তরা যাতে বেদান্তের বাণী জানতে পারে সেজন্য তিনি 'Voice of Freedom' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন ঃ "আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হোক। এটি এমন সুরে ঝঙ্কৃত হোক, যাতে আমরা সকলে একবাক্যে মুক্তির বিশ্বসঙ্গীত গাইতে পারি। এস, আমরা মুক্তির ভাষায় কথা বলি। এস, আমরা মুক্তির আলোকে চিন্তা করি। এস, আমরা মুক্তির বলে কাজ করি।"[২৬] এই পত্রিকা এপ্রিল ১৯০৯ থেকে মার্চ ১৯১৬ সাল পর্যন্ত চলে। শ্রীম কর্তৃক অনূদিত 'The Gospel of Sri Ramakrishna'-এর প্রথম খণ্ড (আমেরিকান সংস্করণ) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের চেষ্টায় সানফ্রান্সিসকো থেকে বের হয়।

ত্রিগুণাতীতানন্দজী মেয়েদের জন্য মন্দিরের অদূরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্ত্রীমঠ শুরু করেন, কিন্তু ১৯১২ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি বছর তিনি সানফ্রান্সিসকোর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে শান্তি আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ retreat করতেন। কর্মযোগ, সাধনভজন, শাস্ত্রপাঠ ও স্তবস্তুতি, রাতে ধুনির সামনে ধ্যান ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ চলত। সিদ্ধগিরির ওপরে ধুনি জ্বেলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারারাত তিনি Vigil করতেন। শান্তি আশ্রমে স্থায়িবাস সম্ভব নয়—তার মূল কারণ জলাভাব এবং শহর থেকে তার দূরত্ব। তিনি সানফ্রান্সিসকো থেকে দেড় ঘণ্টার পথ কংকর্ডে একটা বেদান্ত উপনিবেশ গড়বার মনস্থ করেন, যেখানে ভক্তেরা বৃদ্ধবয়সে অবসর জীবনযাপন করবেন। ২০০ একর জমি ক্রয় করে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা হলো এবং বেদান্ত সোসাইটির জন্য ২৫ একর জমি বরাদ্দ হলো যেখানে মন্দির ও গ্রন্থাগার থাকবে। ভক্তেরা স্ব স্ব ভূমিতে গৃহনির্মাণ, কূপখনন, সবজি ও ফলফুলের বাগান প্রভৃতি তৈরি শুরু করল। প্রতি শনিবার ত্রিগুণাতীতানন্দজী ভক্তদের নিয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন।

২৬ তদেব, ২।২৭

১৯১৪ সালের প্রথম থেকে ত্রিগুণাতীতানন্দজীর বাতবেদনা ও নানাবিধ শারীরিক উপসর্গ দেখা দিল। তিনি জনৈক শিষ্যকে বলেন ঃ "অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে বহুবার আমি ভাবি—আমার দেহ যাক, আমার জীবন শেষ হোক। কিন্তু আমি তা করতে পারি না। কারণ মনে এই চিন্তা আসে যে, ঠাকুরের কাজ চলা উচিত। তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহকে কার্যক্ষম রাখি। এই দেহ একটা শুষ্ক খোলসের মতো হয়ে গেছে এবং যে-কোন মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হতে পারে। গত তিন বছর যাবৎ মনের জোরেই আমি দেহকে চালিত।"[২৭]

অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতার দরুন বক্তৃতার সময় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর কণ্ঠস্বর কাঁপত। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের এই বার্তাবহ দৈহিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে ঠাকুরের কাজ করে যেতেন। ক্রমে ১৯১৪ সালে বড়দিনের উৎসব এল। সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই উৎসব চলত। ২৫ ডিসেম্বর ত্রিগুণাতীতানন্দজী সকাল ১১টা, বিকাল ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টায় বক্তৃতা দেন। স্তবপাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন।

ক্রিসমাসের দুদিন পরে রবিবাসরীয় অপরাহ্ণ বক্তৃতার সময় এক বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক তাঁর ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। ছাত্রটি আগে হিন্দুমন্দিরে বাস করেছে এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার দরুন তাকে মন্দির থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যাহোক, বোমার আঘাতে যুবকটি নিহত হয় এবং ত্রিগুণাতীতানন্দজী গুরুতররূপে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন সেবক দিনরাত তাঁর কাছে থাকত। তিনি ঐ যন্ত্রণার মধ্যে মিসেস পিটারসনকে ঠাকুরের মন্দিরের বেদি মেরামত করতে বলেন এবং ঐ হতভাগ্য যুবকটির জন্য অনুশোচনা করেন। ৯ জানুয়ারি, ১৯১৫ বিকালে তিনি সেবককে বলেন যে, আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি—ঐদিন তিনি দেহত্যাগ করবেন। ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মর্তলীলা শেষ করে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। এর এক বছর পরে স্বামী প্রকাশানন্দ ও ভক্তেরা তাঁর দেহাবশেষ শান্তি আশ্রমের সিদ্ধগিরিতে সংস্থাপন করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর দেহাবশেষ বিদেশে এক মরুপ্রান্তরে নির্বাক সাক্ষী হয়ে রইল, কিন্তু তাঁর অমরবাণী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ঃ খুব কাজ কর। নিজেকে সংযত কর। চরিত্র গঠন কর। শেষপর্যন্ত সহ্য কর। আত্মজ্ঞান লাভ কর এবং মুক্ত হও।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিশন' বহন করে শহীদ হয়ে রইলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ (১ মে ১৮৯৭-১৯৯৭) উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। অনন্তকালের তুলনায় শতবর্ষ কিছুই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা ও পরবর্তী

২৭ তদেব, ২।৩৯-৪০

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আত্মাহুতি দিয়ে ঠাকুরের 'মিশন' দেশে-বিদেশে বহন করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মপ্রবাহ এখনো বিশাল আকার ধারণ করেনি। ঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ "আমি দেখেছি বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার ওপরে জল ধপাস্ ধপাস্ করছে, আর তোলপাড় করে দিচ্ছে।"[২৮] তেমনি অবতার যখন আসেন, তখন চট করে সকলে বুঝতে পারে না। বেশ কিছুকাল পরে তাঁর 'মিশন' প্রকাশিত হতে থাকে।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবন্যার ইঙ্গিত করে লিখেছেন ঃ "ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী।"[২৯] নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ১১ এপ্রিল ১৯০৬ সালে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ "You see, when we who understood Swamiji, and remember Him are dead, there will come a long period of obscurity and silence, for the work that He did. It will *seem* to be forgotten, until, suddenly, in 150 or 200 years, it will be found to have transformed the West."[৩০] (দেখ, আমরা যারা স্বামীজীকে দেখেছি বুঝেছি ও মনে রেখেছি—সেই আমরা যখন মরব, তখন [পাশ্চাত্যে] তাঁর মিশনের ওপর আসবে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অস্পষ্ট নীরবতা। লোকে প্রায় ভুলে যাবে। তারপর দেড়শ-দুশ বছর পরে হঠাৎ স্বামীজীর জীবন ও বাণী পাশ্চাত্যকে রূপান্তরিত করবে।)

একদিন বেলুড় মঠে স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বলেন ঃ "এইখানে—এইখানে—যে মণিমুক্তা সঞ্চিত করে রেখে গেলাম—এগুলি তোরা রাখবি, সযত্নে রাখবি। এগুলি তোরা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করবি। এগুলি নিয়ে যারা কাজকর্ম করবে তারা আসছে—আসছে—বহুদূর থেকে আসছে। পাঁচ-ছয় জেনারেশন পরে তারা আসবে। তখন তারা তা ভোগ করবে। তোরা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করে যা। আমি শুধু আগমনী গান গেয়ে গেলাম—তা শুধু তোরা রক্ষণাবেক্ষণ কর।"[৩১]❑

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩৬১

২৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৭১, পৃঃ ৪৩১

৩০ Letters of Sister Nivedita, Vol II, Edited by Sankari Prasad Basu, Nababharat Publishers, 1982, p 800

৩১ স্মৃতিকথা—স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ, ১৩৭৭ পৃঃ ৫৫

ঠাকুর যদি আজ থাকতেন

'যদি' শব্দটা সংশয়াত্মক। আর এই সংশয় থেকে মানুষের যত দুর্গতি। এই 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার ফলে প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টের কি দুর্গতি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে একটি অপূর্ব কাহিনী আছে। কুমারিল ছিলেন দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। বেদজ্ঞ দার্শনিক। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির নিকট তর্কে পরাজিত হয়ে তাকে পণ অনুসারে বৌদ্ধ হতে হয়। পরে তিনি নালন্দাতে ধর্মপালের কাছে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেন। একদিন গুরু ধর্মপাল বেদের নিন্দা করায় কুমারিল গোপনে অশ্রু বিসর্জন করেন। জনৈক বৌদ্ধ তা দেখতে পেয়ে ধর্মপালকে জানায়। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কুমারিলকে বলেন : "এখনও বেদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা! তুমি ভান করে বৌদ্ধ সেজে আমার শিক্ষা নিচ্ছ? তোমার সাধ্য থাকে তো আমার বাক্য তুমি অপ্রমাণ কর।" ফলে ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ শুরু হলো। ধর্মপাল যুক্তিশরে বিদ্ধ হলেন। শেষে কুমারিল বললেন : "সর্বজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন জীব সর্বজ্ঞ হতে পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বেদ মানেননি—ইহা তাঁর চৌর্য ভিন্ন আর কি?"

বৌদ্ধরা তখন ক্ষেপে গিয়ে কুমারিলের ওপর অত্যাচার শুরু করল। গুরু ধর্মপাল বললেন : "একে তোমরা ঐ উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফেলে বধ কর।" বৌদ্ধরা কুমারিলকে টেনে ছাদে তুলল এবং ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বললেন : "বেদ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাকি।" ভূতলে পতিত হয়ে কুমারিল মরলেন না। বৌদ্ধরা স্তম্ভিত হলো। কুমারিল বললেন : " ওহে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধগণ, আমি দেখছি আমার চক্ষুতে একটু আঘাত লেগেছে। আমার এ ক্ষতি হতো না, যদি আমি 'বেদ যদি প্রমাণ হয়'—এই সংশয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ না করতাম।" বৌদ্ধেরা কুমারিলের দৈবশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল।

কুমারিল তো তাঁর বিশ্বাসের জোরে রেহাই পেলেন, কিন্তু আমাদের গতি কি? আমাদের সন্দিগ্ধ মন ক্রমাগত সংশয়ের দোলায় দুলছে : "আজ যদি ঠাকুর থাকতেন?" "তিনি কি আছেন না নির্বাণ নিয়েছেন?" "কিন্তু—যেন—মনে হয়...।" এইসব সংশয়াত্মক ভাব মন থেকে সরাবার জন্য আমরা শাস্ত্র পড়ি, সাধুসঙ্গ করি, জপধ্যান করি, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করি। তবুও সংশয় যায় না। আর এ সংশয় যাবেই বা কেন? একটা ক্ষুদ্র সর্ষের মতো বটের বীজের মধ্যে বিরাট বটবৃক্ষ লুকিয়ে রয়েছে—এ যেমন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, তেমনি অনন্ত বিরাট ঈশ্বর কি করে একটা সাড়ে তিন হাত মনুষ্য-শরীরে থাকতে পারেন, তাও ধারণা করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো, সেবক রামলাল একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সংশয়ের কথা বলেন ঃ "আমি তাঁকে 'আপনি' 'আপনি' করতুম, খুড়ো বলে মনে হতো না। ঠাকুরের আচরণ ভাব ও সমাধি দেখে কিছু বুঝতে পারতুম না, মনে একটা সংশয় উঠত। ভাবতুম ইনি (অর্থাৎ ঠাকুর) একজন মুখ্‌খু শুখকু মানুষ, এঁর কাছে কত বড় বড় লোক ও পণ্ডিত এসে পরাস্ত হচ্ছে, ইত্যাদি। ইনি কে, সত্যই কি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন? একদিন আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "দেখুন, আমার মনে আপনার সম্বন্ধে সংশয় ওঠে, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।" এই কথা শুনে ঠাকুর আমায় বললেন ঃ "দেখ, বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জানিস, যেমন জিলিপির পাক রে। জিলিপি গোল চক্রের মতো ঘুরানো আছে, ওপরে কিছু বুঝবার নেই, কিন্তু মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে। তুই যা মনে করেছিস (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন) তাই যদি এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) হয় তো এটার সেবা করছিস, মা কালীর পুজো ও ভক্তদের সেবা করেছিস। আবার এই রক্তের (নিজ শরীর দেখাইয়া) স্রোত তোর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে। এর বেশি আর কি চাস?"[১]

প্রিয়জনের বিরহে মানবহৃদয়ে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এটি স্বাভাবিক নিয়ম। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যান, তখন রামলালদাদা ঠাকুরকে বলেন ঃ "আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন করবে।" তিনি শুনে বললেন ঃ "তুই মনে করবি যে, আমি যেন কলকাতায় গেছি, [illegible]। আবার আসব এই ভাববি, তাহলে মন কেমন করবে না।"

রামলালদাদা পরবর্তী কালে ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "সেই অবধি মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর এখান থেকে চলে গেছেন। সর্বদাই মনে হয় তিনি রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই।

"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'যে আসবে, চেনা হোক, অচেনা হোক, তুই তাকে একটু মিষ্টি, এক ঘটি গঙ্গাজল খেতে দিবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। এই করলে জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞের ফল যা কিছু সব হবে।' তাই এইগুলি করি, তাই খুব আনন্দ পাই। আর বাস্তবিক ধ্যান-জপে তেমন মন বসে না। তবে অভ্যাসবশত যা করি এই পর্যন্ত।"[২]

"এখন তাঁর (ঠাকুরের) ভক্তসংখ্যা বেড়েছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে কত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ভাব! যাদের ভাষা জানি নে, এমন কত লোক দেশ-দেশান্তর থেকে এসে পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ধূলি নিয়ে যায়, অশ্বত্থপাতা নিয়ে যায়, বেলপাতা নিয়ে যায়।"[৩]

একেই ভক্তিশাস্ত্রে বলে প্রেমের লক্ষণ। প্রেমাস্পদের অধর মধুর, বদন মধুর, রূপ মধুর, হাসি ও কথা মধুর, নৃত্যগীত মধুর, বাসস্থান, জিনিসপত্র সব মধুর। "মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।"

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমলকৃষ্ণ মিত্র, পৃঃ ৬২ ২ তদেব, পৃঃ ৬-৭, ৬১-৬২
৩ শিবানন্দ বাণী, ১/১৩৩

প্রিয়তমের বিচ্ছেদে দুঃখ আছে, আনন্দও আছে। পুকুরের অগভীর জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়লে মাছেরা আনন্দে খেলা করে আর ভাবে চাঁদ তাদেরই সঙ্গী। চাঁদ অস্ত গেলে তারা বিষাদগ্রস্ত হয়; আবার চাঁদের অপেক্ষায় ক্ষণ গোণে। পদ্ম সূর্যোদয়ে বিকশিত হয়; আবার সন্ধ্যাগমে পাপড়িগুলি বন্ধ করে সারারাত প্রিয়তমের ধ্যানে কাটায়। ঐ ধ্যানে আনন্দ আছে। আমরা স্থূলবুদ্ধির মানুষ, তাই ক্ষণিক স্থূল শরীরের মিলনের আনন্দটাই বুঝি। সূক্ষ্ম মনের বা আত্মার মিলনানন্দ যে দীর্ঘস্থায়ী তা বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন,

"প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।"

আমরা অনেক সময় ভাবি, আমরা যদি ঠাকুরের কাছে থাকতাম কি আনন্দটাই না হতো! স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন ঃ "ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা করে যা না হয় তখন তা আপনিই হতো।"[৪] স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন ঃ "ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘন্টার কীর্তনে যা আনন্দ হতো, তাতে সারাজীবনের দুঃখকষ্ট পুষিয়ে যেত।"[৫]

আবার শ্রীম বলেছেন ঃ "কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুজ্যে ফটকের বাইরের দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমায় আবার নেও মামা।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক।' আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন, 'আমি কি তখন তোমায় জানতুম?' অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।"[৬]

চর্মচক্ষে দেখা আর ভাবচক্ষে দেখা

মানুষ চর্মচক্ষে ঈশ্বরের মায়িক জীবজগৎ দেখে। এ দেখার শেষ নেই। মায়া এককে বহু করে, তাই এই জগৎ বৈচিত্র্যময়। তারপর সাধনার দ্বারা চর্মচক্ষু, ভাবচক্ষু বা প্রেমের চক্ষুতে পরিণত হলে সেই মানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখে। একে বলে সমত্ব দর্শন বা জ্ঞান। তখন অনুভব হয়—উপনিষদের ভাষায়—"একই অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেরূপ অদ্বিতীয় আত্মা (সর্বান্তর্যামী) বিভিন্ন জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের সদৃশ হন। আবার তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তদতিরিক্তরূপে বর্তমান থাকেন।"[৭]

৪ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৪০
৫ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (১৩৬২), পৃঃ ৩১
৬ শ্রীম দর্শন--স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ১৯৯-২০০
৭ কঠ উপনিষদ, ২/২/৯

শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে বলেন ঃ "একদিন ঘরে গান হয়েছে। অনেক লোক আছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন। এসো গো মা, বসো।' সত্যি যেন কেউ এসেছেন, এই ভাব, এইরূপে আদর আপ্যায়ন করলেন। আর একদিন খুব গান হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের লোক রয়েছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'মা এসেছেন, মা এসেছেন' বলে। বিশ্বাস হয় না লোকের, তাই আবার বললেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' "[৮]

আমাদের ঠাকুরের মতো চোখ নেই যে, মা জগদম্বাকে ঠাকুরের মতো 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ' রূপে দেখব। আমরা ঠাকুরের বিষয় শুনি, পড়ি, ঠাকুরের লীলা স্মরণ করি, তবুও তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় না। কারণ কোন কিছু সরস করতে হলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন চাই। কেবল বুদ্ধির আশ্রয় করলে বস্তু প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে। শ্রীম ভক্তদের ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন scene রোজ একটি করে ধ্যান করতে বলতেন, যেমন ঃ (ক) দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট। ধ্যানান্তে ভক্তদের বললেন, 'যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না।' (খ) আকাশে নবীন মেঘ উঠেছে। তার প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। ঠাকুরের পিছনে এই কালো চালচিত্র। তিনি পঞ্চবটী থেকে ঘরে আসছেন। (গ) বলরাম-মন্দিরে। বলরামের বাপকে বলছেন, 'অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু আমি দেখি সব এক। ...যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার।'[৯]

ঈশানচন্দ্র রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শন'-প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন ঃ

"খ্রীস্টভক্ত জনৈক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হায়রে, যদি উনিশশত বৎসর পূর্বে জন্মিতাম!' শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত একজন বলিয়াছিলেন, 'যদি ঠাকুরের সময়ে থাকিতাম!' তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, তাহা হইলে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দর্শনের অভিলাষ একবার জন্মিয়াছিল। সাধু অভিলাষ ভগবানের বিধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, মরদেহ ত্যাগ করিলে মানুষমাত্রই চর্মচক্ষুর অদৃশ্য হয়; সেই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব কি?

"কোন মহাপুরুষ, যুগমানব, যুগাবতারকে চর্মচক্ষুতে দেখিতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু মানুষ তো দেখিয়াও দেখিতে পায় না, চিনিয়াও চিনিতে পারে না। ভগবান যীশুকে দেখিয়াছিল সহস্র সহস্র লোক; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং এরিমেথিয়ার যোসেফ যে যীশুকে দেখিয়াছিলেন, সেই যীশুকে তো ফ্যারিসীদিগের সৈন্যরা দেখিতে পায় নাই! যদি দেখিতে পাইত তবে যীশুকে নির্যাতন করিতে, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিতে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনই চরম দর্শন নহে।

"এ-সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয় নীলমণি, কানা ছেলে হয় পদ্মলোচন! প্রণয়ী Helen's beauty দেখেন in Ethiope's brow, যে নারীকে একজন করে

৮ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৫

৯ তদেব, পৃঃ ২৬৭-৬৮

অবহেলা, তাহাকে আর একজন সর্বস্ব পণ করিয়া বরণ করে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ, চর্মনেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেত্রে দর্শন শ্রেষ্ঠ। চর্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ভাবনেত্রে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায়।

"কেহ মনে করিতে পারেন, ভাবনেত্রে দর্শন তো কল্পনারঞ্জিত, সুতরাং অবাস্তব; কিন্তু এ-কথা যথার্থ নয়। মায়ের চোখে সন্তানের যে সৌন্দর্য ধরা পড়ে, সেই সৌন্দর্য সন্তানে যথার্থই বিদ্যমান থাকে, তাহা বাস্তব। সুতরাং চর্মচক্ষুতে দর্শনের ফল যেরূপ সত্য, ভাবচক্ষুতে দর্শনের ফলও সেরূপই সত্য।"[১০]

শাস্ত্র বলেন, "ভাবেন লভতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।" শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, কথা, গান, লীলাস্থান মনকে ঠাকুরের ভাবে উদ্দীপিত করে।

ভাগ্যবানেরা দেখতে পায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।"

আমরা আমাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করি, কারণ ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে সাময়িক অনুপ্রেরণা বোধ করি, আবার মন সেই অবসাদে ডুবে যায়। হা-হুতাশ করি। ভাবি—এ-জীবনটা ব্যর্থ হলো।

শ্রীম এ-বিষয়ে একটু আশার কথা বলেছেন ঃ "আজও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যদি কেউ বই পড়ে—কখন কোথায় বসেছিলেন, কোথায় কি করেছিলেন, এসব জেনে নিয়ে নিজেকেও ঐ স্থানে ঐ সময়ে ঐ সঙ্গে আছে বলে মনে করে কল্পনার ছবি আঁকে, তাহলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে দেখা যায়। আজ যা কল্পনা কাল তা বাস্তব। কল্পনা ঘনীভূত হলে দর্শন হয়। আবার যোগশাস্ত্রে সব বর্তমান—অতীত, ভবিষ্যৎ নাই।"[১১]

নবাগত লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অনুপস্থিতকালে কিভাবে তাঁকে দর্শন করেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে রামলাল-দা বলেন ঃ "বালককে (লাটুকে) দেখি গঙ্গাতীরে বসে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলুম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন করছে। ...বালক নাকি কার নিকট হতে শুনেছে যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিত্য আছেন এবং সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে বালক বসে আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আমি তাকে বাড়ি যেতে বলি। আমার কথা শুনে বালক কি বললে জান?—'হামি ঠিক শুনেছি তিনি ইখানকে আছেন—হামি তাঁর সাথে দেখা না কোরে যাবে না।' আমি যত বলি—'না রে না তিনি দেশে গেছেন।' বালক ততই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে—'আপুনি জানেন না; পরমহংস মশায় ইখানকে আছেন।' বালকের এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। মন্দিরে সন্ধ্যারতি

১০ উদ্বোধন, ৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৭০-৭১

১১ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৩০

করবার জন্য ফিরে গেলুম। মন্দিরে এসে মনে পড়ল যে লাটুকে তো মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়নি। প্রসাদ নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখি যেন কাকে ও প্রণাম করছে। কিছু বুঝতে পারলুম না—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মিনিট দুই-তিন পরে বালক সামনে আমাকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে 'পরমহংস মশায় কুথায় গেলেন?' আমি তো থ হয়ে গেলুম। কোন উত্তর দিতে পারলুম না। বালককে প্রসাদ দিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলুম।"[১২]

স্বামী শান্তানন্দ রামলাল-দার কাছ থেকে আর একটি ঘটনা শুনে[১২ক] লেখেন ঃ

"রামলাল চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে, ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুনলেন যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস করছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম এত্না তকলিব করকে অযোধ্যাসে উন্‌কো ওয়াস্তে পয়দল আঁতে হে, আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২/৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এ-সময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ-কদিন খাসনি, এই পায়েস এনেছি, খা।' এই বলে ওকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, এখন হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে-মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে-সরাটিও দেখালেন। রামলাল-দা সেই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কিভাবে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

রামকৃষ্ণলোকে থাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ কি কেবল কামারপুকুরে, কাশীপুরে বা বেলুড় মঠে? তিনি ভগবান। স্থানকালের অতীত, তিনি সর্বত্র। তিনি সব জীবের ভিতরে আছেন, তবে মানুষে বেশি প্রকাশ। শ্রীম বলতেন ঃ "ঠাকুর কৃপা করে এমনি একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন চোখে, তাতেই সব লাল দেখি, সবকে আত্মীয় বলে বোধ হয়, সব আপনার জন।"[১৩] একেই বলে প্রেমের চক্ষু। এই চক্ষু খুললে সবাইকে রামকৃষ্ণের লোক বলে মনে হয়।

---

১২ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২

১২ক উদ্বোধন ৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৪৩০

১৩ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৯০

ভক্তেরা অনেকে কল্পনা করেন যে, মৃত্যুর পর আমরা সব 'রামকৃষ্ণলোকে' চলে যাব। একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠে—'দেহ ছেড়ে গেলে কোথায় যাব?' মহাপুরুষ মহারাজ এ-সম্বন্ধে বলেন, 'আমরা রামকৃষ্ণলোকে চলে যাব। ঠাকুর থাকবেন, আমরাও সেখানে থাকব।' আমি বলি, কোন লোকে যাচ্ছি না। External কোন world-এ যাচ্ছি না। ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো। মন যখন সদাসর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় ডুবে থাকবে, যখন মুহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে না; তখন যেখানেই থাকি না কেন সেই রামকৃষ্ণলোকেই থাকা হলো।"[১৪]

শ্রীমর ডায়েরী মধুচক্র

মৌমাছি ফুলে ফুলে ছোটে মধুর অন্বেষণে। তারপর মধু সংগ্রহ করে রচনা করে মধুচক্র। মানুষ ঐ মৌচাক ভেঙে মধু পান করে খুশি হয়। শ্রীম ছুটতেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রামকৃষ্ণ-মধু আহরণ করবার জন্য। তারপর তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে সৃষ্টি করলেন এমন এক রামকৃষ্ণ-মধুচক্র, যাতে ভাবীকালের অধ্যাত্মপিপাসুরা আনন্দে রামকৃষ্ণ-মধু পান করে অমর হতে পারে।

কোন এক অতীত যুগে বাল্মীকি 'রামায়ণে' রামকথা ও ব্যাস 'ভাগবতে' ও 'মহাভারতে' কৃষ্ণকথা লিখে গেছেন, এখনও আমরা ঐ পুরুষোত্তমদের জীবনগাথা ও বাণীর আস্বাদ পাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের চোখ ও কল্পনার ভিতর দিয়ে আমরা রাম ও কৃষ্ণকে দেখি। তেমনি আমাদের শ্রীমর, স্বামী সারদানন্দের ও ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদের চোখ দিয়ে ঠাকুরকে দেখতে শিখতে হবে। কারণ এঁরাই ঠাকুরের জীবন ও বাণীর দ্রষ্টা, শ্রোতা, লেখক ও সংগ্রাহক। কালে আমাদের চোখ যখন ঠাকুরের কৃপায় দিব্যচক্ষুতে পরিণত হবে, তখন আমরা ঠাকুরকে সাধ মিটিয়ে দেখতে পাব।

পরবর্তী কালে ক্ষুধার্ত ও তৃষিত মানুষ ছুটে গেছে রামকৃষ্ণ-মধুচক্র-নির্মাতা শ্রীমর কাছে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনতে ঃ

"ভক্ত—আপনি ঠাকুরের কথামৃত কখন লিখতেন? রাত্রি জেগে কি লিখতে হতো? খুব পরিশ্রম হতো; না?

"শ্রীম—পরিশ্রম ছাড়া কোন কাজ হয়? হ্যাঁ, রাত্রে লিখতাম। শুনে এসে পরদিনও লিখেছি, ধ্যান করে করে।

"তারপর চণ্ডীখানি লইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ উহা খুঁজিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ, তাঁর কাজ তিনিই করলেন।' 'মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা' ইত্যাদি পড়িয়া বলিলেন—'একি আর আমি করেছি! ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন।

১৪ উদ্বোধন, ৪৩ বর্ষ, পৃঃ ৩৪৪

তিনিই মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার ভিতর আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন। তিনিই কর্তা ও কারয়িতা। আমরা বুঝি আর না বুঝি।' ''[১৫]

''ভক্ত—আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জীবন দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে। ওরা যখন যোগবাশিষ্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শুষ্ক মনে হয়, বুদ্ধিতে যেন লাঠি মারে। এখানে তো দেখছি বেশ সরস সবল সাবলীল।

''শ্রীম—এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। যাঁর জীবনই ছিল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির জীবন্ত ও জ্বলন্ত উদাহরণ, তাঁর কথা শুনে, বলছি। কেবল বিচারে বেদান্ত বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই। এ করতে হলে সাধন চাই। আর যার এইসব অবস্থা হয় তাঁকে দেখলে তো কথাই নেই। শাস্ত্রের সদর্থ প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। সর্বদাই আসেন যখন কদর্থ হয়ে যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। ভাগ্যিস ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি পাঁচ বছর, তাই এসবের একটু একটু বুঝতে পেরেছি। 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মন্ত্রটি বিদেহ-মুক্তির দৃষ্টান্ত।''[১৬]

''সতীশ (শ্রীমর প্রতি)—অমূল্য জিনিস এই ডায়েরী। কত accurate (যথার্থ) লেখা, time place, personality (স্থান কাল পাত্র) সব আছে। শুনলে মনে হয় চোখের সামনে দেখছি।

''শ্রীম—হাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের সময়ের একটি লোক পেলে আমরা দৌড়ে যাব না কি দেখতে? তেমনি ঠাকুরের কথা। তা শুনতে তো লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে।

''আমরা তাঁর contemporary, (সমসাময়িক) তাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে evidence (সাক্ষ্য) নিতে, examine (পরীক্ষা) করতে। ছেলেখেলা!

''অবতার যখন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় পরখ করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র নেয়। বাকি লোক পরখ করে। তাতে টিকলে তখন নেয়।

''তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের জীবনও দেখে। তাদের কথা শুনে যদি বুঝে ঠিক, তবে নেয়।

''আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সম্পর্কে বলে আমাদের দাম। নইলে কিছু নয়।

''Contemporary (সমসাময়িক) লোক ভাব অনেকটা ঠিক রাখতে পারে। তারপর মিকশ্চার হয়ে যায়। Mother tincture (মূল নির্যাসটি) আর পাওয়া যায় না তখন। First-hand evidence (চোখে-দেখা কানে-শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। তারপর first-hand evidence and second-hand evidence diluted (অধিক তরল) হয়ে যায়। আসল জিনিস আর তখন পাওয়া যায় না।''[১৭]

১৫ তদেব, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৩৪

১৬ শ্রীম-দর্শন, ১১শ ভাগ, পৃঃ ৩৮

১৭ তদেব, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ৩৫-৩৬

"শ্রীম—আমার জীবনের greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) যদি জিজ্ঞেস করেন—তা হচ্ছে পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"[১৮]

এখানে এলে-গেলেই হবে

কথায় বলে ঃ "এলে-গেলেই আত্মীয়তা।" ঘন ঘন দর্শনের ফলে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর বা অবতারের সঙ্গে একবার আত্মীয়তা স্থাপিত হলে অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা ও ভয় দূর হয়। ঠাকুর বলতেন ঃ "আমি আছি আর আমার মা আছেন।" ব্যস, আর কাকে চাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের শেখাতেন কি করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবের সাধন-কথা আছে। যে-কোন একটা ভাব অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়। দক্ষিণেশ্বরের হাঁসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন ঃ "দ্যাখ আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন পতি। (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য) কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, চেষ্টা করব।"[১৯]

ঠাকুর কাউকে কাউকে বলতেন ঃ "এখানে এলে-গেলেই হবে।" এই 'এখানে'-র বিশেষ মানে—ঠাকুরের কাছে। ব্যাপক মানে ঈশ্বরের কাছে। ঠাকুর ছিলেন নররূপী ঈশ্বর। শ্রীম বলতেন, "অবতারকে দর্শন করলে ঈশ্বরকে দর্শন করা হলো—এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন। যীশুও তাই বলেছেন ঃ 'He that hath seen me hath seen the Father,' 'I and my Father are one.' কেন বলতেন, এখানে এলে গেলেই হবে—না তাঁকে দর্শন করলেই উদ্দীপন হবে। জপ-তপ করা কেন?—ভগবানের উদ্দীপন হবে বলে। এখানে যে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন। একেবারে সাক্ষাৎকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে বসে আছেন। তাই বলতেন, 'এখানে এলে-গেলেই হবে।' নিজেকে নিজেই জানতেন।"[২০]

তব তত্ত্বং ন জানামি

শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার জন্য আমরা দৌড়ঝাঁপ করি, দেবদেউলে মাথা কুটি, সাধুসঙ্গ করি, শাস্ত্র পড়ি, কখনও কাঁদি ও হা-হুতাশ করি। কেউ বা নিজের কর্ম ও সংস্কারকে দোষ দেয়, আত্মধিক্কার করে, নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, সময় না হলে কারও বুঝবার অধিকার নেই। গীতা বলেন ঃ "কালেন আত্মনি বিন্দতি।"

১৮ তদেব, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৫
১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/১/১০
২০ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬

বীজ পুতলেই ফল হয় না। কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। অধ্যাত্ম-জীবনেও তেমনি খানদানি চাষার মতো চাষ বা সাধন-ভজন করে যেতে হয়। বৃষ্টি বা কৃপা একদিন বর্ষিত হবেই হবে।

জনৈক ব্রহ্মচারী একবার স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন করেন ঃ "মহারাজ, আমাদের এত গলদ, সন্দেহ হয়, ঠাকুর কি আমাদের মতো হতভাগাদের দেখা দেবেন?" উত্তরে, ব্রহ্মচারীকে অশেষ সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তাঁকে ডেকে যাও, বাবা। খাদ গালিয়ে মনকে গড়েপিটে তৈরি করে তিনিই নেবেন। তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। ভয় নাই। বিশ্বাস কর।"[২১]

কোন কোন গৃহী-ভক্তদের বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই। মুক্তি অনিবার্য। কেউ কেউ মনে করতেন যে, ঠাকুরকে দেখেছি, সুতরাং সাধন-ভজনেরও প্রয়োজন নেই। স্বামীজী কিন্তু এ-ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন ঃ "যারা তাঁর (ঠাকুরের) দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না; আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ-কথা সত্য নয়।"[২২]

স্বামীজীর মতো বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ বলেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে খুব অল্পই বুঝেছেন। ঠাকুরের সন্তানদের কথোপকথন থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব' জানবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টার মধ্যে বেদনা আছে, আবার আশাও আছে। ভক্তিশাস্ত্রে 'আশাবদ্ধ' একটি গুণ। এটি ভগবৎ ভাবের একটি লক্ষণ।

মহাপুরুষ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল অনেক অনেক মুসলমান নরনারীও ঠাকুরকে খোদার পয়গম্বর মহম্মদজ্ঞানে ভজনা করছে। আমি সে বৎসর (উতকামণ্ডে) নীলগিরি পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানকার ভক্তেরা কুনুরে একটি বাংলো ভাড়া করে আমাদের রেখেছিল। আমরা ওখানে আছি এই সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাক্তার সপরিবারে কুনুরে এসে হাজির। পরিচয় নিয়ে জানলুম, তিনি বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বিলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে—খাসা চেহারা। সামান্য দু-চার কথার পর ডাক্তারটি আমায় বললেন, 'আমরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, তার কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বাল-গোপালভাবে ভজনা করেন এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের ওপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা যে, তাঁর ইষ্টদেবই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের ওপর অগাধ ভক্তি! বেশ

---

২১ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ২৫০

২২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪-৯৫

সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন—'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা! তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিবমহিম্নঃ-স্তোত্রের কথা মনে হলো—

'তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ।।'

—হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাহা আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপ হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার!

"বাস্তবিকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ-কথাই বলতে হয়।"[২৩]

ছবিতে দেখাই কি সার হবে?

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রভৃতি অবতারদের সময় ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা ঠিক জানতে পারি না তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন। বিভিন্ন শিল্পী ও ভাস্কর কল্পনার দ্বারা ঐ-সব অবতারের ছবি ও মূর্তি গড়েছেন তাই দেখে আমরা প্রাণের আর্তি মেটাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মোট ছয়খানি ছবি ক্যামেরার দ্বারা তোলা হয়—চারখানি জীবদ্দশায় এবং দুখানি দেহত্যাগের পর। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। এতে ধ্যানের সুবিধা হয়। অযথা কল্পনা করতে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তিনখানি ছবি সু-পরিচিত—কেশব সেনের বাড়িতে তোলা, রাধাবাজার বেঙ্গল স্টুডিওতে তোলা এবং দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণু মন্দিরের সামনে তোলা। চতুর্থখানি ভক্ত রামদত্তের ব্যবস্থায় তোলা হয়। সে-ছবি দেখে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "এ চেহারা আমার নয়।" শশী মহারাজ স্বামী অভেদানন্দজীকে পত্রে ঐ ছবির সম্বন্ধে আরও লেখেন [২৪] ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ রামবাবু কর্তৃক গৃহীত ফটো সম্বন্ধে বলেন ঃ "সেই ফটো দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি কি এত রাগী?' রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, এ-ছবি ঠাকুরের মনঃপূত হয় নাই। রামচন্দ্র সে-ছবি লইয়া গেলেন এবং নেগেটিভসহ ছবিটি গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।"[২৫]

ঠাকুরকে চাক্ষুষ দেখতে কার না সাধ হয়? একবার জনৈক সাধু ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন ঃ "মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে দেখাই কি সার হবে? আমাদের কি কোন উপলব্ধি হবে না?" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ খুব আশ্বাস দিয়ে বলেন ঃ "না, না, ছবিতে কেন? (হৃদয় দেখাইয়া) এইখানেই সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি উপলব্ধি হবে।"[২৬]

---

২৩ শিবানন্দ-বাণী ১/৬৯
২৪ পত্র-সংকলন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, পৃঃ ৩৭
২৫ উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫
২৬ শিবানন্দ বাণী, ২/৬৬

পুরীতে ঠাকুরের ছবি -প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটা অপূর্ব ঘটনা বলেন। মা সেবার পুরীতে সকালে পৌঁছে ঠাকুরের ছবিখানি একটা ঘিয়ের টিনের ওপর রেখে পূজা করে জগন্নাথ দর্শন করতে যান। (তখন মনে হয় ঐ বাড়িতে কোন বেদী বা আসবাসপত্র ছিল না।) মা ফিরে এসে দেখেন ঠাকুরের ছবি টিনের নিচে। মা নিজে বলেন ঃ "শেষে দেখি বড় বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কিনা—সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।"

ভক্ত—ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?

মা—আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁরই ছায়া।[২৭]

ঠাকুর বলতেন ঃ "শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" তেমনি ঠাকুরের ছবি দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে। আমাদের পরিচিত এক হিন্দুপরিবার সৌদি আরবে কর্ম উপলক্ষে যান। ভদ্রমহিলার কাছে ঠাকুরের বাঁধানো ছবি ছিল। আরবে দেবদেবীর ছবির প্রবেশ নিষেধ। সেখানকার কাস্টম (custom) অফিসার, 'কার ছবি' জিজ্ঞাসা করায়, ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে বলেন ঃ "আমার বাবার ছবি।" তিনি মিথ্যা বলেননি। ঠাকুরই প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরম পিতা।

পরবর্তী কালে মানুষ ছুটে গেছে শ্রীশ্রীমাকে ও ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের দেখবার জন্য। মানুষরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা স্পর্শ করেছেন, তাঁদের স্পর্শ করবার জন্যও ভক্তদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আমি স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে রামেশ্বর তীর্থদর্শন করতে যাই। তিনি এই সুন্দর স্মৃতিকথাটি বলেন, যা আমি টেপ রেকর্ডারে তুলে নিই ঃ

"আমি নারায়ণস্বামী আইয়ার নামে এক ভক্তকে জানতাম। তার বাড়ি ছিল মাদ্রাজ থেকে ৭৫ মাইল দূরে। সে ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার গ্রাহক ছিল, ফলে সে ঠাকুর, স্বামীজী ও অন্য শিষ্যদের বিষয় অনেক কিছু জানত। সে অবিবাহিত ছিল, মাকে দেখাশুনা করত, এবং আট টাকা বেতনে একটা বাগানের কর্মাধ্যক্ষ ছিল। তার একটা বাসনা ছিল। সেটি হলো, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যে স্পর্শ করেছে তাঁকে স্পর্শ করবার। সে যখন শুনল যে শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজে আসছেন (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ), সে মাকে দেখবার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ায় সে আসতে পারল না।

"তারপর ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাদ্রাজে এলে নারায়ণস্বামী তাঁর সেই সুপ্ত বাসনা পূরণ করতে মনস্থ করল। সে মাদ্রাজ মঠে গিয়ে শুনল যে, মহারাজ মাদ্রাজ স্টুডেণ্টস হোমে রয়েছেন। নারায়ণস্বামী ছিল দীনতার প্রতিমূর্তি। সে বেলা দেড়টায় স্টুডেণ্টস হোমে উপস্থিত হলো। মহারাজ তখন আহার সেরে সবে বিশ্রাম করছেন। মহারাজের সেবক নারায়ণস্বামীকে অসময়ে আসার জন্য বকুনি দিলেন। মহারাজ শুনতে পেয়ে সেবককে ডেকে ভক্তটিকে ভিতরে আসতে বললেন। নারায়ণস্বামী আমাকে তাঁর

২৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২/৫৭-৫৮

সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছিল ঃ "আমি ঘরে ঢুকে মহারাজের পায়ের কাছে ফলফুল রাখলাম। তারপর আমি মহারাজের পা-দুটি স্পর্শ করলাম এবং মাথা ঠেকালাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। আমি কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না। মন আমার আনন্দে ভরে গেল। আমার বহুদিনের বাসনা পূরণ হলো। আমি মহারাজকে ছুঁয়েছি আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ছুঁয়েছেন। মহারাজ তাঁর হাত দুখানি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন এবং আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি তাঁর শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখলাম। তারপর মহারাজের দিকে মুখ করে আমি পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।"

ইদানীংকালের অনেক ভক্তদের মনে ক্ষোভ—ঠাকুরকে দেখিনি, তাঁর সন্তানদের দেখিনি। কেবল ছবি ও বই নিয়ে কি করে ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাব? একবার বালিগঞ্জের জনৈক ভক্ত শ্রীমকে বলেন (১২.২.১৯১৯) ঃ "আপনারা খুব fortunate (ভাগ্যবান)। ঠাকুরকে স্পর্শ করেছেন, দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সেবা করেছেন।" প্রত্যুত্তরে শ্রীম বলেন ঃ "না, ঠাকুর বলেছেন তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর সন্তানেরা সবাই পাবে। তাঁর ঐশ্বর্য হচ্ছে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম। ঠাকুরকে চিন্তা করলেই ভিতরে শুভ সংস্কার হয়। ... ভক্ত যে ভগবানকে ডাকে, সে ভগবানের গুণে। ভগবানই ভক্তকে ডাকায়। সেটা ভক্তের গুণ নয়। ... তিনিই সব হয়েছেন। ... এখনও ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান, তাঁর ভাব সব ধ্যান করলে তাঁকেই (যেমন আমরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি) চিন্তা করা হয়। ফল একই।"[২৮]

অথাতো রামকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা

ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ প্রথমে বেদান্তের অধিকারি হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ "ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বস্তু, না অপ্রসিদ্ধ।" ব্রহ্ম যদি প্রসিদ্ধ হন তবে আমরা সবাই ব্রহ্মকে জানি, সুতরাং সে-বিষয়ে প্রশ্ন নিরর্থক। আর ব্রহ্ম যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তাঁকে জানবার চেষ্টা বৃথা। যা অজ্ঞাত, তা কখনো জ্ঞাত হয় না। এ-প্রসঙ্গে দীর্ঘ বিচার আছে। এখানে সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

রামকৃষ্ণ কে?—এ-বিষয়ে অতীতে প্রশ্ন উঠেছে, এখনও উঠছে এবং ভবিষ্যতেও উঠবে। রামকৃষ্ণ-তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ও সূক্ষ্ম। ভাবীকালে ব্রহ্মসূত্রের মতো রামকৃষ্ণ-সূত্র রচিত হবে। ঠাকুরের এক-একটি কথা ধরে এক-একখানি গ্রন্থ রচিত হবে, দর্শন সৃষ্টি হবে, ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী লিখিত হবে। রামকৃষ্ণ-সূত্রের কতকগুলি নমুনা ঃ 'যত মত তত পথ'; 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও'; 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল,' 'যত্র জীব তত্র শিব' ইত্যাদি।

২৮ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৩৭

ঠাকুর বলতেন যে, কেউ কাশী দেখেছে আর কেউ কাশীর বিষয় শুনেছে। যে দেখেছে তার কথায় খুব বিশ্বাস হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় খুব জোর। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে গেলে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা বা লেখা অবলম্বন করে এগুতে হবে। এসব ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষ নন; এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর। সাধারণ মানুষ এঁদের ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।

যে কেহ ঠাকুরকে একবার দর্শন করেছে সে-ই মহা পবিত্র ও পুণ্যবান। বিশ্বাসী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত বলতেন, এমনকি যে গাড়িতে ঠাকুর উঠেছেন, সেই গাড়ির কোচম্যান, সহিস, গাড়ি, ঘোড়া পর্যন্ত সব পবিত্র হয়ে গেছে। এ-কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোকে তাঁকে রাস্তায় ঘাটে দর্শন করেছে, কত গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস, সকলেই তো দেখেছে। তারা কি আর তা বলে মুক্ত হয়ে যাবে?" এ-কথা শুনে রামবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি গর্জে বললেন, "যা—যা। সেই গাড়োয়ান সহিসের পায়ের ধুলো একটু নিগে যা। যা—যা। যে মেথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই মেথরের একটু পায়ের ধুলো নিগে যা। তোর মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন পবিত্র হয়ে যাবে।"[২৯]

"রামবাবুর ছিল বৈষ্ণবভক্তের ভাব। একবার হরিপদ (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) বালকোচিত সহজভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?' রামবাবু ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর কিনা বলিতেছিস তাঁহাকে মাঝি-মাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানবি যে, যে মাঝি-মাল্লা সুকৃতিবশত তাঁহার শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান।' হরিপদ লজ্জায় ও ক্ষোভে রামবাবুর নিকট তাঁহার ঐ উক্তির জন্য পায়ে ধরিয়া মার্জনা চাহিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে লিখিয়াছেন, 'অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে-ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আমি তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নই।' "[৩০]

বিজয়নাথ মজুমদার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: "যোগোদ্যান ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। রামবাবু, গিরিশবাবু, অক্ষয়বাবু, হরমোহনবাবু, কালীপদবাবু ও মনোমোহনবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমরাও তিন-চারজন ছিলাম। সহসা একজন বলিলেন—'ঠাকুরের নিকট যাঁহাদের আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সাধক ও শুদ্ধসত্ত্ব।' মনোমোহনবাবু বলিলেন—'ও-কথা আমি মানতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামারে (Grammar) ও-কথা থাকলে আমাদের গতি কি হতো? আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তখন এদের মতোই (পার্শ্বস্থিত যুবকদিগকে দেখাইয়া) আমাদের অবস্থা। আমাদের না ছিল বিশ্বাস, না ছিল

২৯ রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য, পৃঃ ৬৪
৩০ স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ১৫৭

শ্রদ্ধা, না ছিল স্থির লক্ষ্য, না ছিল লক্ষ্যসাধনে তৎপরতা। ইন্দ্রিয়সংযম যে কাহাকে বলে তখন জানতাম না। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি ওসব আগে আসে না। একে একে তাঁর দয়ায় পরে পরে এসেছে। তাঁর কৃপায় তাঁকে ধরবার পর আমাদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, যা বল, সব এসেছে। আমরা নিজের জোরে ওসব পাইনি। তাঁর দয়ায় পেয়েছি।"[৩১]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে এই প্রশ্নটি ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রকে করা হয় ঃ "তাঁহার (ঠাকুরের) অবতার সম্বন্ধে আপনার মত?" প্রত্যুত্তরে গিরিশবাবু বলেন ঃ

"যদি অনুরূপ ঈশ্বর থাকেন তাহলে আমি ক্ষুব্ধ হব। আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনার গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ থিয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ-ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। তাঁহার এক কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হলধারী আমাকে গাছে বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়াছিল।' যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল দেখা যায়, এই কথা স্মরণ হইবামাত্র সন্দেহের উদয় হইতেই পারে না। তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।"[৩২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের ঠাকুর সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

"প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তোর দেখছি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তিনি সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য দিনরাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি সব সংশয় দূর করে দেবেন, তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন—আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই। তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে অনুরাগ, সে আকঙ্ক্ষা কয়জনের আছে।"[৩৩]

"প্রশ্ন—ঠাকুরের ideal existence (মানসিক সত্তা) ছাড়া real existence (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি?

স্বামী সারদানন্দ—আছে বৈকি। অনেকে তাঁকে দেখছে, কথা কইছে।

প্রশ্ন—আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি?

---

৩১ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২২৭

৩২ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পৃঃ ৫৬৩

৩৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী-ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৫৬

স্বামী সারদানন্দ—কিছু কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে কি এমনি পড়ে আছি?

প্রশ্ন—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতেন না কেন?

স্বামী সারদানন্দ—কথা কইতেন বৈকি। এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক এমনিভাবে কথা বলেছেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্র হতো না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে দেখা করে তবে কইতে হবে। স্বামীজী তো আর ঠাকুরের সমান plane-এ (ভূমিতে) ছিলেন না, কর্মের মধ্যে থাকলে মন একটু নিচে থাকে। তাই কথাবার্তা হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের plane-এ (ভূমিতে) নিয়ে যেতে হবে।"[৩৪]

"জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ তো ভাল সাক্ষীকে—বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন। মনে কর, তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম। সবই কি সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ শুনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই, বিশ্বাস—অচল অটল। সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না।"[৩৫]

আমি যদি জন্ম নিতেম

মানুষের কল্পনার শেষ নাই, সীমাও নাই। অনেকে কল্পনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না—কল্পনা কি করে বাস্তবে রূপ নেয়। একটা উদাহরণ দিই ঃ আমেরিকায় এমন লোক নেই যে ডিসনিল্যাণ্ডের (Disneyland) কথা জানে না। তা হলো পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্তবিনোদনের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াল্ট ডিসনি (Walt Disney)। তিনি একবার ইংলণ্ডে গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার বড় বড় পুরান ক্যাসলগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "দেখুন ঐ সব পুরান ক্যাসলে অনেক ভূতপ্রেত আছে। তাদের বাস্তুহারা করছেন কেন? আপনারা যদি ঐসব বাস্তুহারাদের জন্য বাড়ি তৈরি না করেন, তবে আমি ওদের আমেরিকায় নিয়ে যাব।" ওয়াল্ট ডিসনিল্যাণ্ডে Haunted House তৈরি করলেন। ইহা এক আকর্ষণীয় দৃশ্য। ঐ-সব বৃটিশ ভূত প্রেত এখন আমেরিকার ডিসনিল্যাণ্ডে নাচছে, গাইছে, কাঁদছে, হাসছে, বাইবেল পড়ছে। এভাবে কল্পনা রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ দৃঢ় করে ধরতে পারে না—তাই বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

৩৪ স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৩৪০-৪১

৩৫ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ৩১

রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' কবিতাটি এখনো মনে আছে ঃ

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।
চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যু জরা।
জীবন-তরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"

আমরা যদি জন্ম নিতেম রামকৃষ্ণের কালে? কি হতো? একবার আমেরিকার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ মনে করুন আপনি রাতে একা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় যীশুখ্রীস্ট সশরীরে আপনার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আপনি কি করবেন? খুব করে ভেবে দেখুন।

ভক্তদের চুপ করে থাকতে দেখে বললাম ঃ "আমি জানি আপনারা কি করবেন। আপনারা টেলিফোনে ৯১১ ডায়াল (dial) করবেন। (আমেরিকায় ৯১১ হচ্ছে এমারজেন্সি নাম্বার। ৯১১ ডায়াল করামাত্র অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে—কাকে চাই? পুলিশ, অ্যামবুলেন্স অথবা ফায়ার-ব্রিগেড?) আমরা ভীতু। খ্রীস্টকে দেখবার জন্য এখনও প্রস্তুত হইনি।" অনেকে বলবে, "প্রভু, তুমি দেয়ালের ঐ ছবিতে ঝুলে থাক। তোমাকে কাছে দেখলে বড় ভয় করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকা অত সহজ ছিল না। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে পড়েছি—মায়ের উঠতে একটু দেরি হলে ঠাকুর নহবতের দরজার চৌকাঠের ভিতরে জল ঢেলে দিতেন। মা ও লক্ষ্মী-দিদি মেঝেতে শুতেন। অনেকদিন বিছানা ভিজে যেত। আমেরিকার মহিলাদের আমি ঠাট্টা করে বলি, এমন স্বামী পেলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স করে দিতেন!

রানী রাসমণিকে মা-কালীর মন্দিরে মকদ্দমার চিন্তা করতে দেখে ঠাকুর দুই চাপড় মারলেন। বরানগরের ঘাটে বসে জয় মুখুজ্যে অন্যমনস্ক হয়ে জপ করছিল। ঠাকুর তাকে দুই চাপড় মারলেন। এঁরা সব ভাগ্যবান। ঠাকুর চিরদিনের তরে ওদের মন ভগবৎমুখী করে দিলেন। যখনই তাঁরা অন্যমনস্ক হবেন ঠাকুরের কথা মনে করবেন। অনেক সময় ভক্তদের মনে হয়—হায়! সকাল-সন্ধ্যায় যদি ঠাকুরের দুটি চড় খেতাম, কি সুন্দর ধ্যানজপটাই না হতো!

মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত ছিল। নিজের অবর্তমানে ঠাকুরের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে একটা তালুক লেখাপড়া করে দেবার পরামর্শ হৃদয়ের সঙ্গে করতে গিয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর ঐ-কথা শোনা মাত্র উন্মত্ত হয়ে "শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস" বলে মথুরকে মারতে গেলেন। শোনা যায় মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রক্ষা পান।

লাটু মহারাজকে একদিন সন্ধ্যায় ঘুমোতে দেখে ঠাকুর প্রায় তাকে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ এক রাতে দুখানা রুটি বেশি খাওয়ায় ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের (৪ খানি) অধিক দিতে বারণ করেন। অবশ্য মা তাঁর কথা গ্রহণ না করে বলেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে মনস্থ করেন। তারপর আলমবাজার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। তিনি শুনেছিলেন যে, ঠাকুর সব লোকের মনের কথা জানেন। সুতরাং সকলের সামনে ঠাকুর যদি তার মনের কথা বলেন, তাহলে তাকে বিব্রত হতে হবে। এই ভয়ে তিনি আর ঠাকুরকে দেখতে গেলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ। লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। 'যাকে যেমন তাকে তেমন'—এইভাবে শিক্ষা দিতেন। উত্তররামচরিতে ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল।

হায় বাসনা! ঠাকুরের কাছে থাকবার বাসনা উঠলে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে: কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, "মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।"[৩৬] মায়ের এ -কথা পড়লে চোখ দিয়ে জল গড়ায়। নিজের স্বামীকে জগতের স্বামী করবার জন্য মায়ের এ স্বার্থত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আমরা ধন্য—তোমরাও ধন্য

এ-জগতে যারা সন্দিগ্ধমনা তারা চিরদুঃখী। সন্দেহ তাদের সুখশান্তি ধ্বংস করে। বাইবেলে খ্রীস্ট-শিষ্য টমাসকে 'Doubting Thomas' বলা হয়। পুনরভ্যুত্থানের পর যীশুখ্রীস্ট শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হন। তখন টমাস সেখানে ছিল না। বন্ধুদের কাছে যীশুর আবির্ভাবের কথা শুনে টমাস বলল যে, সে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন সে নিজে হাতে যীশুর গায়ে ক্রুশ চিহ্ন স্পর্শ করবে। আট দিন পরে যীশু আবার সব শিষ্যদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, এবং টমাসকে দেখে বললেন, "তুমি আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের ও বুকের পাশের ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ কর। অবিশ্বাস করো না—বিশ্বাস করো।" টমাস বলে উঠল, "হে মোর প্রভু, হে মোর ঈশ্বর।" যীশু বললেন, 'টমাস, তুমি দেখেছ সেহেতু তুমি বিশ্বাস করলে। তারাই ধন্য, যারা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে।"

তারাই ধন্য যারা ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে তাঁকে ধরে রয়েছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ

৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২/৫৫

বলতেন ঃ "আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুরকে লইয়া পড়িয়া থাক—দেখিবে পরে কি হয়। তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও—দেখিবে সত্যসত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি।"[৩৭]

অনেকে হা-হুতাশ করে বলেন ঃ "আমাদের সংস্কার খারাপ", "আমরা ভাগ্যহীন", "এ-জীবনে আমাদের কিছু হলো না" ইত্যাদি নেতিমূলক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর শিষ্যগণ পছন্দ করতেন না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভক্তদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ "আমরা না হয় তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে পাগল হয়েছি, কিন্তু তোমরা যে তাঁর নাম শুনেই পাগল।"[৩৮]

একবার জনৈক সন্ন্যাসি-সেবক মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন ঃ "মহারাজ, আমরা ঠাকুরকে দেখিনি। আপনি আছেন, এতেও আমাদের কত আনন্দ! আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনার কাছে থাকতে পেয়েছি, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আছেন, তাই এত সাধুসন্ন্যাসী ও কত ভক্ত, সকলেরই ভরপুর আনন্দ। আমি তো এক এক সময় ভাবি, কত লোক দূর দূর থেকে টাকা পয়সা খরচ করে, কত কষ্ট স্বীকার করে আসে শুধু একটিবার আপনাদের দর্শন করতে! আর আমাদের এমনই সৌভাগ্য যে, সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকতে পারছি।"

মহারাজ খুবই আবেগভরে বলিলেন—"ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তোমাদের ওপর। তাই তিনি তাঁর ভক্তের সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা। তোমরাও ধন্য, আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত?"[৩৯]

ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি আছে। ব্রহ্মা বলছেন, "আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাই, কোন বনভূমিতে। সকল বনের ভিতর বৃন্দাবনে জন্মলাভ করতে পারলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করব। কারণ, বৃন্দাবনবাসিগণ অহর্নিশ তাদের মিত্র কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছে। আপনার ও তাদের চরণরজে ব্রজভূমি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। সেই চরণরজ আমার শিরে ধারণ করে ধন্য হব। বেদও এই চরণরজের জন্য লালায়িত।

"হে কৃষ্ণ, যতদিন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় না হয়, ততদিন তাদের স্নেহাদি বৃত্তি চোরের ন্যায় তাদের সর্বস্ব হরণ করে তাদের অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। ততদিন তাদের গৃহ কারাগার-সদৃশ হয়ে থাকে, ততদিন তাদের পাদদ্বয় মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে।

"হে প্রভো, পৃথিবীতে আপনার অবতারশরীর গ্রহণ কেবল শরণাগতজনের আনন্দরাশি বৃদ্ধির জন্য। আপনি স্বরূপত নিষ্প্রপঞ্চ।"

শ্রীম বলেন ঃ "ব্রহ্মার ঐ কথাটি বড় সুন্দর—ব্রজে বাসের বাসনা নরশরীর ধারণ

৩৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৩৪ ৩৮ উদ্বোধন, ৪১ বর্ষ, পৃঃ ৩০৩
৩৯ শিবানন্দ-বাণী, ২/১৬০ ৬১

করে। কেন? না, ওখানকার ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণচিন্তা নিরন্তর করে করে কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন। তাঁদের চরণরজঃ মস্তকে পড়লে ব্রহ্মা কৃতকৃত্য হবেন। ব্রহ্মা বেশ বললেন, শরণাগতজনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরীর।

"আমরা তাই ধন্য। তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে ঘর করেছি, তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরেছি, তাঁর প্রসাদ খেয়েছি, চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করেছি, কানে তাঁর কথা শ্রবণ করেছি, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার-নিরাকার রূপ দর্শন করেছি, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাপ্ত হয়েছি, আমরা ধন্য। তোমরাও ধন্য তাঁর কথা শুনে, না দেখে তাঁকে ভালবেসেছ। তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছ। তাঁর ভক্ত যারা ঘরে আছে তারা কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর এ-কথা বলেছিলেন।"[৪০]

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন ঃ "মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে কেউ চোখে চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর-দর্শন হলো না।" মা উত্তরে বললেন ঃ "স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।" পরে ভক্তটির মাথায় হাত রেখে মা দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।"[৪১]

স্বামী প্রেমানন্দ একবার স্বামী গিরিজানন্দকে (ইনি মায়ের দীক্ষিত) বলেছিলেন ঃ "তোরা কি কম মনে কচ্ছিস নাকি? শ্রীশ্রীমায়ের ছেলে যারা তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাকি? আমাদের পায়ের ধুলা সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড় হয়ে গেছি মনে করিস? আমরা ঠাকুরকে দেখে এসেছি, আর তোরা না দেখে এসেছিস। তোরাই তো আমাদের চেয়ে বড়।" ("মদ্ভক্তানাং যো ভক্তঃ স মে ভক্ততমো মতঃ"।)

স্বামী গিরিজানন্দ বললেন, "ঠাকুর আপনাদের বড় করে গেছেন।" স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, "তিনি আমাদের বড় করেননি, ছোট করে গেছেন। তোরা সব ছোট হবি, অহঙ্কারগুলোকে একেবারে মনের ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিবি। ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।"[৪২]

গিরিশবাবু এক পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন ঃ "কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া আক্ষেপ করে যে, ঠাকুরের দর্শন পাই নাই। আমি তাহাদের বলি যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত শতমুখী হইয়াছিলেন, ঠাকুরের প্রেমও সেইরূপ ভক্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বহিতেছে, জগৎকে পরিত্রাণ দিবে।"[৪৩]

আজ যদি ঠাকুর থাকতেন

জীবনে যখন ঝড়ঝাপটা আসে, চারিদিক অন্ধকার দেখি, পথ খুঁজে পাই না—তখন কেবল মনে হয় আজ যদি ঠাকুর থাকতেন তবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াতাম, মনের

৪০ শ্রীম-দর্শন, ৯ম ভাগ, পৃঃ ১৭০-৭১ ৪১ মাতৃদর্শন, পৃঃ ২৪৭ ৪২ প্রেমানন্দ, ২/৫২ ৫৩
৪৩ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পৃঃ ৬০৯

খেদ মিটাতাম। সংসারের অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক মানুষকে অহরহ পুড়িয়ে মারছে। চিতা মানুষকে একবার মাত্র পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা সর্বদা দাহ্ করছে। ঐজন্য মানুষ ছুটে গেছে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেন ঃ "সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকা ঠিক নয়—হাসবি, তামাসা করবি, তবে তো মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারবি। ঠাকুর ফুর্তি করে কত গল্প বলতেন, কত রসিক লোক ছিলেন।"[৪৪]

দক্ষিণেশ্বরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন ঃ "আজ ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কত অবান্তর এসে যেতে পারে, কত ভুলচুক করে ফেলছি। তাঁদের ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচি। যাক—যখন সময়টা আমার ভাল যাচ্ছিল না, সাংসারিক সুখ একেবারেই ছিল না, অভাব আর অভাব, কিছুতেই কুলোয় না; বেশ মনে আছে—ঠাকুরের কাছে অনটন বা অভাবের কথা কোন দিন মাথায় বা মনে উদয় পর্যন্ত হয়নি। তাঁর কৃপা ভিন্ন তা সম্ভবই ছিল না। তাঁর কথা শুনতেই যেতাম, শুনে আসতাম।

"দুই কি আড়াই বছরের মধ্যে যে-কয়দিন তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, একদিনও তাঁকে একলা পাইনি। সাংসারিক মনঃকষ্ট তো যাচ্ছিলই, একদিন আপিসে যাব বলে বেরিয়ে ওপারে (বালীর পারে) পৌঁছে আর আপিসে গেলুম না, ইচ্ছা হলো না। গিয়ে কি ফল? তার চেয়ে ঠাকুরের কাছে যাই। কলকাতার ফিরতি পানসি ডেকে পূর্বপারে রানী রাসমণির ঘাটে গিয়ে নাবলুম। দেখতে পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। নিকটে উপস্থিত হতেই ঃ 'কিরে—আপিস পালালি! ওটা ভাল নয়। তোরা কুমিরের মতো, জলের মধ্যে বা সংসারে হাঁপিয়ে উঠলে—শ্বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকিস, আবার সে-কথা ভুলে গিয়ে ডুব মারিস—বেশিক্ষণ থাকতে পারিস না। দুঃখকষ্ট না থাকলে কি কেউ এদিক মাড়াতো! দুঃখকষ্ট বড় দরকারি জিনিস রে। সেই তো মানুষকে সৎপথ খোঁজায়। ভাগ্যবান পথ দেখতে পায়।'

পরে বলেন ঃ 'বিবাহ করেছিস, মা আছেন না?' 'আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছেন।' একটু চুপ করে রইলেন, যেন কি ভাবলেন। শেষে বললেন ঃ 'যা এখন সংসার কর, একটু দুঃখকষ্ট থাকা ভাল, এগিয়ে দেয়। দুঃখ না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নিত না।' এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক একটি বলছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হলো তিনি যেন কষ্টবোধ করছেন। সত্যিই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে। না, আর নয়, বললুম ঃ 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন, এই তো আহারের পর উঠেছেন, আমি বুঝিনি, জ্বালাতন করছি।'

'কষ্ট তো আছেই, কিছু জানবার থাকে তো বল।' হাসতে হাসতে বললুম ঃ 'আমাদের তো সবই জানবার, জানলুম আর কি?' 'কেন, ভগবানকে জানবি, চেষ্টা থাকলেই পাবি।

৪৪ তদেব, পৃঃ ৬০৯

তিনি যখন রয়েছেন, পাবিনি কেন। ইচ্ছা প্রবল হলেই পাবি। সে ইচ্ছা আনা চাই।' 'আপনি আশীর্বাদ করুন।' 'ওসব আশীর্বাদের বস্তু নয়, নিজের কাজ—আকাঙ্ক্ষা বাড়া। বাড়ি যা।'

"জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে তিনি তখনো বলতে প্রস্তুত। কি জিজ্ঞাসা করব—তাই জানি না। তাঁকে ঘরে দিয়ে বাড়ি ফিরলুম।"[৪৫]

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরে কেদারবাবুর মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা দেয়। তিনি উদাসীর মতো ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এক চলতি নৌকায় কলকাতায় যেতে রানী রাসমণির কালীবাড়ি চোখে পড়ল। হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।"

বাগবাজারের ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সেদিন কলকাতায় যাননি। পূর্বের এক শোনা কথা সহসা হৃদয়ে ধ্বনিত হলো ঃ "কাঁকুড়গাছিতে ভক্ত রামদত্ত মহাশয়ের বাগানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির হয়েছে।"

কেদারবাবু কাঁকুড়গাছি কোথায় সঠিক জানতেন না। শুধু শুনেছিলেন যে, রেললাইন পেরিয়ে নারকেলডাঙ্গার কাছে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। সেই একবার মাত্র রাসমণির বাগানের সামনে একপ্রকার অসম্বিতেই তাঁর প্রাণ বলে উঠেছিল, "ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।" ঐ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল।

তাঁর আত্মকথা ঃ "রেল লাইন পার হয়ে আবার রাস্তা—তার দুধারে বাগানই বেশি। বসতবাটি বিরল। বেলা বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর, গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র প্রচণ্ড—ঝাঁ ঝাঁ করছে। পথ প্রায় জনশূন্য। দিনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয়।... নিশ্চয়ই রামবাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে। কিন্তু কোথায়? আরো একটু এগুলাম। দক্ষিণে একটা গলিপথ কিছুদূর চলে গিয়েছে, প্রান্তে ফটক দেখা যাচ্ছে আর বাঁশঝাড়।... গেট বন্ধ নয়—ভেজানো রয়েছে। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম।

"কিন্তু মন্দির কই—ঠাকুরের সমাধি-মন্দির? তবে কি এ-বাগান নয়? মন যে বলছে—এই বাগানই। এগোতেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটা ছোট পুষ্করিণী। তার চারদিকে রাস্তা। পুষ্করিণীর পূর্ব পারে পশ্চিমমুখো একটি ছোট পাকা কুটুরী—চুনকাম করা। এইবার কুটুরীর দিকে সোজা-সুজি চাইলুম—দ্বার উন্মুক্ত। এ কি! ঠাকুর যে! প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠল। ধন্য ভক্ত, একেবারে যে জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন! 'সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড়—সেই তেমনি কাঁধে ফ্যালা। আবার দেখলুম—এ কি, হাওয়ায় দাড়ির দুই এক গাছি চুলও মৃদু মৃদু নড়ছে! আশ্চর্য! যেমনটি দেখেছি হুবহু সেই মূর্তি!' "

তিন-চার মিনিট দর্শনের পর কেদারবাবু বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুনতে পেলেন পূজারীর কণ্ঠস্বর, "কে গা আপনি? কি দেখছেন?" "ঠাকুরকে দেখছি। এইটিই কি রামদত্ত মশায়ের বাগান?"—এই বলে কেদারবাবু পূজারীর দিকে এগুলেন।

৪৫ উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, পৃঃ ৭৩-৭৫

"কি দেখছিলেন—বললেন?"

"পরমহংসদেবের মূর্তি...!"

"মূর্তি? কোথায়? কি বলছেন?"

"কেন—ঘরের মধ্যে তবে...।"

"ঘর তো বন্ধ। চাবি এই আমার কাছে রয়েছে। ঘরের মধ্যে রূপার বাসন-কোসন রয়েছে... দেখবেন কি?... বড় জোর এক ঘণ্টা হবে, পূজাদি সেরে ঘর বন্ধ করে খেতে গিয়েছিলুম। আপনি ওসব কি?..."

তখন উভয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে দেখেন, ঐ ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত, আর ঘরের মধ্যে ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মূর্তির চিহ্নমাত্রও নেই। বিহ্বল কেদারবাবু একটু সামলে বললেন, "মশাই, আপনার জিনিসপত্রগুলো সব ঠিক আছে কিনা আগে দেখে নিন।" পূজারীও অবাক হয়ে বললেন, "সেসব আমার সামনেই রয়েছে—ঠিক আছে। কিন্তু কয় বৎসর নিত্য এই কাজ করছি এমন ভুল তো কোনদিন ঘটেনি।"

তারপর "এটি রামবাবুর বাগান কিনা?" কেদারবাবুর এ-প্রশ্নের উত্তরে পূজারী বললেন, "হ্যাঁ, তাঁরই যোগোদ্যান। আর এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধি-মন্দির। আচ্ছা, আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? অনেকেই তো আসেন। আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। বাবুকে কি বলব?"

"বাবুকে বলবার দরকারই বা কি? এই তো বললেন কত লোক আসেন, আমিও সেইরূপ একজন। ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় এসেছিলুম।"

তারপর পূজারীর কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদী শশা, কলা, পেঁপে, শাঁকালু, বাতাসা, আর এক গ্লাস জল খেয়ে কেদারবাবু দেহমন শীতল করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। অমনি এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, "বাবু যাবেন নাকি—কোথায় যাবেন?" বলে তাঁর সামনে থামল।

"দক্ষিণেশ্বরে।"

"আসুন, আমার বরানগরের বেণী সার আস্তাবলের গাড়ি।" গাড়িতে বসে কেদারবাবু ঠাকুরের অপূর্ব লীলা চিন্তা করতে লাগলেন: "আজ যখন নৌকা রানী রাসমণির মন্দির সম্মুখে, তখন তো আমার কোন চিন্তা, কোন জ্ঞানই ছিল না, কোথা হতে অবচেতনা সহসা সাড়া দিয়ে উঠল—'ঠাকুর যদি আজ থাকতেন?' কেন যে এ-কথা (মনে) এসেছিল, কি অভাব বোধ হয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাকুলতা কি কাতরতা তার মধ্যে গোপন ছিল কিনা—তাও তো জ্ঞানত বলতে পারি না। হে ভাবরূপী ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী, তুমিই অন্তরে বসে ও-কথা বলিয়ে থাকবে, আবার অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তুমিই ব্যবস্থা করে সে অভাব মেটালে! এ অভাগার প্রতি একি অনির্বচনীয় করুণা! 'সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝাড়ো!' এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে? কোথায় পাব?"[৪৬]

৪৬ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ২৯২-৯৮

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমন

মুখবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমন বিষয়টি বিতর্কিত। আমাদের এক আমেরিকান ভক্ত বইতে পড়েছিল যে, ঠাকুর একশ বছর পরে বাউল হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। ১৯৮৬ সালে ভক্তটি শ্রীরামকৃষ্ণের নবরূপ দেখবার জন্য বীরভূম জেলায় কেঁদুলীর মেলায় (জয়দেব মেলা) হাজির হলো। তারপর বিভিন্ন বাউলদের সঙ্গে ঘুরে এসে জানাল তার হতাশার কথা। তখন আমি এই প্রবন্ধটি লিখি।

প্রকৃতপক্ষে, কথামৃতে ঠাকুরের একটি স্পষ্ট উক্তি আছে—"বায়ু কোণে (উত্তর-পশ্চিম) আর একবার দেহ হবে।" এখন দক্ষিণেশ্বর থেকে উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান, পাঞ্জাব, আফগানিস্থান,রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি যে-কোন স্থান হতে পারে। আবার ঠাকুরের পার্ষদদের কাছে শোনা গেছে যে, একশ বা দুশ বছর পরে আসবেন; কেউ বলেছেন, সময় সম্বন্ধে কিছু শোনেননি। স্বামীজীকে একবার পাশ্চাত্যে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ "খ্রীস্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন?" তিনি উত্তরে বলেন ঃ "এসব ব্যাপারে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমার কাজ হলো মূল নীতি নিয়ে। ভগবান বারবার আবির্ভূত হন, আমি শুধু এ-কথাই প্রচার করি; রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ-রূপে তিনি ভারতে এসেছেন এবং আবার তিনি আসবেন। এ-কথা প্রায় স্পষ্টভাবেই দেখানো যেতে পারে যে, প্রতি পাঁচশ বছর অন্তর পৃথিবী নিমজ্জমান হয় এবং তখন প্রচণ্ড একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আসে, আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে থাকেন একজন খ্রীস্ট।"[1] স্বামীজী নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন যে, ঠাকুর এযুগের অবতার।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন ঃ "তিনি (ঠাকুর) শত বৎসর সূক্ষ্ম শরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন।" এখন এই 'শত' বলতে মা নিশ্চয়ই 'শত শত' বছর ইঙ্গিত করেছেন, কারণ ঠাকুরের দেহত্যাগের শতবর্ষ পর এখনো অগণিত ভক্ত ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করে চলেছে। এসব কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভ্রান্তিতে পড়বার সম্ভাবনা, অথবা এও হতে পারে—মায়ের স্মৃতিকথা লেখকের লিপিতে 'শত শত' বছরের জায়গায় 'শত' বছর হয়েছে।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭

ত্রেতাযুগে রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, আড়াই হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধ, দুহাজার বছর পূর্বে খ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁরা এখনো কোটি কোটি মানবের হৃদয়ে বেঁচে আছেন ও থাকবেন। অবতারপুরুষেরা দেশ ও কালের উর্ধ্বে। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী কালাতীত। এখন ঠাকুর যখন, যেখানে, যেভাবে আসুন না কেন—তাঁর ভাবধারা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীস্টের ন্যায় অনন্ত কাল ধরে চলবে।

এই প্রবন্ধটি গত দশ বছর আমার কাছে ছিল। কোন কোন সাধু আমাকে এটি ছাপাতে বারণ করেছিলেন, কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, এ-প্রবন্ধ ভক্তদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঠাকুরের ভক্তরা তাঁর পুনরাগমনের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পরস্পরবিরোধী উক্তি পড়ে বিভ্রান্ত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক প্রাচীন ও পণ্ডিত সন্ন্যাসীর কাছে প্রবন্ধটি পাঠ করি (৮ ও ১১ আগস্ট ১৯৯৭)। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে এটি ছাপাবার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধে আমি ঠাকুরের পুনরাগমনের পক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ কিছু না বলে ঐ-বিষয়ক বিভিন্ন উক্তির একটা যুক্তিপূর্ণ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছি মাত্র।

কল্পনা ও প্রতীক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'মজার মানুষ', 'মনের মানুষ'। মনের মানুষকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে কার না ভাল লাগে? প্রাণের সঙ্গীর সঙ্গে ভাব জমাতে পারলে জীবনের সার্থকতা। হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুরের লক্ষণ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে লিখেছেন ঃ "যার ভাবাঙ্কুর জন্মেছে, তার ভিতর ক্ষান্তি (চিত্তের অক্ষোভিত ভাব), অব্যর্থকালত্ব (ভগবৎ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তায় সময় ব্যয় না করা), ইন্দ্রিয়ভোগে বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবানের গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাঁর বসতিস্থানে প্রীতি প্রভৃতি গুণ দেখা যায়।" প্রেমিক ভক্তের স্বভাবই হচ্ছে প্রেমাস্পদ ভগবানের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা। তাঁকে এ-জীবনে নিশ্চয়ই পাব—এরূপ দৃঢ় আশা হৃদয়ে পোষণ করা। তাই ভক্তিশাস্ত্রে রয়েছে—"আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া"।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমনের আশা করতাম না, যদি তিনি নিজ মুখে না বলতেন যে, তিনি আবার আসছেন। তাঁর দৈবীলীলার স্থান-কাল-পাত্র, কথা-কাহিনী-সঙ্গীত কিছুই ম্লান হয়নি। এ হলো ১৯৯৮ সাল। যদিও তাঁর অন্তর্ধানের একশ এগার বছর অতিক্রান্ত হলো, তবুও এখনো সবকিছু যেন জীবন্ত। তাঁর ব্যবহৃত জামাকাপড়, খাট-বিছানা, থালাবাটি, হুঁকো-কলকে, চটি, ছবি, হাতের লেখা পুঁথি সবকিছু রয়েছে। এগুলি যখন দেখি তখন অবিশ্বাসী মনকে বলি ঃ "দেখ হে, এগুলি স্বয়ং অবতার ব্যবহার করেছেন।" এতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেদিন লীলাপ্রসঙ্গের ক্লাসে বলছিলাম ঃ "ঠাকুরের জীবনী ও কথামৃত পড়লে মনে হয়, তিনি কত আপনার জন।" একটি আমেরিকান মেয়ে আবেগভরে বলে ফেলল ঃ

"Swami, Avatar is my great grandfather." (মেয়েটির গুরু স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ এবং তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।)

শ্রীম বলতেন ঃ "ঠাকুরের highest idea (সর্বোচ্চ আদর্শ) চিন্তা করতে দেখলে আমার আহ্লাদ হয়। তাঁর মহাবাক্য যেন এখনো মূর্তিমান হয়ে রয়েছে। ঠাকুর এই টাটকা এসেছেন কিনা তাই তাঁর ভাব এখনো সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। এ-জন্মে যাদের হবে না, তাদের ত্রিশ জন্মেও হবে না।"[২]

অনন্ত ভগবান মর্তে অবতরণ করেন রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে—এটি বড়ই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যজনক। একদিন ঠাকুর হঠাৎ শ্রীমকে বললেন ঃ "এই মুখ দিয়ে ভগবান কথা বলেন। এইজন্য অবতার। তা থেকেই বেদ বেরিয়েছে। এইখানে আনাগোনা করলেই হবে।" অপর একদিন ঠাকুর ও শ্রীম গাড়ি করে কলকাতায় যাচ্ছেন। ঠাকুর যেতে যেতে বললেন ঃ "পাশে ভগবান, তবুও ভগবান ভগবান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"[৩]

অবতার যুগপ্রয়োজনে আসেন। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হলেই ভগবানকে অবতীর্ণ হতে হয়। এটি ঐতিহাসিক সত্য। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারগণের আবির্ভাব ঐ সত্যকে প্রমাণ করে। ভক্তেরা অবতারের প্রতীক্ষায় থাকেন। শ্রীম বলতেন ঃ "অবতার যখন আসেন, তখন তাঁর লীলা আস্বাদন করবার জন্য অনেক মহৎ ব্যক্তি আসেন। যেমন চতুর্দিকে মরুভূমি, সেই মরুভূমির এক জায়গায় গাছ, জলাশয় রয়েছে, লোকে সেখানে এসে বিশ্রাম করে। সেইরূপ তাঁর লীলা আস্বাদন করবার জন্য... লোকে হাঁ করে থাকে। যেমন ইহুদিদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা হাঁ করেছিলেন ও বলেছিলেন, 'আমাদের উদ্ধারকর্তা আসছেন।' ভরদ্বাজাদি ঋষিরা রামচন্দ্র আসবেন বলে প্রতীক্ষা করেছিলেন। অদ্বৈত গোস্বামী বলেছিলেন, 'চৈতন্যদেব আসবেন।' "[৪]

অবতার একা আসেন না। তিনি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। কারণ, অবতার হলেন আধ্যাত্মিকতার জমাট-বাঁধা মূর্তি—যেমন গতিহীন তুষার, আর তাঁর শিষ্যেরা ঐ তুষারগলা জলে পুষ্ট খরস্রোতা নদী। এঁরাই অবতারের বার্তাবহ। ঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ "অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান কার্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।"[৫]

ব্রহ্মকুণ্ডলিনীর জাগরণ

বিজ্ঞানের গতি সর্বজনবিদিত। মানুষ বিশাল পৃথিবীকে স্বল্প সময়ে পরিক্রমা করতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

---

২ শ্রীম-কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৬০, পৃঃ ৫

৩ অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮

৪ শ্রীম-কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩-২৪ ৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৫২

পূর্ববর্তী অবতারগণের জীবদ্দশায় মানবসভ্যতা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। তাই রামচন্দ্রের প্রভাব বিস্তারলাভ করল অযোধ্যা থেকে শ্রীলঙ্কা, কৃষ্ণের মথুরা-বৃন্দাবন থেকে দ্বারকা-প্রভাস, বুদ্ধের কপিলাবস্তু থেকে গয়া-কাশী, খ্রীস্টের জুডিয়া থেকে সামেরিয়া-গ্যালিলি, চৈতন্যের নবদ্বীপ থেকে পুরী-বৃন্দাবন। সমাধির জমাটবাঁধা মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে বেশি ঘুরে বাণী প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বসে বিশ্বের কুণ্ডলিনীকে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে, তাঁর বাণী অল্পসময়ের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করল। এই কুণ্ডলিনীশক্তিই মা কালী। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন ঃ "ঠাকুর তো আর কেউ নন, সেই মা কালীই ঐরূপে প্রকাশিত হয়ে জগৎ উদ্ধার করছেন।"[৬]

স্বামীজী বলতেন ঃ "জানিস, এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রত হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব হচ্ছে, সেই মহামায়া কুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে। Individual (ব্যক্তিগত) কুণ্ডলিনী তো জাগ্রতা হবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি?"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ "তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব।"[৮] তাই স্বামীজী স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি কাঁধে বহন করে বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর শিষ্যকে বলেন ঃ "নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐস্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"[৯] যে ব্রহ্মকুণ্ডলিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-শরীরে সঞ্চারিত করেন এবং পরে স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে উল্লেখ করেছেন ঃ "শ্রীভগবান এখনো রামকৃষ্ণ-শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনো সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূলশরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক, অসহায়, পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সঙ্ঘটিত হইত না।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঠাকুর এই সঙ্ঘশক্তিকে আশ্রয় করেই তাঁর কাজ করছেন। স্বামী শিবানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন ঃ "ঠাকুর, স্বামীজী—এঁরা যে কি ছিলেন, তা লোকের বুঝতে ও জানতে এখনো ঢের দেরি। জগতের হিতের জন্য এতবড় আধ্যাত্মিক শক্তি সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যেও জগতে আবির্ভূত হয়নি। বুদ্ধদেব এসেছিলেন—তার শত শত বৎসর পরে লোকে তাঁকে কতকটা বুঝতে পেরেছিল, তাঁর সেই উদার ভাব জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন দেখ না, কোথায় বুদ্ধদেবের একটি দাঁত নিয়ে গেছে, তাতেই কি কাণ্ড! কত বড় দন্তমন্দির তৈরি হয়েছে তার ওপর। আর

৬ শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭ ৭ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮
৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১১ ৯ তদেব; ১০ বেলুড় মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১৮

এখানে ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এঁদের ভস্মাস্থি রয়েছে। এসব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। এই বেলুড় মঠের ধূলিতে গড়াগড়ি দেওয়ার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে কত লোক ছুটে আসবে। তার সূচনাও বেশ দেখা যাচ্ছে।... তাঁকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় কি কাণ্ডই না শুরু হয়েছে! আমরা ধন্য যে এসব দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আরো কত দেখতে পাবে!"[১১]

সত্যযুগ শুরু হয়েছে

নদীর ভাঁটার শেষে শুরু হয় জোয়ার। ভাঁটাতে নদী ক্ষীণ হয়, জোয়ারে ফেঁপে ওঠে। জোয়ার-ভাঁটার খেলা নদীর জীবনের অঙ্গ। তেমনি ধর্মের পতন ও অভ্যুদয় সমাজ-জীবনের অঙ্গ। ভণ্ড প্রতারকেরা ধর্মকে নিচে নামিয়ে দেয় আর অবতারগণ এসে ধর্মকে টেনে ওপরে তুলে দেন। প্রতি যুগেই ধর্মের এই খেলা চলতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কলির কলুষ ধ্বংস করে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। তিনি কলকাতা তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন কি করে নিচু দৃষ্টিকে উঁচু করা যায়। তিনি বারবার বলেছেন ঃ "মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ"—কামকাঞ্চন নয়। "আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।"

১৮৯৫ সালে স্বামীজী শশী মহারাজকে আমেরিকা থেকে লেখেন ঃ "রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে।"[১২] আরেকখানি চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে। এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।"[১৩]

শ্রীশ্রীমাও বলেছেন ঃ "ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে।... সাধারণ লোক কত জন্মাচ্ছে, মরছে। এই সব সর্বপ্রধান যাঁরা, তাঁরাই ভগবানের কার্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসেন।"[১৪]

সত্যযুগে মানুষ সুখশান্তি আশা করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের ৬০ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। কত মানবজীবন ধ্বংস হলো। এখন প্রশ্ন উঠবে—এই কি সত্যযুগের নমুনা? এর উত্তর শ্রীশ্রীমা এরূপভাবে দিয়েছিলেন ঃ বৃষ্টির আগে আসে ঝড়। সেই ঝড় ধুলো উড়িয়ে মানুষের দৃষ্টি ঢেকে দেয়, বাড়িঘর, গাছপালা ভেঙে চুরমার করে। তারপর বৃষ্টির পর ধুলো ভিজে যায়, মানুষও পরিষ্কার দেখতে পায়। তেমনি অবতারের আবির্ভাবে পৃথিবীতে নেমে আসে ধ্বংসের লীলা। যা মিথ্যা, অধার্মিকতায় ভরা তার তো ধ্বংস হবেই। তারপর প্রকাশ পায় ধর্মরাজ্য; আর মানুষের সুখশান্তি তো ধর্মের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীজী দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে বেলুড় মঠের উঠানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

---

১১ শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২-৯৩

১২ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩ ১৩ তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৮

১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৯

"যে-স্রোত এসেছে তা অবাধে সাত-আটশ বছর চলবে, কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। এ যুগপ্রবাহ আপন শক্তিতে চলবে—কারো সাহায্যের অপেক্ষা করবে না। এসব ঐশী শক্তির ব্যাপার—মানুষ কি করবে? এ-যুগপ্রয়োজন সাধনে যে সহায়ক হবে সে নিজে ধন্য হয়ে যাবে।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমন প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথোপকথন মিসেস হ্যান্সবরো তাঁর স্মৃতিকথাতে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ "স্বামীজী চাইতেন দেহ থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত হতে। একদিন তিনি বলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে আমাকে আরেকবার আসতে হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তাই আপনাকে আসতে হবে?' তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'মহাশয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহান আত্মাদের শক্তি অপরিসীম।' প্যাসাডোনাতেও একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী অনুরূপ কথা বলেন। সম্ভবত একদিন দুপুরে আহারের পর তিনি বসবার ঘরে পায়চারি করবার কালে বলেন, 'ঠাকুর বলেছিলেন যে, তিনি আবার আসবেন প্রায় দুশ বছর পরে এবং আমিও তাঁর সঙ্গে আসব। ঠাকুর যখন আসেন তখন তিনি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে নিয়েই আসেন।' "[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় আসছেন?

পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, অবতারের আবির্ভাবের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কখনো রাজার প্রাসাদে, কখনো গরিবের কুটিরে, কখনো কারাগারে, কখনো বা আস্তাবলে। তবে এ-কথা ঠিক, অবতার ধর্মপ্রাণ পিতামাতার গৃহেই আবির্ভূত হন। অবতারের বাপ-মা হতে গেলে অনেক ত্যাগ, তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন।

আমার এক বন্ধু আমাকে ঠাট্টা করে বলতঃ "হিন্দুধর্ম দুর্বল। কারণ, সেখানে অবতারকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু খ্রীস্টধর্মে যীশুই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র, ইসলামধর্মে মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। তাদের দ্বিতীয় প্রফেটের প্রয়োজন নেই।" আমি হেসে বলেছিলামঃ "দেখ হে, ভগবান খ্রীস্টান বা মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে ভয় পান। কারণ, তাঁকে আবার ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে বা লোকে তাঁর শিরশ্ছেদ করে ফেলবে। তাই তিনি ভারতে হিন্দুদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে অবতারকে কেউ বধ করবে না। অধিকন্তু খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে দ্বিতীয় অবতারের স্বীকৃতি নেই। তাই তিনি তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ!"

যাহোক, ঠাকুরকে দেখবার জন্য কার না মন ছটফট করে! কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ

১৫ শিবানন্দ বাণী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬

১৬ Swami Vivekananda : His Second Visit to the West—Marie Louise Burke pp. 411-12

পড়বার সময় ভক্তদের মনে জেগে ওঠে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গের বাসনা। সত্যসঙ্কল্প ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন যে, তিনি আসছেন। এখন তিনটি প্রশ্ন : কোথায়? কখন? কিভাবে?

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো স্পষ্টভাবে আবার কখনো আকার-ইঙ্গিতে তাঁর পুনরাবির্ভাবের উল্লেখ করেছেন : "আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়।... তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ি ফিরে যাচ্ছে! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বলজ্বল করতে করতে কি বেরিয়ে গেল—পেছু পেছু!... এদের উঁচু ঘর। তবে শরীরধারণ করলেই বড় গোল। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই শরীরধারণ।"

একজন ভক্ত—যাঁরা অবতার দেহধারণ করে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐরকম পরি। এখনো আছে। জানি কিনা, আরেকবার আসতে হবে।

বলরাম (সহাস্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা সৎকামনা রাখতে হয়, ঐ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে বলে।[১৭]

ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বললেন : "আরেকবার আসতে হবে তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন? তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আসছে—যেন কলমির দল—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে।"[১৮]

অপর একদিন ঠাকুর মহিমাচরণকে বলেন : "যেসব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো। তাহলে আর বেশি সাধনভজন করতে হবে না। প্রথম—আমি কে, তারপর—ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ। যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আরেকবার (আমার) দেহ হবে। ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়।... শুদ্ধ আত্মা না দেখলে কেমন করে থাকি!"[১৯]

এখন ঠাকুরের কথাতে জানা গেল, তিনি বায়ুকোণে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে আবার শরীরধারণ করবেন। এ-স্থানটি কোথায় তা নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। একদিন জনৈক ব্যক্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন : "মহারাজ, শুনেছি ঠাকুর নাকি আবার বর্ধমান অঞ্চলে শীঘ্রই আসবেন—ইহা কি সত্য?" মহারাজ উত্তরে বলেন : "কৈ, তা তো শুনিনি। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আবার আসবেন—এইরূপ শুনেছি।"[২০]

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৯৬, পৃঃ ৯৭১; ১৮ তদেব, পৃঃ ৪১৫
১৯ তদেব, পৃঃ ১০০৩ ২০ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৪৭

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'উদ্বোধন'-এ 'অবতারবাদ' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। আর নিজদেহ দেখাইয়া উত্তর-পশ্চিমাস্যে অবস্থানপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, মা বলছেন এর বিষয় যে যত ভাববে—সে তত ধর্মের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব শিগ্‌গির বুঝতে পারবে। আর উত্তর-পশ্চিম কোণে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'আবার ঐদিকে আসতে হবে—তখন জ্ঞানলাভ করতে কেউ বাকি থাকবে না।' "[২১]

১৯৩৫ সালের ২৬ নভেম্বর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বরিশালে কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের বলেন ঃ "এবার তিনি (ঠাকুর) এসেছিলেন গোপনে। তিনি আবার আসবেন একশত বৎসর পরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে।" প্রশ্ন—তিনি কি এর পরে পাঞ্জাবে অবতীর্ণ হবেন—বলে গেছেন? স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—আবার পাঞ্জাব প্রদেশে আসবেন—একথা ঠাকুর নিজমুখে বলেননি।[২২]

স্বামী অভেদানন্দ 'The Gospel of Sri Ramakrishna' গ্রন্থে (বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত) লিখেছেন ঃ "One evening Sri Ramakrishna was attended by his faithful servants Sashi (Ramakrishnananda) and Kali (Abhedananda), who were waiting upon him [at Cossipore]. The Bhagavan opened his mouth and inspired them by saying 'My Divine Mother has shown me that the photograph of this body will be kept upon altars and be worshipped in different houses as the pictures of other avatars are worshipped. My Divine Mother has also shown me that I shall have to come back again and that my next incarnation will be in the West.'"[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ কখন আসছেন?

ঢেউয়ের উত্থান ও পতন আছে। যে-ঢেউ যত নিচুতে নামে পরবর্তী ঢেউ তত উঁচুতে ওঠে। বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাবের ইতিহাস দেখলে জানা যায়, ধর্মের ঢেউ নামতে তিনশ থেকে পাঁচশ বছর লাগে, আবার উঠতেও ঐরূপ সময় লাগে। স্বামীজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎবাবুকে বলেন ঃ "হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে চলবে।"[২৪]

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমনের সময় সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কোন উক্তি নেই। কারো মতে তিনি একশ বছর পর এবং কারো মতে দুশ বছর পর আসবেন। ঠাকুরের এত তাড়াতাড়ি পুনরাগমনের ইচ্ছার কারণ মনে হয়— পৃথিবীতে হিংসা, ঘৃণা, অরাজকতা

---

২১ উদ্বোধন, ২৫ বর্ষ, পৃঃ ৭২৬-২৭

২২ সৎপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৫৭ ৫৮

২৩ Gospel of Sri Ramakrishna, 1947, p 418

২৪ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

ও অশান্তির রাজ্য দ্রুত ঘনীভূত হয়ে আসছে। ঠাকুর নিজে বলেছেন : "সরকারি কর্মচারীকে জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।"[২৫] তেমনি ভগবানের জীবকল্যাণসাধন-রূপ কর্ম যতদিন থাকবে ততদিন তাঁকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হতে হবে।

শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের পুনরাগমন সম্বন্ধে বলেছেন : "ঠাকুর বলেছিলেন যে, একশ বছর পরে আবার আসবেন। গোল বারান্দা হতে বালি, উত্তরপাড়ার দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন। আমি বললুম, 'আমি আর আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা? কলমির দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।"[২৬] "তিনি (ঠাকুর) শত বৎসর সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন বলেছেন। আর তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে।"[২৭] "তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলেছেন।"[২৮]

স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি (ঠাকুর) নিজ সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি) বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ পর্যন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুইশত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে। যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে, তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।' "[২৯]

একদিন জনৈক ব্যক্তি স্বামী সারদানন্দকে অবতারবাদ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন : "সত্যই কেহ অবতীর্ণ হন কি?" উত্তরে তিনি বলেন : "অবতীর্ণ হন বৈকি! ঠাকুরকে বলতে শুনেছি—যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ একই power (শক্তি) প্রয়োজনমত বিকাশপ্রাপ্ত হন।" আবার বলেছেন—"দুশ বছর পরে আবার অবতীর্ণ হবেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে—বলতে শুনেছি। কি জান, সমস্ত জীবজগৎই তাঁরই বিকাশ বৈ তো নয়! তবে প্রয়োজনমত কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থলে বিশেষ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।"[৩০]

একবার জনৈক ভক্ত শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন : "মহারাজ, মঠ হইতে এখন যেভাবে কাজ হইতেছে তাহা দেখিয়া কিন্তু মনে হয় না ঠাকুরের আগমনে এদেশে যে আমূল পরিবর্তন হইবার কথা তাহা কখনো সাধিত হইবে।" উত্তরে শরৎ মহারাজ বলেন : "এখন যেভাবে কাজ হচ্ছে তা একরকম হচ্ছে; এর বেশি কাজ হবে দুশ বছর পরে যখন ঠাকুর আবার আসবেন। যেমন বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াইশ বছর পরে সম্রাট অশোক এসে বুদ্ধদেবের ধর্ম জগৎময় ছড়িয়েছিলেন তেমনি ঠাকুরের ভাবও জগতে তখনই ছড়িয়ে

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩
২৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৮
২৭ তদেব, পৃঃ ১০
২৮ তদেব, পৃঃ ১৯৯
২৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭৭
৩০ উদ্বোধন, ২৯ বর্ষ, পৃঃ ৭২৩

পড়বে যখন ঠাকুর আবার আসবেন।"[৩১]

একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ "মহারাজ, কেউ বলে (ঠাকুর) একশ বৎসর পরে, আবার কেউ বলে দুশ বৎসর পরে আসবেন।" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "আমি সময় সম্বন্ধে কিছুই জানি না—কিছু শুনিওনি।"[৩২]

জনৈক ব্যক্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মহারাজ, ঠাকুরের পুনরাগমন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কোন বইতে একশ বছর আবার কোন বইতে দুশ বছর পরে আসবেন বলে লেখা রয়েছে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন ঃ "তবে এ-কথা ঠিক যে, ঠাকুর শিগ্‌গিরই আসছেন।"[৩৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মী-দিদি বলেন ঃ "ঠাকুর বলেছেন, 'আমি একশ বছর পরে পৃথিবীতে আসছি।' এই একশত বৎসর তাঁহার আবির্ভাব হইতে গণনা করিতে হইবে, কি তিরোভাবের দিন হইতে গণনা করিতে হইবে, অথবা তিনি যেদিন একথা বলিয়াছিলেন সেইদিন হইতে একশত বৎসর ধরিতে হইবে, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না।"[৩৪]

আমরা এখন এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। সবে আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শে নিজেদের ও সমাজকে গড়তে শুরু করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ব্যাপকভাবে বিশ্বে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। এখন যদি শ্রীরামকৃষ্ণ নবরূপে ও নবনামে আবির্ভূত হন, তবে তো দারুণ সঙ্ঘর্ষ শুরু হবে। নতুন অবতার কি পুরান অবতারের কর্মপন্থা ও আদর্শকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন? এরূপ ভয় ভক্তদের মনে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, প্রথমত অবতার 'comes to fulfil, not to destroy' অর্থাৎ তিনি গড়তে আসেন, ভাঙতে আসেন না। তিনি মিথ্যাকে ধ্বংস করেন কিন্তু সত্যকে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকেই প্রচার করেছেন এবং পুনরায় এলে তিনি সেই একই সত্যকেই প্রচার করবেন। বেদে আছে—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

একবার জনৈক প্রাচীন সাধু এক নবীন সাধুকে পরীক্ষাচ্ছলে বলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ যদি তোমার সামনে এসে বলেন, 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য কামকাঞ্চন ভোগ', তখন তুমি কি করবে?" নবীন সাধু বলল ঃ "আমি বলব, 'হে ভণ্ড রামকৃষ্ণ, তুমি বিদায় হও। তোমাকে আমার দরকার নেই।' " যীশু কখনই বলতে পারেন না—"Blessed are the impure in heart for they shall see God." অর্থাৎ অপবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তারা ভগবানের দর্শন পাবে।

দ্বিতীয়ত, গৃহস্বামী যদি প্যান্টকোট বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বা অন্য যে-কোন বেশে বাড়িতে ঢোকেন, প্রভুভক্ত কুকুর অনায়াসে তাকে চিনতে পারে। তেমনি অবতার যে-কোন বেশে বা নামে আসুন না কেন, প্রকৃত ভক্ত তাঁকে ঠিকই চিনতে পারবে।

৩১ শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন দেখিয়াছি, পৃঃ ৪২৭
৩২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৪৭
৩৩ উদ্বোধন, ৪৫ বর্ষ, পৃঃ ২২৩
৩৪ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণিদেবী, পৃঃ ৪১

তৃতীয়ত, পতঞ্জলি যোগসূত্রে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ", অর্থাৎ অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্মাধর্ম, জাতি, আয়ু, ভোগ এবং সংস্কার—এই সমস্ত যাতে নেই এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলে।[৩৫] এই সূত্রের ওপর ব্যাসভাষ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ "ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য কাহারও হইতে পারে না। কারণ দুইটি তুল্য বল ঈশ্বর হইলে তাহাদের কোন পদার্থে এক সময় 'এটি নূতন হোক', 'এটি পুরাতন হোক'—এইভাবে ইচ্ছা হইলে একের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে অপরের ইচ্ছা ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। যুগপৎ উভয়ের ইচ্ছাসিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই, কারণ একই পদার্থে একসময়ে নূতন ও পুরাতন ভাব থাকিতে পারে না, কারণ উহারা পরস্পরবিরুদ্ধ। অতএব বলিতে হইবে যাঁহার ঐশ্বর্য সাম্য ও অতিশয় বিরহিত সেই ঈশ্বর পুরুষবিশেষ—পুরুষ হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব নহে।" (পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চুর অনুবাদ) স্বামীজীও ঠাকুরকে 'শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্' বলেছেন।[৩৬]

যাহোক, আমরা ব্যাসভাষ্য থেকে জানতে পারি, যাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা তিনিই ঈশ্বর—তিনি এক, বহু নন। সেই ঈশ্বরের নূতন বা পুরাতন হয় না। তিনি শাশ্বত। সেই একই ঈশ্বর অভীষ্ট সিদ্ধির (ধর্মস্থাপন) জন্য বারবার অবতাররূপে আসেন, যেমন ঠাকুর বলতেনঃ "একই চাঁদ আকাশে বারবার ওঠে।" সুতরাং নতুন অবতার এলে পুরান অবতারের উদ্দেশ্য ব্যাঘাত হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে আসছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে আসবেন, সে-বিষয়ে তাঁর কোন নিজস্ব উক্তি কথামৃতে বা লীলাপ্রসঙ্গে নেই। তবে কথামৃতে (১৫ মার্চ ১৮৮৬) আছে যে, ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেনঃ "বাউলের দল হঠাৎ এল—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এল—গেল, কেউ চিনলে না।"[৩৭]

১৩২০ সালের ২৯ বৈশাখ জয়রামবাটীতে স্বামী অরূপানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁর কথোপকথন 'মায়ের কথা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ "রাত্রে আহারের পর মার ঘরে পান আনিতে গিয়াছি। রাঁচিতে একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন, সেই কথা মাকে বলিলাম—একটি লোক সাধুদর্শন করবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কখনো কখনো যেতেন। তিনি পাতলা ও বেঁটে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'ঝুনো সরষে' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের দেহ যাওয়ার অনেক বছর পরে যখন তিনি শিলং-এ চাকরি করেন, সেই সময়ে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হন। তাঁদের অফিস শিলং থেকে ঢাকায় আসে এবং পরে রাঁচি যায়। রাঁচিতে রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন, হঠাৎ কার ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতে শোনেন যে,

---

৩৫ পাতঞ্জল-যোগসূত্র, ১/২৪ ৩৬ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫

৩৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১১২৫

কে ডাকছে—'ও ঝুনো সরষে!' অবাক হয়ে ভাবছেন, আমার এ নাম তো কেউ জানে না—ঠাকুর ডাকতেন। দরজা খুলে দেখলেন, ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে—গেরুয়া পরা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে! জ্যোৎস্না রাত। বলছেন, 'এখানকার কিছু কথা হতো। তা ঢাকায় নয় দরকার ছিল না, এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি করো না'।—বলে অন্তর্ধান হলেন।

"মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে কেন দেখলে?'

"মা—সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউলবেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, 'বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্যে করবে, ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।' যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন—কোন দিগ্‌বিদিক খেয়ালই নেই।

"আমি—বর্ধমানের রাস্তা কেন?

"মা—এইদিকে দেশ (জন্মস্থান)।

"আমি—তবে কি বাঙালী?

"মা—হ্যাঁ, বাঙালী। আমি শুনে বললাম, 'ও কি গো, তোমার একি সাধ?' তিনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার হাতে হুঁকো-কলকে থাকবে।'"[৩৮]

১৯১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি গৌরী-মা কথাপ্রসঙ্গে বলেন: "ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে।"

মা—হ্যাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার হুঁকো/কলকে হাতে থাকবে।' ভাঙা একটা পাথরের বাসন ঠাকুরের হাতে থাকবে। হয়তো ভাঙা কড়ায় রান্না হবে, যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসব না।' তিনি হেসে বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবে কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমির দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।' বৃন্দাবনে রেল থেকে নামছি। ছেলেরা আগে নেমেছে। গোলাপ গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছে। লাটুর হুঁকো-কলকেগুলো পড়ে ছিল, আমার হাতে দিয়েছে। লক্ষ্মী বলছে, 'এই তোমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল।' আমিও 'ঠাকুর, ঠাকুর, এই আমার হুঁকো-কলকে ধরা হয়ে গেল।' বলে ধুপ করে মাটিতে ফেলে দিয়েছি।'"[৩৯]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে লিখেছেন: "নিকুঞ্জদেবীকে (শ্রীমর স্ত্রী) শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'একদিন ঠাকুর বললেন, তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের বলব না। তোমার ধার শোধবার জন্য আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে নেব।'"[৪০]

শ্রীশ্রীমায়ের জনৈক সেবক একবার তাঁকে বলেন: "ঠাকুরকে ও আপনাকে আবার

---

৩৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭০-৭২ ৩৯ তদেব ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৭-৮৮

৪০ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ৩০

তো আসতে হবে—এবার বাউলরূপে।" শ্রীমা পান খেতে খেতে বললেন ঃ "তোমাদেরও কারুর নিস্তার নেই। যারা এবার এসেছে, সক্কলকে আসতে হবে—কেউ বাদ যাবে না। আকাশে চাঁদ দেখেছ তো? চাঁদ কি একলা ওঠে? চারদিকে তারাগুলোকে নিয়ে তবে ওঠে।" সেবক আনন্দে বলল ঃ "তাতে আমরা খুব তয়ের, আপনাকে তো পাব।"[৪১]

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বাউলরূপে আসবেন সে-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন তথ্য জানা নেই। তবে এখানে 'বাউল' শব্দের অর্থ এবং বাউলদের জীবনযাত্রা, সাধনপ্রণালী, সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'বাউল' শব্দের আভিধানিক অর্থ উন্মত্ত, পাগল, প্রেমে বিহ্বল বা আত্মহারা। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইতে বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করে নাই।"[৪২] পরবর্তী কালে উহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষরূপে প্রকাশ পায়। ইহারা মহাপ্রভুকে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলে। ইহাদের মতে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানবদেহেই সদা বিরাজমান, সুতরাং নরদেহ ত্যাগ করে অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা। বাউলের ভাষায়, 'যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গোলক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন—সবকিছুই দেহের মধ্যে রয়েছে। এজন্য এদের মত 'দেহতত্ত্ব' নামে প্রসিদ্ধ। প্রকৃতি সাধনই এদের প্রধান সাধন। এরা তিলক, মালা, ডোর, কৌপীন, বহির্বাস ধারণ করে। এরা দাড়িগোঁফ রাখে, কেশ উন্নত করে চূড়াকারে বাঁধে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারে 'দণ্ডবৎ' বলে নমস্কার করে। এদের কেউ কেউ 'ক্ষ্যাপা' উপাধি পেয়ে থাকে।[৪৩]

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' (অর্থাৎ উন্মাদ) শব্দের প্রাকৃত রূপ নিয়ে 'বাউল' শব্দটি বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এরা একটা বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ। বাউলেরা বেশবাস ও আচার-ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার পরিত্যাগী, আত্মকর্ম-সমাহিত, উদাসীন ধর্মসাধক। সমাজে তারা 'ক্ষেপা' বলে পরিচিত—বিশেষত রাঢ় দেশে।

বাউলেরা ঈশ্বরভক্ত। মানুষ ভগবানের পূজারী। তারা গৃহহীন যাযাবর। সকল দেশই তাদের দেশ। তাদের শত্রু নেই, জাতি নেই। সঙ্গীতই তাদের বাণী। তাদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তু 'কর্তাভজন', 'গুরুপ্রসাদ', 'মানুষ ভজন', 'দেহতত্ত্ব কথন', 'ষট্চক্রনিরূপণ' ইত্যাদি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন ঃ "বাংলার বাউলদের সাধনা অধর মানুষকে ধরবার সাধনা। এই 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'অটল মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'রসের মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'আলোক মানুষ', 'ভাবের মানুষ', মানুষের হৃদয়বিহারী পরমাত্মা। যদিও ইহা মূলত

৪১ শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, পৃঃ ৮৪
৪২ বাংলার বাউল ও বাউলগান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৬
৪৩ দ্রঃ ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়, পৃঃ ১৭১

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরতম সত্তা, তবুও বাউলেরা তাঁহাকে অনেক স্থলে ব্যক্তিগত ভগবান মনে করিয়াছে এবং অনেক গানে তাঁহার কাছে দৈন্য, আর্তি, শরণাগতি প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছে। 'মনের মানুষের' সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কতকগুলি গানে আকুলতাও প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই 'অধর মানুষ'কে উপলব্ধি করিবার বা 'ধরিবার' যে পদ্ধতি, তাহা একটা যৌগিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াই বাউল সাধনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।"[৪৪]

যাহোক, অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের নিকট তাঁর কৃষ্ণ-বিরহ দশার বর্ণনায় নিজেকে 'মহাবাউল' বলে অভিহিত করেছেন—

"দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন বিষয়ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।।"

মহাপ্রভুর মন শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে মহাবাউল নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে যাত্রা করেছে। এই উপমা দৃষ্টে মনে হয়, বাউলগুরু শিষ্যদের নিয়ে তীর্থে তীর্থে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবেন। মহাবাউল প্রথমে নিজে ইন্দ্রিয়গুলিকে শিষ্য করবেন এবং দেহাসক্তি, ভোগাসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবেন।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, এবার শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন অবতাররূপে প্রকাশিত হলে শিষ্যগণ-সহ দেশ-দেশান্তরে ঘুরবেন। কারণ, গত আবির্ভাবকালে তিনি ছিলেন সমাধির ঘনীভূত মূর্তি, তাঁর পক্ষে বেশি চলাফেরা করে প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। ঠাকুর নিজেই একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন : "গৌর-নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার করে বেড়িয়েছেন, আর আমি ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না।" দক্ষিণেশ্বরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলেন : "বাসনা না থাকলে শরীরধারণ হয় না। (সহাস্যে) আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম, মা, কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করব, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি—এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!"

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে)—সাধ কি মিটেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু বাকি আছে।[৪৫]

পূর্ণকামের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়ে থাকে। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ণ সাধগুলি মেটাতে বাউল হয়ে আসবেন। বলরাম-মন্দিরে একদিন ঠাকুর গিরিশকে বলেন : "দুটি সাধ ছিল। প্রথম—ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয়—শুঁটকে সাধু হব না।"[৪৬] এ সাধ-দুটি যে

৪৪ বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ৯১

৪৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৪৭২

৪৬ তদেব, পৃঃ ৮৭৩

তাঁর পূরণ হয়েছে—এ-কথা ঠাকুর বলেননি। তবে তাঁর জীবনীপাঠে জানা যায়, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ ও রসিক ছিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঠাকুরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ "এবারে তিনি গোপনে এসেছিলেন। আবার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শারীরিক শক্তি নিয়ে রাজা হয়ে... আসবেন।"[৪৭] এ-কথা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ঠাকুর ভক্তদের রাজা হয়েই আসবেন। ঠাকুরের পক্ষে পার্থিব বস্তুর রাজা হওয়া সম্ভব নয়। বাউলবেশী শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই 'শুঁটকে সাধু' হবেন না। কারণ বাউলের মন প্রেমরসে ভরপুর। সে রসের রসিক। বাউলের ভাষায়—"রসিক যে-জন প্রেমজোয়ারে রসের তরী বায়।"[৪৮]

শ্রীশ্রীমার কথা থেকে জানা যায় যে, ঠাকুর বর্ধমান অঞ্চলে বাঙালী হয়ে বাউলবেশে আসবেন। মায়ের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ "কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘোষপাড়া ও কেঁদুলীর মেলায় সমাগত বাউলদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত স্থানের মধ্যেই বর্তমান সময়ে প্রকৃত বাউলের আড্ডা এবং এই সম্প্রদায় বাংলার আদি বাউল-সম্প্রদায়ের শেষ নিদর্শন।"[৪৯]

অবতার ঃ আসল ও নকল

কথায় বলে, পায়েতে যদি মণি লুণ্ঠিত হয় এবং মাথায় কাঁচ ধৃত হয়, তবুও উভয়ের গুণের অন্যথা হয় না। অর্থাৎ কাঁচ কাঁচই থাকে এবং মণি মণিই থাকে। কাঁচ কাঁচের দামে বাজারে বিক্রি হয় এবং মণি মণির দামে। অবশ্য অসাধু ব্যবসায়ীরা লোভের বশে কাঁচকে মণির দামে বাজারে বিক্রি করতে চেষ্টা করে, তেমনি অনেক অসাধু সাধুরূপে ধর্মজগতে নামযশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে শেষে লাঞ্ছিত হয়।

জ্বলন্ত আগুনকে ঢেকে রাখা যায় না। তা প্রকাশ পাবেই পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে দরিদ্র, নিরক্ষর, মন্দিরের পূজারীরূপে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন কি শেষপর্যন্ত? স্বামীজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎবাবুকে বলেনঃ "কয়েক শত বৎসর পরে হয়তো একবার ভগবানের অবতার হয়—আজকাল কিন্তু শুনে এলেম একমাত্র ঢাকা অঞ্চলেই পাঁচটি অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে! উহার কারণ কি জানিস? ভগবান যখন জীবের প্রতি করুণায় নরশরীর ধারণ ও অপূর্ব লীলাবিলাস করিয়া অন্তর্হিত হন, তখন অনেকে প্রতিষ্ঠা ও নামযশাদির জন্য অবতার বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, যুগে যুগে ঐরূপ False Prophet আসিয়াছে। এবার ভগবান যে সত্য সত্যই রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ

৪৭ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৩৪
৪৮ বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ২৩০
৪৯ তদেব, পৃঃ ৭৩

এই যে, তাঁর তিরোভাবের কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন।"[৫০]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন অবতার এলে তিনি আসল কি নকল বুঝব কেমন করে? অবতারের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে ঃ ১) জীবে দয়া, ২) পতিতদের উদ্ধারকর্তা, ৩) সর্বভূতে সমজ্ঞান, ৪) পবিত্র ও প্রেমিক, ৫) পরম বৈরাগ্য, ৬) জৈবধর্মবর্জিত, ৭) অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন, ৮) অন্তর্যামী, ৯) ধর্মের রক্ষক ও পালক, ১০) কর্মনাশকারী ও কপালমোচন, ১১) শোকমোহ-বর্জিত, ১২) সত্যসঙ্কল্প, ১৩) "দেহস্থোহপি ন দেহস্থঃ" ইত্যাদি।

হৃদয়-দুয়ার মুক্ত রাখা

নতুন অবতার এলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীর দুঃখিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। তারা ঠাকুরের নতুন লীলা দেখে হৃষ্ট ও পুলকিত হবে। হৃদয়কপাট বন্ধ করে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সম্প্রদায় গড়ে—"প্রভুর আমার কিবা রূপ কিবা গুণ" গাইবে, তারা ঠাকুরের ভাষায় "গেঁড়ে-গুগলির দল",'কুয়োর ব্যাঙ'। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং সকল মতের ও পথের সঙ্গমস্থল। ঠাকুর বলতেন—অন্ধেরা হাতি ছুঁয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে খণ্ডিত মত প্রকাশ করে, কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পুরো হাতি দেখে। ঠাকুর তাই স্বামীজীকে পুরো হাতি দেখিয়েছিলেন, যাতে তিনি সম্প্রদায় গড়তে না পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাগমনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দিন দিন 'বৃদ্ধি' পাচ্ছেন। তাঁর নামে অসংখ্য লোক জড় হচ্ছে, শত শত আশ্রম গড়ে উঠছে। এ গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। স্বামীজী যেদিন ঠাকুরের অস্থি বেলুড় মঠে নিজ কাঁধে বহন করে প্রতিষ্ঠা করেন, সেদিন শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কথাবার্তা হয়। শরৎবাবু কৌতূহলী হয়ে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে কাশীপুরে সেবাধিকার নিয়ে কিরকম দলাদলি হয়েছিল?

স্বামীজী বলেন ঃ " 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দলফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন-আপন বুদ্ধির রঙে রাঙিয়ে এক-একজনে এক-একরকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক-একরকম রঙিন কাচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট বলে দেখছি। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দলফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝলসে যায়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি সব ভেসে যায়।"

৫০ উদ্বোধন, ২৫ বর্ষ, পৃঃ ৭২৫

ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সম্প্রদায় হবে কিনা, শরৎবাবুর প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ "হ্যাঁ, কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে। কিন্তু ঐসকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে। আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।"[৫১]

স্বামীজীর মনে ভয় ছিল যে, সম্প্রদায়হীন ঠাকুরের নামে কালে সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। লাহোরে আর্যসমাজের নেতা লালা হংসরাজকে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "দেখুন, আমার হাতে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বারা আমি জগতের এক-তৃতীয়াংশ নরনারীকে এক পতাকার নিচে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারি। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহা আমার করিবার ইচ্ছা নাই, কারণ তাহা হইলে আমার গুরুদেব-প্রবর্তিত 'যত মত তত পথ'—এই মহাসমন্বয় বাক্য খণ্ডিত হইয়া ভারতে একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে।"[৫২]

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই বলেননি, তিনিই একমাত্র অবতার বা শেষ অবতার। তাঁর শিষ্যরাও তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি। প্রতি অবতারকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে—এটি প্রকৃতির নিয়ম। সম্প্রদায় মন্দ নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ভয়ঙ্কর। একখানি মোটরে যদি বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ ও রামকৃষ্ণ চলেন, তাহলে তাঁরা পরস্পর আমোদ-আহ্লাদ করতে করতে যাবেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গনও করবেন। কিন্তু একখানি গাড়িতে যদি একজন বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান ও হিন্দু যায়, তবে তারা ঝগড়া ও মারামারি করে মরবে। এই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ফল। এসব লক্ষ্য করে ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ— যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো। দুজনে ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না।"[৫৩]

সুতরাং আমরা যদি ঠাকুরের ঠিক ঠিক ভক্ত হই, তবে বাউলরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ এলে কখনই 'ঝগড়া কিচিমিচি' করব না। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীমূর্তি স্বামীজী ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় কি সে-বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ঃ "ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্য আমরা হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা উহা চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের এক-একখানি পত্র এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনো অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব। আমরা বর্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিব।"[৫৪]

৫১ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১২
৫২ উদ্বোধন, ২৫ বর্ষ, পৃঃ ৭৩১
৫৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯০
৫৪ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২

ঐ বন্যা আসছে

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কথাপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রকে বলেন ঃ "আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার ওপর জল ধপাস্ ধপাস্ করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে।"[৫৫] ঠাকুর নিজে হচ্ছেন ঐ বিরাট জাহাজ।

স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি। তিনি রামকৃষ্ণরূপ ঐ বিরাট জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করে আমেরিকা থেকে লেখেন ঃ "মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।... ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী।"[৫৬] অপর একখানি চিঠিতে স্বামীজী লেখেন ঃ "ওঠ, ওঠ, মহাতরঙ্গ আসছে—onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও), যেখানে তাঁর (ঠাকুরের) নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না?... সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন।"[৫৭]

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎবাবু স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মহাশয়, আপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল?" এর উত্তরে তিনি বলেন ঃ "কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।"[৫৮]

১৯০২ সালে শরীরত্যাগের কিছুকাল আগে স্বামীজী লাটু মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "ওরে! দেখছিস কি? যা করে দিয়ে গেলুম তার ফল বুঝতে পারবি—এই তো সবে আরম্ভ। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা তাঁর নাম নিতে সবে আরম্ভ করেছে। দু-দশ বছর বাদে দেখবি ওদেশের লোকেরা আমাদের ঠাকুরের ভাব নেবে। এখন তো দু-চারজন দেখছিস, তখন দেখবি হুদো হুদো লোক আসছে।"[৫৯]

সমুদ্রের বড় ঢেউ বালুচরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে বেলাভূমিকে ভিজিয়ে দেয়। আবার বেলাভূমি হয়ে যায় শুষ্ক। কিছু সময় পরে আবার ঢেউ এসে সব ভিজিয়ে দেয়। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী আধ্যাত্মিক প্লাবন জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং কালচক্রে এ প্লাবন শুকিয়ে যাবে। আবার আসবে নতুন আধ্যাত্মিক বন্যা। এই বন্যার পুরোধা হবেন বাউলরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি 'অবতারবরিষ্ঠায়' শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও দিগ্‌বিদিকে প্রচার করতে আসবেন। যেমন জ্যোতিরূপী সূর্যকে পরিচয় দিয়ে বলতে হয় না—আমি সূর্য, আমার আলোতে জগৎ আলোকিত; তেমনি অমিত জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-ত্যাগ-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যরূপী মহাবাউল শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমহিমায় আবির্ভূত হবেন। তাঁকে চিনতে অসুবিধা হবে না। আমরা তাঁর প্রেমসাগরে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেই পৌঁছে যাব লক্ষ্যে।

৫৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩০৭ ৫৬ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০-৩১
৫৭ তদেব, পৃঃ ৩৫৭; ৫৮ তদেব ৯ম খণ্ড পৃঃ ২৫৩; ৫৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬

পরিশিষ্ট

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

আপনাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—এই কথা যদি কালিদাস ও ভবভূতিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই নীলাকাশের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো মিটমিট করিয়া হাসিয়া পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেন। ইহা সত্ত্বেও যদি তাঁহাদের বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তাকুল হইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিতেন ঃ "দেখ ভাই, ইহা সাব্যস্ত করা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। উপরন্তু ইহা নির্ধারণ করিতে যে নৈপুণ্যের দরকার তাহা আমাদের নাই।" এই উত্তরে জিজ্ঞাসুরা কখনই খুশি হইবে না। কারণ প্রতিভার মূল্যায়ন হয় অপরের কাছে। কস্তুরীমৃগ কখনও নিজের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধ পায় না। মানুষের রূপ নিজের চোখে ধরা পড়ে না—পড়ে অপরের চোখে। সেইহেতু আমরা এই কবিকুল-শিরোমণিদ্বয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া তাঁহাদের অমরকীর্তি রামচরিতে প্রবেশ করিব।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃতসাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহাদের মধ্যে কে বেশি উজ্জ্বল বলা কঠিন। উভয়েরই নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। উভয়েরই কবিত্বশক্তি অসাধারণ। রসব্যাপারে পণ্ডিতেরা বলেন—শৃঙ্গারে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হৃদয়ের প্রবল আবেগ-প্রকাশে ও করুণ রসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণত কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রসবৈচিত্র্য দেখা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কালিদাসের রচনা—"পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সুমার্জিত, সুবিন্যস্ত, সুরম্য উদ্যান"; এবং ভবভূতির রচনা—"সুন্দর, ভীষণ, বীভৎস, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য।" জনৈক পণ্ডিতপ্রবরের মতে—কবিত্বে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞতায়, সদাচারে, ধার্মিকতায় ভবভূতি বড়।

উভয়ের নাটকেই গাম্ভীর্য বিদ্যমান। তথাপি কালিদাসের নাটকগুলি ব্যঞ্জনাপ্রধান এবং ভবভূতির নাটকগুলি অভিধা-শক্তির দ্বারা সুন্দরভাবে চিত্রিত। উভয়ের উপরে কালের প্রভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। কালিদাসের কালে ভারতবর্ষে আনন্দ ও শান্তি বিরাজিত ছিল; সেইহেতু তাঁহার রচনা আমোদপ্রমোদে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও সাময়িক দুঃখ প্রকাশ পাইলেও উহা চিরস্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। কালিদাসের সমস্ত নাটকেই বিদূষক বিদ্যমান। তিনি হাস্য-পরিহাসের দ্বারা নায়ক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

অপরদিকে ভবভূতির জীবন দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন

উহা ভারতের ঘোর অবনতির যুগ। বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর অধঃপতন, নানাবিধ উদ্ভট ক্রিয়াকলাপে সমাজ জর্জরিত। ইহার প্রমাণ ভবভূতির মালতীমাধবে রহিয়াছে। সেখানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীর আশ্রম-বিগর্হিত কার্যকলাপ ও তান্ত্রিক অভিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভবভূতি আপন জীবনকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে দেরি হইতেছে দেখিয়া দুঃখপূর্ণ করুণরসের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

নাট্যসমালোচকদের দৃষ্টিতে কালিদাসের নাটক বৈদর্ভী রীতিতে এবং ভবভূতির নাটক গৌড়ীয় রীতিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কালিদাসের রচনায় বহির্জগতের পরিপাটি এবং ভবভূতির রচনায় অন্তর্জগতের খুঁটিনাটি।

বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লিয়ে তারিখ সাল।।" ইহা খুব সত্য কথা। কালিদাস ও ভবভূতির আবির্ভাব-কাল লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। তথাপি বিভিন্ন গ্রন্থ-দৃষ্টে মনে হয় কালিদাস ৬ষ্ঠ এবং ভবভূতি ৮ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কবিদের ছায়া পরবর্তীদের উপর পতিত হওয়াই স্বাভাবিক; সেইহেতু ভবভূতির উপর কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইতিহাসপাঠে জানিতে পারা যায় কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন এবং ভবভূতি ছিলেন কনৌজের রাজা যশোবর্মার সভাপণ্ডিত। পরবর্তী কালে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনৌজরাজকে পরাভূত করিয়া ভবভূতিকে মহাসমাদরে কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ-প্রদেশের পদ্মপুর নগরে। তিনি সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া শ্রীকণ্ঠ উপাধি পান। কালিদাসের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন যে, তিনি পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন। কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া আমাদের দেশে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে ঃ

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।।"

রামচরিত্র বিশাল ও সুগভীর। কাহারও চক্ষে রাম অবতার, কাহারও কাছে আদর্শ মানব, আদর্শ রাজা। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।" অর্থাৎ কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ করিয়াছেন? রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" এই আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে কত মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, গল্প, কবিতা, কথকতা, ব্রতকথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আদিকবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধককবি তুলসীদাস, ভক্তকবি কৃত্তিবাস, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মনীষীরা রামগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যকেই সাধারণত Epic বলে; কিন্তু রামায়ণ বেদনার কাব্য। বীরত্বের

অন্তরালে রহিয়াছে ব্যথা। এই ব্যথা রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা করিয়াছে, সীতাকে অতুলনীয় সতীত্বে দাঁড় করাইয়াছে, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, হনুমানকে আদর্শ কর্মবীরে পরিণত করিয়াছে। এই অশ্রুসিক্ত কাব্য আমাদের দুঃখভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি। রামায়ণ আমাদের ঘরের কথায় ভরা; সেইহেতু আমাদের বড় আদরের।

কেহ কেহ মনে করেন—দুঃখে কি আনন্দ আছে? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। (সাহিত্যদর্পণ) অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যে যদি শুধু সুখজনক স্বীকৃত হয় তাহা হইলে করুণ প্রভৃতি রস দুঃখজনকত্ব বলিয়া তাহাদের রসত্ব নাই। ইহার উত্তর সাহিত্যদর্পণে দেওয়া হইয়াছে ঃ

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।
কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোহপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।।"

অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রসে যে অত্যন্ত সুখ জাত হয়, সহৃদয়ের অনুভবই তাহার একমাত্র প্রমাণ। স্বাভাবিক যদি তাহাতে দুঃখই থাকিত তবে সে বিষয়ে কেহ উন্মুখ হইত না এবং রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য কেবল দুঃখেরই হেতু হইত। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে। সন্ন্যাসীদের তপস্যারূপ কৃচ্ছ্রতা, সতীনারীদের ব্রত-উপবাসরূপ কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আনন্দ আছে।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে এবং ভবভূতি 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত' নামক দুইখানি অমর নাটকে রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। যাহা দেখা যায় বা অভিনয় করিয়া দেখানো যায় তাহা দৃশ্য কাব্য—যেমন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত'। যাহা শুনা যায় তাহা শ্রব্য কাব্য—যেমন 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি। সুতরাং রামচরিতে কালিদাস শ্রব্য কাব্যের এবং ভবভূতি দৃশ্য কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতির রামচরিত্র পড়িলে একটি জিনিস স্বতই মনে হইবে যে কালিদাস রামচন্দ্রকে দেবতারূপে এবং ভবভূতি মহাবীররূপে আর কোথাও বা লোকোত্তর পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের প্রারম্ভে দেবগণ অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর কাছে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া রাবণবধের প্রার্থনা জানান। ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলেন, "আমি দশরথের পুত্ররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া শাণিত শরাঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধিপের শিরঃ-পরম্পরারূপ কমলমালা সংগ্রামভূমির বলিরূপে প্রদান করিব।" ভবভূতির রামচন্দ্র মহাবীর। অলৌকিক তাঁহার পরাক্রম। কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নাই।

পণ্ডিতেরা চরিত্রচিত্রণ, রসপুষ্টি, বর্ণনাচাতুর্য, রচনাশৈলী ও ভাষার সৌকর্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষের জীবনে লেখা এবং ঐ কালে তাঁহার ধর্মবুদ্ধি প্রবল ও গভীর হইয়াছিল। অন্যান্য কাব্যের (কুমারসম্ভব, মেঘদূত,

ঋতুসংহার) প্রারম্ভে কালিদাস মঙ্গলাচরণ করেন নাই; কিন্তু রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।"

অর্থাৎ আমি প্রচুর পরিমাণে শব্দ ও অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, জগতের জনক-জননী-স্বরূপ শিব ও শিবানী এই উভয়কে ভক্তি-সহকারে নমস্কার করি। রঘুবংশে মহাকবির বিনয় আমাদের মুগ্ধ করে—"ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" অর্থাৎ কোথায় সেই মহান সূর্যবংশ আর কোথায় আমার মতো অল্পবুদ্ধি মানুষ। অজ্ঞানবশত মহৎ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই হেতু ভেলা লইয়া দুস্তর সাগর পার হইতে চলিয়াছি। বৃহৎ তরুশাখায় ঝুলন্ত ফল উন্নত পুরুষ ধরিতে পারেন, কিন্তু বামন ঐরূপ করিতে গেলে উপহাস্যাস্পদ হয়। "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" অর্থাৎ মূঢ়মতি হইয়া কবিদের যশঃপ্রার্থী হইয়াছি, সুতরাং আমি যে উপহাস্যাস্পদ হইব—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভবভূতির তিনখানি নাটক প্রসিদ্ধ আছে—বীররসসমন্বিত 'মহাবীরচরিত', শৃঙ্গারস-সমন্বিত 'মালতী-মাধব' এবং করুণরসসমন্বিত 'উত্তররামচরিত'। রচনাদৃষ্টে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভবভূতি মহাবীরচরিত প্রথমদিকে এবং উত্তররামচরিত শেষ জীবনে রচনা করেন। সংস্কৃত নাটকে নান্দীপাঠই মঙ্গলাচরণ। উহা নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য পঠিত হয়। ভবভূতি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মার অংশরূপ ও অমৃতের ন্যায় সুরসা বাগ্‌দেবীকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থদ্বয় আরম্ভ করিয়াছেন। কালিদাসের মতো অত বিনয় প্রকাশ করিয়া ভবভূতি রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচরিতের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া গম্ভীরভাবে লোকোত্তর পুরুষের জীবনসলিলে অবগাহন করিয়াছেন। নাটকের নৈপুণ্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নাটকের গুণ বাড়াইতে পারে না। বাক্য যদি গম্ভীর ও প্রাঞ্জল হয়, তাহা হইলেই অর্থের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উহাতেই নাটকের নৈপুণ্য বিকশিত হয়।" মালতী-মাধব পড়িলে বোঝা যায় যে, ভবভূতির নিজের প্রতিভার প্রতি একটি দৃঢ় আস্থা ছিল। একটি সুন্দর শ্লোকে তিনি উহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"তে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং, জানন্তি যে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমানধর্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।।"

অর্থাৎ আমার প্রতি যাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা অল্পই বোঝে; তাহাদের জন্য আমার এই রচনার প্রয়াস নহে। এ পৃথিবী বিশাল এবং কালেরও কোন সীমা নাই; সেহেতু আমার সমানধর্মী কেহ আছে বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে। ভবভূতির 'সমানধর্মা' এবং Greyর 'Kindred Soul' একার্থক। লেখক ও পাঠকের যোগসূত্র কাব্যই স্থাপন করে এবং পরস্পরং ভাবয়ন্তং না হইলে উহা রসোত্তীর্ণ হয় না। Leo Tolstoy তাঁহার What

is art গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Every art causes those to whom the artist's feeling is translated to unite in soul with the artist and also with all who receive the same impression."

রঘুবংশ কালিদাসের ১৯ সর্গব্যাপী একখানি উৎকৃষ্ট বিরাট কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্য কাব্যের মতো ইহার সমস্ত অঙ্গই বিদ্যমান। দৈর্ঘ্যে একটু বেশি হইলেও উহার গাঁথুনি মজবুত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনে লেখনীমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ "কাব্য বা মহাকাব্য হয় একটি নায়ক, একটি নায়িকা, একটি দেশ, একটি নগর বা একটি নগরী লইয়া। সমস্তটাই বহির্জগতেরই হউক বা অন্তর্জগতেরই হউক, একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। অন্তর্জগতের গণ্ডিও ছোট—হয় প্রেম, নয় করুণ, নয় বীররস। রঘুবংশ গণ্ডি মানে না। যদি ইহার কোন গণ্ডি থাকে তবে উহা প্রকাণ্ড দিগ্‌দেশকাল ব্যাপিয়া। রস-ভাব বল, প্রায় সব কটিই উহাতে আছে। সুতরাং কি বাহিরে কি ভিতরে রঘুবংশ একখানি প্রকাণ্ড কাব্য। দেশ যদি বল, উহা সমস্ত ভারত জুড়িয়া আছে; এমন কি ভারতের বাহিরেও পারস্য দেশ, আরবদেশ, যবন দেশ, হূন দেশ, লঙ্কা, উচাং, বোস্তাং, খোটান প্রভৃতি দেশগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেরও একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলের দেশগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ আছে, মর্ত আছে, নাগলোক আছে, সমুদ্র আছে, পর্বত আছে, বন আছে, নদনদী আছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে যাহা কিছু আছে, ইহাতে সবই আছে। দেশও যেমন প্রকাণ্ড, কালও তেমন প্রকাণ্ড। ২৯ পুরুষ এই কাব্যের বিষয়।... মোটকথা, সমস্ত পৃথিবীর কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভালগুলি রঘুবংশে লইয়াছেন।"

রামায়ণে আদিকবি বাল্মীকি রামকে নানাভাবে রূপ দিয়াছেন; গাহিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব কীর্তিকথা। তাহা হইলে কবি কালিদাসের আবার নূতন প্রয়াস কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ "কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপর টেক্কা দেওয়া। তিনি রামসীতার ছবি আঁকিতে গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রামসীতার আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন।... কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এতো গেল খাস রামায়ণে—যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণের বাহিরে যেসব ছবি, বাল্মীকিতে তো সেগুলি নাই, সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।"

কাব্যে যাহা দেখানো সম্ভব, নাটকে তাহা সম্ভব নহে; আবার নাটকে যাহা সম্ভব কাব্যে তাহা দেখানো যায় না। দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য উভয়েই যদিও কাব্যধর্মী তবুও উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে এবং বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কালিদাস ৬টি সর্গে (৫৫২টি শ্লোকে) আর ভবভূতি ২ খানি নাটকে (১৪টি অঙ্কে) রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় ভবভূতিও বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া আপন আদর্শ ও ভাবানুযায়ী রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির কল্পনা সুদূরপ্রসারী। অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উহার প্রমাণ দিব। ভবভূতির মালতীমাধব একটি কাল্পনিক সৃষ্টি। রঘুবংশে কালিদাসের যেমন নিজস্বতা আছে তেমনি ভবভূতির রামচরিতদ্বয় নিজস্বতায় পরিপূর্ণ। শ্রব্য কাব্য বলিয়া কালিদাস background সাজাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু ভবভূতি বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের মুখে কথা সাজাইয়া দিয়া উহাদের জীবন্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। নাট্যকারেরা চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারে licence লইয়া থাকেন, ইহা সর্বজন-বিদিত। ভবভূতি ঐ সুযোগ ছাড়েন নাই। কালিদাস বাল্মীকিকে টেক্কা মারিয়াছেন; ভবভূতি কিন্তু কেবল টেক্কা মারিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনভাবে বিস্তার করিয়াছেন।

ভবভূতি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। কথিত আছে, তিনি কুমারিল ভট্টের নিকট 'পূর্বমীমাংসা' এবং জ্ঞাননিধির নিকট 'উত্তরমীমাংসা' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ' ভবভূতি ধুরন্ধর তার্কিকদের ন্যায় নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে বৈদিক ধর্মের উৎকর্ষ এবং ন্যায়সঙ্গতা দেখাইয়াছেন। হাস্যরস নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ, নতুবা দর্শকের একঘেয়ে লাগিবার আশঙ্কা থাকে। কালিদাসের নাটকে বিদূষক আছে, কিন্তু ভবভূতির তিনখানি নাটকে কোথাও বিদূষক নাই। করুণরসের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করা কঠিন হইলেও ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে মুনিবালকদের দ্বারা অশ্বমেধের অশ্বকে লইয়া কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি বলিয়াছেন ঃ

"ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাটকে যন্ন দৃশ্যতে।।"

অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ ও কর্ম নাই যাহা নাটকে দেখানো যায় না। শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য মনের উপর অধিক রেখাপাত করে।

রঘুবংশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস স্বতই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে; উহা হইতেছে একটি মহান বংশের উত্থান ও পতন অর্থাৎ উঠতি বেলা ও পড়তি বেলা। সূর্য-বংশের সূর্য দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘু, অজ ও দশরথের উপর দিয়া উদিত হইয়া যখন রামচন্দ্রের উপর পড়িল তখন বেলা বারটা। রঘুবংশ তখন গৌরবের শীর্ষে। ঐ সূর্য তারপর যখন ২৩ পুরুষ পার হইয়া ২৪ পুরুষ বা শেষ পুরুষ অগ্নিবর্ণে পৌছাইল তখন সূর্য অস্তোন্মুখ। অগ্নিবর্ণ নামেই অগ্নিবর্ণ ছিলেন; অত্যধিক ভোগোন্মত্ততার জন্য তাঁহার রাজযক্ষ্মা হয়। ইহার ফলে বিবর্ণ হইয়া কোন বংশধর না রাখিয়া মারা যান। প্রজারা অগ্নিবর্ণের এক গর্ভবতী মহিষীকে রাজপদে ন্যস্ত করেন। কালিদাস বড় নির্দয়ভাবে

রঘুবংশের উপর যবনিকা টানিয়াছেন।

কালিদাস রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ১০ম সর্গে দেখাইয়া একটু মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"দশানন-কিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ।
মণিব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যশ্রুবিন্দবঃ।।"

অর্থাৎ রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষসলক্ষ্মীর অশ্রুবিন্দুসকল অবনীতলে পতিত হইল। যজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে সর্বগুণের আকর রামচন্দ্রকে চাহিলেন। রামচন্দ্রের বয়স তখন ১৫ বৎসর। কালিদাস লিখিয়াছিলেন, "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে" অর্থাৎ তেজস্বীদের বয়স পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রামলক্ষ্মণ কৌশিক মুনির সঙ্গে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন। এইকালে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে তাঁহারা বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করেন এবং সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করেন। রামচন্দ্র পরে অহল্যা-উদ্ধার এবং মিথিলায় গমন করিয়া হরধনু ভঙ্গ করেন এবং জনকের অযোনিজা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। ইহা সত্যই আশ্চর্যের যে, ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত—উভয়েরই নায়িকাদ্বয় অযোনিজা।

নিমিকুলের সঙ্গে রঘুকুলের সম্বন্ধ বৈবাহিক সূত্রে দৃঢ় হইল। রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইল। রাজা দশরথ সকলকে লইয়া অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইলেন। তিন দিন চলিবার পর কৃতান্তসম পরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। পরশুরাম নিজগুরু শিবের ধনুর্ভঙ্গকারী রামকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিলেন, "নিহত দৃপ্ত রাজন্যবর্গের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিরপায়ী আমার এই ভয়ঙ্কর পরশু নির্দয়ভাবে পতিত হউক তাহার উপর, নিঃশঙ্কচিত্তে যে আমার গুরুর ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন এবং উচ্ছলিত নবীন যৌবনের দ্বারা যাহার অখর্ব গর্বতাপ স্ফুরিত হইয়াছে।" রসগঙ্গাধর গ্রন্থে এই উক্তিটিকে রৌদ্ররসের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে! এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে, একমাত্র রামায়ণে দেখা যায় দুই জন অবতারের পরস্পর সাক্ষাৎ। জয়দেবকৃত দশাবতার-স্তোত্রে প্রথমে 'কেশবধৃতভৃগুপতিরূপ' এবং ঠিক তাহার পরেই 'কেশবধৃতরঘুপতিরূপ' উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়কারী মাতৃহন্তা পরশুরামকে দেখিয়া বৃদ্ধ দশরথ ভীত হইয়া 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' বলিয়া জামদগ্ন্যকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ জগতে পুত্রবাৎসল্য মানুষকে এইরূপই উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। কালিদাস পরশুরামের বীরত্ব অত্যন্ত সাধারণভাবেই দেখাইয়াছেন। "পূর্বে 'রামনাম' উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন সেই নাম অভ্যুদয়োন্মুখ তোমাতে বিভক্ত হওয়াতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে। তুমি আমার এই শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শরসংযুক্ত ধনুক আকর্ষণ কর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। ইহাতে সমর্থ হইলে তোমাকে সমবাহু-

বলশালী বিবেচনা করিয়া পরাভব স্বীকার করিব অথবা আমার প্রদীপ্ত কুঠারের ভয়ে ভীত হইয়া প্রার্থনা কর।" পরশুরামের উপর্যুক্ত উক্তিতে রামচন্দ্র মৃদুহাস্য করিয়া ধনুক গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"বলুন, এই অব্যর্থ শর দ্বারা আপনার স্বৈরগতি অথবা যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোক অবরোধ করিব?" হৃতদর্প পরশুরাম নতি স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া জানিতাম না এমন নহে; আপনি মর্তে অবতরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনার দিব্যতেজ দর্শন করিবার জন্য আপনাকে কুপিত করিয়াছি। যাহা হউক, আপনি আমার গতি রুদ্ধ করিবেন না, আমার পুণ্যার্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ করুন।" রামচন্দ্র তাহাই করিলেন।

ভবভূতি কালিদাসের মতো রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচন্দ্রের উপর তাঁহার প্রথম নাটক মহাবীরচরিত। বীররূপেই তিনি রামচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চে উঠাইয়াছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে ধনুর্বাণহস্তে যজ্ঞরক্ষাকারিরূপে দেখি। ঐ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মিথিলার রাজর্ষি জনককে বলিয়া পাঠান, "তুমি এই যজ্ঞে যজমানরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছ জানিবে এবং সীতা ও ঊর্মিলার সঙ্গে কুশধ্বজকে এখানে পাঠাইয়া দিবে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র জনক নিজভ্রাতা কুশধ্বজকে কন্যাদ্বয়সহ সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। যাহা হউক, নাটকের প্রারম্ভে ইহাদের পূর্বকল্পিত মিলন খুবই সুন্দর।

এ জগতে গুণানুরাগ রূপানুরাগকে দৃঢ় করে। রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে অহল্যার উদ্ধার হইলে পর সীতা চুপি চুপি সানুরাগে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "ইঁহার যেরূপ শরীরের গঠন, ইঁহার প্রভাবও তাহারই অনুরূপ।" মহাবীর-চরিতে এই বালকাণ্ডের যথেষ্ট নূতনত্ব রহিয়াছে; যাহা অন্য কোন রামায়ণে নাই। সিদ্ধাশ্রমেই রাবণ-পুরোহিত 'সর্বময়' নামক জনৈক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের দূতরূপে আসিয়া জানাইলেন যে, রাবণ সীতাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এমন সময় তাড়কা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিতে আসিলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে রাক্ষসীকে বধ করিতে নির্দেশ দেন। রাম বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্ স্ত্রী খলু ইয়ম্।" অর্থাৎ ইনি যে স্ত্রীলোক! এই কথা শুনিয়া সীতার পূর্বরাগ আরও বর্ধিত হইয়াছে। সীতা বলিয়া উঠিয়াছেন, "আহা! স্ত্রীলোক বলিয়া ইঁহার মনের ভাবটা কেমন বদলাইয়া গেল!" যাহা হউক, রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আদেশে তাড়কাবধ করিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট অলৌকিক সব দিব্যাস্ত্র লাভ করেন এবং হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিলেন। ভবভূতির হরধনুর বর্ণনা বাল্মীকি বা কালিদাসের সঙ্গে মিলে না। তাঁহার মতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবতাদের পরাক্রমের সার দিয়া ত্রিপুরাসুরবধের জন্য এই হরধনু তৈরি করেন। অপরদের মতে বিশ্বকর্মা ঐ ধনুর নির্মাতা।

যাহা হউক সেই 'সর্বময়' রাক্ষস সব কিছুর সাক্ষী হইয়া লঙ্কায় রাবণ-অমাত্য মাল্যবানকে সংবাদ দিতে গেল। মন্ত্রী মাল্যবান মহেন্দ্রদ্বীপে পরশুরামের কাছে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইলেন। মাল্যবান প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মতো 'সাম-

দান-ভেদ ও দণ্ড' নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে শম্ভু-শিষ্য উগ্রতেজা পরশুরামকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন। পরশুরামের চরিত্র ভবভূতির একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতে রহিয়াছে ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, অপূর্ব গুরুভক্তি। ভবভূতি রামচন্দ্রের বীরত্ব-খ্যাপনে পরশুরামের চিত্র যত উজ্জ্বল করিয়াছেন, রাবণের চিত্র তত উজ্জ্বল হয় নাই। প্রবাদ আছে, 'জটিলে কুটিলে না হইলে লীলা পোষ্টাই হয় না' অর্থাৎ বিঘ্নকারীরা না থাকিলে প্রেম বা বীরত্ব কোনটিই বিশেষভাবে প্রকটিত হয় না। তাই মনে হয় ভবভূতি কিশোর বালক রামের প্রতি পরশুরামের ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার, সর্বগ্রাসী মনোভাব একটু বেশি করিয়া দেখাইয়াছেন। রামকে দেখিয়া পরশুরামের অশ্রুও বিগলিত হইয়াছে। মানুষের চোখের জল ফেলাইতে ভবভূতি সিদ্ধহস্ত। একই চরিত্রে যুগপৎ বিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ। পরশুরামের হিংস্রতার মধ্যে দেখা দিয়াছে মানবিক স্নেহ কোমলতা। তিনি রামচন্দ্রকে 'ক্ষত্রিয়ডিম্ব' বলিয়া গালাগালি করিয়া পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "তুমি নয়নাভিরাম, আমার প্রিয়; কিন্তু গুরুর অপমান হেতু তুমি বধ্য। আবার তুমি নূতন বিবাহ করিয়াছ। সেই নববধূর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তোমাকে বধ করিতে আমার কষ্ট হইতেছে। এইরূপ কষ্ট আমার পূর্বে কখনও হয় নাই; অথচ পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার কালে আমি ক্ষত্রিয়নারীর গর্ভ হইতে ক্ষত্র-পুত্র বাহির করিয়া কাটিয়াছি।"

শত বিপদেও মহাবীর রাম নির্বিকার। ভবভূতি রামকে কোথাও উদ্বিগ্ন হইতে দেন নাই। পরশুরামের গালিগালাজ-বর্ষণ, ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও রাম তাঁহার শ্রদ্ধা বা বিনয়-প্রকাশে কার্পণ্য করেন নাই। ভবভূতি শত্রু পরশুরামের মুখ হইতে রামের মহিমা প্রকাশ করাইয়াছেন ঃ "আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য ও সৌজন্য! ক্রোধে গম্ভীর, পৌরুষে ধীর।" যখন অন্তঃপুর হইতে বধূদের কঙ্কণ মোচনের জন্য জামাতা রামচন্দ্রের ডাক পড়িল, তখনও মানবিকতাবোধে পরশুরাম বলিতেছেন, "যাও, লোকধর্ম পালন করিয়া আইস।" তারপর রাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া পরশুরাম তাঁহাকে নিজ ধনু দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভবভূতি সীতাকে নারীসুলভ মৃদুতা, কোমলতা দিয়া গড়িয়াছেন। পরশুরামের ভয়ে সীতা জড়সড় ছিলেন। ইতিহাস-বিশ্রুতা ক্ষত্রিয়রমণী সংযুক্তা স্বামী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধের সাজ পরাইয়া দিবার কালে বলিয়াছিলেন, "তুমি চৌহান-সূর্য। তুমি এই জীবনে যশ ও সুখ দুই-ই যেমনভাবে পাত্রপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছ, তেমন আর কেহ করে নাই। জীবন হইতেছে একটা পুরান কাপড়; যদি ইহাকে ফেলিয়া চলিযা যাইতে হয়, দুঃখ নাই। কারণ ভাল করিয়া মৃত্যুবরণ করাই হইতেছে অমরতা।" সীতা সংযুক্তার মতো না হইলেও তাঁহার মৃদুতা নিছক দুর্বলতা নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন, "মৃদুতার দ্বারা কঠোর জিত, অকঠোরও জিত হয়। মৃদুতার দ্বারা অভিভূত হয় না, এমন কিছুই নাই। মৃদুতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র।"

রঘুবংশে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড মাত্র ১০৪টি শ্লোকে সমাপ্ত (দ্বাদশ সর্গ)। কালিদাস কেবল বাল্মীকির চিন্তাধারার সংগতি

রক্ষা করিয়া দুই-চারিটি কথা বলিয়া কাব্যিক প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন। কালিদাসের উপমা তুলানহীন। দ্বাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে তিনি পরবর্তী ঘটনায় ভূমিকাস্বরূপ বলিয়াছেন ঃ উষাকালে বর্তিকার অন্তর্বর্তিনী দীপশিখা যেমন পাত্রস্থিত সমস্ত তৈল সম্ভোগ করিয়া নির্বাণোন্মুখ হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ অন্তিম দশায় উপস্থিত ও বিষয় সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণের সমীপবর্তী হইলেন। জরা দশরথের কর্ণে রামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোপনা কৈকেয়ী ঈর্ষাবিষ উদ্গীরণ করিলেন। বাল্মীকি বনগমন-ব্যাপারে কৈকেয়ীর নিকট রামচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "আমি রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি।" রামচন্দ্রের বনগমনে কালিদাসের অনুভব ঃ "সীতাকে রামের পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী রামগুণে পক্ষপাতিনী হইয়া, কৈকেয়ীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন।" অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র নির্বিকার, অপূর্ব সংযমী, সত্যে অটুট। কেহ তখন বিষাদমগ্ন, কেহ প্রতিশোধপরায়ণ, কেহ বা রাজ্যকামী—কিন্তু ঐ সব সাংসারিক বিপর্যয়ের ভিতর জ্ঞানী রামচন্দ্র কর্তব্যের বিগ্রহরূপে অবস্থিত। বৈষয়িক সংঘর্ষ সাধারণ মানুষের মতো তাঁহার হৃদয়কে দোলায়িত করিতে পারে নাই। কালিদাস একটু সহানুভূতির সুরে বলিয়াছেন, "প্রশান্তচিত্ত সানুজ রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে যৌবনকালেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত আচরণ করিতে চলিলেন।"

ভবভূতির মহাবীরচরিতে অযোধ্যাকাণ্ডের বিবরণ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই রামচন্দ্রকে দমনের জন্য রাবণের ষড়যন্ত্র দেখা যায়। রাবণের মাতামহ ও মন্ত্রী মাল্যবান এইসব ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। প্রথমে পরশুরামকে দিয়া রামকে জব্দ করিবার চেষ্টা, পরে শূর্পণখাকে মায়াবিনী হইয়া মন্থরার উপর ভর করিতে নির্দেশ এবং অবশেষে বালীকে দিয়া রামচন্দ্রের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা। মাল্যবানের সঙ্গে শূর্পণখার কথাবার্তা ভবভূতির কল্পিত। নাট্যে ও কাব্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্য কল্পনা দূষণীয় নহে।

মন্থরা-শরীর-প্রবিষ্ট শূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণকে পাইয়া কৈকেয়ীর পত্র দেখাইতেছেন ঃ "দেখ বৎস, পূর্বে মহারাজ আমাকে দুইটি বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ের বার্তাবাহক-স্বরূপ। একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্যশ্রী ভোগ করুক; অন্য বরের দ্বারা রাম কালহরণ না করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।" অযোধ্যায় তখন রামের অভিষেকের মহোৎসব ও জামদগ্ন্য-বিজয়োৎসব চলিতেছে। এমন সময় রামচন্দ্র রাজা দশরথের কাছে বনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ঐ কথা শুনিয়া দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে চলিলেন।

দর্শক ও শ্রোতা যখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন অন্য রস পরিবেশন করিয়া ঐ বিষাদের লাঘব কবি-কুশলতার পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই সমান দক্ষ। কালিদাস শূর্পণখাকে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে ফষ্টিনষ্টি করিয়া

হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যরতা সীতাকে ক্রোধোন্মত্তা শূর্পণখা বলিয়াছে ঃ "তুই শীঘ্রই ওই পরিহাসের সমুচিত ফল পাইবি; আমার দিকে দেখ্, মৃগী যেমন ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে তুই আমাকে সেইরূপ পরিহাস করিলি, ইহা মনে রাখিস্।" তারপর লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিলেন। ফল হইল সীতাহরণ। বাল্মীকি সীতাহারা রামকে দিয়া হা-হুতাশ ও বিলাপ করাইয়াছেন; কালিদাস ও ভবভূতি ওদিকে বেশি যান নাই। মানুষ আপন মন দিয়াই জগৎ গড়ে। ভক্তকবি তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের নবদূর্বাদলশ্যাম কোমল দেহশ্রী অঙ্কন করিয়া তাঁহার বীরত্বের ও বৈরাগ্যের দিকটা তত দেখান নাই। মহর্ষি বাল্মীকি বনবাসোপলক্ষে বিলাপরতা কৌশল্যাকে দিয়া বলাইয়াছেন, "মহেন্দ্রধ্বজ-সঙ্কাশ উন্নতদেহ রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘ-তুল্য-কঠিন বাহু উপাধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন?" শৃঙ্গবেরপুরে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইঙ্গুদীমূলে কঠিন স্থণ্ডিলভূমি রামের বাহু-নিষ্পেষণে মর্দিত হইয়া আছে, আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।" সুতরাং ভক্তকবিদের রামবর্ণনা 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল' বা 'ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে'—বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতির সঙ্গে মিলে না।

পূর্বে আমরা সীতাকে কোমলস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঐ কোমলতার সঙ্গে ছিল বুদ্ধির প্রখরতা আর ছিল পতিগতপ্রাণা সতীর পতিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। ইহার একটু নমুনা উল্লেখ করিয়া আমরা বালীবধের বর্ণনায় প্রবেশ করিব। বনবাসকালে ঋষিগণের অনুরোধে রাম রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্যনিবারণের ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সীতা রামকে বলেন, "তিনটি কার্য পুরুষের বর্জনীয়—মিথ্যাকথা, পরদার ও অকারণ শত্রুতা। তোমার সম্বন্ধে প্রথম দুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না; কিন্তু তুমি রাক্ষসগণের সঙ্গে অকারণ শত্রুতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" রাম প্রত্যুত্তরে বলেন, "ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়। আমি শরণাগত ঋষিগণকে কথা দিয়াছি। আমার যে-কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকেও পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

কালিদাস একটি শ্লোকে বালীর উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন। বাল্মীকি বালীকে সাহস, তেজ ও উদারতার পরাকাষ্ঠারূপে দেখাইয়াছেন। বাণবিদ্ধ বালী রামচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় যেসব যুক্তিমণ্ডিত নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি তাহার একটিরও যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নাই। কয়েকটি যুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ ১। আমি আপনার রাজ্যে যাইয়া কোন অন্যায় করি নাই, অথচ আপনি আমাকে বধ করিলেন। ২। আমার মাংস আহার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ৩। এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা উৎকৃষ্ট শস্য জন্মায় না, যেহেতু আপনি এ স্থান অধিকার করিবেন। ৪। আপনি লুকাইয়া তস্করের ন্যায় আমাকে বধ করিলেন; লুকাইয়া বাণনিক্ষেপ যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। ৫। যে আপনার কোন অন্যায় করে নাই, তাহাকে অন্যায়পূর্বক হত্যা করিলেন—ইহা সাহসী যোদ্ধার কাজ নহে। ৬। সুপ্ত ব্যক্তিকে

যেরূপ সর্প দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সম্মুখ যুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিহত হইতেন। ৭। রাজহত্যার ফল অনন্ত নরক; আপনি তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। আপনার ভিতরে হিংসা অথচ তপস্বীর মতো জটাজুট চীরবাস ধারণ করিয়াছেন। আমাকে বধ করিয়া আপনি অক্ষয় অযশ অর্জন করিলেন।

বালীর এই উক্তির উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তিগুলি দৈন্যে ভরা। ভবভূতি কিন্তু ঐদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামচন্দ্র ও বালীকে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছেন এবং পরে বাণবিদ্ধ বালীকে দিয়া নাটকীয়ভাবে যুগপৎ একটি বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। মাতঙ্গমুনির আশ্রমে মৃত্যুপথগামী বালীই রাম ও সুগ্রীবের এবং রাম ও বিভীষণের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করাইয়া দেন।

রামচন্দ্র কপিকুল দ্বারা অপার সমুদ্র সলিলোপরি এক দৃঢ় সেতু বন্ধন করাইলেন; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত রসাতল হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সেই সেতুপথে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানরসৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধ করিলেন। আরম্ভ হইল তুমুল যুদ্ধ। স্ববশে আনিবার জন্য রাবণ মায়াবলে জানকীকে রামের ছিন্ন মস্তক দেখাইলেন; পরে ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা দিল। গরুড় রাম-লক্ষ্মণকে মেঘনাদের নাগপাশবাণ হইতে মুক্ত করিল। রাবণের শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ বিদীর্ণ করিল; পরে হনুমান কর্তৃক আনীত মহৌষধি লক্ষ্মণকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিল। 'তুমি অতিশয় নিদ্রাপ্রিয়; দশানন অকালে তোমাকে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন'—কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করাইলেন। "অরাবণমরামং বা জাগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ" অর্থাৎ আজ ব্রহ্মাণ্ড হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য হইবে—এই নিশ্চয় করিয়া রাবণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে পাদচারী রামচন্দ্র ও রথারূঢ় রাবণের যুদ্ধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র রামের নিকট স্বীয় সারথি মাতলিসহ নিজ জৈত্ররথ পাঠাইয়া দিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর 'দেবতাদের অবধ্য' এই বরপ্রাপ্ত রাবণ মানুষ রামের হস্তে নিহত হইলেন। রঘুবংশে কালিদাস-বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসে সিঞ্চিত হইতে পারে নাই। কারণ কালিদাস ভবভূতির ন্যায় রামচন্দ্রকে লইয়া বীররসের অবতারণা করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "We have no martial music, no martial poetry either. Bhavabhuti is a little martial." প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে পরে বর্ণিত উক্তি কালিদাসকে নরম থাকের মানুষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। "দশানন অতিশয় ক্রোধভরে জানকীর সঙ্গমসূচক রামচন্দ্রের স্পন্দমান দক্ষিণ-ভুজে শর নিক্ষেপ করিলেন।" কালিদাসের আর একটি উক্তি ধরা যাক: "অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রামের সেই দীপ্ত অস্ত্র আকাশপথে শতধা প্রদীপ্ত হইয়া করালফণামণ্ডলধারী শেষভুজঙ্গমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।" আবার ঠিক তাহার

পরেই রহিয়াছে, "সেই অস্ত্রাঘাতে মস্তকচ্ছেদনকালে লঙ্কেশ্বর কিছু মাত্রই কষ্ট অনুভব করিলেন না।" অবশ্য এইরূপ পাশাপাশি ভাবের বৈচিত্র্য কাব্যকে সুন্দর করিয়া তোলে—এই কথা সত্য। যুদ্ধের বর্ণনায় কালিদাস যে কম নিপুণ ছিলেন, এ-কথা বলিলে ভুল হইবে। কারণ রঘুবংশে রঘুপুত্র অজের সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ বা কুমারসম্ভবে ৪টি সর্গে (১৪, ১৫, ১৬, ১৭) ২০৯টি শ্লোকে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সঙ্গে তারকাসুরের যুদ্ধবর্ণনা সত্যই অদ্ভুত ভীতিপ্রদ।

ভবভূতি রাবণকে বীররূপে আঁকিয়াছেন, রাবণ প্রিয়তমা ভার্যা মন্দোদরীর সাবধানোক্তি উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের পৌরুষে সদা আস্থাবান ছিলেন। যিনি লোকপাল ঈরদের জয় করিয়া নিজের বশে রাখিয়াছিলেন, তিনি কি আর মানুষ-বানরকে গণ্য করিবেন! মন্দোদরী চাহেন স্বামীর মঙ্গল। সেইহেতু তিনি অত্যাশ্চর্যভাবে রামের সেতুবন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছু বর্ণনা করিলেন, যাহাতে রাবণ যুদ্ধ হইতে বিরত হন। বালীপুত্র অঙ্গদ রামের দূতরূপে আসিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বলিল। 'বানরও বক্তা হইল'—রাবণের উপহাসোক্তি অঙ্গদকে ক্রোধোন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে হুংকার দিয়া রামের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। শুরু হইল যুদ্ধ।

রাম-রাবণের যুদ্ধের তুলনা রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই তুলনাহীন যুদ্ধের কাহিনী উপস্থাপনে ভবভূতির রচনাশৈলী অপূর্ব ও মৌলিক। তিনি নিজের মুখে কিছু না বলিয়া আকাশমার্গে একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়া গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন সংযোজনা করিয়াছেন। ঠিক যেন ফুটবলখেলার ধারাবিবরণী। দেবরাজ ও গন্ধর্বরাজের কথোপকথনে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের একখানি নিখুঁত ছবি। ভবভূতির মনের ইচ্ছা—আমি কিছু জানি না; মানুষরাজ ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধের সাক্ষী দেবরাজ ও গন্ধর্বরাজ। ঐ প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও ভবভূতি রাম-রাবণের মনে বাৎসল্যরস সিঞ্চিত করিয়াছেন। একদিকে রাম ও রাবণ সংগ্রামে মত্ত, অপরদিকে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ। একদিকে চলিয়াছে ঘোর বাণবৃষ্টি, কিন্তু তাহার ভিতরেও দুই স্নেহাস্পদের প্রতি রাম ও রাবণের ছুটিয়াছে স্নেহদৃষ্টি। ভবভূতি বেশ মজা করিয়া বলিয়াছেন, "মানুষে লোকে বাৎসল্যং নাম কেবলমখিলেন্দ্রিয়বশীকরণ-চূর্ণমুষ্টিঃ" অর্থাৎ মনুষ্যলোকে বাৎসল্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীকরণের চূর্ণমুষ্টিস্বরূপ। শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামের চিত্ত যুগপৎ করুণ ও বীররসে পূর্ণ হইয়াছিল। চিত্ররথ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আহা, রঘুপুঙ্গবের কি বাৎসল্য-মহিমা! উনি অনুজের অবস্থা নিজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতেছেন।" তারপর হনুমান মহৌষধি আনিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন।

Suspense বা সন্দেহজনিত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিতে ভবভূতি অদ্বিতীয়। নাটককে মনোরম করিতে উহার ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্র ও চিত্ররথের একটির পর একটি উদ্বেগ-সৃষ্টি ও উহার নিরসন সত্যই মনোজ্ঞ। রাবণ-নিধনের পর

কালিদাস সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখান নাই, ভবভূতি দেখাইয়াছেন। লঙ্কার ভয়াবহ ধ্বংসের বিবরণ কালিদাস দেন নাই, ভবভূতি দিয়াছেন।

এবার অযোধ্যায় ফিরিবার পালা। পুষ্পক বিমানে উঠিবার পূর্বে রঘুবংশের ভাষার ও নৈসর্গিক বর্ণনার একটু মূল্যায়ন করা দরকার। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গে (৩১টি শ্লোক) কালিদাস তাঁহার কবিত্বশক্তির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৩টি সর্গে (২৮, ২৯, ৩০) বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা আছে। কালিদাস রঘুবংশে সংক্ষেপে ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। 'ঋতুসংহার' নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে তিনি ঋতুবর্ণনায় বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখেন নাই। কালিদাসের নামে একটি অপবাদ আছে যে, তিনি সম্ভোগের কবি। এই কথা কিন্তু নিছক অপবাদ। পাঠক-সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, প্রথমত সংস্কৃত সাহিত্য, তাহার উপর কালিদাসের রচনা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। মল্লিনাথ কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত—এই কাব্যত্রয়ের উপর সঞ্জীবনী ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবতরণিকা-শ্লোকে লিখিয়াছেন ঃ

"ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি।।"

অর্থাৎ কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্ছাগ্রস্ত; আমার এই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যাই তাহাকে উজ্জীবিত করিবে।

রঘুবংশের ভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ "কালিদাসের অন্য সকল কাব্যে ও নাটকে ভাষার যে-সকল দোষ দেখা যায়, রঘুবংশে সে-সকল দোষ দেখা যায় না। 'ঋতুসংহার' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অনেক সময় দূরান্বয় দেখা যায়। 'রঘুবংশে' সে দোষ একেবারে নাই। কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ রঘুবংশে নাই বলিলেও হয়। যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে না তাহার একটা দোষ—উহাতে লম্বা লম্বা সমাস আসিয়া জুটিয়া যায়। কালিদাসে কিন্তু সে দোষ বড় বেশি নাই। বাণভট্টে, ভবভূতিতে ও শঙ্করাচার্যে যেরূপ দেড়গজী ও দুগজী সমাস দেখা যায়, কালিদাসে সেরূপ একেবারেই নাই। সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইলে, আমার বোধ হয়, কালিদাসই মডেল, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রঘুবংশ'ই মডেল।"

কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের আরম্ভে লিখিয়াছেন; অনন্তর সর্বগুণসম্পন্ন নারায়ণের অংশসম্ভূত রঘুতিলক রামনামধারী হরি পুষ্পক-রথে আরোহণপূর্বক শব্দগুণশালী আকাশপথে যাত্রাকালে সাগর ও দূর হইতে ভারতভূমি দর্শন করিয়া সুমধুর বাক্যে প্রিয়তমা জানকীকে বলিতে লাগিলেন ঃ "মৈথিলি, দেখ—

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বীতমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।' "

অর্থাৎ দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলাভূমি লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা

পাইতেছে। আলোচ্যমান শ্লোকগুলি কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। মহাকবি অপূর্ব কৌশলে রামসীতার অপূর্ব প্রেমচিত্র ফুটাইয়াছেন; দুঃখময়, বিরহপূর্ণ অরণ্যবাসের স্মৃতিগুলিও আজ তাঁহাদের কাছে মনোরম। বেদনা ভালবাসাকে গাঢ় করিয়া তোলে। রামচন্দ্র কখনও রাক্ষসসঙ্কুল জনস্থান, কখনও সেই বনস্থলী যেখানে তিনি সীতার নূপুর পান, কখনও পম্পা সরোবর, গোদাবরীর তীর, বিভিন্ন তপস্বীদের আশ্রম ইত্যাদি প্রিয়তমা মহিষীকে দেখাইতে দেখাইতে সুখ-দুঃখের দিনগুলির উপর দিয়া ঝটিতি উড়িয়া গেলেন। পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "লঙ্কাদ্বীপ হইতে সারা ভারতবর্ষের—দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সারা দেশের—এমন বর্ণনা আর নাই। যত বড় বড় জিনিস, সব দেখানো হইল। পুরাণ কথা সব বলা হইল। পুরাণ প্রেমের কাহিনী সব মনে করিয়া দেওয়া হইল। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখিলেন; মাঝে মাঝে সীতার উপর রামের প্রেম উথলিয়া পড়িল। এই মিলনই মিলন, চরম মিলন, পরম মিলন।"

কাব্যে যাহা সম্ভব নাটকে তাহা সম্ভব নহে। কালিদাস রঘুবংশে রামকে দিয়া এক তরফা বলাইয়াছেন; কিন্তু মহাবীর-চরিতে ভবভূতি স্বতন্ত্র। নৈসর্গিক বর্ণনা যৎসামান্য। আকাশপথে যাত্রাকালে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলেরই কথাবার্তা আছে। প্রথমে প্রশ্নকারী সীতা "অস্মাভিঃ সাম্প্রতং ক্ব প্রস্থীয়তে?" অর্থাৎ আমাদের এখন কোথায় যাইতে হইবে? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন ঃ "দেবি, রঘুকুলরাজধানীমযোধ্যাং প্রতি।" অর্থাৎ রঘুকুলের রাজধানী অযোধ্যায়। ভবভূতিতেও পুরাণ কথা, আশ্রমবর্ণনা, রামচন্দ্রের বিগত দিনের বীরত্বগাথা প্রভৃতি সব কিছুই আছে। কল্পনার অশ্ব ভবভূতিও ছুটাইয়াছেন। তিনি সেই আকাশ-বিমানকে উর্ধ্বে তুলিয়া অন্তরীক্ষলোক দেখাইয়াছেন, সেখানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখা যায়। অশ্বমুখী কিন্নর-মিথুন নামে অদ্ভুত জীবও দেখাইয়াছেন। তারপর মধুময় পূর্ব স্মৃতিগুলি রোমন্থন করিতে করিতে তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, উহা বাল্মীকির রচনা নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকায় উহা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডের পর রামায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় সেখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। তাহা ছাড়া বাল্মীকি সীতার উপর দুইবার নিষ্ঠুরতা করেন নাই। বসু মহাশয় বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে পূর্বকবি ও উত্তরকাণ্ডের রচয়িতাকে উত্তরকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ "পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন; কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা, না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয় উত্তরকবির আদর্শ মহৎ। তিনি আপাতনিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তরকবির মনঃপুত হয়নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্ত বোধ হয়

কালিদাসেরও ভাল লাগেনি, তিনি রঘুবংশে এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন; কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তার দিয়েছেন। বিধবা রাক্ষসীদের শাপের ফলে রাম সীতাকে অশুভ নয়নে দেখেছিলেন, এ-কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন। তুলসীদাস অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতাল প্রবেশ একেবারে বাদ দিয়েছেন।" ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' মিলনান্ত। তিনি নির্বাসন দিয়া মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু সীতাকে পাতালপ্রবেশ করান নাই।

সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাম-চরিতে কোথায় ঔচিত্য আর কোথায় অনৌচিত্য, উহা বিবৃত করাও অপ্রাসঙ্গিক। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধককবিরা সুধামাখা রামকথা জনমানসে যুগ যুগ ধরিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন; আর ভারতের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে উহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। জন্মদুঃখিনী সীতার কথা বিবৃত করিতে গিয়া মনে হয় কালিদাস নিজেই কষ্ট পাইতেছেন। লঙ্কা হইতে প্রত্যাগতা সীতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার কাছে আত্মপরিচয় দিতেছেন, "ক্লেশাবহা ভর্তুরলক্ষণাহং সীতা"—অর্থাৎ পতির ক্লেশপ্রদা আমি সেই অলক্ষণা সীতা। প্রত্যুত্তরে শ্বশ্রূমাতাগণ বলিতেছেন ঃ

"উত্তিষ্ঠ বৎসে ননু সানুজোঽসৌ বৃত্তেন ভর্ত্রা শুচিনা তবৈব।
কৃচ্ছ্রং মহৎ তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হং তামুচতুস্তে প্রিয়মপ্য-মিথ্যা।।"

অর্থাৎ বৎসে, উঠ, উঠ। তোমারই চরিত্রের পবিত্রতা হেতুই রামলক্ষ্মণ মহৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন; এইরূপ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে পরম প্রেমাস্পদ বধূকে সান্ত্বনা করিলেন। সীতার কপালে কোন সুখই স্থায়ী হইল না। প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র ভদ্র নামক এক গুপ্তচর দ্বারা নগরীর খবর লইয়া জানিলেন যে, রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির পর সীতাগ্রহণের জন্য তাঁহার নিন্দা হইতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, "যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ।" আপন কীর্তি বাঁচাইতে গিয়া রামচন্দ্র গর্ভবতী কান্তাকে হারাইলেন। সমষ্টি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতির ডোর কাটিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন সীতাকে বনবাসে রাখিয়া আসিবার জন্য। অনুজ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশ মন হইতে অনুমোদন করেন নাই; কিন্তু লোকশ্রুতি "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" অর্থাৎ গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়—অনুসারে স্বীকৃত হইলেন। বাল্মীকির তপোবনে মূর্ছিতা সীতার নিকট হইতে লক্ষ্মণের বিদায় সত্যই মর্মন্তুদ। পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর একটিও দেখা যাইবে না যে রাজমহিষী উপরন্তু গর্ভবতী সীতার দুঃখে অশ্রু ফেলিবে না বা রামচন্দ্রের অন্যায় একবাক্যে স্বীকার করিবে না। কালিদাস এমন মরমী ভাষায় এই চিত্রটি আঁকিয়াছেন যে, স্থাবর জঙ্গম সর্বত্রই শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে ঃ

"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি।।"

অর্থাৎ সীতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ময়ূরগুলি পেখম গুটাইয়া নাচ থামাইল; কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষগুলি হইতে কুসুম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণগুলি মুখে কচি ঘাস ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল; আহা! সীতার দুঃখে বনভূমিও কাঁদিতে লাগিল! সে ক্রন্দন পৌঁছাইল দয়াশীল মুনি বাল্মীকির কর্ণে। তিনি সীতাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। কালিদাস রামের অবস্থা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কৌলীন্য-ভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বিদেহসুতা মনস্তঃ।" অর্থাৎ লোকাপবাদভয়ে রাম মৈথিলীকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করেন, কিন্তু হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারেন নাই।

'উত্তররামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে' অর্থাৎ উত্তররামচরিতে ভবভূতির বহু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক 'উত্তররামচরিত' রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মহাবীরচরিত নাটকের উত্তরাংশ বলিয়া উহার এইরূপ নাম। কোন কোন পণ্ডিত উত্তর অর্থে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কারণ যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্রের মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, স্ত্রী ভাই প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনুরক্তি ও কর্তব্য লক্ষিত হয়। কিন্তু উত্তররামচরিতে প্রজানুরঞ্জনের জন্য, আদর্শস্থাপনের জন্য, পূর্ণ যৌবনে আপন মনকে বশীকৃত করিয়া স্ত্রীনির্বাসন, বর্ণাশ্রমধর্ম সংরক্ষণ, স্বর্ণসীতা গড়িয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ইত্যাদি গুণাবলী রামচন্দ্রকে মর্যাদাবান পুরুষে পরিণত করিয়াছে। এই নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকেও সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং ভবভূতির কবিকল্পনার উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। ভবভূতির এই নাটকে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে—আমরা অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে উহা দেখাইব।

উত্তররামচরিতের আরম্ভটা সুন্দর; বহু দুঃখের পর রাম-সীতার মিলন আনন্দের। রাজলক্ষ্মী সন্তান-সম্ভবা। বিধি সীতাকে পুনর্বার নির্বাসনে পাঠাইবার ভূমিকাস্বরূপ রামচন্দ্রকে লোকপ্রসিদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ঃ 'গর্ভবতীর যে-কোন ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ করিবে।' রামচন্দ্র সীতার সামনে প্রজাপালনের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ বলিয়াছেন "লোকের সন্তোষের নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, সুখ এমন কি সীতাকে পরিত্যাগ করিতেও আমার দুঃখ নাই।" সীতা এই কথা সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন; কারণ তিনি তখন ঐ কথার তাৎপর্য চিন্তা করেন নাই। কালিদাস লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে বিভিন্ন স্মৃতিকথা টানিয়াছেন, ভবভূতি সেখানে সংক্ষেপে সারিয়া বর্তমান নাটকে চিত্রদর্শন নামে প্রথম অঙ্ক সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এইরূপ আলেখ্যদর্শন ভবভূতির একান্ত নিজস্ব নহে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলায়' (ষষ্ঠ অঙ্কে) কালিদাস বিরহকাতর রাজা দুষ্মন্তকে শকুন্তলার চিত্র দর্শন এবং ঐ চিত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে জীবিতের ন্যায় সম্ভাষণাদি করাইয়াছেন। পরে বয়স্য চিত্র বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বলিলেন,

"দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা।।"

অর্থাৎ আমি তন্ময় হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, তুমি স্মরণ

করাইয়া দিয়া পুনরায় কান্তাকে চিত্রীভূতা করিয়া তুলিলে। এইভাবে দেখা যায় কালিদাসের ছায়া ভবভূতির উপর পড়িয়াছে।

ঐ সব চিত্রদর্শনকালে সীতা আবেগভরে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "স্নিগ্ধ ও নিস্তব্ধ বনশ্রেণীর মধ্যে আবার বিচরণ করিব, আর পবিত্রতাজনক, পাপনাশক ও শীতল ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিব।" রাম সীতার ঐ মনোবাসনা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে সীতার অভিলাষ পূর্ণ করিতে বলিলেন। এদিকে দুর্মুখ আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রজাদের অসন্তোষের কথা বলিলেন। রামচন্দ্র স্থির করিলেন ঃ যে-কোন কার্যের দ্বারা লোকের সন্তোষ করা সজ্জনের ব্রত। তথাপি তাঁহার খেদোক্তি সত্যই হৃদয়বিদারী ঃ "হায়, বিধাতা দুঃখ-ভোগের জন্য রামের দেহে চৈতন্য দিয়াছিলেন।" নিদ্রিতা সীতার চরণযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া (সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) রামচন্দ্র বলিলেন, "দেবি, রামের মস্তকে তোমার চরণকমলস্পর্শ এই শেষ।" স্ত্রীর পা স্বামী মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন—ইহাতে ভবভূতির কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্য অনুমিত হয়। ভবভূতি ভাবিয়াছেন, এইরূপ আচরণের দ্বারা রামচন্দ্রের এই অক্ষয় অকীর্তির কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। তারপর লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণ করিয়া প্রকারান্তরে নির্বাসন দিয়া আসিলেন।

ভবভূতির পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক দ্বিতীয় অঙ্কটিও স্বকপোলকল্পিত। বাল্মীকির আশ্রম হইতে আগতা আত্রেয়ীর সঙ্গে বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথন খুবই চমৎকার। আত্রেয়ী সীতাসখী বাসন্তীর কাছে বলিয়া চলিলেন সীতার দুর্দশার কথা, অপবাদের কথা, কুশ ও লবের জন্মকথা। আত্রেয়ী আরও বলিলেন যে, রাজার দোষ ভিন্ন প্রজাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু হয় না; সেই হেতু রাম-রাজ্যে এক ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হওয়ায় রামচন্দ্র নিজে ঐ মৃত্যুর হেতু শম্বুক নামক এক শূদ্র-তপস্বীর অন্বেষণ করিতেছেন। বাসন্তী জানিতেন যে, যজ্ঞের ধূমমাত্রপানকারী শম্বুক নামক শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তিনি রামচন্দ্রের দর্শনে আশান্বিত হইলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলিলেন। যজ্ঞ করিতে হইলে যজমানের সহধর্মিণীর প্রয়োজন হয়। বাসন্তী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে আত্রেয়ী বলিলেন যে, রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি গড়িয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বাসন্তী রামচন্দ্রের ঐরূপ কড়ি-কোমল আচরণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন ঃ

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি।।"

অর্থাৎ লোকোত্তর পুরুষদের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠিন আবার কুসুম হইতেও কোমল; সুতরাং সেই চিত্ত কে বুঝিতে পারে?

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' চতুর্থ খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাব বুঝাইতে গিয়া স্বামী সারদানন্দজী ভবভূতির উপরোক্ত বিখ্যাত শ্লোক অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ "অবতারশরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর

মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, এ-কথা ভাবি নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সকলের আকর্ষণের কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "কুসুমকোমল বালক-পরিচ্ছেদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ।"

ভবভূতির ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কটিও কাল্পনিক। পূর্ব অঙ্কে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ কুমারকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং শূদ্র তপস্বী শম্বুককে তাহার ঈপ্সিতলোকে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটী ও জনস্থানের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বনবাসের সেই সুখ-দুঃখে ভরা দিনগুলির স্মৃতি অনুভব প্রারম্ভে তমসা ও মুরলা নামক নদীদ্বয়কে মানবীরূপে সৃষ্টি করিয়া রাম-সীতার মিলনের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তমসা সীতার কাহিনী বলিয়া চলিয়াছেন ঃ "লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তারপর সীতার প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখাবিষ্ট হইয়া নিজেকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই দুইটি বালক প্রসব করেন। সেই সময় ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গা (বালক দুইটির সহিত) সীতাকে ধরিয়া পাতালে লইয়া যান। স্তন্য-দুগ্ধ-পরিত্যাগের পর তাঁহার সেই বালক দুইটিকে স্বয়ং গঙ্গাদেবী বাল্মীকির নিকট সমর্পণ করিয়া আসেন। কিন্তু বর্তমানে শম্বুকের ঘটনায় রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন—সরযূ নদীর মুখে গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া সীতার সহিত গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীনদীকে দেখিতে আসিয়াছেন। কুশ ও লবের জন্ম হইতে আজ দ্বাদশ বৎসর শেষ হইয়াছে। ভগবতী গঙ্গা সীতাকে অদৃশ্য হইবার বর দিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন, 'তমসে, তুমি সীতার সহচারিণী হও।'

ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে রামচন্দ্রের সহিত বাসন্তীর সাক্ষাৎ হয় এবং ছায়া সীতা ও সহচরী তমসা রামচন্দ্রকে দর্শন করেন। ভবভূতি এখানে অলৌকিক উপায়ে রাম-সীতার মিলন ঘটাইয়াছেন। ভবভূতি রামচন্দ্রকে সীতার জন্য হা-হুতাশ এমন কি মূর্ছা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। মহাবীরচরিতের রামচন্দ্র কঠোর, দৃঢ়, বীর; কিন্তু উত্তররামচরিতের রামচন্দ্র কোমল, দুর্বল, এমন কি নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ভবভূতি হইতেছেন নাটক-নির্মাতা; সুতরাং তাঁহাকে অপরের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নাটকের শ্রোতৃবর্গ স্ত্রীপুত্র-পালনকারী সাধারণ মানুষ; সেই হেতু তাহাদের মনের ভাব ভবভূতি নাটকে দেখাইয়াছেন। ইতিহাসকর্তা বাল্মীকির মতো বস্তুপ্রকাশ করিয়াই তিনি মুক্ত থাকিতে পারেন না। তাহা ছাড়া বীরপুরুষের হৃদয় সদা সর্বদা যে কেবলমাত্র বীররসে ভরপুর থাকিবে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। মনুষ্যহৃদয় কোন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না, সেখানে নানা ভাবের আলোড়ন উঠিতে পারে। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে, হৃদয়ের নিজেরই একটা যুক্তি আছে, যুক্তি যে বিষয়ে নিজে অজ্ঞ। এই ব্যাপারে ভবভূতি লৌকিক উদাহরণ দিয়াছেন ঃ জলরাশি বৃদ্ধি পাইয়া জলাশয়ের অনিষ্ট আরম্ভ করিলে তাহার জল-নিঃসারণই প্রতীকার; সেইরূপ শোকের উদ্বেলন আরম্ভ হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয়কে ধারণ করা যায়।

ভবভূতি তাঁহার অমর লেখনীতে রামচন্দ্রের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"কষ্টং ভোঃ! কষ্টম্। দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে,
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।

জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ,
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্।।"

অর্থাৎ দারুণ কষ্ট! দারুণ কষ্ট! গাঢ় শোকাবেগ হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে না; বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না; অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না; মর্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। কালিদাস পঞ্চদশ সর্গে ১০৩টি শ্লোকে রামের অন্ত্যলীলা শেষ করিয়াছেন। তিনি নূতন কিছু বলেন নাই; আপনভাবে বাল্মীকিকে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। সীতাকে বিদায় দিয়া আসিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন ঃ "কালের গতিই এই প্রকার। সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। আপনি যদি মৈথিলীর জন্য শোকবিহ্বল হন তবে যে-অপবাদের ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অপবাদই (রাম কলঙ্কিনী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত) আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হইবে।" বাল্মীকি এইখানে বেশ যুক্তিসম্পন্ন ব্যবহার দেখাইয়াছেন। ভবভূতি কিন্তু নিজের হৃদয়াবেগকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। যজ্ঞের বিঘ্নকারী লবণ রাক্ষসের বধের জন্য রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন যাত্রাকালে বাল্মীকির তপোবনে একরাত্রি কাটান। বাল্মীকি-রাময়ণমতে সেই রাত্রেই কুশ ও লবের জন্ম হয়। নামকরণের হেতু দেখাইতে গিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন যে, একটির কুশদ্বারা ও অপরটির লব বা গোপুচ্ছ-লোম দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত আদিকবি তাহাদের নাম কুশ ও লব রাখেন। ইহার পর রামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে বধ করিয়া মৃত ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ভবভূতি বধ দেখান নাই।

ভবভূতির কথা আমরা বেশি করিয়া বলিতেছি, কারণ তিনি রামের অন্ত্যলীলায় অনেক মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ববর্তী অঙ্কগুলির ন্যায় বর্তমান অঙ্কটি (কৌশল্যা ও জনক-সম্মেলন) নূতন ধরনের। সীতার শোকে পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল অগ্নিব্যাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় সন্তপ্ত। জনক, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা প্রভৃতি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম হইতে বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত। মহামান্য অতিথিদের জন্য মধুপর্ক সহযোগে অর্ঘ্য দিবার রীতি আছে। পশুমাংস দিয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিতে হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুহিংসার বিধি আছে (সমাংসো মধুপর্কঃ ইতি শ্রতেঃ)। মনু-স্মৃতিতেও মধুপর্কে পশুহিংসার কথা আছে। যাহা হউক, অঙ্কের প্রারম্ভে পূর্বকথিত অতিথিদের জন্য মধুপর্ক-পরিবেশন লইয়া ভবভূতি তপস্বী ভাণ্ডায়ন ও সৌধাতকির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সৃষ্টি করিয়াছেন তারপর পশুহিংসার যৌক্তিকতা দেখানো হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভবভূতি মীমাংসক মত পোষণ করিতেন।

কৌশল্যা আশ্রম-বালকদের মধ্যে লবকে দেখিয়া "ও মা, ইহাদের মধ্যে এইটি কে? ঠিক রামভদ্রের শোভায় পরিশোভিত, সুলক্ষণ, সুন্দর এবং সুন্দরভঙ্গিসমন্বিত অঙ্গদ্বারা আমাদের নয়ন শীতল করিতেছে।" জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি অভ্যাগতেরা যখন লবকে স্নেহ, আদর করিতে ব্যস্ত এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তৎপর, তখন নেপথ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর আদেশ শ্রুতিগোচর হইল। অভ্যাগতদের কাছে চন্দ্রকেতুর পরিচয় পাইয়া লবের রামায়ণের উপাখ্যান মনে পড়িল। অভ্যাগতদের আগ্রহাতিশয়ে লব তাঁহাদের সীতানির্বাসন পর্যন্ত 'রামায়ণ' শোনাইলেন। পরবর্তী অংশ সম্বন্ধে বলিলেন ঃ আমি জানি না; তবে ভগবান বাল্মীকি উহার কোন এক অংশকে নিজ হস্তে লিখিয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সূত্রকার ভরতমুনির কাছে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ ধনুর্বাণহস্তে সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন।

'রাজা সার্বভৌমোঽশ্বমেধেন যজেত নাপ্য-সার্বভৌমঃ' (আপস্তম্বঃ)। ক্ষত্রিয় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সার্বভৌম রাজা হইতেন। বাল্মীকি-শিষ্য লব রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব আটক করিলেন। শুরু হইল তুমুল যুদ্ধ। বীর বালক একাকী অযোধ্যার চতুরঙ্গ সেনা বিধ্বস্ত করিলেন। রথচারী চন্দ্রকেতু পাদচারী লবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে মহাবাহু লব, এই সকল সৈন্য দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? এই আমি রহিয়াছি, আমার নিকটে আইস; তেজে তেজ লীন হউক। তুমি আশ্চর্য গুণাধিক্যবশত আমার প্রীতিকর হইয়াছ। অতএব তুমি আমার সখা হইলে।" সারথি সুমন্ত্র বালক লবের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কারণ লব জৃম্ভকাস্ত্র দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমারদ্বয় পরস্পরকে স্নেহ ও অনুরাগের সঙ্গে দর্শন করিলে কি অবস্থার উদ্ভব হইল, ভবভূতি তাহার একটি মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়াছেন ঃ ইহা কি ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সম্মেলন, না গুণের আধিক্য? কিংবা জন্মান্তরীণ গাঢ় সম্বন্ধ নিবন্ধন কোন চিরপরিচয় অথবা দৈববশত অজ্ঞাত কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ? বিনা কারণে যে প্রণয় জন্মে, তাহার নাশ হয় না, কারণ স্নেহস্বরূপ সেই সূত্র অন্তরের মর্মস্থানগুলিকে সেলাই করিয়া দেয়।

তারপর রামচন্দ্রের কথা উঠিল। রামায়ণজ্ঞ বাল্মীকি-শিষ্য লব বলিয়া চলিলেন রামের অকীর্তির কথা—তাড়কাবধ (নারীবধ), খরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিন পা পিছাইয়া যাওয়া, গোপনে বালীবধ ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দায় চন্দ্রকেতুও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বাধিল তুমুল সংগ্রাম। চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলে লব বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা থামাইয়া দেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ-বর্ণনায় ভবভূতি দেবরাজ ইন্দ্র ও গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও তেমনি বিদ্যাধর দম্পতিকে উজ্জ্বল বিমানে উঠাইয়া যুদ্ধবর্ণনা দেওয়াইয়াছেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। এমন সময় শম্বুক-বধ করিয়া রঘুনাথ রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রের আদেশে যুদ্ধ থামিল চন্দ্রকেতু রামপদে প্রণত হইলেন। চন্দ্রকেতু পরিচয় করাইয়া দিলে লব নিবেদন

করিলেন, "পিতঃ, বাল্মীকির ছাত্র লব অভিবাদন করিতেছে।" লবকে দেখিয়া রামের মনের অবস্থা ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই বালকটি সহসাই আমার দুঃখের অবসান করিতেছে কেন? কেনই বা অন্তরাত্মাকে স্নেহার্দ্র করিতেছে? অথবা স্নেহ কোন কারণ অপেক্ষা করিয়া হইবে—ইহা তো অপ্রামাণিক! আভ্যন্তর কোন গূঢ় কারণে দুইটি হৃদয় স্নেহসূত্রে বাঁধা পড়ে; ভালবাসা তো কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। তারপর লবের জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে সেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতাকে আলেখ্য দর্শন করাইবার সময় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীন দিব্যাস্ত্রগুলি কালে সীতার সন্তানদের হস্তগত হইবে। ঐসব অস্ত্র একমাত্র গুরুপরম্পরা আসিয়া থাকে।

আপন সন্তানের প্রতি বাৎসল্যভাব কালিদাস 'শকুন্তলা'তে দেখাইয়াছেন। হেমকূট পর্বতে ভগবান মরীচির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত ভরতকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "আমার হৃদয়ে এই বালকের প্রতি ঔরস-পুত্রের ন্যায় স্নেহ জন্মিতেছে।" ভবভূতি যেমন জৃম্ভকাস্ত্রের দ্বারা সম্বন্ধ টানিয়াছেন, কালিদাসও তেমনি ভরতের মণিবন্ধে রক্ষাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। এইসব দৃষ্টে মনে হয় পূর্ববর্তী কবি কালিদাসের ছাপ পরবর্তী কবি ভবভূতির উপর কতভাবেই না পড়িয়াছে!

সীতা-নির্বাসন-প্রসঙ্গে কালিদাস 'রঘুবংশে' রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের [illegible]

"শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশ-[illegible]
অনন্যজানেঃ সৈবাসীৎ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী।।"

অর্থাৎ মৈথিলীর পরিত্যাগও শ্লাঘনীয়, কারণ রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্বীয় ভার্যা পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি সীতারই স্বর্ণমূর্তি দ্বারা সহধর্মিণীর কার্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরাই ঐ যজ্ঞের রক্ষক ছিলেন। তদনন্তর মৈথিলীতনয় কুশ ও লব বাল্মীকির আদেশে তৎপরিজ্ঞাত রামায়ণ ইতস্তত গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একে রামের চরিত্র, বিশেষত আদি কবি বাল্মীকির রচনা, উপরন্তু কুশ ও লব কিন্নরসদৃশ কণ্ঠস্বরশালী। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণসহ সানন্দচিত্তে উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারপর বাল্মীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "মৈথিলী যদি স্বীয় চরিত্র-বিষয়ে প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, তবেই তাহা সম্ভব।" বাল্মীকি সীতাকে তপোবন হইতে আনাইলেন। কালিদাস সীতাকে যে তপস্বিনীর বেশ পরাইয়াছেন, তাহা সত্যই সুন্দর ঃ

"কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিত চক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা।"

অর্থাৎ সীতার প্রশান্ত মূর্তি কাষায়বসনে আবৃত এবং তাঁহার নয়নদ্বয় নিজ চরণে সমর্পিত—ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া অনুমান করিল।

পবিত্রতাস্বরূপিণী নারীজাতির আদর্শ সতী সীতার উদ্দেশে 'রামায়ণী কথা'য় বলা

হইয়াছে ঃ "নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ, তাহার পুনরুদ্দীপন কর। তোমার সুকোমল অলক্তরাগরঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত; তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান।"

যাহা হউক, প্রজাদের সামনে সেই জনাকীর্ণ অযোধ্যার রাজসভায় রাজমহিষী সীতা নিজ সতীত্বের চরম পরীক্ষা দিতে ঢুকিলেন। সারা জীবনই তিনি দুঃখের উপর পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, এবং প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কালিদাস লিখিয়াছেন ঃ

"বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি।।"

অর্থাৎ ভগবতী বসুন্ধরে, যদি আমি বাক্য মন ও কর্ম দ্বারা পতির প্রতি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান দান করুন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল। বসুধাদেবী নাগেন্দ্রফণোদ্ধত সিংহাসনে আপন কন্যা সীতাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া রামচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও অন্তর্হিত হইলেন। গুরুজনেরা ধরণীর প্রতি রামচন্দ্রের ক্রোধ শান্ত করিলেন। সীতার অন্তর্ধানে রামচন্দ্র মণিহারা ফণী হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি সেই মিথিলেন্দ্রনন্দিনী পৃথিবীতে একান্তই না থাকেন, আমার জীবন কি করিয়া থাকিবে? আলম্বন বিনা আশ্রয়ের স্থিতি হয় না।" কালিদাসের রামচরিতে যবনিকা পড়িল। রামচন্দ্রকে ছদ্মবেশী যম আসিয়া নিবেদন করিলেন ঃ "ব্রহ্মার অনুরোধে আপনি এইবার স্বর্গারোহণ করুন।" কুশ ও লবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামচন্দ্র পবিত্র সরযূ নদীকে স্বর্গারোহণের সোপান করিলেন।

রামচরিতে কালিদাস বিয়োগান্ত, ভবভূতি মিলনান্ত। কালিদাস লব কুশকে দিয়া অযোধ্যার রাজসভায় রামায়ণগান করাইয়াছেন; ভবভূতি বাল্মীকির তপোবনেই উহার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। উত্তররামচরিতের সম্মেলন নামক শেষ অঙ্কে তপোবনের গঙ্গাতীরে রামলক্ষ্মণ ও প্রজাবর্গের সম্মুখে বাল্মীকি-বিরচিত ও অপ্সরাগণ কর্তৃক অভিনীত রামায়ণের শেষ অধ্যায় সীতা-নির্বাসন পালা শুরু হইল। রামচন্দ্র ভ্রমবশত অভিনয়কে সত্য বলিয়া ক্রমাগত হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রতিবারেই নাটক বলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। নাটকের মধ্যে নাটক প্রবেশ—ইহা সংস্কৃত নাটকের একটি টেকনিক। যাঁহারা কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' বা শ্রীহর্ষদেব-বিরচিত 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন সেখানেও নাটকের মধ্যে নাটক সৃষ্টি করিয়া এক অপূর্ব কলার উদ্ভব হইয়াছে।

কালিদাস সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইয়াছেন বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী অনুসারে। এই দৃশ্য সত্যই করুণ। সেইহেতু ভবভূতি ওদিক দিয়া গেলেন না। তিনি গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিলেন। তিনি সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইলেন আবার

অলৌকিক উপায়ে তুলিলেন। ইহা আমরা ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কে তমসার মুখে শুনিয়াছি। তারপর ভবভূতি রামচন্দ্রকে নাটক দেখাইতে দেখাইতে নাটকীয়ভাবে সীতাকে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন। বাস্তব সীতাকে সঙ্গে লইয়া অরুন্ধতী প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনপদবাসিগণ, আমি অরুন্ধতী। ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী প্রশংসা করিয়া সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছেন। পূর্বে ভগবান অগ্নি ইহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্যবংশের বধূ এবং যজ্ঞভূমি হইতে সমুৎপন্ন সীতাকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করুন—এ-বিষয়ে আপনাদের মত কি?" তিরস্কৃত প্রজাগণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া বাল্মীকি মিলনের সমাপ্তি ঘটাইলেন। নাটকের যবনিকা পড়িবার পূর্বে ভবভূতি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ "সানুষঙ্গানি কল্যাণানি" অর্থাৎ মঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গেই উপস্থিত হয়।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই কাব্যসমুদ্র মন্থন করিলেন। তাহা হইতে উঠিল 'রাম-সুধা', যে সুধা পান করিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। কালিদাস শোনাইলেন (রঘুবংশ ঃ শ্রব্যকাব্য) আর ভবভূতি দেখাইলেন (রামচরিতদ্বয় ঃ দৃশ্যকাব্য)। কর্ণেন্দ্রিয় কালিদাসের রামগাথা শুনিয়া সব কিছু মনের নিকট পৌঁছাইয়া দিল এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় ভবভূতির রামচরিত নাটকদ্বয় দেখিয়া সব কিছু মনের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। ফলে মনোজগতে একটি মধুর হিন্দোল দোল দিতে লাগিল। ঐ হিন্দোলের নাম 'রামলীলা'। ঐ রামলীলা শুনিবার ও দেখিবার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া তাহার গেহকে ভুলিয়া, দেহকে কষ্ট দিয়া, দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, সংসারের মায়ামোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাত্রা করিয়াছে। ঐ যাত্রা অমর তীর্থযাত্রা। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' গাহিতে গাহিতে মানুষ চলিয়াছে অযোধ্যানগরীতে, গোদাবরী নদীতীরে, পঞ্চবটীবনে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে। ভক্ত আপনভাবে ভগবানের সঙ্গে নিজ মানস সেতু বাঁধিয়াছে ঐ দীর্ঘ তীর্থযাত্রার মাধ্যমে। সে মানসচক্ষে ত্রেতাযুগের সব ঘটনা দেখিয়াছে; আপনভাবে বুঝিয়াছে সত্যস্বরূপ ভগবান রামচন্দ্র রজ ও তমের প্রতিমূর্তি রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রামনামের কৃপা ও মহিমা বুঝাইতে গিয়া ভবভূতি মন্দোদরীকে দিয়া বলাইয়াছেন, "রামনামে শিলা জলে ভাসে।" নিতান্ত নির্বোধ স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া রাবণ উহা উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরাও মূঢ়তাবশত ঐরূপ করি। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা জানে রামনামে অসাধ্য সাধন হয়। সেতুবন্ধে দাঁড়াইয়া তাহারা রামচরিতের সঙ্গে নিজেদের সেতু বাঁধে। নিজেদের মধ্যে যে তমোগুণী কুম্ভকর্ণ ও রজোগুণী রাবণ আছে, তাহাদের দমন করিবার জন্য 'শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম' ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করিতে থাকে। কালিদাস ও ভবভূতি সেই রামনামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন। 'শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম'কে সাধারণ মানুষের অনায়াসলভ্য করিয়া দিবার জন্যই মহাকবিদের প্রয়াস। রামনামের মহিমা কীর্তন করিয়া বাল্মীকির ন্যায় কালিদাস ও ভবভূতি অমর হইয়া রহিয়াছেন।

রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

প্রতিভা ভাবগঙ্গার গোমুখী। সে নিজের ভিতরেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। উহাকে বাহির করিবার জন্য হাতুড়ির দরকার হয় না বা কোন সাধ্য-সাধনার দরকার হয় না। সে প্রকাশিত হয় আপনভাবে অনায়াসে অজান্তে। সেক্সপীয়রকে হ্যামলেট বা টেমপেস্ট লিখিতে দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু মিলটনকে লেখনী লইয়া বহুত জোর-জবরদস্তি করিতে হইয়াছিল। তাই সেক্সপীয়র উজ্জ্বল, মিলটন ম্লান।

ঐ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারি ছিলেন কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস। উভয়েই রামগান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গান এই জগতের সামগ্রী নহে। ঐ গানের সুর ও ভাব আসিয়াছে দূর হইতে—বহুদূর হইতে—কোন জ্যোতিঘন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে যেখানে পার্থিব মালিন্যের লেশমাত্র নাই। ঐ মহান সঙ্গীত নিরাশ প্রাণে আনিয়া দেয় আশা, নীরস হৃদয়ে আনিয়া দেয় ভালবাসা এবং মানুষকে এ জগৎরূপ ডাইনীর কুহক হইতে বাঁচিবার পথ বলিয়া দেয়। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস—এই দুই ভক্তকবির কাব্য-প্রতিভা ঐ মহান সঙ্গীতের দুইটি লহরী।

বাংলাদেশে সকলে এক ডাকে চিনিতে পারে এমন কবি কে আছেন? রবীন্দ্রনাথ? মধুসূদন? কখনই নহে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র—সকলেই চেনে এমন কবি হইতেছেন কৃত্তিবাস। চন্দ্র-সূর্যের মতো তিনি বাংলাদেশের সকল কোণের আঁধার দূর করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ 'যে মহাকবির গানের নূতন সুর যোজনা করিতে যাইয়া কালিদাস পর্যন্ত বামনের চাঁদধরার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভীত হইয়াছেন, যাঁহার কথা মহানাটককার ভবভূতি বিস্ময় ও ভক্তির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কীর্তন করিয়াছেন, যিনি ভারতের আদি কবি, শ্রেষ্ঠ কবি, ঋষি—সেই বাল্মীকি, কৃত্তিবাস না জন্মিলে সম্ভবত বঙ্গের সর্বশ্রেণীর অনায়ত্ত, আকাশ-কুসুম হইয়া থাকিতেন। বাংলায় এ সুরধুনী-ধারা চিরদিনই কৈলাসবাসী কোন দেবতার জটাকলাপে আবদ্ধ হইয়া থাকিত। বাঙালী গৃহস্থের ভাগ্যে সেই মন্দাকিনীর আস্বাদ হয়ত কখনই লাভ হইত না। কৃত্তিবাস স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে খাদ কাটিয়া সেই ধারা আমাদের দেশে আনিয়াছেন, তাই চাষার কুঁড়ে ঘরের পাশ কাটিয়া সেই ধারা যেমন ছুটিয়াছে, রাজ-প্রাসাদের পার্শ্বেও সেইভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। কৃষকবধূ সন্ধ্যার প্রদীপটি জ্বালিয়া সেই রসধারার কুলকুলধ্বনি শুনিতে দাঁড়াইয়াছে, রাজবধূও তাঁহার গবাক্ষের পার্শ্ব হইতে তেমনি আবিষ্ট হইয়া তাহা শুনিতেছেন।'

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট স্টেশনের সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামে ১৪৩৩ খ্রীঃ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় দিয়াছেন ঃ

'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী।।
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী।।'

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর কৃত্তিবাস সভাপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের নিকট যান এবং পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। গুণী রাজা চমৎকৃত হইয়া তাহাকে উপঢৌকন দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের কাব্য-প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে সরল বাঙ্গালা পদ্যে একখানি রামায়ণ লিখিতে অনুরোধ করেন। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একস্থানে রহিয়াছে ঃ

'শ্রীরামের আগে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোকত্রাণহেতু রচিলেন রামায়ণ।।'

হিন্দী ভাষার সমগ্র রস ও মাধুর্য যেন তুলসী রামায়ণের ভিতর দিয়া উপচাইয়া পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসী-রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য। হিন্দীভাষী ভারতবাসীকে তুলসীদাস রামভক্ত করিয়া দিয়াছেন আপন ভক্তিরস সিঞ্চন করিয়া। 'বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা, তেহি বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রামপদ, হোঁই ন দৃঢ় অনুরাগ।।' অর্থাৎ সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয় না। রামকথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রামপদে গাঢ় অনুরাগ হয় না। তুলসীদাস গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'রাম-চরিতমানস' অর্থাৎ রামচরিত্ররূপ মানস-সরোবর। তাহাতে রামকথারূপ হংস বিচরণ করে। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীদাসের নামও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লোকে বলে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'তুলসী রামায়ণ'। উভয়েই নিজেদের নামের সঙ্গে রামের নাম মিশাইয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে হিন্দীভাষী অধিক, সেহেতু তুলসীর জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাস হইতে অধিক।

উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজপুর নামক গ্রামে সম্ভবত ১৬৪৬ খ্রীঃ তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তিনি মাতৃহীন হন; এক দাসী তাঁহাকে লালনপালন করে। এই দাসীও পাঁচ বছর পর গত হয়। তখন এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া বালককে ভোজনাদি করাইয়া যাইতেন। লোকের বিশ্বাস ইনিই মা অন্নপূর্ণা। এইরূপে আরও দুই বৎসর অতীত হইল। ঐ কালে নরহরিজী নামক এক সাধু বালককে লইয়া অযোধ্যায় যান।

সম্ভবত ইনিই তুলসীদাসের গুরু ছিলেন। রামায়ণের গুরুপ্রণামে আছে ঃ 'বন্দউঁ গুরুপদ কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি'। সে যাহা হউক, তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কথিত আছে তুলসীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। স্ত্রীর দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার চৈতন্য হয় এবং বিরাগী হইয়া তিনি কাশীতে যান। মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন ঃ

'আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতা।।'

অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দ-কাননে তুলসীদাস হইতেছেন একটি চলমান তুলসীতরু, এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে ভূষিত। কাশীতে প্রথমে প্রেতাত্মার নির্দেশে ভক্ত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং পরে হনুমানজীর উপদেশানুযায়ী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন—এ-কাহিনী সর্বজনবিদিত। তুলসীদাসের রামদর্শনের ছবিখানি আবেগে পূর্ণ, আবদারে কলকলিত এবং ভক্তিতে ভাস্বর। প্রথম দিন তো ধনুর্বাণধারী মৃগয়াবেশধারী অশ্বারোহী রাম-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন হনুমানজীর নির্দেশে ব্যাকুল হৃদয়ে নির্নিমেষ নয়নে রামদর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন; ভগবান প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া তুলসীকে বলিলেন,

'বাবা, আমাদের চন্দন দাও।' 'চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীর।
'তুলসীদাস চন্দন ঘিঁসে তিলক দেত রঘুবীর।।'

তুলসীদাস নয়নযুগল ভরিয়া ভগবানের রূপসুধা পান করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার চন্দন চাহিলেন। কিন্তু কে তখন সে কথা শোনে! তখন ভগবান নিজ হস্তে চন্দন লইয়া আপন ললাটে মাখিলেন, এবং তুলসীদাসের কপালেও মাখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন তুলসীদাস চিত্রকূটে রামলীলারত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দর্শন পান।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনায় ভক্তির সঙ্গে মনে হয় যশোলিপ্সাও ছিল। আর তুলসীর ছিল ভক্তির আত্মনিবেদন। তুলসীর কপালে ভগবান স্বয়ং চন্দন লেপন করিয়াছেন; আর কৃত্তিবাস যখন রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসেন তখন—

'চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।।'

আবার অন্যত্র

'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।।'

কৃত্তিবাসের ভাব কোথাও বা স্বকল্পিত, কোথাও বা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস বা বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত। তাঁহার ভাষা সরল, মধুর ও প্রাঞ্জল। ঐ ভাষা ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন, সেই হেতু আধুনিকদের কাছে উহার কিছু কিছু শব্দ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কৃত্তিবাসের কালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল এবং পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী রচয়িতারাই কবি ছিলেন। কৃত্তিবাস ঐ সকল ছন্দেই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উপাখ্যানভাগ বেশি। কারণ কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে মূলত অবলম্বন করিলেও তিনি জৈমিনি ভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ, উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি

হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অগ্রে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উহার উল্লেখ করিব।

উপাখ্যানের দিক হইতে তুলসীদাস কৃত্তিবাস হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার রামায়ণে গল্পাংশ খুব কম। যাহাতে রামপদে ভক্তি হয়, মানুষ নীতির পথ মানিয়া চলে—তুলসীদাস সেই দিকে জোর দিয়াছেন। রামায়ণ দৃষ্টে মনে হয় তুলসীদাস একটু আটপৌরে অর্থাৎ ঘরোয়া কথা দিয়া সাধারণ মানব-মনকে আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত। অযোধ্যার রাজপুত্র-রাজবধূকে তিনি বসনভূষণে সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু এমন বাক্যের সংযোজনা করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় উহারা আমাদেরই ঘরের লোক। উদাহরণস্বরূপ দশরথ যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সে সঙ্গীদের ফেলিয়া আসিতে চাহে না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছুটিয়া পালায়। ধূলিমাখা ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান। তারপর

'ভোজন করত চপল চিত, ইত উত অবসর পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধিওদন লপটাই।।'

অর্থাৎ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে পালায়, মুখে দইভাত লেপটাইয়া থাকে। এ দৃশ্য দেখিতে রাজবাড়ি যাইবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত দেশ জুড়িয়া ঘরে ঘরে এরূপ রাম আছে। এই জন্য তুলসীর এত আদর। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীও চলতি ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তুলসীর ভাষা সহজ, কথা লৌকিক এবং ছন্দ—চৌপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দ—এই চারিটি।

সংক্ষেপে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের জীবন-কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। রামচরিত-রচনায় বাল্মীকির ন্যায় তাঁহাদের মৌলিকতা নাই। বাল্মীকি ভাত রান্না করিয়াছেন, আর সেই রাঁধা ভাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঘি, লবণ, ব্যঞ্জনাদি মিশাইয়া উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদের যশ অপহরণ করা যায় না। ইঁহারা বাল্মীকির ভাবধারার অনুবাদ বা গতানুগতিক অনুসরণ করেন নাই; বরং নিজেদের প্রতিভাবলে বাল্মীকির রোপিত বৃক্ষে বারিসিঞ্চন করিয়া পত্রে পুষ্পে ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই যদিও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায়।

মূল রামায়ণে প্রবেশের পূর্বে আমরা অপর একটি তুলনা পরিক্রমা করিব। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর মহাশয় তাঁহার রামায়ণে দেখাইয়াছেন কিভাবে আমাদের রামায়ণের ছায়াপাত গ্রীককবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডে পড়িয়াছে ঃ

রামায়ণে ঃ	ইলিয়াডে ঃ
লঙ্কাযুদ্ধ	ট্রয় যুদ্ধ
অযোধ্যা	স্পার্টা
রামচন্দ্র	**মেনিলেয়াস**
লক্ষ্মণ	পেট্রোক্লিস
সীতা	হেলেন
রাবণ	প্যারিস

ইন্দ্রজিৎ	হেক্টর্
সুগ্রীব	য়্যাগামেম্নন্

শুধু বিদেশী মহাকাব্যের উপর নয় আমাদের বিখ্যাত মহাভারতের উপরও রামায়ণের রেখাপাত হইয়াছে। অর্জুনের সহিত লক্ষ্মণের অনেকটা মিল আছে। উভয়েরই মধ্যে আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব ও বনবাস। রাম-যুধিষ্ঠির, বিভীষণ-বিদুর, রাবণ-দুর্যোধন প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। স্ত্রীচরিত্র-চিত্রণে রামায়ণ তুলনাহীন। সীতার কাছে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী কেহই দাঁড়াইতে পারে না। আবার ঘটনা দৃষ্টেও উভয় মহাকাব্যে মিল আছে। উভয় মহাকাব্যই বিয়োগান্ত। সীতার জন্য রাবণবংশ ধ্বংস হইল আর দ্রৌপদীর জন্য কুরুকুল ধ্বংস হইল। উভয়ক্ষেত্রে বনবাস, দুই নায়িকাই অযোনিজা, চক্রভেদ ও ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বিবাহ, নারীহরণ (রাবণ কর্তৃক সীতা, জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী), মুনিশাপে মৃত্যু (দশরথ ও পাণ্ডু) এইরূপ বহু অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে।

এবার আমরা মূল রামায়ণে প্রবেশ করিব। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সপ্তকাণ্ডে সর্বসমেত শ্লোকসংখ্যা ৬৬,৪৫০। অতি সংক্ষেপে ঐ বিশাল গ্রন্থের সার বর্ণনা ঃ

'আদিকাণ্ডে রামজন্ম সীতা-পরিণয়।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম-বনবাস হয়।।
অরণ্যকাণ্ডেতে হয় জানকীহরণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন।।
সুন্দরকাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে মহারণে রাবণ-নিধন।।
উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
মনোদুঃখে বৈদেহীর পাতাল-প্রবেশ।।
এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ।
কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন।।'

কৃত্তিবাসের আরম্ভটা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ। দস্যু রত্নাকরের পাপের ভাগী তাঁহার পরিবারবর্গ হইল না। তখন তিনি ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ও নারদের নিকট হইতে 'মরা' (পাপের ফলে রাম-মন্ত্র-উচ্চারণে অক্ষমতা হেতু) মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ষাট হাজার বৎসর উহা জপ করেন। বল্মীকের (উইমাটির ঢিপি) দ্বারা রত্নাকরের আবরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস যেন একটু অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ণনা আছে- —বল্মীকের কীটগণ রত্নাকরের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিল; অবশিষ্ট রহিল কেবল অস্থি। ষাট হাজার বৎসর পরে ব্রহ্মা আসিয়া রত্নাকরকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু রামনাম শুনিতে পাইলেন। তারপর ঢিপির ভিতর মুনি বসিয়া আছেন জানিয়া, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সাতদিন ক্রমাগত প্রচণ্ড বারিপাত করিতে বলিলেন। তারপর ঐ ঢিপি ধুইয়া গেলে ব্রহ্মা ঐ অস্থি-সম্বল মুনির চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন ঃ আজি হৈতে তব নাম 'বাল্মীকি' হইল। ঘটনাটা

আধুনিক মানুষের কাছে আজগুবি বলিয়া ঠেকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাম-নামে অসাধ্য সাধন হয়—এ-কথা ভুলিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া ইহা প্রাচীন ভারতের একখানি তপস্যার অনুপম ছবি।

আদি কবি বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত গাহিয়া কৃত্তিবাস—রঘুবংশের বিবরণ, সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, কপিলের অভিশাপে সগরের ষাট হাজার পুত্রের বিনাশ এবং পরে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার মর্তে আগমন—অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে কৃত্তিবাসের মতো বংশপরিচয়ের ঘটা নাই; কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র মিথিলায় যাইবার পথে জাহ্নবীতীরে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে রঘুবংশের কাহিনী কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে পুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশকে অবলম্বন করিয়া দিলীপ, রঘু, অজ-ইন্দুমতী, দশরথের বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস রাম, সীতা ও বানরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন অভিনবভাবে। অনেক জায়গায় তিনি অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রামচন্দ্রের দেবভাব দেখাইতে গিয়া তিনি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারেন নাই। যেমন—

'মধু-চৈত্রমাস, শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী।।
গর্ভব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইলা উপনীত।।'

সংস্কৃতে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলের দ্বারা কৃত খাত। ঐ খাত হইতে সীতার জন্ম বলিয়া নাম হইল সীতা (সীতামুখোদ্ভবাৎ সীতা)। ভগবান সশক্তিক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই রীতি। দেবগণ তেজসঞ্চার করিলেন বিভিন্ন বানরের ভিতর। ইন্দ্র-তেজে বালী, সূর্য-তেজে সুগ্রীব, ব্রহ্মা-তেজে জাম্বুবান, পবনের তেজে হনুমান, অগ্নির তেজে নীল, শিবের তেজে কেশরী, কুবেরের তেজে প্রমাথী, ধন্বন্তরির তেজে সুষেণ, চন্দ্র-তেজে দধিমুখ প্রভৃতি।

রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। চারিবেদ আগমপুরাণ বিচার করিয়া কৌশল্যার নন্দনের নাম 'রাম' রাখা হইল। ভূ-ভার বহন করিবেন বলিয়া কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত। রামচন্দ্রের নামকরণের একটি প্রাচীন কাহিনী সুবিদিত আছে। বশিষ্ঠকে রাজা দশরথ এত নাম থাকিতে কেন 'রাম' নাম রাখা হইল উহার সার্থকতা দেখাইতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন যে 'রাম' নাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও শৈব মন্ত্রের সার। রা='নমো নারায়ণায়' এই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্ত্র হইতে 'রা' বাদ দিলে থাকে 'নমো নায়নায়' (ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ণ, ন হইয়া যায়) ইহার অর্থ রূপরসাদি বিষয়কে নমস্কার। আবার ম='নমঃ শিবায়' এই প্রসিদ্ধ শৈবমন্ত্র হইতে 'ম' বাদ দিলে থাকে 'ন শিবায়'। ইহার অর্থ কল্যাণের জন্য নহে অর্থাৎ দুঃখের বা অমঙ্গলের জন্য।

তুলসীদাসকৃত রামচরিতমানসের প্রথম কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড; কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতি রামায়ণে উহা আদিকাণ্ড নামে খ্যাত। তুলসীদাসের এই 'বালকাণ্ড' পদের মধ্যে নিজের আত্মভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। তুলসী রাম-সীতার এক বালকপুত্র হইতে চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। নিজের মনের কথা অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ যে ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি; যেমন মা ছেলেকে করে। যখন সন্তান বড় হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার প্রৌঢ় পুত্রের মতো, আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের মতো।

রঘুবংশের প্রারম্ভে মহাকবি কালিদাস আভিজাত্যপূর্ণ বিনয় দেখাইয়াছেন ঃ 'মন্দকবিযশঃপ্রার্থী', 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাই' ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু তুলসীর ভক্তি-বিনয় যেন হৃদয় মন্থন করিয়া বাহির হইতেছে ঃ আমি রঘুপতিব গুণগান করিতে চাই। আমার বুদ্ধি হালকা, আর রামচরিত্র ত অথই। আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মতো, আর ইচ্ছাটা রাজার মতো। আমি চাই অমৃত, অথচ জগতে আমার ঘোলও জোটে না। তারপর তুলসীদাস আদি কবি বাল্মীকির পাদ বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 'বাল্মীকি মুনি প্রথমে হরির কীর্তি গান করিয়াছেন, সেইহেতু আমার পথ সুগম হইয়াছে। অতি অপার যে মহানদী তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে পরম লঘু পিঁপড়াও বিনাশ্রমে পার হইয়া যায়।' পণ্ডিতেরা 'উপমা কালিদাসস্য' বলিয়াছেন; কিন্তু উপমায় তুলসীদাস কম যান না। কালিদাসের উপমাগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলসানো, কিন্তু তুলসীর উপমা সরলতা ও সজীবতায় ভরপুর। রান্নার ভালমন্দ যথাযথ ফোড়নের উপর নির্ভর করে। তপ্ত বালুর কড়া হইতে ধবল খৈগুলি যেমন লাফাইয়া বাহিরে পড়ে, তেমন রামকথার মাঝে মাঝে তুলসীর অপূর্ব শুচিশুভ্র ফোড়নগুলি উপচাইয়া পড়িয়াছে। 'বাল্মীকি রামায়ণে খরের কথা থাকিলেও উহা খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল ও মৃদু। উহাতে দূষণের কথা থাকিলেও উহা দোষরহিত।'

রামচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন, তুলসীদাস তাঁহাদেরই চরণবন্দনা করিয়াছেন। নিজ জীবনে 'রাম-নাম' কিভাবে বসানো যায়, তাহার বিষয়ে অপূর্ব এক দোঁহা রচনা করিয়াছেন তুলসীদাস ঃ

রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর।।

অর্থাৎ তোমার ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল করিতে চাও তবে তুলসী, দেহের দেউড়ীস্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর। রামনামের প্রভাবের শেষ নাই। রামনাম স্বয়ং রামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র ভালুক-বানরের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিলেন, সেজন্য তাঁহাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু রামনাম লইলে সংসারসমুদ্র শুকাইয়া যায়। স্বয়ং রামও নিজের নাম-মাহাত্ম্য গাহিয়া শেষ করিতে পারেন

না। এই নামের প্রভাবে অজামিলের মতো পাপী, পিঙ্গলার মতো গণিকা এবং কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত গজ নিষ্কৃতি পায়। এ নাম কল্পতরুর মতো কল্যাণবহনকারী। এ নাম স্মরণ করিতে করিতে তুলসীদাস, যে পূর্বে ভাঙ্গের গাছ ছিল, সে তুলসী গাছ হইয়া গিয়াছে।

কথায় বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পরিপাটি। তুলসীদাস রামচন্দ্রের মহিমাকে সু-উচ্চে উঠাইবার জন্য শিব-সতীর আখ্যায়িকা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছেন। তারপর রাবণের জন্মবৃত্তান্ত এবং মর্তে তাহার অকথ্য অত্যাচার বর্ণনা করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে দিয়া জন্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। পবিত্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগবতের দেবকীর ন্যায় কৌশল্যাও বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ দেখিলেন। কৌশল্যা ঐ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র, এই রূপ ত্যাগ কর। অতিশয় প্রিয় সদাচারসম্মত বাললীলা কর, যাহাতে পরম অনুপম সুখ পাওয়া যায়।' ভগবানের চারি অংশে অবতরণের ফলে অযোধ্যায় যে আনন্দোৎসব লাগিয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত। তুলসীদাস মজা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে সব কৌতুক দেখিবার জন্য সদাচলমান সূর্য চলিবার কথা ভুলিয়া অযোধ্যায় এক মাস রথ সমেত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বশিষ্ঠ চারিপুত্রের নামকরণের সার্থকতা দেখাইয়াছেন ঃ ত্রিলোকের সুখধাম এবং অখিল লোকের বিশ্রামদায়কহেতু রাম, বিশ্বের ভর্তা ও পোষণকর্তাহেতু ভরত; স্মরণ করিলে শত্রুনাশ হয়, সেই হেতু শত্রুঘ্ন; এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল জগতের আশ্রয়স্থল বলিয়া লক্ষ্মণ।

বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে ৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যার অধিকারি হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মাত্র ১৪ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যা লাভ করেন।

কৃত্তিবাসের মতে 'সাত-বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে।।'

আর রামচন্দ্রের যখন সীতার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাঁহার বয়স বার এবং সীতার পাঁচ। লোকে এবং শাস্ত্রে কথিত আছে ধর্মে বা তেজে উৎকর্ষতা বয়সের দ্বারা নিরূপিত হয় না। বিশ্বামিত্র বালক রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দশরথ কপটতা করিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে দিলেন। পরে সত্য প্রকাশ পাইলে মুনির অভিশাপভয়ে রাম-লক্ষ্মণকে দিলেন। এখানে কৃত্তিবাস দশরথের বিমাতাসদৃশ আচরণ দেখাইয়াছেন।

সীতার বিবাহ-ব্যাপারে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। বাল্মীকি লিখিয়াছেন, 'বীর্যশুল্কেতি যে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা' অর্থাৎ আমার এই অযোনিজা কন্যাকে পেতে গেলে বীর্যশুল্ক দিতে হবে। সীতার তুলনাহীন রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া কত রাজা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি রাবণ, যিনি কৈলাস পর্বত ধরিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার বিশ হাতে তিনবার চেষ্টা করিয়াও হরধনু তুলিতে না পারিয়া পলায়ন করেন।

কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস রাম-সীতার বিবাহ ব্যাপারে স্ব স্ব দেশাচার ও লোকাচারের আশ্রয় লইয়াছেন। কৃত্তিবাসের বিবরণ পড়িলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী বিবাহ দেখিতেছি এবং তুলসীদাসের বিবরণ দৃষ্টে মনে হয় যেন হিন্দুস্তানী বিবাহ চলিতেছে। বিবাহের লগ্ন দেখা, গায়-হলুদ, ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাঁশী, টোপর, বরণ, সিঁতেয় সিঁদুর, দুর্বা-ধান, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতদের বংশাভিজাত্যকথন, ইত্যাদি বাঙ্গলা দেশের বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম-সীতার বিবাহে কৃত্তিবাস নব-বরকনেদের লইয়া মেয়েদের ফষ্টিনষ্টিটুকু বাদ দেন নাই।

'পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত।।
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল।।
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর।।'

বিবাহ-ব্যাপারে কৃত্তিবাস কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ জ্যোতিষগণনার দ্বারা যে লগ্ন ঠিক করিলেন, সেই লগ্নে বিবাহ হইলে 'স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।' এখন উপায় ? দেবগণ দেখিলেন যে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছাড়া রাবণবধ সম্ভব নহে; তাই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঐ লগ্ন ভ্রষ্ট করিলেন। চন্দ্রকে নর্তক সাজাইয়া বিবাহবাসরে পাঠানো হইল। চন্দ্রনৃত্য দেবকার্য সিদ্ধ করিল। 'অতীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ!' কৃত্তিবাসের বিবরণ হইতে মনে হয় বাংলাদেশে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সতীনের ঘর করা নারীর পক্ষে অসহ্য। পরশুরাম যখন রামচন্দ্রকে ধনুকে গুণ দিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছেন, তখন সীতা ভাবিতেছেন ঃ

'একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ।।
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী।।'

বালকাণ্ডে তুলসীদাস উপাখ্যানভাগের উপর এত বেশি জোর দিয়াছেন যে, রামচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়। যাহা হউক, সংক্ষেপে বাললীলা বর্ণনার পর বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রাম-লক্ষ্মণের যজ্ঞরক্ষা ও মিথিলায় গমন দেখানো হইয়াছে। এই যাত্রার পথে তুলসীদাস আমাদের প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রাণকথা, পুরাণকথা, ইতিকথা, শৌর্যবীর্যের কথা, মহাপুরুষদের চরিতকথা, বিভিন্ন অধ্যাত্মবিদ্যার কথা প্রভৃতি বলিয়া চলিয়াছেন ঋষি বিশ্বামিত্র। আর দুইটি তরুণ মন কখনো গঙ্গাতীরে, কখনো তপোবনে বিশ্রামকালে, কখনো বা রাত্রে ঋষিকুটিরে শয়নকালে গোগ্রাসে গিলিয়া চলিয়াছেন ঐ সব ভারতকথা। আর আজ সেই

ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারত দ্রুত বিদায় লইতেছে।

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিদেহ নগরে পৌঁছিলেন। বিদেহ সম্বন্ধে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'জহঁ বসন্তরিতু রহী লোভাঙ্গ' অর্থাৎ সেই অপূর্ব নগরীতে বসন্তঋতু লোভে থাকিয়া যাইত। লক্ষ্মণের নগর দেখিবার বাসনা হইল। রাম চলিলেন সঙ্গে। অযোধ্যার রাজপুত্র নগর দেখিতে আসিয়াছেন, চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তুলসীদাস যে নিজের ইষ্টদেবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অপূর্ব ভঙ্গিতে সীতার সখীদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ 'বিষ্ণুর চারিটি হাত, ব্রহ্মার চারি মাথা, আর শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা। অপর এমন কোন দেবতাই নাই যাঁহার সহিত রামচন্দ্রের সৌন্দর্যের তুলনা চলে।' নবদূর্বাদলশ্যাম রামকে যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। সীতাসখীরা সেই রূপ দেখিয়া বিবশ হইয়া সীতাকে বলিতেছেন ঃ সখি! সে রূপের কথা আর কি বলিব? "গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বাণী"; অর্থাৎ বাক্যের ত চোখ নেই, আর চোখের ত বাকশক্তি নেই। রামের রূপ-বর্ণনায় তুলসীদাসকে এই ভাবে 'নেতি-নেতির' আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বিবাহের পূর্বে রাজকাননে রাম-সীতার পারস্পরিক সন্দর্শনকে লইয়া তুলসীদাস একটু রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে বিবাহের ব্যাপারে দর্শন, পূর্বাভাস এবং পূর্বরাগ—এই তিন প্রকার ব্যবস্থা ছিল। রামচন্দ্র দেখিয়াছেন সীতার অপরূপ রূপ। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন নিজের মহান রঘুবংশের কথা, নিজের পবিত্রতার কথা—

'মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী।
জেহি সপনেহু পরনারি ন হেরী।।'

অর্থাৎ আমার হৃদয় সম্বন্ধে ত বড় বিশ্বাস যে, আমি স্বপ্নেও পরস্ত্রী দেখি নাই। কালিদাস কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটা সমাধান দিয়াছেন ঃ 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।' অর্থাৎ যাহার প্রথম দর্শনে হৃদয়ে একটা গাঢ় ভাবের উদ্রেক হয়—উহা নিশ্চিতই পূর্বজন্মের সম্বন্ধের ফল। সুতরাং রামরূপী নারায়ণ যে সীতারূপী লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? রামচন্দ্র মনে মনে সীতার মুখের সহিত চাঁদের তুলনা করিয়াছেন এবং পরে আবার চাঁদের দোষ দেখাইয়া সীতার রূপের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। বর্ণনাটি খুব সুন্দর ঃ চাঁদ ত সীতার মুখের মত নয়। চাঁদের জন্ম সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে। চাঁদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। সন্ধি অনুসারে রাহু ইহাকে গ্রাস করে। চাঁদ চখার দুঃখদায়ক ও পদ্মফুলের শত্রু। চাঁদের কত দোষ। সীতার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা অনুচিত ও হাস্যকর।

তুলসীদাস নিশ্চেষ্ট থাকিবার নন। তিনি ত কবি। আর রূপবর্ণনা ত কবির স্বভাব-সুলভ ব্যাপার। তাঁহার কথায় ঃ সীতাকে বর্ণনা করিয়া, তাঁহার উপমা দিয়া কোন্ কবি কুকবি বলিয়া অপযশ লইবে? সংসারের স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি দেবদেবীর কথা ধরা যায়, তাহা হইলে সরস্বতী বাচাল, ভবানী অর্ধাঙ্গী, রতি স্বামিহীনা বলিয়া দুঃখী। আর

হলাহল ও মদ হইতেছে লক্ষ্মীর ভাই (সমুদ্র মন্থন কালে ইহারা লক্ষ্মীর সঙ্গে জাত), তাহার সঙ্গেই বা সীতার তুলনা কি করিয়া চলে? যদি অমৃত-সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরমরূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভা রশি হয়, সাজসজ্জা মন্থনদণ্ড হয়, আর কামদেব যদি নিজ পদ্মহস্তে মন্থন করেন, তাহা হইলে যদি সৌন্দর্য ও সুখের মূল শোভালক্ষ্মী উৎপন্ন হন, তবুও তাঁহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে কবির সঙ্কোচ হইবে।

অন্যান্য রামায়ণে দেখা যায় সীতার বিবাহের পর পরশুরামের সঙ্গে রামের দেখা হয়; কিন্তু তুলসীদাস সে পর্ব আগেই সারিয়া লইয়াছেন। অহিংসার কাছে হিংসা কিভাবে থাকিয়া যায়, তুলসী তাহার এক অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। পরশুরামের সর্বগ্রাসী, সর্ববিধ্বংসী ভাবের কাছে রামচন্দ্রের ভালবাসা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নিরভিমানিতা, আনুগত্য, মৃদুতা লক্ষণীয়। পরশুরাম বলিতেছেন ঃ 'রাগে বুক পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু হাত উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার হত্যা করিতে চাহিতেছে না। বিধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব বদলাইয়া গেল।'

সীতার বিবাহ হইল। তুলসীদাস উহা বর্ণনা করিতে গিয়া যত ভাব ও ভাষা ছিল সব প্রয়োগ করিয়া বলিলেন ঃ 'কবি উপমা না পাইয়া হার মানিয়া এই কথা মনে মনে বলিল যে, ইহাই ইহার উপমা।' তোতা, ময়না প্রভৃতি পালিত পক্ষীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতা চলিয়াছেন শ্বশুরবাড়ি। 'বিকল মীনগণ জনু লঘু পানী'—অল্প জলে মাছেরা যেমন ছটফট করে বিদেহ নগরে সেই অবস্থা হইল। রানীরা সীতাকে কোলে লইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন ঃ 'সর্বদা স্বামীর প্রিয় হও। চিরায়ুষ্মতী হও।' সখীরা স্নেহভরে মৃদুবাক্যে নারীধর্মের শিক্ষা স্মরণ করাইয়া দিলেন ঃ 'শ্বশুর-শাশুড়ী ও গুরুর সেবা করিও। স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিও।' তুলসীদাসের এই ছবিখানি আমাদের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানে বিদায়কালে শকুন্তলার হরিণশাবকদের প্রতি মিষ্ট আচরণ, লতাগুল্মাদির প্রতি সস্নেহ সম্ভাষণ তুলনাহীন। কণ্ব মুনি ত আবেগভরে বলিয়াই ফেলিয়াছেন ঃ 'আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে আমারই যখন এরূপ বিকলতা উপস্থিত হইল, যাহারা গৃহী, না জানি তাহারা নূতন তনয়া-বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে!' শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা; সীতাও জনকের পালিতা কন্যা। বিদেহ জনক জ্ঞানী বলিয়া সর্বকালে প্রসিদ্ধি আছে; তথাপি তিনিও জানকীকে বুকে ধরিলেন। জ্ঞানীরা সুখে-দুঃখে বিচলিত হন না; কিন্তু জনক বিচলিত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই বাল্মীকির পথ ধরিয়াছেন। বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবুও অযোধ্যাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাস অপেক্ষা আরও গভীর ও প্রাঞ্জল। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ী-কুব্জার কুমন্ত্রণা, রামের বনবাস ও পরে চিত্রকূটে ভরতমিলন দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে। এই কাণ্ডের শেষে কৃত্তিবাস একটা নূতন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংবৎসর পরে রাম-লক্ষ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সীতা তখন ফল্গু নদীর তীরে। এমন সময় দশরথ সীতাকে দর্শন দিয়া

পিণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে পিণ্ডদান করেন এবং দশরথ তাহাতে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যান। তারপর রামচন্দ্রকে সে বৃত্তান্ত বলায় তিনি উহার প্রমাণ চাহিলেন। সীতা সাক্ষীদের একে একে ডাকিলেন। বট বাদে সবাই সীতার পিণ্ডদানের কথা অস্বীকার করিল। তখন সীতা প্রথম তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে বলিলেন ঃ

'লক্ষতঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে।
ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে।।'

তুলসীগাছ যদিও শ্রীহরির আদরের ধন, তবু তাহাকে বলিলেন ঃ

'অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে।
শৃগাল কুকুর মূত্র-পুরীষ ত্যজিবে।।'

ফল্গুনদীকে শাপ দিলেন ঃ

'অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্বকাল।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুক্কুর-শৃগাল।।'

তারপর বটকে অক্ষয় অমর বর দিয়া বলিলেন ঃ

'তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল।
শীতকালে উষ্ণ হবে, গ্রীষ্মেতে শীতল।
পুনর্বার সীতা তারে দিলা এই বর।
ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর।।
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার।।
সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে।
সর্বদা আনন্দে রবে নিজ-পত্র-ফলে।।'

প্রবাদ আছে তুলসীদাস প্রথম জীবনে স্ত্রৈণ ছিলেন। সেহেতু তিনি কৈকেয়ী-দশরথের ঘটনাটা একটু দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কৈকেয়ী যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডাল কাটিল। স্ত্রী-স্বভাব অগম্য, গভীর ও গোপন। আরসির উপর নিজের যে ছায়া পড়ে তাহাও যদি ধরা সম্ভব হয়, তথাপি নারীমন জানা সম্ভব নয়। আগুন কি না জ্বালায়? সমুদ্রের ভিতর কি না প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রীলোক প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি না নাশ করে? প্রাণের রঘুনাথকে বনবাসে পাঠাইতেছেন কৈকেয়ী; সেহেতু কোপনস্বভাবা কৈকেয়ীকে তুলসীদাস প্রচণ্ডভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। এ ব্যাপারে কৃত্তিবাসও দশরথকে টিপ্পনী করিতে ছাড়েন নাই ঃ

'কৈকেয়ী যুবতীনারী, দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী-নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।।'

বনবাসকালে সীতা সঙ্গে যাইতে চাহিলে রামের নিষেধ সীতা মানেন নাই। সীতার

যুক্তিগুলি অকাট্য, সুন্দর ও বাস্তব ঃ আত্মীয়স্বজন এবং সকল স্নেহের সম্পর্ক স্বামী না থাকিলে সূর্য অপেক্ষা বেশি তপ্ত লাগে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পতিহীনার নিকট শোকের হেতু; ভোগ রোগের মতো লাগে, ভূষণ ভার বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মতো লাগে।

রামচন্দ্রের নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইবার কালে পাটনীর উপাখ্যানটি মনে হয় তুলসীদাস অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামচন্দ্র পার হইতে চাহিলে পাটনী করজোড়ে কহিল ঃ 'প্রভু, তোমার মর্ম জানিয়াছি। সকলে বলে তোমার চরণকমলের ধুলায় এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষ করিয়া দেয়। তোমার ছোঁয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী (অহল্যা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঠ ত পাথর অপেক্ষা শক্ত নয়। সুতরাং নৌকাই আমার পরিবার পালন করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। প্রভু, যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে আমাকে তোমাদের পাদপদ্ম ধোয়াইবার আজ্ঞা দাও। পারের কড়ি চাই না।' এমন সরলতাপূর্ণ প্রেমগাথা কঠোর মানুষের প্রাণেও ভক্তির হিল্লোল না বহাইয়া যায় না। প্রাচীন যুগের আশীর্বাদগুলিও কতই না তাৎপর্যপূর্ণ! সতী সীমন্তিনী সীতার বনবাসকালে শাশুড়ীরা আশীর্বাদ করিতেছেন ঃ 'যতদিন গঙ্গা-যমুনার জলস্রোত বহিবে ততদিন যেন তোমার এয়োতি থাকে।' চলার পথে গ্রামের স্ত্রীরা বলিতেছেন ঃ 'যতদিন নাগের মাথার উপর পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন তুমি স্বামি-সোহাগিনী থাক।'

কৃত্তিবাস অরণ্যকাণ্ডে গতানুগতিকভাবেই প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ামৃগ ধরিতে রামের গমন; পরে মায়াবী মারীচের ডাকে সীতাকে রাখিয়া রামের সাহায্যে গমনকালে লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডি দিয়া রাখিয়া যান। এ-গণ্ডি দেওয়ার ব্যাপার বাল্মীকি বা তুলসীদাসে নাই। তুলসীদাস আবার এখানে অধ্যাত্ম-রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তুলসীদাস চাহেন না তাঁহার ইষ্টদেবী সীতাকে রাবণ স্পর্শ করুক। তাই লক্ষ্মণের অগোচরে সর্বজ্ঞ ভগবান রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিলেন এবং পরে ছায়াসীতাকে লক্ষ্মণের হেফাজতে রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে গেলেন। এখানে তুলসীদাস রামচন্দ্রের মানুষভাব দেখান নাই।

সীতাহরণকালে কৃত্তিবাস আর এক নূতন শক্তিশালী পক্ষীর নাম করিয়াছেন। তাহার নাম সুপার্শ্ব। ইনি সম্পাতির পুত্র এবং জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ করিয়া যখন লঙ্কার দিকে দ্রুত যাইতেছিলেন তখন সুপার্শ্ব তাঁহাকে রথ সমেত গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। কিন্তু

'রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী।।'

তারপর রাবণ কোন মতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ছাড়া পান। কৃত্তিবাস আর একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রতি রামের অভিশাপ। রাম যখন 'সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন চক্রবাক রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া বলে,

'এক নারী দুইজনে রাখিতে না পারে।
নারীর উদ্দেশে তাই হৈলো দেশান্তরে।।'

রামচন্দ্র ক্রোধে দিলেন দারুণ অভিশাপ।

'স্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে কৈলা উপহাস।
স্ত্রীর গর্ব রতি-রস আজি হোক নাশ।।
রজনীতে আহার করিবে দুইজনে।
কেহ কারে না চিনিবে আমার বচনে।।'

রামচন্দ্রের নিকট হইতে চরমবিচ্ছেদের অভিশাপ পাইয়া পক্ষী ক্ষমা চাহিল। রাম বলিলেন যে দ্বাপর যুগে তোমার এ অভিশাপ খণ্ডন হইবে।

তুলসীদাসের অরণ্যকাণ্ডে আছে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের উপাখ্যান। মূর্খ জয়ন্ত রামের প্রভাব না জানিয়া কাকের রূপ ধরিয়া সীতার অঙ্গ বিদ্ধ করিল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে পারিলেন। তিনি ধনুকে খড়ের বাণ লাগাইয়া জয়ন্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রপূত বাণ জয়ন্তের পিছনে ছুটিল। জয়ন্ত প্রাণভয়ে পলাইল। দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তারপর নারদের পরামর্শে জয়ন্ত রামের শরণ লইল। রাম তাহার একটা চোখ নষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি কাকের এই দৃষ্টান্ত লইয়া ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ অধ্যায়ে এক অপূর্ব দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন ঃ বিবেকীর বুদ্ধি অবিরোধিবিষয়সুখে ও স্বরূপানন্দে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গমনাগমন করে। কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাস্ত্রঘাতের ফলে দৃষ্টি একটি মাত্র রহিয়া গেল। তাহা ক্রমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে যাতায়াত করে। দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গদ্বারা ইহা অনুমিত হয়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পম্পা সরোবরে নৈসর্গিক বর্ণনা তুলনাহীনভাবে আঁকিয়াছেন আদি কবি বাল্মীকি। মনুষ্যমনের উপর নৈসর্গিক শোভা কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কালিদাসের ঋতুসংহারে। বারো মাসের দুই দুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি ঋতুর বিকাশ এই ভারতবর্ষে ছাড়া অন্যত্র তেমনটা নাই। অন্যান্য দেশের গ্রন্থাদিতে ঋতুগুলির নাম ও বর্ণনা আছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বকীয় চিত্রপটে উহাদিগকে এমন আক্ষরিকভাবে দেখা যায় না।

পম্পার শোভা রামচন্দ্রের সীতাবিরহের সেই তীব্র জ্বলুনির উপর সাময়িকভাবে একটু প্রলেপ দিয়াছে—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পম্পার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের কতকগুলি অবিস্মরণীয় কাহিনী। এগুলি লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। আদি কবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস সেগুলি পরিবেশন করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র একদিন সরোবরতীরে তীর পুঁতিয়া রাখিবার কালে একটি ভেক বিদ্ধ হয়। রক্ত দেখিয়া রামচন্দ্র তাহাকে শব্দ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ভেক বলিল ঃ 'রাম,

যখন অপরে মারে তখন বলি—"হে রাম, তুমি রক্ষা কর।" এখন স্বয়ং রামই মারিতেছেন—কাহার আর সাহায্য চাহিব?' আর একটি কাহিনী ঃ একটি তৃষ্ণার্ত কাককে জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন। লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে কাক বলিল ঃ 'আমি অহর্নিশ রামনাম জপ করি। যদি জলপান করিতে চাই, তবে ত ঐ সময়টুকু আমার রামনাম হইবে না।' আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী ঃ রামচন্দ্র একদিন পম্পাতীরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ দেখ, ঐ বকটি কি ধার্মিক! চুপ করে বসে আছে।' রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া একটি ছোট মাছ বলিয়া উঠিল, 'হে রাম, তুমি কাহাকে ধার্মিক বলিতেছ? উঃ! তুমি ত জান না, সে আমার সমস্ত বংশ শেষ করিল।' সহবাসের দ্বারাই সহবাসীর চরিত্র জানা যায় (সহবাসে বিজানীয়াৎ চরিত্রং সহবাসিনাম্)।

রামচন্দ্র পম্পা হইতে গেলেন ঋষ্যমুক পর্বতে। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইল। তারপর বালীবধ। বালীবধের পর বালীপত্নী তারা স্বামীশোকে মুহ্যমানা হইলেন। শাস্ত্রে অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন নারীকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। স্বামীবিরহে কাতর তারা রামকে দিলেন দারুণ অভিশাপ ঃ

'আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে।
কান্দিবে সীতার তরে চিরদিন ধরে।।
এই শাপ দিনু আমি, না হবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম, হবে জ্বালাতন।।'

কৃত্তিবাস এখানে মৃত্যুপথযাত্রী বালীর মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। বালী তারাকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন ঃ

'বিধির নির্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।'

রাম সুগ্রীবকে রাজপদে এবং বালীপুত্র অঙ্গদকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বর্ষা ঋতুতে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নয়, তাই রামচন্দ্র মাল্যবান পর্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন শরৎ ঋতুর জন্য। বাল্মীকির বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা খুবই সুন্দর ও কাব্যিক। কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষা ও শরতের সঙ্গে উহার বহু সৌসাদৃশ্য আছে। তবে পার্থক্যের মধ্যে কালিদাসের বর্ণনা ভাল ভাল ভোগসামগ্রীর ফর্দমালা আর বাল্মীকির বর্ণনা সুন্দর সাবলীল। মনে হয় আদি কবি রামচন্দ্রের বিরহযন্ত্রণাকে উপজীব্য করিয়া প্রকৃতিতেও শোক-চিত্র ফুটাইয়াছেন। শরতের আগমনে সুগ্রীবকে সীতা-উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মুহ্যমান রামকে লক্ষ্মণ বলিতেছেন, 'আপনার শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে।' আর সমাধিহীন মানুষ তো বাত্যাবিতাড়িত মেঘের ন্যায়।

ইহার পর লক্ষ্মণের তিরস্কারে সুগ্রীবের চৈতন্য হইল। চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণে বানরসৈন্য প্রেরিত হইল। এখানে কৃত্তিবাস তদানীন্তন ভারতের ভৌগোলিক সীমার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণার্থে পূর্ব দিকের বর্ণনা দিয়াছেন ঃ গঙ্গা, সরযূ, গোমতী, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী; মলয়, কোকনদ, পাণ্ডব, মগধ, বঙ্গ,

মন্দরপর্বতে অবস্থিত কিরাতদেশ, কর্ণাট, শাকদ্বীপ, ক্ষীরোদ-সাগর, শ্বেতগিরি, কালোদক পর্বত, লোহিত পর্বত, উদয়গিরি প্রভৃতি। পশ্চিম দিকের বর্ণনা ঃ সিন্ধুনদ, মলয়দেশ, কাবেরীর তীর, হিঙ্গুলিয়া গিরি, চন্দ্রবান গিরি, বরাহ পর্বত, সুমেরু পর্বত প্রভৃতি। উত্তর দিকের বর্ণনা ঃ হিমালয় গিরি, কৈলাস পর্বত, অলকাপুরী, বিমলানদী, ত্রিশৃঙ্গ পর্বত, জম্বুদ্বীপ পর্বত, মন্দর পর্বত, কৌশিকী নদী, দ্রোনগিরি, পুণ্যদা নদী, হেমগিরি প্রভৃতি। দক্ষিণদিকের বর্ণনা ঃ কৃষ্ণা, নর্মদা, গোদাবরী, অশ্বমুখ গিরি, বিন্ধ্যপর্বত, মলয় পর্বত, মহেন্দ্র পর্বত, মৈনাক পর্বত, ঋষভ পর্বত, স্বর্ণলঙ্কাপুরী, যমপুরী প্রভৃতি।

প্রতি দিকের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন সুগ্রীব। ঐ সব গিরি, উপত্যকা ও নদীর মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কোথায় কি পাওয়া যায়, কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানাইয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন যে একমাসের মধ্যে সীতার খবর না আনিতে পারিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লঙ্কার দক্ষিণ দিকে তাই যোগ্য হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি পাঁচজনকে পাঠানো হইল।

হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন এবং সীতান্বেষণে লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া যখন অকৃতকার্য হইলেন তখন তিনি বিরাট মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাঁহার মনে হইল প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণবিসর্জন দিব কিংবা সাগরকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব অথবা বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক বনে বনে কাটাইব। চিরকুমার কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান হনুমান আবার ভাবিলেন যে রাজপুত্রদ্বয় ও বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে। রামচন্দ্র বলিয়াছেন ঃ 'যিনি প্রভুকর্তৃক দুষ্কর কার্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত তাহা সম্পূর্ণ করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।' বহুলোকের শান্তিসুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে—এই বোধ হনুমানকে নৈরাশ্যের ঝটিকা হইতে মুক্ত করিল। যখন বাহুশক্তি বিফল হয় তখন মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। বাল্মীকি-রামায়ণে হনুমানের এ-ভাবটি অনুপম। 'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং নিজ প্রভু সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাপসবৃত্তি ও আত্মশক্তির বিকাশের ফলে তিনি অশোকবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন। কৃত্তিবাস হনুমানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ

'যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে প্রভু তব কল্পতরু নামে।।'

হনুমান যখন লঙ্কা দগ্ধ করেন তখন তাঁহার লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য সাগরের জলে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু উহাতে জ্বালা না কমায়—

'সীতা বলে, মুখামৃত দেহ হনুমান।
এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্বাণ।।
নির্বাণ হইল জ্বালা, পুড়ে গেল মুখ।
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক, সে যে বড় দুখ।

সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলেই হবে মুখপোড়া।।'

বানরজাতির মুখপোড়ার ইতিকথা বিবৃত করিলেন কৃত্তিবাস।

রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনকালে কৃত্তিবাস এক স্বতন্ত্র পথে গিয়াছেন, কারণ বাল্মীকি-মতে সাগর বলিয়াছেন, 'বিশ্বকর্মাপুত্র নল পিতৃবরে সর্ববস্তু নির্মাণের সামর্থ্য পাইয়াছে। পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক— আমি তাহা ধারণ করিব।' সাগরের পরামর্শে রাম নলকে সাগরবন্ধনের ভার দিলেন, কারণ তাহার উপর ব্রহ্মার আশীর্বাদ ছিল ঃ

'আমি বর দেব তোরে শোন রে বানর।
তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর।।'

নল রামকে বলিল ঃ

'এক মাসে বাঁন্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছ-পাথর আনি দিক যত কপিগণ।।'

কাজ করিতে গেলে উৎকৃষ্ট কর্মীর মনেও অজান্তে একটু অভিমান আসিয়া থাকে। কৃত্তিবাস মানুষের এই মনোবৃত্তির এক অপূর্ব চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হনুমান বিরাট বিরাট পাথর মাথায় বহন করিয়া নলকে দিতেছিলেন, আর সে বাম হস্তে লইয়া সেতু বাঁধিতেছিল। হনুমানের মনে অভিমান হইল। কী আমাকে তাচ্ছিল্য! সে নলের শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য গন্ধ-মাদন ভাঙ্গিয়া লোমে লোমে পাথর বাঁধিয়া হুংকার দিয়া দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকার করিয়া নলের উপর পড়িতে উদ্যত হইল। নল রামের শরণ লইল। রাম তখন পথ আটকাইলেন এবং হনুমানের অভিমানকে শান্ত করিয়া দিলেন।

কৃত্তিবাস সেই বিখ্যাত কাঠবিড়ালীর উপাখ্যানটি বাদ দেন নাই। কাঠবিড়ালীর দল আসিল রামকার্য করিবার জন্য।

'লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে।
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।।

ফাঁক যত ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে।' বীর হনুমান যাতায়াতের বিঘ্ন দেখিয়া ঐ কাঠবিড়ালগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিলেন। তাহারা গিয়া রামের কাছে নালিশ করিল।

'হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাষ্ঠ-বিড়ালের কেন কর অপমান।।
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোঙর।।'

তারপর সহৃদয় রঘুনাথ কাঠবিড়ালের পিঠে হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহারা রাম-কর-কমলাঙ্কিত প্রীতির পরশ-রেখা স্মৃতিস্বরূপ বংশানুক্রমে বহন করিয়া চলিল।

কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডে তুলসীদাস খুবই সংক্ষিপ্তভাবে রামগাথা সারিয়াছেন।

কৃত্তিবাস উপাখ্যানের পর উপাখ্যান বলিয়া চলিয়াছেন, আর তুলসীদাস সেখানে বাল্মীকির রামচরিতের উপর দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছেন। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে নিজের রচনাশৈলীও দেখাইয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ তো কেবল রাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাইবার সোপান।

পম্পার তীরে ছোট ভাই লক্ষ্মণকে রঘুনাথ ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। তুলসীদাসের উপমার শ্রেষ্ঠতা আমরা পূর্বে অনেক বলিয়াছি। পম্পার প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে মানুষের জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন তুলসীদাস। বালীবধের পর রাম শরৎ ঋতুর জন্য পর্বতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাল্মীকি ও কালিদাসের ঋতুবর্ণনার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। এখন ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের রচনার একটু উল্লেখ করিতেছি। বর্ষা সম্বন্ধে—'রাম বলিলেন, হে লক্ষ্মণ দেখ, বৈরাগ্যব্রতপালনকারী গৃহীর বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা হয় ময়ূরগুলিরও মেঘকে দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমন মাটিতে নামিয়া আসিতেছে। সাধু যেমন খলের কথা সহ্য করে, পর্বত তেমন বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতেছে। ক্ষুদ্র নদী উপচাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায়। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া মলিন হয়, তেমনি জল মাটিতে পড়িয়া ঘোলা হইতেছে। হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদী সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল হইতেছে।' শরৎ সম্বন্ধে—'শরৎকালে রাত্রে চাঁদ রৌদ্রের তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন সাধুদর্শন পাপ দূর করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে যেমন হয়, পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি হইয়াছে। জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা ত্যাগ করে, নদী, সরোবর তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে শুকাইতেছে।' ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের এরূপ প্রচুর উপমা রহিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকের বিরক্তি ভয়ে সব দিতে পারিলাম না বলিয়া আফসোস রহিয়া গেল। এ তুলনারাশি তুলসীর নিজস্ব।

সুগ্রীব তাঁহার সীতান্বেষণকারী বানর-সেনাদের উদ্দেশে বলিলেন ঃ 'মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা যত্ন করিয়া সেই বিচারই করিবে যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ পোহাইতে হয় পিঠ দিয়া, এবং আগুন সম্মুখে রাখিয়া পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজনা করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া।' সমুদ্রলঙ্ঘনকালে জাম্বুবান হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয়, জগতে এমন কি কঠিন কাজ আছে যাহা তোমার দ্বারা হয় না। "রাম কাজ লগি তব অবতারা" অর্থাৎ তোমার জন্ম রামের কাজের জন্যই।' ভগবৎকৃপায় হনুমানের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি পর্বতপ্রমাণ হইয়া হুংকার দিয়া হেলায় সাগর লঙ্ঘন করিলেন। পথিমধ্যে সাগরোত্থিত মৈনাক পর্বত ক্ষণেকের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিতে বলিলে আদর্শ কর্মবীর হনুমান উত্তর দিলেন, 'রামকাজু কীন্হে বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম' অর্থাৎ রামের কাজ শেষ না কবা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম কোথায়? কী সুন্দর উত্তর! বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, 'প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা।' কেবলমাত্র ভদ্রতা

রক্ষার জন্য এবং মানীকে মান দিবার জন্য হনুমান মৈনাককে একটু স্পর্শ করিয়া রামকার্য সিদ্ধ করিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন।

তুলসীদাস অনেক সময় নিজেকে আড়ালে রাখিতে ব্যস্ত। হনুমানের লঙ্কাদাহ এবং পরে মেঘনাদ কর্তৃক বন্ধন সম্বন্ধে শিব-পার্বতীর কথোপকথন উত্থাপন করিয়াছেন। শিবের উক্তি ঃ 'যাঁহার নাম জপ করিয়া জ্ঞানী মানুষেরা ভববন্ধন কাটে, তাঁহার দূত বাঁধা পড়িল। ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্যের জন্য তাহাকে বাঁধাইলেন। আগুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, হনুমান তাঁহারই ভক্ত, সেজন্যই হনুমান পোড়ে নাই।' হনুমান রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরী সীতাকে এবং সীতার অভিজ্ঞান চূড়ামণি রামকে দিলেন। দূত হনুমান বন্দীদশাপ্রাপ্ত সীতার কাহিনী, নানা জ্বালা-যন্ত্রণার কথা রামকে বলিলেন আর নিবেদন করিলেন সীতার আত্মকথা ঃ 'হে নাথ, তোমাকে ছাড়িয়াও যে আমার প্রাণ যাইতেছে না, তাহা আমার চোখ দুইটির দোষ। তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। মুহূর্তেই শরীর জ্বলিতে পারে। চোখ তাহার নিজের হিতের (তোমাকে দেখিবার) আশায় জল ঢালিতে থাকে। সেইজন্য বিরহ-আগুনে দেহ জ্বলিতেছে না।' হনুমান যে সীতার বার্তা যথাযথভাবে রামকে নিবেদন করিতে পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তুলসীর কাব্যিক প্রতিভা।

এ-পৃথিবীতে অহংশূন্য মানুষেরাই প্রকৃত কর্মযোগী। রামচন্দ্রের প্রশংসার উত্তরে হনুমান বলিলেন ঃ 'প্রভু, বানরের বড় বাহাদুরী এই পর্যন্ত যে, সে ডাল হইতে ডালে যাইতে পারে। আমি লাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া স্বর্ণপুরী জ্বালাইয়াছি, রাক্ষস মারিয়া বন উজাড় করিয়া দিয়াছি—এ সব তোমার শক্তিতে। আমার কোন কৃতিত্ব নাই।' সৎসঙ্গ বর্ণনার ব্যাপারে তুলসীদাস উদার, অকৃপণ। বিভীষণ যখন রাবণের পদাঘাত খাইয়া রামের দলে চলিয়া আসিলেন, তখন শঙ্কর বলিলেন ঃ

সাধু অবজ্ঞা তুরত ভবানী।
কর কল্যাণ অখিল কৈ জানী।।

অর্থাৎ পার্বতী, সাধুর অবজ্ঞা তাড়াতাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হানি করে। ফুলের মালা গাঁথিবার কালে মাঝে মাঝে জরি বা মণি বসাইলে উহা যেমন চিকচিক করিয়া শোভা বর্ধন করে তেমনি তুলসীদাস রাম-সীতার কথা গাঁথিতে গাঁথিতে কখনও হর-পার্বতী, কখনও ভূষণ্ডী (কাক) ও গরুড়ের কথোপকথন তুলিয়া ধরিয়া উহা সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

লঙ্কাকাণ্ড সুবিশাল। 'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব' অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মতো। তাহার অন্য উপমা হইতে পারে না! কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই যুদ্ধবর্ণনা দিতে কোথাও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহাদের অতি উদার ভাবের ফলে কল্পনা লাগাম ছিঁড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বলেন্দ্রঠাকুর মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন ঃ সে কালে জমকালো অসম্ভব বর্ণনা ফ্যাশান ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে

লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি এখনকার মতো লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটকবদন, লম্বোদরবর্গের সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিনকাল গিয়াছে।

সেতুবন্ধের পরে রামচন্দ্র শিবপূজা করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে ভালুক ও বানরসৈন্যের সমাবেশ হইল। অঙ্গদ দূতরূপে রাবণসভায় প্রেরিত হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। শুরু হইল যুদ্ধ। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ বন্দী হইলেন। তারপর বিনতানন্দন গরুড় আসিয়া তাঁহাদের মুক্ত করেন। রাম বর দিতে চাহিলে—

'গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে।।
শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে।।'

রামের আপত্তি ছিল যে ঐরূপ ধরিলে কপিগণ, বিশেষত ভক্ত হনুমান মনে কষ্ট পাইবে। কারণ যাহাদের ইষ্টনিষ্ঠা থাকে, তাহারা নিজের ইষ্টকে কখনও অন্যরূপে দেখিতে চায় না। তাই বিনতানন্দন পক্ষ বিস্তার করিলে—

'ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে।।

ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।' ভক্তের চোখ এড়ানো অত সহজ নয়। হনুমান সব দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল এই বিখ্যাত শ্লোক ঃ

'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।'

অর্থাৎ শ্রীনাথ বা বিষ্ণু ও জানকীনাথ উভয়েই এক, পরমাত্মা। তবুও আমার যথাসর্বস্ব সেই কমললোচন রামচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণে গরুড়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহা কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

প্রথম যুদ্ধের দিন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলেন না, কারণ তাহাতে যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

'আজি তোরে মারিলে বিপদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি তোর অনেক বাঁচিবে।।
একলক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি।।'

কী বিরাট গোষ্ঠীর বর্ণনা দিলেন কৃত্তিবাস। রাবণ একবার শিবের দ্বারী বানরমুখো

নন্দীকে টিটকারি করায়—

'নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর।।
কপিমুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ।।'

সেই অভিশাপ কার্যে ফলিতে চলিল।

রাবণবধের পূর্বে কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বধ হইল। বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের কাহিনী কৃত্তিবাসের নিজস্ব। ধার্মিকপুত্র তরণীসেন আসিল যুদ্ধক্ষেত্রে।

'অঙ্গে লেখা রাম-নাম রথ চারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্মিক বক আসিয়াছে রণে।।'

যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি তরণীর স্তব এবং কোমলহৃদয় রঘুনাথের অশ্রুসিক্ত ছবিখানি অপূর্ব। তরণীর বাসনা ছিল রামচন্দ্রের হাতে মরণ। তাই আবার নিজ মূর্তি ধরিয়া শুরু করিল যুদ্ধ। দুর্ধর্ষ বীর তরণীসেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে শিখাইয়া দিলেন, একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া উহার মরণ হইবে না। রাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ ধনুতে জুড়িয়া তাহাকে বধ করিলেন।

'দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে।।'

পিতা হইয়া ধর্মের জন্য পুত্রকে বধের তৎপরতা—কৃত্তিবাসেব এ-কাহিনী ধর্মের আদর্শকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। যেমন করিয়াছিল মহাভারতে গান্ধারীর 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' বাণী।

কৃত্তিবাসের কল্পনার বাহাদুরী আছে। রাবণের শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে হনুমান ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন। আবার এদিকে দুপুররাত্রে রাবণ সূর্যকে উদয় হইতে আদেশ দিলেন। ঐ শক্তিশেলে এমন নিয়ম ছিল যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের প্রাণ শেষ হইবে। সেই উদয়গামী সূর্যের প্রতি হনুমান ধাওয়া করিয়া তাঁহার রথের ঘোড়া প্রভৃতি নষ্ট করিয়া মিতালি করিলেন। ভানু-হনুর মিতালি ও কোলাকুলি এবং পরে হনুর বগলের নিচে ভানুর অবস্থান—সেই চরম দুর্যোগের মুহূর্তে হাস্যরসের হিল্লোল তুলিয়াছে।

আর একটি ঘটনা মহীরাবণ কর্তৃক মায়াবলে রামলক্ষ্মণহরণ। হনুমান শতযোজন লেজ দিয়া দুর্গ তৈরি করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে রাখিলেন। বিভীষণ রহিলেন ঐ গড়ের প্রহরী।

মহীরাবণ মায়াবলে বিভীষণের রূপ ধরিয়া রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া যান। অবশেষে হনুমান সেখানে গিয়া মহীরাবণ এবং তাহার সদ্যোজাত সন্তান অহিরাবণকে বধ করিয়া রামলক্ষ্মণকে বাঁচাইয়া লইয়া আসেন। তারপর শুরু হইল রাবণবধের পরিকল্পনা। রাবণবধের জন্য দেবীর অকালবোধন, ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও পূজা শুরু হইল। একশত আট পদ্ম আনিলেন হনুমান। পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে একটি কম পড়িল।

'নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।।'

ইহার আর প্রয়োজন হইল না। দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া অভীপ্সিত বর দান করিলেন।

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নূতন নূতন উপাখ্যানের শেষ নাই। হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ অন্য কোন রামায়ণে দেখা যায় না। কথিত আছে রাবণের প্রতি শিবের বর ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে—

'হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে জোড়া দিবে।।'

ঘরসন্ধানী বিভীষণ বলিলেন, রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে। একমাত্র মন্দোদরী জানে উহা কোথায়। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে চলিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার ছলনা করিয়া স্ফটিকের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া সেই মৃত্যুবাণ আনিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণবধ করিয়া ভূভার হরণ করিলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। মন্দোদরীর বিলাপে ব্যথিত রামচন্দ্র তাহাকে 'জন্মায়তী' বর দিয়া ফেলিলেন। স্বামীহীনা নারী কি করিয়া ঐ বর পাইবে? তাই রামচন্দ্র আশীর্বাদ করিলেন,

'শুন মোর বাণী—গৃহে যাও রানী—দুঃখ না ভাবিও চিতে।
রাবণের চিতা—রহিবে সর্বথা—চিরকাল থাক আয়তে।'

তাই প্রবাদ আছে যে রাবণের চিতা এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতা নিভিলে তবে ত বৈধব্যের প্রশ্ন।' 'নারীরাই অধিক নারীবিদ্বেষী'—এ প্রবাদ রামায়ণেও দেখা যায়। মন্দোদরী আদর্শ সতী নারী হইয়াও শাপ দিয়াছেন সীতাকেঃ

'তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।
পুরী-সহ রাবণে নাশিয়া কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।।
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।।'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র চলিলেন অযোধ্যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অভিশাপোক্তির ছড়াছড়ি। পদ্মানদীর প্রতি গঙ্গার অভিশাপ, দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, বামদেবের প্রতি বশিষ্ঠের, ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুর প্রতি

সীতার, রামের প্রতি তারার, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি রামের, সীতার প্রতি মন্দোদরীর, রাবণের প্রতি নলকুবেরের ও নন্দীর অভিশাপ। তখনকার যুগে মনে হয় ভুল করিলে আর মার্জনা ছিল না। মানুষ ছিল বাক্‌সিদ্ধ। আর অভিশাপই ছিল ভুলের দণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাসের মতো উপাখ্যান বা বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার রামচরিতের উদ্দেশ্য ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন! তাই প্রতি কাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ-বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসন্তোষসম্পাদানো নাম তুলসীকৃত' ইত্যাদি।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাসের আরম্ভটা অনেকটা ম্যাজিকের মতো। রামচন্দ্র দক্ষিণদিকে মেঘ ও বিদ্যুৎ দেখিলেন এবং মৃদু-মধুর মেঘধ্বনি শুনিলেন। বিভীষণ বলিলেন ঃ প্রভু, মেঘ ও বিদ্যুৎ নয়। লঙ্কার হর্ম্যশীর্ষে মেঘরঙের ছাতার নিচে রাবণের নৃত্যগীতের ঘটা চলিতেছে। মন্দোদরীর কানের দুল হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্পহারী রামের বাণ রাবণের মাথার মুকুট ও মন্দোদরীর কানের দুল কাটিয়া আবার তূণে ফিরিয়া আসিল।

অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের সভায় পাঠানো হইল। বহু বাদানুবাদের পরে ত্রিভুবনজয়ী রাবণ সাধারণ মানুষ রামের ভয়ে ভীত নয় বলায় অঙ্গদ বলিল ঃ ওরে চরিত্রহীন মূর্খ, রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল? কামদেব কি সাধারণ ধনুকধারী? গঙ্গা কি সাধারণ নদী? কামধেনু কি সাধারণ পশু? কল্পতরু কি সাধারণ গাছ? অন্নদান কি সাধারণ দান? অমৃত কি সাধারণ রস? গরুড় কি সাধারণ পক্ষী? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর? বৈকুণ্ঠ কি সাধারণ লোক? রামভক্তি লাভ কি সাধারণ লাভ? রামচন্দ্র মানুষ নন—এ-কথা বুঝাইতে যত উপমার দরকার তুলসী সব যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। যে হরি ও হরের নিন্দা শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়। রামনিন্দা শুনিতে না পরিয়া দূত অঙ্গদ ক্রোধে রাবণের চারিখানি মুকুট কাড়িয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকট ছুঁড়িয়া মারিল। পরে রাম উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গদ বলিল ঃ 'প্রভু, উহা মুকুট নয়, রাজার চারিটি গুণ। বেদে বলে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারিগুণ রাজার হৃদয়ে থাকে। এই চারিটি হইতেছে নীতিধর্মের পা। মনে মনে ইহাই জানিয়া গুণগুলি ধর্মভ্রষ্ট রাবণকে ত্যাগ করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছে। তুলসীদাসের ব্যাখ্যাগুলির বেশ একটা মৌলিকতা আছে।

শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের জন্য রামের হাহুতাশ খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলসী ব্যক্ত করিয়াছেন। রামের উক্তি ঃ 'ভাই, পাখাহীন পাখি, মণিহীন সাপ ও শুঁড়হীন হাতির যে অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখে তবে তোমা বিনা আমার অবস্থাও তেমনি হইবে। স্ত্রীর জন্য ভাই হারাইয়া অযোধ্যায় কোন্ মুখে যাইব?' তুলসীদাস তাঁহার প্রভুকে সাধারণ মানুষের মতো দুর্বলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না। তাই শিবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ 'উমা, রঘুরাজ এক ও অখণ্ড, তবুও ভক্তবৎসল রাম মানুষের অবস্থা দেখাইতেছিলেন।'

নরম থাকের মানুষ তুলসীদাসের যুদ্ধ বর্ণনা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এক্ষেত্রে কৃত্তিবাস তুলসীদাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রাবণ যখন রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন তখন বিভীষণ রথহীন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'বিনা রথে তুমি বীর রাবণকে কেমন করিয়া জিতিবে?' প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন; 'সখা শোন, যাহাতে জয় হয় সেই রথ আমি আনিয়াছি। সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্য; উহার ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান বিচারশক্তি; ইন্দ্রিয়সংযম ও পরহিত উহার ঘোড়া; ক্ষমা ও কৃপা হইতেছে লাগাম; ঈশ্বর-ভজন চতুর সারথি; বৈরাগ্য ঢাল; সন্তোষ তলোয়ার; দান কুঠার; বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি বা শেল; শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক; পবিত্র স্থির মন তূণীর; শান্তি, অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম ও বহিরিন্দ্রিয়-সংযম নানা বাণ; ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা অভেদ্য বর্ম। ইহাদের মতো জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, যাহার এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে পারে এমন শত্রু কোথাও নেই।' তুলসীদাস এক অপূর্ব রথরূপক উপস্থিত করিলেন। এইরূপ দৃঢ়রথে আরূঢ় ব্যক্তিই একমাত্র অজেয় সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে। এ ধরনের রথ-কল্পনা কঠোপনিষদেও আছে।

যাহা হউক, রামচন্দ্রকে পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি-সহ নিজের রথ পাঠাইয়া দিলেন। শুরু হইল তুমুল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের বৃথা আস্ফালন ও দুর্বাক্যের উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন 'বড়াই করিয়া যশ নাশ করিও না। সংসারে তিন রকম লোক আছে—গোলাপ, আম ও কাঁঠালের মতো। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দুইই দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর একজন কেবলই করে, বলে না।' যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের নীতি-উপদেশ শুনিয়া রাবণ প্রথমে হাসিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন করিয়া বজ্রের মতো বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধে মায়াবী রাবণের মায়াজাল মায়ধীশ রামচন্দ্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। 'রঘুপতি সর সির কটেহু মরঈ' অর্থাৎ রঘুপতিশরে রাবণের মাথা কাটে, কিন্তু রাবণ মরে না। এ-কাহিনী শুনিয়া সীতা ত্রিজটাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল : 'রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আর সীতার হৃদয়ে রামের বাস এবং রামের ভিতরে রহিয়াছে গোটা বিশ্বভুবন। যদি সেখানে বাণ লাগে তবে সকলের নাশ হইবে। তবে মাথা কাটায় রাবণের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে তখনই বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে বাণ মারিবেন।' অদ্ভুত কল্পনা তুলসীদাসের। তিনি নিজে আর যুদ্ধ বর্ণনা না দিয়া শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবিদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

রাবণের নাভিতে ছিল অমৃতকুম্ভ। বিভীষণ রামকে বাণদ্বারা ঐ অমৃত শুকাইয়া ফেলিতে বলিলেন। ফলে বধ হইল দশগ্রীব রাবণ। অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে যান—ইহা আমার পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতাকে এখন কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাম আদেশ করিলেন। পবিত্রতার আগুনে সদাবেষ্টিত সীতাকে প্রভু রামচন্দ্র ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা করিলেন। লেলিহান অগ্নি অকলঙ্কিনী সীতার সতীত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া বিদায় লইলেন। তারপর শুরু হইল অযোধ্যায় ফিরিবার পালা।

উত্তরকাণ্ডে কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করিলেও কোথাও কোথাও 'জৈমিনি ভারত' হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাণ্ডে অগস্ত্য ঋষি পুরাণকথা বলিয়াছেন। অতি সুন্দর সে-সব কথা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে নানা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে; তবুও উহার মূল ভাবটি কোমলতা, মৃদুতা ও মধুরতার দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের মাটি বড়ই নরম ও স্নিগ্ধ। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—এঁদের কথাই তো ভারত-চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে করুণা, সহানুভূতি ও নয়নে ভক্তির অশ্রু— ভারতবাসী তাহাকেই হৃদয়ে বরণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস ভারতের এই মর্মকথা জানিতেন বলিয়া তাঁহার কথা মর্মে প্রবেশ না করিয়া যায় না।

উত্তরকাণ্ডের প্রারম্ভে কৃত্তিবাস অগস্ত্য ঋষির দ্বারা এক অপূর্ব কথা শোনাইলেন।

'চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীর মুখ না করে দর্শন।।
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে।।'

অযোধ্যার রাজসভায় সকলে হতবাক্ হইয়া গেল। রামচন্দ্র বলিলেন, 'আমি ত লক্ষ্মণকে নিজ হাতে ফল দিয়াছি, সঙ্গে সীতা ছিল; সুতরাং ইহা কি করিয়া সম্ভব?' লক্ষ্মণকে সভায় ডাকা হইল। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'আপনি "ধর" বলিয়া ফল দিতেন, খাইতে ত বলেন নাই। সীতাহরণ কালে আপনার হয়ত মনে আছে আমি সীতার পরিত্যক্ত হার চিনিতে পারি নাই, কিন্তু নূপুর চিনিতে পারিয়াছিলাম। আপনি ও সীতা যখন কুটিরে নিদ্রিত থাকিতেন, তখন ধনুর্বাণ হাতে প্রহরীরূপে থাকিতাম। নিদ্রাদেবী আমার কাছে আসিলে আমি তীর দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলাম চৌদ্দ বৎসর পরে আসিতে।' এ-পৃথিবীতে কোন বিরাট কর্ম করিতে গেলে কী বিরাট আত্মত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন—তাহাই দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। উপবাস বা ব্রত, ব্রহ্মচর্য বা সংযম, নিদ্রাজয় বা তামসপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের মধ্যেই রহিয়াছে বিজয়ের সম্ভাবনা।

লক্ষ্মণের ত্যাগের প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একখানি ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে: 'লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকার আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে-গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও উপেক্ষিত। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে -কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল। ...পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই

শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?'

সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস বেশি করিয়া গাহিয়াছেন। বিচ্ছেদ-বেদনা মানবমনকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। নির্বাসিতা সীতার হাহুতাশ অত্যন্ত কঠিন হৃদয়েও দোলা না দিয়া যায় না। বাল্মীকির তপোবনে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যে বিস্তৃত যুদ্ধকাহিনী কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছেন—অন্য কোন রামায়ণে ঐরূপ দেখা যায় না। একদিকে দুইটি কিশোর বালক—লব-কুশ—অপর দিকে শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যার অজস্র চতুরঙ্গ সেনা। শত্রুঘ্নের পতনের পর যুদ্ধে আসিলেন ভরত ও লক্ষ্মণ এবং তাঁহাদের পতনের পর আসিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। কী অদ্ভুত রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। রাবণবিজয়ী পরাস্ত হইলেন আপন পুত্রদের কাছে। সীতা জানিতেন না লব-কুশ কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সীতা আশীর্বাদ করিয়া বলিতেছেন ঃ

'কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি।।'

যুদ্ধরহস্য সীতা বুঝিলেন, লব-কুশ যখন হনুমান ও জাম্বুবানকে বাঁধিয়া আনিল। সীতা শুনিলেন রামের পতনকথা। ছুটিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জ্বালিলেন আগুন প্রাণাহুতির উদ্দেশ্যে। বাল্মীকি আসিয়া পড়ায় সব বিপদ কাটিয়া গেল। সবাই পুনর্জীবিত হইলেন।

বিচ্ছেদের পর মিলন মধুময় লাগে। কেবল-মিলনের ভিতর সুখ থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে মাধুর্য বা গরিমা নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেই মিলনসুখ বেশি অনুভূত হয়। রাম-সীতার ক্রমাগত বিচ্ছেদ ভক্তহৃদয়ে ভগবৎ-বিরহের ভাব জাগাইয়া দেয়। একটির পর একটি পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত। আন্তরিকতার উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ দারুণ মর্মবেদনার কারণ হয়। আপবাদে লাঞ্ছিতা সীতা স্বামীর কাছে শেষ আক্ষেপ করিলেন ঃ

'জন্মে জন্মে প্রভু, তুমি হয়ো মোর পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি।।'

সীতার পাতালপ্রবেশ পর্বে কৃত্তিবাসের এই উক্তি আমাদের বেদুইন কবি বেন ইদ্রিশের রচিত কবিতাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি ইদ্রিশ ছিলেন অমৃতলোকে বিশ্বাসী। তাই তাঁহার রচনায় ফুটিয়াছে এক অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেম। ঐ প্রেমের নাম 'বেদুইন প্রেম।' এ জগতে মিলন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম ত বিফল হইবার নয়। সীতার হৃদয়ের প্রেম তাঁহাকে অমরত্ব দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে পৃথিবী হইতে বৈকুণ্ঠে। শ্রীরামচন্দ্রও নরদেহ ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন।

'সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে।।'

এই মিলনই চরম মিলন, পরম মিলন।

উত্তরকাণ্ডে তুলসীদাস একদম স্বতন্ত্র। তিনি চিরাচরিত বাল্মীকির উপাখ্যানের দিকেই গেলেন না। রাবণ মরিল। মনোরাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় রামরাজ্য বসিল। আবার এদিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে যে রামরাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের জুড়ী হইল। তুলসীদাস এই সব কাহিনী নিজে না শোনাইয়া শিব-পার্বতী এবং কাকভূষণ্ডী গরুড়ের মারফত শোনাইয়াছেন। তুলসীদাস সীতার বনবাস দেখান নাই। প্রাণের রঘুবীরকে কষ্ট দিতে তিনি চাহেন না—তাই মনে হয় দেখান নাই। আবার একটি মত আছে—বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার বনবাস পর্বটা প্রক্ষিপ্ত; ঐজন্যও হয়ত তুলসীদাস ওদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামরাজ্যের অধিবাসী হইতে ব্যস্ত। তাহার মতে একমাত্র ভক্তি হইতেছে ঐ রাজ্যের প্রবেশের পাঞ্জা বা ছাড়পত্র।

রামরাজ্যের অপূর্ব বর্ণনা দিয়া কাকভূষণ্ডী গরুড়কে বলিলেন ঃ 'রামরাজ্যে রাজার হস্তস্থিত দণ্ড গিয়া সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি হইল। কারণ সেখান হইতে সমস্ত অপরাধ চিরদিনের জন্য বিদায় হইল। রাজার ভেদনীতি অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন গেল নর্তকদের সমাজে; সুরতালের জন্যই ভেদ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পররাজ্য জয়ের আর প্রয়োজন হইল না। কারণ রামরাজ্যে পরই কেহ রহিল না—জয় করিবে আর কাহাকে? জয় করিবার কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে। এই হইল রামরাজ্য।

তুলসীর উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশ কাকভূষণ্ডী ও গরুড়ের কথোপকথনে পূর্ণ। রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া গরুড়ের মনে সন্দেহ জাগিল—এ কী ব্যাপার! যাঁহার নাম জপ করিয়া মানুষ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তুচ্ছ রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাঁধিল! বিভ্রান্ত গরুড় সন্দেহ নিরসনের জন্য ছুটিল প্রথমে নারদের কাছে, তারপর ব্রহ্মা ও শিবের কাছে। শিব তাহাকে পরম রামভক্ত ভূষণ্ডীকাকের কাছে পাঠাইলেন। স্বয়ং বিষ্ণুবাহন পক্ষিরাজ গরুড় একটা নগণ্য কাকের কাছে সেই রামতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। ভূষণ্ডী অনেক কিছু বলিয়া শেষে মন্তব্য করিল ঃ হে খগপতি, এখন আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন ছাড়া ক্লেশ যায় না। রামকৃপা ভিন্ন রামের প্রভুত্ব জানা যায় না। না জানিলে বিশ্বাস হয় না, আর বিশ্বাস না হইলে প্রীতিও হয় না। প্রীতি ছাড়া ভক্তি হয় না, আর হরিভক্তি বিনা কি সুখ হয়? নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন স্থির হয়? হে পক্ষিরাজ, রামের কৃপা ছাড়া স্বপ্নেও মন শান্তি পায় না। অতএব

'অস বিচারি মতি ধীর ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল।
ভজহ রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ।।'

অর্থাৎ ইহা বুঝিয়া কুতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ করিয়া হে স্থিরবুদ্ধি, তুমি সুখদায়ক, সুন্দর, করুণাময় রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর। ইহা কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ ভূষণ্ডীকাকের কথা নয়, তুলসীদাসেরও মনের কথা।

লোকে প্রবাদ আছে, যে ঋণ অপরিশোধ্য, উহার উল্লেখ দ্বারা ঋণ-ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াছেন। কবিভূষণের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণে আমার মতো স্বল্প হিন্দী জানা লোকের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধরিয়া রামচরিত-রূপ মানসসরোবর পার হইয়াছি। অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন—এ-কথা অল্পবিশ্বাসী মানুষ বুঝিতে পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয় স্বদেশী আন্দোলন কালে জেলে না গেলে এ গ্রন্থ রচনা হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার আত্মকথা ঃ 'এবারকার জেলে জেলখানার গোশালার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। গোশালার তিন বেলার কাজ করিয়া যে সময় বাঁচিত, তাহা রামায়ণ-অনুবাদ কাজে লাগাইতাম।' দীর্ঘকাল ব্রত উদ্‌যাপনের পর ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন খুব আনন্দ হয়। দুই বিরাট কলেবরযুক্ত গ্রন্থ পরিক্রমার পর সেই কথা মনে হইতেছে।

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া ছুটি পান নাই। কারণ যুগে যুগে তাঁহাদের রামগান করিয়া মানুষকে মুক্তির কথা শোনাইতে আসিতেই হইবে। রামচরিত-কীর্তন ছাড়া তাঁহাদের আজ কাজ নাই। যুগে যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে রাম আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে অন্যায়-রাবণ দশ মাথায় দশ ইন্দ্রিয় লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশ মুণ্ড কাটিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়া রাবণকে নিজের বশে আনিয়া ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়া সীতা হরণ করিতেছে। সীতাকে তো সে অপবিত্র করিতে পারে না, সত্যকে মলিন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম আসিয়া রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার করেন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সেই ট্রাডিশান সমানেই চলিয়াছে।

রামকথার ইতি নাই। হে সজ্জন পাঠক, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস দুইজনেই সুর করিয়া রাম-গান শোনাইবার জন্য ডাকিতেছেন। কৃত্তিবাস বলিতেছেন ঃ

'রাম-নাম জপ ভাই, অন্য-কর্ম মিছে।
সর্ব-ধর্মকর্ম রাম-নাম-বিনা মিছে।।'

তুলসীদাস বলিতেছেন ঃ

'রামহিঁ' সুমিরিয় গাইয় রামহিঁ।
সন্তত সুনিয় রামগুণ গ্রামহিঁ।।'

অর্থাৎ রামকেই স্মরণ করিবে, রামকেই গাহিবে, সর্বদা রামের গুণগ্রাম শুনিবে। হে পাঠক, ক্রমাগত শুনিতে থাকুন। যদি মনে করেন রামায়ণের ওসব আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া কি হইবে? দোহাই! না শুনিয়া বলিবেন না কি হইবে। যখন ঐ দুই সাধক-কবি শুনিতে ডাকিতেছেন, তখন একবার শুনিয়াই দেখুন।

নির্দেশিকা

গ্রন্থ তালিকা ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ

ধর্ম প্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ চন্দ্র দত্ত

সৎপ্রসঙ্গে—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ—সুরেশ চন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমল কৃষ্ণ মিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি

উদ্বোধন (পত্রিকা)

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরী

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণিদেবী—কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা—অক্ষয় কুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা

ব্রহ্মানন্দ লীলা কথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

ভক্ত মনোমোহন

গৌরীমা

শ্রীম দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর প্রসঙ্গ—স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

নবযুগের মহাপুরুষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন

স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—সংকলক ঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী

যোগোদ্যান মাহাত্ম্য

শ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদা শংকর দাশগুপ্ত

স্বামী সারদানন্দের জীবন—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য

শিবানন্দ বাণী

সাধু নাগ মহাশয়—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ

সৎপ্রসঙ্গ—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীমকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবন ও সাধনা

Sri Ramakrishna and His Disciples—Sister Devamata

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভগবত-গীতা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

মন ও মানুষ, ৩য় খণ্ড—আমার জীবন কথার পাণ্ডুলিপি—অতুল চন্দ্র ঘোষ

চৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চৈতন্য ভাগবত

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী—রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীমদাচার্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধনা ও উপদেশ—শ্রীঅমৃতলাল সেন

আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ

Prabhuddha Bharat 1925 pp 532-33

জননী সারদাদেবী—স্বামী অপূর্বানন্দ

ব্রহ্মানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ

শিবানন্দ বাণী (২য় ভাগ)
তত্ত্ব মঞ্জরী (পৌষ, ১৩১০ সাল)
Days in an Indian Monastery—Sister Devamata
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র
মহাপুরুষজীর পত্রাবলী
পরমার্থ প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ
পরমার্থ প্রসঙ্গে—গোপীনাথ কবিরাজ
ঋতম্ভরা
যোগদর্শন—মহর্ষি পতঞ্জলি
স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ
স্বামী গোপালানন্দের স্মৃতিকথা—সংগ্রাহক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
Vivekananda : East meets West—Christopher Isharwood
সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—সম্পাদনা ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস
আদি কথামৃত
কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ
হাসির গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও সাধনা—বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ—সুশীল কুমার গুপ্ত
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ
গিরীশচন্দ্র—অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার—সংকলক ঃ কুমার কৃষ্ণ নন্দী
মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরী প্রসাদ বসু
স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা
কঠ উপনিষদ্
ছান্দোগ্য উপনিষদ্
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
স্বামিজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ
প্রেমানন্দ—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ
শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা
শিবানন্দ স্মৃতি সংগ্রহ
স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম প্রসঙ্গ—স্বামী ওঁকারানন্দ
Vivekananda Centenary Volume p. 170
যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
Swami Vivekananda in the West : New Discoveries—Marie Louise Burke
Vedant and the West
স্মৃতিকথা—স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ
Letters of Sister Nivedita Vol II — Ed. Sankari Prasad Basu